বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক
(১৯৭১-২০০০)

মো: এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক (১৯৭১-২০০০)

ড. মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ হতে এম.এস.এস (প্রথম স্থান) ডিগ্রী লাভ করার পর ২০০০ সালে তিনি উক্ত বিভাগ থেকে প্রথম এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। ইউ.জি.সির পিএইচ.ডি ফেলো হিসেবে ২০১১ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী একটি দৈনিক পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে ১৯৯৪ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। ২০০৪ সালে প্রভাষক হিসেবে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে যোগদানের পূর্বে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (IIUC)-এর সহকারী অধ্যাপক ছিলেন এবং প্রায় এক দশক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক, ওয়ার্ডেন ও রেজিস্ট্রারের দায়িত্বসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ড. পাটওয়ারী অনেক শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। বিভিন্ন সময়ে তিনি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট লক্ষীপুরের সাধারণ সম্পাদক, লক্ষীপুর পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর টিচার্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি, চিটাগাং ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এর প্রথম পরিচালনা পর্ষদের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী বর্তমানে লক্ষীপুর জেলার রায়পুর আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (BIIT) চিটাগাং চ্যাপ্টারের সেক্রেটারী এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগরীর জয়েন্ট সেক্রেটারী, সেন্টার ফর দাওয়া এন্ড ইসলামিক রিসার্চ (CDIR)-এর নির্বাহী পরিচালক এবং চ.বি রাজনীতি বিজ্ঞান এলামনাই এসোসিয়েশনের ট্রেজারারের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া (IIUM) থেকে শিক্ষা প্রশাসনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ইতোমধ্যে তাঁর দুইটি পুস্তক এবং বিভিন্ন গবেষণা জার্নাল ও পত্রিকায় ২৫টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। IIUC'র প্রথম 'বার্ষিকী'সহ ৬টি প্রকাশণাকর্ম তিনি সম্পাদনা করেছেন। জাতীয় গুরুত্বপুর্ন ইস্যুতে দৈনিক নয়াদিগন্ত, ইনকিলাবসহ বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন ও প্রশিক্ষণ উপলক্ষে তিনি সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, নেপাল, ভারত, সৌদি আরব ও দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার Incheon National University-তে Post Doc Research Fellow হিসেবে গবেষণায় নিয়োজিত আছেন।

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক (১৯৭১-২০০০)

মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী

অ স ডা র
পাবলিকেশন্স

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক (১৯৭১-২০০০)
মো: এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৪

ISBN: 978-984-90583-0-4

প্রচ্ছদ : মো. শাহজাহান কাজী

অসডার পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত, ২৪/২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, *বাণিজ্যিক কার্যালয় :* ১৩১, ডি.আই.টি. এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ এবং অসডার প্রিন্টার্স কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : দেশে ঃ ৬৫০.০০ টাকা, বিদেশে ঃ ২৫ মার্কিন ডলার

Bangladesh Islami Rajneetir Tin Dashak (1971-2000), (Three Decades of Islamic Politics in Bangladesh 1971-2000), Written by Md. Enayet Ullah Patwary, Published by Osder Publications, 24/2 Eskaton Garden, Dhaka-1000, *Business Office:* 131 DIT Extension Road, Dhaka-1000. Bangladesh and printed by Osder Printers in Bangladesh, March 2014.

Price : Local - BDT 650.00, Foreign - US$ 25

উৎসর্গ

আমার আম্মা
মোসাম্মৎ হোসনে আরা বেগম রেনু (মরহুমা)
আমার পিতা
ডাঃ মোঃ আমিন পাটওয়ারী (মরহুম)
এবং আমার শ্বশুর
জনাব নজির আহাম্মদ মজুমদার (মরহুম)-এর
আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ
তাঁদের পবিত্র স্মৃতিতে নিবেদিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী দলসমূহের ভূমিকা (১৯৭১-২০০০)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে আমি পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করি। **বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক (১৯৭১-২০০০)** পুস্তকটি আমার পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মের উপর ভিত্তি করে রচিত। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি আমার শিক্ষক এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ এর প্রতি যাঁর বিজ্ঞ নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং উৎসাহের ফলে আমার পিএইচ.ডি গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এবং বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণাকর্মের কোর্স ওয়ার্ক সমাপ্ত করার জন্য বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রফেসর ড. মখদুম-ই মুলক মাশরাফীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর ড. ইউ.এ.বি রাজিয়া আকতার বানু (মরহুমা) আমার গবেষণা কর্মের বাৎসরিক অগ্রগতি মূল্যায়নে কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর জন্য উচ্চ মর্যাদা কামনা করছি। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও যাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ আমাকে গবেষণা কর্মটি শেষ করতে সাহস যুগিয়েছে বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী (মরহুম), প্রফেসর ড. এম. বদিউল আলম, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, প্রফেসর ড. মাহফুজুল হক চৌধুরী, প্রফেসর এফ. আর. এম. জিয়াউন নাহার খান, প্রফেসর ড. রাশিদা খানম, প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধূরী, প্রফেসর ড. আ.ন.ম. মুনির আহমদ, প্রফেসর ড.ভূইয়া মনোয়ার কবির, প্রফেসর ড. এম. ইমদাদুল হক, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, প্রফেসর শেখ জহির আহমেদ, প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকীসহ রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষক ও সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্বশুর জনাব নজির আহাম্মদ মজুমদারের (মরহুম), কৃষি ব্যাংকের প্রাক্তন সহকারী মহাব্যবস্থাপক-এর প্রতি যাঁর অবিরত তাগিদ এবং অনুপ্রেরণা আমাকে গবেষণায় সক্রিয় রেখেছে। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। পিএইচ.ডি থিসিস্ মূল্যায়ন বিষয়ক কাজে কষ্ট স্বীকার করার জন্য সম্মানিত পরীক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর ড.ইউ.এ.বি রাজিয়া আকতার বানু এবং জাহাঙ্গির নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের বরিষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর এম. সলিম-উল্লাহ খানের নিকট কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রইলাম। সামগ্রিকভাবে তাঁদের পরামর্শ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

গবেষণা কর্মের উপাত্ত সংগ্রহ এবং সাক্ষাৎকার প্রদান করে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক

সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাক্ষাৎ প্রদানকারী উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন: মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, মুফতি মাওলানা ফজলুল হক আমিনী, চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্যজোট, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, মাওলানা রেজাউল করিম, আমীর, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন, মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ, আমীরে শরীয়ত, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, আবদুল লতিফ নেজামী, মহাসচিব, ইসলামী ঐক্যজোট, মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, মহাসচিব, খেলাফত আন্দোলন প্রমুখ।

গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমাকে পিএইচ.ডি ফেলোশিপ প্রদান করে ধন্যবাদার্হ হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষাছুটি প্রদান করে গবেষণার কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার সুযোগ প্রদান করেছেন। এই জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ সেমিনার লাইব্রেরী, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা সংগ্রহশালা, মাওলানা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচারবিভাগের সংগ্রহশালা, খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংগ্রহশালা ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অসডার (OSDER) পাবলিকেশন্স বইটি প্রকাশে এগিয়ে এসেছে। এ জন্য 'অসডার' পাবলিকেশন কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রচ্ছদ এবং অক্ষর বিন্যাসের দায়িত্ব পালন করেছেন মো. শাহজাহান কাজী। তাঁকেও জানাই ধন্যবাদ।

দীর্ঘদিন গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার সহধর্মিণী উম্মে সালমা নাজনীন পারিবারিক কাজে অত্যধিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমাদের সন্তানরা- রাফী, তানহা, ওয়াসী এবং রাদিয়া তাদের প্রাপ্য পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের সকলের প্রতি রইল দোয়া ও শুভাশীষ।

মো: এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

পূর্বকথা

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মুসলিম জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। এখানে সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অষ্টম শতক থেকে প্রথমে আরব মুসলিম বণিক এবং পরবর্তীতে মুসলিম মুবাল্লিগদের মাধ্যমে ইসলামের চিরন্তন শান্তি ও সাম্যের বাণী এ ভূখন্ডে প্রচারিত হতে থাকে। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর শাসন ক্ষমতায় আরোহনের মাধ্যমে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। এরপর থেকে ইসলাম বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় আদর্শ হিসেবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এবং তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের রয়েছে সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ইতিহাস। সুপ্রাচীন তথা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে এ ভূখন্ডের ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা জানা যায়। প্রাচীন বঙ্গ, বঙ্গাল (বঙ্গ+আল) থেকে বাংলা অত:পর আজকের বাংলাদেশ। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এখানে মনুষ্য বসতি ছিল বলে ধারণা করা হয়। আর্য ছাড়াও আরো চারটি প্রধাণ জাতি এখানে বসবাস করেছে। জাতিগুলো হলো নেগ্রিটো, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়। তবে দ্রাবিড় ও আর্যদের মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিরোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আর্যরা দ্রাবিড়দের উপর আধিপত্য বিস্তার করে শৌর্য-বীর্যের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাস শুরু করে।

বাংলাদেশের তিন দিক তথা উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে প্রতিবেশী ভারতের সীমান্ত। দক্ষিণ-পূর্বাংশে সীমান্তের কিছু অংশ মায়নমার সাথে সম্পৃক্ত। দক্ষিণ দিক জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শত সত্তর বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ ক্ষুদ্র দেশটিতে প্রায় ষোল কোটি মানুষের বাস। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। তবে ঘনবসতির দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় রয়েছে।

অনেক রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাইয়ের পর বাংলাদেশ বর্তমান অবস্থানে এসেছে। প্রাচীন বাংলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের রয়েছে কয়েক হাজার বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। এ ভূখন্ড শাসন করেছে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্রাট, রাজা, সুলতান-নবাবগণ। বাংলার শৌর্য-বীর্যের কথা প্রাচীন ল্যাটিন ভাষার ইতিহাস পুস্তকেও উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন যুগে সামন্ত রাজা বৈন্যগুপ্ত, মহারাজা শশাংক, পাল বংশ, এবং সেন বংশের শাসকগণ এ ভূখন্ড শাসন করেণ। অত:পর ১২০৪ সালে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা অভিযানের সময় হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত

করে বাংলার শাসন ক্ষমতায় আরোহন করেণ। বখতিয়ার খিলজির এই বিজয়ের পর শুরু হয় বাংলার মুসলিম শাসন। অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় আরো পূর্বে-৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বছর (১২০৪- ১৭৫৭)-এ ভূখন্ড মুসলিম শাসকদের অধীনে শাসিত হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের 'পলাশীর প্রহসনমূলক' যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয় এবং মৃত্যুর পর দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন। প্রায় এক শত নব্বই বছর চলে এ শাসন। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের এক শত বছরের মধ্যে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয় বৃটিশ ভারতের প্রথম সশস্ত্র 'স্বাধীনতা যুদ্ধ'। এ যুদ্ধেও নেতৃত্বের আসনে ছিল মুসলিম জনগণ।

বৃটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ভারতের মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে মাইলফলক। মুসলিম লীগের আন্দোলন-সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রধানত: বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতার পটভূমিতে পাকিস্তান তার অখন্ডতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়নি। বিশেষত: পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের রাজনৈতিক বঞ্চনা ও নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিক্ষোভ ও সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উন্নত বা অনুন্নত যে কোন সমাজে ধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সব সময়ই পরিলক্ষিত হয়েছে। খৃষ্টীয় সমাজে দীর্ঘ দিন ধর্মের একচ্ছত্র ক্ষমতা চর্চা হয়েছে। খৃষ্টান ধর্মের একচেটিয়া ভূমিকার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্রোহ ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জন্ম হয়েছে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের। ইসলাম বিশ্বাসীদের মতে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে জাতির পথনির্দেশিকা। ইসলাম শুধুমাত্র একটি পারলৌকিক ধর্মের নামই নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে রয়েছে ইসলামের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনীতি বিজ্ঞানের জনক এ্যারিস্টটলের মতে মানুষ জন্মগতভাবে রাজনৈতিক জীব। সত্যিকার ভাবে মানুষের পূর্ণতা একমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সম্ভব। তাই রাজনৈতিক কর্মকান্ড জীবনের একটি ব্যাপক অংশ জুড়ে আছে। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক কোন বিষয় নয়। ইসলাম হচ্ছে একটি সামগ্রিক সংস্কৃতির নাম। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা আচার আচরণ ইসলামের গন্ডী থেকে পৃথক কোন বিষয় নয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় আদর্শ হিসেবে ইসলাম এখানকার মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলামী দলগুলো ইসলামের রাজনৈতিক বিধি বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেমনিভাবে ইসলামের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতিতেও ইসলাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক স্বার্থে হলেও ইসলামকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। ইসলামী দলগুলো প্রত্যক্ষভাবে ইসলামকে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ ঘোষণা করে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী দলগুলোর প্রভাব প্রতিপত্তি নানান যাত্রায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এবং প্রায় সকল রাজনৈতিক ইস্যুতে ইসলামী দলগুলো তাদের ভূমিকা রেখে আসছে। নিকট অতীতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলো ক্ষমতার ভারসাম্যর (Balance of power) ভূমিকা পালন করে। তাই বংলাদশের রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা মূল্যায়নের দাবী রাখে। এ লক্ষ্যে আমার পিএইচ.ডি গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। গবেষণার ভিত্তিতে রচিত বর্তমান পুস্তকটি মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলো হচ্ছে: ভূমিকা, ইসলাম ও রাজনীতি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশের রাজনীতি, খেলাফত আন্দোলন: ইসলামী রাজনীতির নতুন অধ্যায়, ইসলামী ঐক্যজোট ও অন্যান্য ইসলামীদলের রাজনৈতিক ভূমিকা, জঙ্গিবাদ ও বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী রাজনীতির সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং উপসংহার।

ভূমিকায় ধর্মের ভূমিকা, ধর্ম ও রাজনীতি, ইসলামী রাজনীতি: তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ধারা, মুসলিম বিশ্বের রাজনীতি ও ইসলাম ধর্ম, রাজনৈতিক উন্নয়ন: পাশ্চাত্য ও ইসলামী ধারণা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিণ্যাস আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় "ইসলাম ও বাংলাদেশের রাজনীতি" শিরোনামে বাংলায় ইসলাম আগমনের সময় ও কারণসমূহ, মুসলিম জীবন-যাপনে ইসলামের প্রভাব, মুসলিম শাসন পতনের কারণ এবং ইংরেজ শাসনবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন, পাকিস্তান পরবর্তী মুসলিম রাজনীতি এবং বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। দলটির প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, পাকিস্তান আন্দোলন এবং পরবর্তী অগ্রগতি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর জামায়াতের পুনর্গঠন থেকে শুরু করে নব্বয়ের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনসহ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে। নির্বাচন এবং সংসদে জামায়াতের ভূমিকাও আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল খেলাফত আন্দোলনের রাজনৈতিক কার্যক্রম তুলো ধরা হয়েছে। জাতীয় ঐক্য গঠন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে তাঁর ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামী ঐক্যজোট এবং এর প্রধান দু'শরিক ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এবং খেলাফত মজলিশের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচীসহ রাজনৈতিক ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ট অধ্যায়ে জঙ্গি তৎপরতায় ইসলামী দলগুলোর অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে সন্ত্রাস সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলাদেশে ইসলামের নামে জঙ্গি তৎপরতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির

প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার পর ইসলামী দলগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী দলগুলোর উত্থানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ কারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে উক্ত অধ্যায়ে।

এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলোর ভূমিকাসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দলিল সংযোজিত হয়েছে। আশা করি সংযোজিত দলিলগুলো পরবর্তী সময়ের বিশ্লেষক ও গবেষকদের তথ্য সংগ্রহের অন্যতম একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো দীর্ঘসময় থেকে রাজনীতি করে আসলেও বিভিন্ন কারণে এখনো রাজনীতিতে নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। তবে দলগুলো অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ কেটে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে সময়ের ব্যবধানে ইসলামী দলসমূহের একটি কার্যকর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব কিছু নয়।

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্তকরণ তালিকা

আই ডি এল : ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
আই ও জে : ইসলামিক ঐক্যজোট
ই ছা শি : ইসলামী ছাত্র শিবির
ই শা আ : ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
ইউ এন ও : উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ইউ পি পি : ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি
ইশা ছা আ : ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন
এন ডি এফ : ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
এন জি ও : বেসরকারি সাহায্য সংস্থা
চা ক সু : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
জা পা : জাতীয় পার্টি
জা স দ : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
জা ই বা : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
জে এম বি : জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ
জে এম জে বি : জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ
পি পি আর : পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন
পি ডি পি : পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি
পাস : পার্টি ইসলাম মালয়েশিয়া
বি এন পি : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
বি জে পি : ভারতীয় জনতা পার্টি
বি ডি পি : বাংলাদেশ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
বাকশাল : বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ
রা ক সু : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
সি পি বি : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
সি এন আর এস : সেন্টার ফর ন্যাশনাল এন্ড রিজিয়নাল স্টাডিজ
সি ই সি : প্রধান নির্বাচন কমিশনার
ADAB : Association of the Development Agencies in Bangladesh
AL : Awami League
BNP : Bangladesh Nationalist Party
BWP : Workers Party of Bangladesh
BML : Bangladesh Muslim League
BMA : Bangladesh Medical Association
CEC : Chief Election Commissioner
COP : Combined Opposition Parties
CNRS : Center for National and Regional Studies
CUCSU : Chittagong University Central Students Union
CPB : Communist Party of Bangladesh

DAC	:	Democratic Action Committee
EPR	:	East Pakistan Rifle
IOJ	:	Islami Okkay Jote
IDL	:	Islamic Democratic League
JIB	:	Jammat-e Islami Bangladesh
JSD	:	Jatiya Samajtantrik Dal
MPO	:	Monthly Pay Order
MNA	:	Member of National Assembly
MPA	:	Member of Provincial Assembly
NAP	:	National Awami Party
NGO	:	Non Government Organisation
OIC	:	Organisation of Islamic Conference
OPEC	:	Organisation of Petroleum Exporting Countries
PPR	:	Political Parties Regulation
PDM	:	Pakistan Democratic Movement
PDP	:	Pakistan Democratic Party
PSA	:	Public Safety Act
RUCSU	:	Rajshai University Central Students Union
UPL	:	University Press Limited
UPP	:	United Peoples Party

সারণি তালিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

রাজনীতি এবং সমাজ পরিবর্তনে ধর্ম ও আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম একটি কার্যকর সামাজিক শক্তি। সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস তার রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অনেক রাজনৈতিক দল ধর্মভিত্তিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসও রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান এবং তারা ধর্মপ্রাণ। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করার কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়। অনুসারীদের নিকট ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক কোন বিষয় নয়। রাজনীতি ধর্মীয় বিধি-বিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমান বিশ্বে পরিপূর্ণ অর্থে কোন ইসলামী রাষ্ট্র না থাকায় ইসলামের রাজনৈতিক ভূমিকা সুস্পষ্ট নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর বলে ধারণা করার অবকাশ রয়েছে। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকলেও শাসন কার্যক্রমে ইসলাম পরোক্ষভাবে হলেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় দলগুলোর মধ্যে কয়েকটি ইসলামকে তাদের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজ-উদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ' বছর প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান শাসকগণ এ ভূখন্ড শাসন করেন। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে প্রায় দু'শ বছর মুসলমানগণ ইংরেজদের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়। মুসলমানদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন, সংগ্রাম এবং অনেক রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হলেও পাকিস্তান কখনো পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়নি। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তানী নেতৃত্বের সংঘাত জনগণকে হতাশ করে। অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী এবং প্রতিষ্ঠার পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগের নেতৃত্ব জনপ্রিয়তা হারায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতার কারণে সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির বৈষম্যমূলক আচরণ, শোষণ, নির্যাতন নিষ্পেষণের বিরুদ্ধেও এই ভূখন্ডের জনগণ আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণে সামরিক শাসক আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিতে বাধ্য হন। দীর্ঘ অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ফলে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোটামুটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্রের পরিণামে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। জেনারেল ইয়াহিয়া খান অগণতান্ত্রিক পন্থায় অগ্রসর হন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালোরাত থেকে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী সে অসমযুদ্ধে সর্বস্তরের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক-জনতার অসাধারণ ত্যাগ ও জীবন উৎসর্গের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বিশ্বের মানচিত্রে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম এক নতুন রাষ্ট্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২৪-৭৫) নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের সকল ধারা স্থগিত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী পাস করা হয়। এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র হতে দেশ রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক ডিক্রির মাধ্যমে দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে সে দলের চেয়ারম্যান পদে আসীন হন। বাকশাল ছাড়া অন্য সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা খুব বেশি দিন কার্যকর থাকার সুযোগ পায়নি। কারণ, ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক নেতার সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর একটি অংশের হাতে শেখ মুজিব তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নিহত হন। ১৫ই অগাস্টের অভ্যুত্থানের পর মুজিব সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে নতুন এক সরকার গঠিত হয়। প্রায় ৮০ দিনের মাথায় বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতাচ্যুত হন। বন্দী করা হয় তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম নতুন রাষ্ট্রপতি হন। সাত নভেম্বর (১৯৭৫) সিপাহী-জনতার এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াউর

রহমান বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান এবং তখন থেকেই তিনি ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে স্বাধীনতা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষক এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ২০ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশ (পিপিআর) ঘোষণার ফলে বহুদলীয় রাজনীতি চর্চার পথ সুগম হয়। পি.পি.আর-এর আওতায় ১৯৭৬ সালে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) গঠিত হয়। সেই দলে মূলত পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), নেজাম-ই-ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর প্রাক্তন নেতা-কর্মীগণ সমবেত হন এবং তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকেন। আইডিএল- মুসলিম লীগ জোট ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ২০টি আসন লাভ করে। প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১০.০৭ ভাগ পায় এ জোট। ইসলামী দলগুলোর ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের অব্যবহিত পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং উল্লেখযোগ্য (আসন প্রাপ্তির দিক থেকে দলীয়ভাবে তৃতীয় স্থান) আসন ও ভোট লাভ ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অশীতিপর বৃদ্ধ এবং রাজনীতিতে প্রায় অপরিচিত মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহর (হাফেজ্জী হুজুর) অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনে তৃতীয় স্থান লাভ তখনকার রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অনেকে তাঁর সফলতাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী প্রবণতার একটি সূচক হিসেবে গণ্য করেছেন।

১৯৭৮ সালের ১লা মে থেকে রাজনৈতিক দল বিধি (পি.পি.আর) তুলে নেয়া হয়। ১৯৭৯ সালের ২৫-২৭ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নতুনভাবে তাদের প্রকাশ্য কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা শুরু করেন জিয়াউর রহমান। কিন্তু নির্বাচনের দু'বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রামে কিছু বিপথগামী সেনা অফিসারের হাতে জিয়াউর রহমান নিহত হন। অতঃপর তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি বিপুলভোটে বিজয়ী হন এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু চার মাসের মাথায় তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন। তিনি সংবিধান স্থগিত করেন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির মহান লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ২১ বছরের মধ্যে ১৬ বছরই সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশটি শাসন করেছে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের এক বছরের মাথায় সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। দীর্ঘ প্রায় নয় বছর এ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে দু'জোটের (১৫ ও ৭ দল) সাথে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতনের পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক ভোট ও আসন লাভ করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন ইসলামী দলগুলোর অবস্থান দৃঢ় হয়। নির্বাচনোত্তর অস্থিতিশীল পরিবেশে ইসলামী দলগুলো তখন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে দেশকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য দলীয়ভাবে বিএনপি সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী নিঃশর্ত সমর্থন প্রদান করলে বিএনপি সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়। সরকার গঠনে বিএনপি'কে সমর্থন দিলেও জামায়াত সরকারে যোগদান করেনি। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের এ সুসম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াত যুগপৎ আন্দোলন করে। বিরোধী দলের দাবি উপেক্ষা করে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করলেও সে সংসদ মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী ছিল। আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে বিএনপি সরকার ৬ষ্ঠ সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে (এবং শেষ অধিবেশন) তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পদত্যাগ করে বিএনপি সরকার।

১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সে নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। প্রায় একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। ১৯৯৯ সালে শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিরোধী দলের আন্দোলনে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক জোট। বিএনপি, জাতীয় পার্টি (জাপা), জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। সে জোট শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ নির্বাচন এবং বিজয়ী হলে সরকার গঠনের ঘোষণাও দেয়। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। চারদলীয় ঐক্যজোট ৩০০ সংসদীয় আসনে জোটগতভাবে প্রার্থী দিয়ে উক্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে সংসদে অর্জন করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

পূর্ব সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা মোতাবেক জোট সরকার গঠন করা হয়। জোটের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামী থেকে দু'জন সদস্য মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামীর মাত্র ৩০ বছরের ব্যবধানে সরকারে অংশগ্রহণ রাজনৈতিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আওয়ামী লীগ এবং বাম রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এসব তথ্য উপাত্ত প্রমাণ করে যে, ১৯৭৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে ইসলামী দলগুলো নানান ধরনের বিরোধিতার শিকার হয়েছে। এর পরও এসব দলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ব্যাপক সমালোচনা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো এখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম একটি শক্তি। তাই ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা মূল্যায়নের দাবি রাখে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে ।

তাত্ত্বিক কাঠামো

বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ প্রায় তিনদিক জুড়ে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের কিছু অংশ মায়ানমারের (বার্মা) সাথে সংযুক্ত। দক্ষিণে রয়েছে বিশাল বঙ্গোপসাগর। অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সামজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে এ ভূখন্ডের জনগণ দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতার তিন যুগ পরও জাতি প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হয়নি। এ ব্যর্থতার জন্য রাজনৈতিক দল এবং নেতৃত্বকে দায়ী করা হয়। একটি দেশের উন্নতির অন্যতম নিয়ামক শক্তি হচ্ছে রাজনৈতিক দল এবং এর নেতৃত্ব। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতি দ্বারাই আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সরকার এবং রাজনীতি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সরকার রাজনীতিরই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে সরকার থাকবে, সেখানে রাজনীতি থাকবেই। ধ্রুপদী চিন্তাধারায় রাজনীতি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। উক্ত চিন্তাধারায় রাজনীতিকে বিবেচনা করা হতো সামাজিক অস্তিত্বের সার হিসেবে। এ্যারিস্টটল-এর মতে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে পারে।[১] অবশ্য ষোড়শ শতাব্দী থেকে রাজনীতির এ ব্যাপকতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে রাজনীতি শব্দটা অনেকটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ক্ষমতাই বর্তমান রাজনীতির মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-এর মতে, রাজনীতি হচ্ছে আন্তঃরাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের মধ্যকার দলগুলোর ক্ষমতায়

অংশগ্রহণ বা ক্ষমতা বিতরণে প্রভাব বিস্তার করার সংগ্রাম।[২] হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল (Harold Lasswell)-এর ভাষায়, রাজনীতির পাঠ হচ্ছে ক্ষমতা ও প্রভাবশালীদের অধ্যয়ন।[৩] রাজনৈতিক দল আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য উপাদান। আমরা জানি, রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন কাঠামো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ব্যবস্থাটিকে সচল রাখে। সরকার, রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দল একই সূত্রে গাঁথা। রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান জটিল দলীয় ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল। আজ থেকে দেড়শ' বছর আগেও রাজনৈতিক দল এতোটা সুসংগঠিত ও সুশৃংখল ছিল না। রাজনৈতিক দলকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উদ্দেশ্য, গঠন প্রক্রিয়া বা কার্যাবলীর দিক থেকে রাজনৈতিক দলকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। দল বলতে সাধারণতঃ রাজনৈতিক দলকেই বোঝানো হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানী মুরিস ডুভারজার (Maurice Duverger) রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি রাজনৈতিক দলের কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন।[৪] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রয়াস পেয়েছেন। ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এডমান্ড বার্ক (Edmand Burke)-এর মতে, জাতীয় স্বার্থ পূরণে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐকবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।[৫] Encyclopedia of Britannica-তে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে: The term Party, has since come to be applied to all organised groups seeking political power whether by democratic election or by revolution.।[৬] আর এম. ম্যাকাইভার (R.M. MacIver)-এর মতে, "বিশিষ্ট এক অর্থনীতির ভিত্তিতে একত্রিত ও সুসংগঠিত হয়ে যারা বৈধ উপায়ে সরকার গঠনে প্রয়াসী সে জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলে।[৭] এইচ.জে. ল্যাস্কির (H. J. Laski) মতে, জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে নির্বাচকমন্ডলীর সমর্থন লাভে প্রচেষ্টা চালনাকারী ব্যক্তিসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলে।[৮] সামগ্রিক অর্থে রাজনৈতিক দল হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কার্যনীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন যা জনগণের সমর্থন লাভের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়।

যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক উন্নয়নে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, জনমত গঠন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিকট গণদাবি পেশ, নাগরিকদের চিন্তা ও কর্মের পার্থক্য হ্রাসের মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কার্যরত একটি রাজনৈতিক দল সাধারণত সম্পন্ন করে থাকে।[৯] আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সরকারের

স্থিতিশীলতা রক্ষা, গোষ্ঠীসমূহকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং তাদের আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণক্ষম করে গড়ে তোলার দায়িত্বও রাজনৈতিক দলকে পালন করতে হয়।[১০]

ইসলামের উৎপত্তি আরবী পদবাচ্য 'সিলমুন' থেকে যার অর্থ শান্তি। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে ইসলাম অর্থ শান্তি, ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু এ শান্তি লাভ বা প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজ বিষয় নয়। ইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল এ শান্তি লাভ করা সম্ভব। পারিভাষিক অর্থে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন মানব জাতির হেদায়েত বা পথ নির্দেশের জন্য যুগে যুগে নবী এবং রাসুলদের মাধ্যমে যে সকল বিধি বিধান পাঠিয়েছেন সেগুলোর সমষ্টি। ইসলাম সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম হচ্ছে জীবন পদ্ধতির নাম। মানুষের জটিল জীবনের যতদিক এবং বিভাগ রয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যন্ত, সকল বিষয়ে ইসলামের নিজস্ব নির্দেশনা রয়েছে।

ধর্ম, রাষ্ট্র এবং একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি বা সভ্যতা বোঝাতে ইসলাম পদবাচ্যটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১১] ইসলাম শব্দটিকে যখন ধর্মীয় অর্থে প্রয়োগ করা, হয় তখন বোঝান হয় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, বিশ্বাস ও আচরণকে। যখন রাজনৈতিক অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়, তখন বোঝান হয় এমন রাষ্ট্র যার আইনের ভিত্তি হল ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, জীবনের সকল দিক এবং বিভাগের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। এটি মানবজাতির জন্য নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশিকা, পার্থিব জীবনের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করেছে।[১২] ইসলাম তথা ইসলামী শরীয়াহ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, "আজকের এ দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ করে দিলাম। আমার যে নিয়ামত তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হচ্ছিল তা আজ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে আমি মনোনীত করলাম"।[১৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনীতি এবং ধর্ম পৃথক কোন বিষয় নয়। ইসলামের উত্থান-এর ধর্ম এবং রাজনীতির স্বাভাবিক ও অবিমিশ্র মতাদর্শিক শক্তির কারণেই।[১৪] ইসলামে গড়ে ওঠেছে এক বিস্তীর্ণ আইন বিজ্ঞান (Jurisprudence) বা ফিক্‌হ। সমাজ কাঠামো তথা মানুষে মানুষে সম্পর্কে এমন কোন দিক নেই যা এ আইন বিজ্ঞানের আওতায় আসেনি। ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ একজন পন্ডিত বলেছেন, ইসলামে সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন সম্পর্কে যতটা উৎসাহ গোড়া থেকেই দেখান হয়েছে, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ঠিক ততটা দেখান হয়নি।[১৫] বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতির দিক থেকে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম এবং জীবন ব্যবস্থা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা এবং তা বিশ্বজনীন। জীবন ব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামেই

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ সকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর নবী- মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। ইসলামের বিধি বিধানের কার্যকারিতা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় বরং পৃথিবীর ধ্বংসের দিন পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে। ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা, বর্ণ, গোত্র বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট নয়। বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন বর্ণের মানুষের জন্য ইসলামের দরজা উন্মুক্ত। বিশেষ কোন যুগ বা কালের গন্ডিতে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম চিরন্তন এবং শাশ্বত। ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম। ইসলাম মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কোন কিছু চাপিয়ে দেয়নি। বৈধ পন্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে মানুষের জৈবিক সকল চাহিদা পূরণে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধি বিধান রয়েছে। ইসলাম মানুষের জৈবিক সত্বা ও আত্মার সুসমন্বয় সাধন করেছে। ইসলাম একদিকে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিয়েছে, অপরদিকে তাকে সামাজিক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ করেছে। নিজস্ব চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে বৈধ উপায়ে সম্পদ আহরণ করতে ইসলামে কোন নিষেধ নেই। কিন্তু উপার্জিত ধন-সম্পদের অপচয় ইসলাম অনুমোদন করেনা। সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম বিশ্বাসীদের ভূমিকা রাখতে হয়। স্বাধীনতা এবং কর্তব্যবোধ দু'টোর অভাবনীয় সমন্বয় রয়েছে ইসলামে।

ইসলামী দলগুলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচি নিয়ে প্রচেষ্টা চালায়। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইসলামী আদর্শের প্রচার, জনগণকে সংগঠিত করা, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা ইসলামী দলগুলোর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল হচ্ছে সেগুলো যেগুলো ইসলামকে দলের নামে এবং দলীয় আদর্শে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে।[১৬] ইসলামী দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নেতাদের ইসলামের জ্ঞান থাকা, সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল বা কাজ করা, ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের দায়িত্ব আমানতদারির সাথে পালন করা, কর্মী বাহিনীর মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা চালানো ইত্যাদি।[১৭]

বাংলাদেশে বেশকিছু ইসলামী দল থাকলেও রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বেশি নয়। প্রায় সকল ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং ইসলামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 'স্বাধীনতাবিরোধী' ভূমিকার কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে জেলে আটক রাখে। ফলে স্বাধীনতার পর দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকে ইসলামী দলগুলোর প্রকাশ্য তৎপরতা। অবশ্য গোপনে ইসলামী দলগুলো তাদের কার্যক্রম সীমিত পর্যায়ে চালু রাখে। মূলত ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো আবার সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাজনীতি করার সুযোগ পাওয়ার পর প্রথমেই আত্মপ্রকাশ করে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)। মূলত

জামায়াতের মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭৬ সালে জামায়াত এবং আরো কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের যৌথ উদ্যোগে আইডিএল গঠিত হয়। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আইডিএল- মুসলিম লীগ জোট ২০টি আসন লাভ করে। পরবর্তিতে ১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ স্বনামে আত্মপ্রকাশ করলে অধিকাংশ আইডিএল নেতাকর্মী জামায়াতে প্রত্যাবর্তন করে। আইডিএল নামে রাজনৈতিক দলটি তখন মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে বলবৎ থাকে। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী) অংশগ্রহণ করেন। তাঁর তওবার রাজনীতির অংশ হিসেবে ১৯৮১ সালের শেষ দিকে গঠন করেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন। আমীরে শরীয়ত হিসেবে তিনি এ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন আমলে বেশ কয়টি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) এম.এ. জলিল গঠন করেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। স্বাধীনতা উত্তর বাম রাজনীতির শক্তিশালী সংগঠন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত ১১ দলীয় সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম দল ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। এ পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর)। খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পর কওমী ধারার মাদ্রাসাগুলোর উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক আলেম এ দলে যোগদান করেন। কিন্তু নেতৃত্বের মতানৈক্য হওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে দলটি ভেঙ্গে যায়। চরমোনাইর পীর এবং খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাওলানা ফজলুল করিম খেলাফত আন্দোলন থেকে বের হয়ে ১৯৮৭ সালে গঠন করেন বাংলাদেশ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। বাংলাদেশ ইসলামী যুবশিবির, আইডিএল এবং খেলাফত আন্দোলনের একটি অংশ মিলিত হয়ে ১৯৮৯ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। এ মজলিসের আমীর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক। বাংলাদেশের রাজনীতিতে একক ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াত এবং জোটগতভাবে 'ইসলামী ঐক্যজোট' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরশাদ সরকারের পতনের পর ২২ ডিসেম্বর দেশের বিশিষ্ট ওলামা, মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবী এবং ৭টি ইসলামী দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় ইসলামী ঐক্যজোট নামে একটি সম্মিলিত জোট গঠিত হয়। সে জেটের অপর শরিকদলগুলো হচ্ছেঃ জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, নেজাম-ই-ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ফরায়েজী জামায়াত, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলো তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা রেখে আসছে। বক্তৃতা বিবৃতি, সভা সমাবেশ, মিছিল ধর্মঘট পালনের ন্যায় প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাড়াও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। সরকার গঠনে তাদের নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতেও দেখা গেছে। সংসদ অধিবেশনগুলোতে তাদের ভূমিকা ছিল গঠনমূলক এবং দায়িত্বশীল। তাছাড়া জনগণকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, জনমত গঠন, কর্মী বাহিনীকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণসহ রাজনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিকে ভূমিকা রাখতে দেখা যায়। বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলা না গেলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান মতে এ সংখ্যা কমপক্ষে ৬০/৭০। রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমজাদ হোসেনের মতে, ইসলামপন্থী দলের সংখ্যা ৭৬টি।[১৮]

তবে ইসলামের বা ইসলামী দলের নামে যারা জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত তাদের আমরা ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচনা করছিনা। অপর পক্ষে সকল ইসলামী দলের কার্যক্রমকে এ আলোচনায় আনা সম্ভব নয়। আমরা প্রধানত সে সমস্ত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলকে বিবেচনায় এনেছি যারা বাংলাদেশের রাজনীতির মূলস্রোতের সাথে সম্পৃক্ত, গণতান্ত্রিক পন্থাকে ক্ষমতা পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে মেনে নিয়েছে, ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলোতে (রাষ্ট্রপতি এবং সংসদ নির্বাচন) নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন বা ভোট পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় বা রাজনৈতিক সংকটে যে সমস্ত দল সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে, বইটিতে তাদের অবদানও মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে। এ সকল বিবেচনায় ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে প্রধানত নিম্নোক্ত দলগুলোর তৎপরতাকে মূল্যায়ন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে:

১. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ;

২. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন;

৩. বাংলাদেশ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন;

৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস;

৫. ইসলামী ঐক্যজোট।

এছাড়া সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ফরায়েজী জামায়াত, নেজাম-ই-ইসলামসহ অন্যান্য ছোট দলের ভূমিকাও প্রাসংগিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাবলীগ জামায়াত, মাদ্রাসা, খানকাহ্ এবং পীরদের ভূমিকা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ না হলেও এ সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়। এ সকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও প্রাসংগিক আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। জঙ্গিবাদ বর্তমানে সারাবিশ্বে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদের উত্থান পরিলক্ষিত হয়েছে। ইসলামে জঙ্গিবাদের স্থান এবং বাংলাদেশের জঙ্গিসংগঠনগুলোর সাথে মূলস্রোতের ইসলামী দলগুলোর সম্পর্কের মূল্যায়নেরও চেষ্টা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে ভূমিকা বলতে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিকট যে আচরণ প্রত্যাশা করা হয় তাকে বোঝায়। ভূমিকা হল সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ায় ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত অর্জিত আচরণের পর্যাক্রমিক বিন্যাস (Patterned sequence) এবং কোন বিশেষ মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য পালন।[১৯] ভূমিকা বলতে ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক তৎপরতা যেমন ঃ সম্মেলন, মিছিল, জনসভা-সমাবেশ, ধর্মঘট, হরতাল, বিভিন্ন ইস্যুতে বক্তব্য-বিবৃতি, প্রস্তাব গ্রহণ, জাতীয় সংসদে দলগুলোর তৎপরতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

ধর্ম ও রাজনীতি

ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মণীষীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলেও ধর্ম বলতে সাধারণভাবে অতিপ্রাকৃতিক এক নিয়ন্ত্রক শক্তিকে বিশেষত: স্রষ্টার আনুগত্যকে বোঝায় যার প্রভাব মানুষের আচরণ এবং বিশ্বাসে প্রতিফলিত। ধর্ম হচ্ছে অদৃশ্য এক মহাশক্তির স্বীকৃতি, বিশ্বাস এবং আনুগত্যের নিয়মপদ্ধতির সমন্বিত রূপ বা ব্যবস্থা। ধর্ম এক ধরনের মূল্যবোধ যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাসকে জাগ্রত রাখে এবং বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য, বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে।[২০] ডার্কহেইস এর মতে, ধর্ম হলো সুসমন্বিত বিশ্বাসমালা এবং অনুশীলন ব্যবস্থা যা পরমার্থিক এবং পবিত্র বিষয় দ্বারা গঠিত এবং যা মানব সমাজকে সম্প্রদায়ভুক্ত করে।[২১] সৃষ্টির শুরু থেকে ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও ধর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়েছে। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মণীষীগণ ধর্মের ব্যাপারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক মন্তব্য করে আসছেন। থমাস ফুলার জোর দিয়ে বলেন ভাল জীবন একমাত্র ধর্মেই সম্ভব। উইলিয়াম পেন (William Penn)-এর মতে, স্রষ্টা এবং মানুষকে ভালবাসা ছাড়া ধর্ম আর অন্য কিছুই নয়। থমাস পেইন (Thomas Paine) লিখেছেন, "পৃথিবী আমার দেশ, সব মানুষই আমার ভাই এবং ভাল কিছু করাই আমার ধর্ম।" বিপরীতপক্ষে অনেক দার্শনিক এবং বুদ্ধিজীবীর লেখায় ধর্মের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ হয়েছে। তন্মধ্যে কঠোর সমালোচনা করেছেন সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিকগুরু কার্ল মার্কস। তিনি ধর্মকে আফিম এর সাথে তুলনা করেছেন। সমাজতন্ত্রীদের মতে, ধর্ম শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ধর্ম সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যবহৃত একটি হাতিয়ার। ধর্মে প্রদত্ত স্বর্গীয় রাজ্যের প্রতিশ্রুতি, পরলোকে সুখী জীবনের মিথ্যে আশ্বাস দ্বারা শ্রমজীবী মানুষকে বাস্তবের সবচেয়ে প্রকট সমস্যাগুলো থেকে, একটা যথার্থ মানবিক ন্যায্য সমাজব্যবস্থার জন্য শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে বিপথগামী করে। ধর্ম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিকোণের ভয়ানক বিরোধী। বহু শতাব্দী ধরে গীর্জা বিজ্ঞানকে দমন করেছে এবং বিজ্ঞানীদের উৎপীড়ন করেছে।[২২]

পাশ্চাত্যের উন্নত, প্রাচ্যের উন্নয়নশীল বা অনুন্নত নির্বিশেষে সকলপ্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার আচরণগত পর্যায়ের অভ্যন্তরে ধর্ম বিভিন্ন মাত্রায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করে চলেছে। ধর্ম সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েবারের ব্যাখ্যা এবং মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা না করেও সাধাশুরু সমীকরণে বলা যায়, অকম্যুনিস্ট সামাজিক সংগঠনের অভ্যন্তরীণ চালিকাশক্তিগুলোর (inner forces) মধ্যে ধর্ম এক শক্তিশালী উপাদান। সমাজস্থ পরস্পর ক্রিয়া ব্যবস্থার (Social interaction) ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা ম্যাক্স ওয়েবার আবিষ্কার করেছেন। মার্কস ধর্মের 'ক্ষমতাকে' অস্বীকার করেননি বরং ধর্মকে এতো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন যে, বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার উপায় এবং উৎপাদন সম্পর্কের স্থিতি রক্ষার্থে তথা শ্রেণী শোষণের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন ।[২৩] শুধু ট্রাডিশন্যাল সমাজ ব্যবস্থাই নয়, বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দেশগুলোতেও ধর্ম আচরণ নির্ধারণে অন্যতম প্রভাবশালী উপাদান।

ধর্ম সর্বকালে সকল সমাজে একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে কমবেশি ক্রিয়াশীল রয়েছে। তবে সমাজে কালভেদে এর প্রভাব এবং কার্যকারিতা কম-বেশি হতে দেখা যায়। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্রই ধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবেও ধর্ম ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান বিশ্বে ১০টি প্রধান ধর্ম এবং অগণিত অপ্রধান ধর্ম রয়েছে।[২৪] ম্যাথিউ আর্নল্ড (Mathew Arnold)-এর মতে, ধর্ম মানবজাতির কর্মকান্ডে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।[২৫] রাজনীতিতেও বিশেষত দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ তৈরিতে ধর্ম সবচাইতে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে। বস্তুত ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তির জীবনীশক্তি এবং তার কর্মতৎপরতার মাত্রাধিক অনুপ্রেরণা। ব্যক্তির জীবনে ধর্ম সবচাইতে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। ধর্ম ও রাজনৈতিক ক্রিয়ার পরস্পর সম্পর্ক বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আঙ্গিকে লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামো ও কার্যের এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার পার্থক্য সূচিত করা হয়। সভ্যতার শুরুতে মানুষ যখন থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে, তখন থেকেই ধর্ম ও রাজনীতি পারস্পরিক সম্পর্কের সূচনা হয়েছে। প্লেটো - পূর্ব গ্রীক সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা (কতিপয় ব্যতিক্রম ভিন্ন) একই সমগ্রের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হত ।[২৬]

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং বিভক্তির পেছনেও ছিল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো প্রধানত: ইসলাম, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এ সকল রাষ্ট্রের জনগণের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীল। উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক আধুনিকীকরণে ধর্মেরও ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সংহতি। ধর্মকে সামাজিক সংযোগ (Social cohesion) স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ধর্ম আজ

পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ধর্ম এখনো প্রধান শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল। এ সকল রাষ্ট্রের নব্য সেকিউল্যার এলীট গোষ্ঠী প্রায়শই বিভিন্ন কারণে ধর্মকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।[২৭]

শুধু উন্নয়নশীল দেশ নয়, উন্নত বিশ্ব তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও ধার্মিক। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা, গেছে ৯৫ শতাংশ অ্যামেরিক্যান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি গীর্জায় যায়, ৩৭ শতাংশ নিজেদের একনিষ্ঠ খ্রিষ্টান মনে করে। ধর্ম শুধু প্রার্থনা কেন্দ্রে সীমিত নয়, ডে-কেয়ার থেকে শুরু করে অনেক কিছুতেই যাজকদের উপস্থিতি দেখা যায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিয়মিত স্মৃতিচারণ করেন যীশুখ্রীষ্ট কীভাবে তার হৃদয়ে পরিবর্তন এনেছেন। ফুটবল খেলোয়াড়রা বল স্পর্শের আগে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন যেন স্বর্গ থেকে তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন।[২৮] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ধর্ম এখনো চালিকাশক্তি বলে মনে হয়। ১৯৭৬ সালের প্রসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী হতে প্রচারণার সময় জিমি কার্টার মন্তব্য করেন "অ্যামেরিক্যান্ জনগণ তাদের শাসনব্যবস্থায় ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিফলন চায়। আর ঈশ্বর চাইছেন, আমি প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি"। এ ধরনের কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে ইভ্যানজেলিক্যাল্ (সুসমাচার মতবাদে বিশ্বাসী) মতাদর্শে বিশ্বাসী কার্টারকে বিপুল ভোটে জয়ী করে মার্কিন জনগণ। রাষ্ট্র ও চার্চকে পৃথক রাখার কথা থাকলেও প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন সরাসরিই বলেছিলেন, সরকারি নীতির ক্ষেত্রে ধর্মের একটি খোলামেলা ভূমিকা থাকা উচিত। রাজনীতি কিংবা নির্বাচনী প্রচারের কাজে কার্টার, রিগ্যান, ক্লিনটন বা বুশ প্রত্যেকেই ধর্মের, বিশেষ করে বাইবেলের উদ্ধৃতি ব্যপকভাবে ব্যবহার করেছেন। ২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থীগণ (রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট উভয় দলের) নিজেদের ধার্মিক হিসেবে পরিচিত করার প্রচেষ্টা চালিয়াছেন।[২৯]

বিশ্বের উন্নত দেশের রাজনীতিতেও ধর্ম প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অনেক দেশেই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনা করছে অথবা প্রধান বিরোধী দল হিসেবে সরকারি কর্মকান্ডে প্রভাব ফেলছে। খ্রীষ্টান মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের শ্লোগান দিয়ে খোদ আমেরিকাতেই কাজ করছে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন। পার্টির ওয়েবসাইটে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে এভাবে 'আমরা শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রের মূল ধারার দু'টি দলের বাইরে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আর্বিভূত হবো'।[৩০] জার্মানীর একজন পিএইচ.ডি গবেষক দেশে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর সমীক্ষা চালিয়েছেন। তার অনুসন্ধানে জানা যায়, উন্নত রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, আস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, আফ্রিকা, কানাডা, ইটালীসহ বিশ্বের বড় বড় গণতান্ত্রিক রাষ্টগুলোতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন থেকে তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে হিন্দুধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দল গঠনের মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা এ দলের ঘোষিত কর্মসূচি। জার্মানীর বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটির নাম ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি। ইউরোপের অন্যতম একটি গণতান্ত্রিক দেশ নেদারল্যান্ডস্। বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের বৃহৎ দলটি হচ্ছে ডাচ ক্রিস্চান্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। কোয়ালিশন সরকারের শরিক দলও ধর্মভিত্তিক ক্রিস্চান্ ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন (সিডিইউ) যার মূল আদর্শ খ্রীষ্টান গণতন্ত্র। দলের মূলতন্ত্রে বলা হয়েছে, বাইবেলই একজন সদস্যের অনুপ্রেরণার উৎস। নিরপেক্ষতা, সমৃদ্ধি আর সৌন্দর্যের দেশ সুইজারল্যান্ড সরকারের কোয়ালিশন পার্টনার ক্রিস্চান্ পিপলস পার্টি প্রায় ১০০ বছরের পুরনো। বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ (জি-৮ সদস্যভুক্ত) ইতালী। এ দেশের প্রধান দলগুলোর মধ্যে 'ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন' অন্যতম। ইউরোপের অন্যতম ধনী ও গণতান্ত্রিক দেশ অষ্ট্রিয়া চরম ডানপন্থী আন্দোলনের নেতা ভিয়েনার মেয়র কার্ল লুগারের নেতৃত্বে ১৮৯৩ সালে গঠিত হয় ক্রিস্চান্ সোশল্ পার্টি (সিএসপি)। ১৯৪৫ সালে অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা লাভের পর সিএসপি নাম পরিবর্তন করে অস্ট্রেয়্যান পিপলস পার্টি নাম ধারণ করে। ২০০২ সালে বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে দলটি এককভাবে সরকার গঠনে সক্ষম হয়। ধর্ম থেকে উৎসারিত এ দলটি অষ্ট্রিয়ার ইতিহাসে গত সোয়াশ' বছর প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। কানাডার কুইবেক রাজ্যে ২০০০ সালে রোমান ক্যাথলিকদের সহযোগিতায় গঠিত হয় ক্রিস্চান্ ডেমক্র্যাটিক পার্টি। পার্টির মূলনীতিতে বলা হয়েছে, অর্থডকস্ খ্রিষ্টীয় মতবাদ ও কুইবেক জাতীয়তাবাদের সমন্বয়ই হবে দলের প্রধান লক্ষ্য। বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম দল হচ্ছে নিউ সাউথ ডয়েলসের ক্রিস্চান্ ডেমক্র্যাটিক পার্টি। এমনকি সমাজতন্ত্রের দেশ কিউবাতেও ধর্মভিত্তিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি কাজ করে যাচ্ছে। ৮০ শতাংশের বেশি হিন্দু অধ্যুষিত ছোট্ট দেশ নেপাল। ১৮মে, ২০০৬-এর আগ পর্যন্ত ছিল বিশ্বের একমাত্র ঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র। কাঠমান্ডুর নৃতাত্তিক কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মতে, নেপালে ২৪০ বছরের রাজতন্ত্র মূলত হিন্দুত্ববাদী ধারা থেকে উদগত। সনাতন ধর্ম সমিতি, নেপালি জনতা পার্টি (বিজেপির নেপালী সংস্কগুরু) প্রধানতম ধর্মীয় দল, যা হিন্দুদের আম্ব্রেলা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য।[৩১]

ইসলামী রাজনীতিঃ তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইসলাম কোন অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মমাত্র নয় যা শুধু স্রষ্টা ও বান্দাহর ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আত্মিক উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং যা দয়া, দানশীলতা, জনকল্যাণ ও পারিবারিক আচরণবিধি অন্তর্ভূক্ত করেই ক্ষান্ত। বরং ইসলাম হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যাতে জীবনের প্রতিটি দিকই শামিল রয়েছে। কুরআন মজিদের আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করলে তাতে তত্ত্ব ও তথ্যমূলক তথা স্রেফ জ্ঞানমূলক আয়াতগুলো বাদে আদেশমূলক যেসব আয়াত রয়েছে তাতে ইবাদত বন্দেগী, নৈতিকতা, দ্বীন প্রচার, সামাজিক আচরণ, বিয়ে,

তালাক, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতার অধিকার, উত্তরাধিকারিত্ব, ক্রয়-বিক্রয়, দান, বাধ্যতামূলক দেয়, ঋণ, সুদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচারকার্য, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ করে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমনঃ হাত-পা কাটা, বেত্রাঘাত, কারারুদ্ধ, বা গৃহবন্ধীকরণ, শূলবিদ্ধকরণ, মৃত্যুদন্ড, দেশ থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি। এসব আদেশ নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার পরিচায়ক।[৩২] কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে রয়েছে বিভ্রান্তি এবং ভুল বোঝাবুঝি। ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত চিত্রিত করে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখার এক ধরনের কৌশল এবং ষড়যন্ত্র চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। অথচ ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। আল্ কুরআনের ঘোষণা মতে, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। মানব রচিত কোন আইন বা জ্ঞান নয় বরং ঐশীভিত্তিক জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী আদর্শের মূল উৎস। শুধু অমুসলিম নয়, মুসলিমদের মধ্যেও রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে অক্সফোর্ডের সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজের এক অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম বিশ্বের অন্যতম নেতা ডাঃ মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, বর্তমান বিশ্বে, এমনকি ইতিহাসের পাতা জুড়ে ইসলাম সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে। শুধু অমুসলিমরা নয়, মুসলমান নিজেরাও এই ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ফের্কা ও মতভেদ যার ফলে ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝি। তাঁর মতে, মুসলমান পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যতদূর সরতে থাকে, পতন তত নিকটবর্তী হতে থাকে।[৩৩] ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা কোন বিষয় নয়। ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্ব এ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা ঐশ্বরিক বিধানমালার (শরীয়া) ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে। তাই রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি অথবা নৈতিকতা ও রাজনীতি আলাদা আলাদা বিষয় নয়।[৩৪] রাজনীতির মূলকথা যদি হয় কল্যাণকর জীবন' (Good Life) এবং এর জন্য প্রচেষ্টা চালানো, তাহলে রাজনীতি ইসলামের কেন্দ্রীয় বিষয়।[৩৫]

রাজনীতিকে সংকীর্ণ অর্থে সরকার পরিচালনা বোঝালেও এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান বিষয়। 'সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ', 'ন্যায়বিচার' সমুন্নত করাসহ আল্ কুরআনের অন্যান্য আদেশ নিষেধ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন,দেশের নাগরিকদের সরকারি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ। কুরআন মজিদ অরাজকতা ও বিশৃংখলাকে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। "অথচ আল্লাহ অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেও পছন্দ করেন না"।[৩৬] ইসলাম, সরকার এবং জনগণ একই বৃত্তে আবদ্ধ। এ প্রসংগে ইবনে কুতাইবা হযরত কা'ব (রাঃ)-এর উদ্ধৃতির উল্লেখ করেন "ইসলাম, সরকার এবং জনগণ হচ্ছে তাবু, খুঁটি, রশি এবং পেরেকের ন্যায়। তাবু হচ্ছে ইসলাম, খুঁটি হচ্ছে সরকার, রশি এবং পেরেক হচ্ছে জনগণ। অপরের সাহায্য ছাড়া একাকী কেউই কিছু করতে পারবেনা"।[৩৭]

রাজনীতিকে যদি ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাহলেও রাজনীতি ইসলামের কেন্দ্রীয় বিষয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাওহীদের ঘোষণার অর্থ হচ্ছে 'তাগুতকে' (আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও অধিকার যিনি ভোগ করেন) পরিত্যাগের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। আল্লাহর সাথে কারো শরিক করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম। ইসলাম শিরক্‌সহ সকল প্রকার জুলুমের মূলোচ্ছেদ চায়। আর এ জন্য দরকার ক্ষমতা। রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা অর্জনের বৈধ একটি উপায়। তাই ইসলামে রাজনীতি শুধু অনুমোদিত বিষয় নয় বরং অত্যাবশ্যকীয়।

পশ্চিমের একজন বিশিষ্ট পন্ডিতের মতে, ইসলাম শুধু একটি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের নাম ছিল না। বরং এটা একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ইসলামের পূর্ণতা ঘটেছিল একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে যাতে রাজনীতি রাষ্ট্র ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।[৩৮] ইসলাম ইবাদতকে কেবল স্রষ্টা এবং বান্দাহর ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং বান্দাহর জীবনের সকল দিক এবং বিভাগের পরিচালনা ইসলামী নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে স্রষ্টার অবিরত ইবাদতের কথা বলেছে। প্রফেসর ডঃ আই.এইচ. কোরেশীর মতে, ধর্ম আমাদের কাছে 'রবিবারের পোশাক' (Suit) নয় যে, যখন ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রবেশ করবো তখন তা পরিধান করব এবং যখন জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম করব, তখন খুলে ফেলব।[৩৯] হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর উইলফ্রেড সি, স্মিথ ইসলাম প্রসংগে বলেন, ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামের বিশেষত্ব এই যে, ইসলাম শুরু থেকে সামাজিক ব্যবস্থার ওপর সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। রাসুল (সঃ) শুধু নীতিবাক্য প্রচার করে ক্ষান্ত হননি, তিনি একটি রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেন।[৪০] ইসলাম ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে। জীবনের কোন একটি দিক অন্যান্য দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্মীয় এবং পার্থিব দুটি পৃথক বিষয় নয়, ওগুলো মূলত একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ইসলামে প্রত্যেকটি কাজ স্রষ্টার এবং তাঁর নির্দেশনার সাথে সংশ্লিষ্ট।[৪১] ইসলাম পাশ্চাত্য খৃষ্টান বিশ্বের মত ধর্ম এবং রাজনীতির পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে। 'রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে' মূলনীতি ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। মানব জীবনকে ধর্মীয় ও পার্থিব অংশদ্বয়ে বিভক্ত করার সুযোগ ইসলামে নেই।

'রাজনীতির সাথে ধর্মের মিশ্রণ' ইসলামের স্বত:সিদ্ধ বিধান কিনা এ প্রসংগে বিশ্বখ্যাত ইসলামী পন্ডিত মুহাম্মদ আসাদ ইসলামী আইন, পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ গবেষণা করে বলেন, ইসলামী শিক্ষা শুধু স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির (মানুষ) সম্পর্কের সীমারেখা চিহ্নিত করেনি বরং সে সম্পর্কের নিরিখে সামাজিক আচরণের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। তাঁর মতে, সত্যিকার ইসলামী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।[৪২] ডঃ ফজলুর রহমান আনসারী ইসলামে রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা শেষে উপসংহারে বলেন, ইসলামী রাষ্ট প্রতিষ্ঠা ছাড়া জীবনপদ্ধতি হিসেবে ইসলামের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়।[৪৩] ইসলাম নির্দেশিত বিধি বিধান মানব সমাজে

বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা জরুরি। রাজনীতি হচ্ছে সে ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর প্রক্রিয়া স্বরুপ। ইসলামকে সকল জীবন ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করার জন্যই রাসুলকে (সঃ) প্রেরণ করা হয়েছে। আল্ কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে ঃ তিনিইতো নিজের রাসুলকে হেদায়েত ও সত্যদ্বীন সহকারে পাঠাইয়াছেন, যেন উহাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয় করিয়া দেয়- তাহা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হউক না কেন ।[৪৪] রাসুল (সঃ) দীর্ঘ সংগ্রাম-সাধনা করে ইসলমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নিজে সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ইসলামী বিধি বিধান বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

আল্লাহ্ তাঁর বাণী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীর প্রতি প্রেরণ করেছেন। ইসলামের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র নির্দেশগুলো মানবজাতির কাছে ব্যাখ্যা করেছেন এবং নিজের জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। তিনিই হচ্ছেন একমাত্র উত্তম আদর্শ (উস্ওয়াতুন হাসানা)। আল্লাহ্ কুরআনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন "প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য খোদার রসুলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান ছিল, উত্তম নমুনা আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি করে খোদার স্মরণ করে।[৪৫] রাসুল (সঃ)-এর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মদীনায় হিজরত। সেখানে গিয়ে তিনি ইসলামের প্রথম সমাজ ব্যবস্থা (Polity) প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন এ 'পলিটির' একই সাথে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব প্রধান। তিনি নামাজের ইমামতি করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, কাজী হিসেবে বিচার করেছেন এবং সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সত্যনিষ্ঠ চার খলিফা (খোলাফায়ে রাশেদীন) পরবর্তী প্রায় ৩০ বছর রাসুল (সঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র সুচারুরুপে পরিচলনা করেছেন। তাঁরাও সমাজের এবং রাষ্ট্রের নেতা হিসেবে শরীয়াতের আইন বাস্তবায়ন করেছেন, ধর্মীয় বিধি বিধানকে সমুন্নত রেখেছেন এবং ওগুলোর বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করেছেন। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য নেই। দ্বিধাহীন চিত্তে উক্ত সময়কালের নীতি ও আদর্শ গ্রহণ এবং অনুসরণ করা যায়। কিন্তু উমাইয়া খিলাফতের আবির্ভাবের মাধ্যমে মুসলিম ইতিহাসে 'রাজবংশীয়' ধারার সূচনা ঘটে, পরবর্তীতে যা বল্গাহীন রাজতন্ত্রে রূপলাভ করে।[৪৬] উমাইয়া খলিফাগণ ক্ষমতা চর্চায় স্বেচ্ছাচারী এবং একনায়কসুলভ ছিলেন। তথাপি তাঁরা ইসলামী আক্বিদা, বিশ্বাস এবং ইসলামের শৌর্যবীর্যের রক্ষক হিসেবে বিবেচিত হতেন। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। ইসলামী শরীয়াহকে মর্যাদা দিতে তারা বাধ্য ছিলেন। উমাইয়াদের হাত থেকে খেলাফত আব্বাসীয়দের হাতে চলে যাওয়ার পরও ক্ষমতা প্রধানত আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাসুল (সঃ)-এর বংশধর হওয়ায় এবং তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ও স্মৃতি সংরক্ষণ করে আব্বাসীয় খলিফাগণ মুসলিম সমাজের অধিকতর আনুগত্য ও শ্রদ্ধা

লাভ করেন। বিভিন্ন কারণে আব্বাসীয় খলিফাগণ খিলাফতের ধর্মীয় দিক আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলেন এবং প্রকাশ্যে নিজেদের ইসলামী শরীয়তের প্রতি আনুগত্যশীল হিসেবে প্রকাশ করেন। ইসলামের প্রতি তাঁদের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা প্রমাণ করার জন্য অধিকাংশ শাসক তাদের নামের শেষে আল্লাহ্ এবং দ্বীন সংযুক্ত করেন। যেমনঃ মুনতাসির বি-আল্লাহ্, আল কাহির বি আল্লাহ্, সালাহ্ আল-দ্বীন, মুহী আল দ্বীন প্রমুখ।[৪৭]

যদিও পরবর্তী খলিফাগণ শরীয়তের উল্লেখ ছাড়া শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং তাদের রাজনীতি থেকে ইসলামী আদর্শকে পৃথক রাখার অনুশীলন করতেন, তথাপি অন্ততঃ বাহ্যিকভাবে তারা বল্গাহীন আচরণ থেকে বিরত থাকতেন। যে ভাবেই হোক, রাজনীতি থেকে ধর্ম কার্যতঃ পৃথক রাখার মুসলিম শাসকদের ইসলামী অনুমোদন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যুক্তি পেশ করা যাবে না। ইসলামী অবস্থানকে মূল্যায়ন করতে হবে এর মূলনীতির মাধ্যমে, অনুশীলনকারীদের বিকৃত কার্যকলাপের দ্বারা নয়। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আযীয ব্যতীত প্রায় সকল মুসলিম শাসক আল্লাহ্‌র আইনের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন না। তাঁরা জনগণের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার চেয়ে তাদের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা এবং আরাম আয়েশের প্রতি অধিকতর যত্নশীল ছিলেন। মূলতঃ আল্লাহ্‌র আইন তথা কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দুনিয়ার শান-শওকত, সুযোগ-সুবিধে এবং প্রবৃত্তি পুজায় নিমজ্জিত হওয়ায় ধীরে ধীরে ইসলামী সাম্রাজ্য পতনের দিকে ধাবিত হয় এবং অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বিদ্‌য়াত ইসলামী সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পরিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয়সহ সকল দিক থেকে মুসলিম জাতি পিছিয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে তুর্কী খিলাফতের (আক্ষরিকঅর্থে) চূড়ান্ত বিলুপ্তির মাধ্যমে ইসলামী শৌর্য বীর্যের দীর্ঘ ইতিহাসের যবনিকা ঘটে। রাজনৈতিকভাবে মুসলিম জাতি বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে তিনটি প্রধান ধারার সৃষ্টি হয়। ওগুলো হচ্ছেঃ সুফী সম্প্রদায়, চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞ গোষ্ঠী (মাযহাব) এবং উলেমা শ্রেণী।[৪৮] উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে সুফীদের একটি অংশ রাজনীতির ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করলেও ইসলামী আইনজ্ঞ এবং উলেমা শ্রেণীর অধিকাংশই ইসলামে রাজনীতির ব্যাপারে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। ইমাম আল গাজ্জালী (রঃ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলাম ও রাজনীতির সম্পর্ককে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম এবং পার্থিব ক্ষমতা হচ্ছে যমজ শিশুর মত। রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে এ পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণ সাধন এবং পরকালের পরম সুখ লাভ করা ।[৪৯] এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার কারণে প্রাচ্যদেশীয় পন্ডিতদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত বিশিষ্ট মুসলিম সমাজতত্ত্ববিদ ইবনে খালদুনও আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনীতি ও ধর্মীয় পরস্পরগ্রন্থিত বিষয়গুলোকে অত্যধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল মাওয়ার্দীর মত ইবনে খালদুনও খিলাফতের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, পৃথিবীর শাসন এবং ধর্মের সংরক্ষণের জন্য খিলাফত হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিকল্প ।[৫০]

মুসলিম বিশ্বের রাজনীতি ও ইসলাম

বিশ্বে প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমান রয়েছে। ৫৬টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে মুসলিম বিশ্ব গঠিত। তুরস্ক ব্যতীত অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানত তৃতীয় বিশ্বের সদস্যভুক্ত। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক গতিধারায় ধর্ম প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে ক্রিয়ারত। মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোতে ইসলাম ধর্ম রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে আছে। যদিও হাতে গোনা ২/১টি মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ পরিপূর্ণভাবে ইসলামী নীতিসমূহ কার্যকর না করলেও প্রকাশ্যে ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান করে না। বিগত শতাব্দীর শেষ অংশে ইসলামী পূণর্জাগরণ বা রেনেসাঁ পরিলক্ষিত হয়েছে। কয়েকটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ইসলামী দল অধিষ্ঠিত হওয়ায় ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যে ব্যাপক অনুসন্ধান চলতে থাকে। বিশেষত: ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব, আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিহত করে ইসলামী দলসমূহের কোয়ালিশন সরকার এবং আরো পরে তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠা ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি বিশ্বে ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পণ্ডিরুত হয়। অবাধ ও মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েও ক্ষমতায় যেতে দেয়া হয়নি আলজেরিয়ার ধর্মভিত্তিক দল ইসলামী সালভেশন ফ্রন্টকে। পরাশক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ মদদে ক্ষমতা কেড়ে নেয় সামরিক জান্তা (১৯৯০)।[৫১] একমাত্র ইউরোপীয়্যান্ মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্কেও ১৯৯৭ সালে সে দেশের ইসলামী রাজনীতির অন্যতম পুরোধা নাজিম উদ্দিন আরবাকান গণতান্ত্রিকভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েও সেনাবাহিনীর হুমকিতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল অন্যতম প্রধান দল হিসেবে কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে। নিম্নে কয়েকটি মুসলিম দেশের ইসলামী দলের নাম উল্লেখ করা হলো: আফগানিস্তানে হেজবে ইসলামী, বাহরাইন ও ইয়েমেনে আল ইসলাহ পার্টি, মিশর, সিরিয়া, জর্ডানে ইখওয়ানুল মুসলেমিন, লেবাননে হিজবুল্লাহ, মরক্কোতে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, সুদানে ইসলামিক ফ্রন্ট, তিউনিশিয়ায় আন নাদাহ পার্টি, তুরস্কে সাদাত পার্টি ও ক্ষমতাসীন এ.কে পার্টি, পাকিস্তানে জামায়াত ও জমিয়তে ইসলামী উল্লেখযোগ্য। এমনকি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপেও ইসলামী দল 'আদালত পার্টি' বিদ্যামান।[৫২] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধ দেশ মালয়েশিয়ার ইসলামী দল 'পাস' দেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। শুধু মুসলিম প্রধান দেশ নয়, মুসলিম সংখ্যালগিষ্ঠ দেশেও ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুপ্রধান ভারতে মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ নামের ধর্মীয় দলগুলো কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছে। যদিও পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়াহ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আফ্রিকার দেশ সুদান, নাইজেরিয়ায়, সোমালিয়ায় ইসলামী দল সরকার এবং বিরোধী দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইসলামী

দলগুলো প্রত্যক্ষ বা এককভাবে ক্ষমতায় যেতে না পারলেও ক্ষমতার ভারসাম্য শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী দলগুলো সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। সৌদি আরবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সামাজিক এবং ফৌজদারী আইনগুলো ইসলামের মূলনীতির আলোকে প্রতিষ্ঠিত।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে ইখওয়ান মুসলিমিনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব খুব বেশি। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সময়কালে 'ইখওয়ান' মিশরে সবচেয়ে শক্তিশালী জনপ্রিয় ইসলামী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মিশর এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সরকারের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় মিশরের 'জামাল আবদুল নাসের' সরকার ইখওয়ানকে পঞ্চাশের দশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার পরও ইখওয়ান গোপনে এবং অন্য নামে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখে। সরকারি নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এর একটি ক্ষুদ্র অংশ 'সশস্ত্র গ্রুপ' সৃষ্টির মাধ্যমে পশ্চিমা প্রভাব এবং অন্যান্য অনৈসলামিক কার্যক্রম দূরীভূত করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জিহাদে অবতীর্ণ হয়।[৫৩]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী শক্তির উত্থান

(১৯৭১-২০০০) সময়কালে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির প্রভাব প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত সার্বিক বিচারে ইসলামী রাজনীতির অবস্থান ক্রমাগত সুসংহত হয়েছে। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ইসলামী সংগঠনগুলো অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো রাজনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করেই এগিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী রাজনীতির অগ্রগতিকে অনেক সেকিউল্যার্ বুদ্ধিজীবী 'মৌলবাদের' পুনরুত্থান হিসেবে বিবেচনা করছেন। এই পুনরুত্থানের জন্য গবেষকগণ অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ-দু'ধরনের কারণ উল্লেখ করেছেন। একজন গবেষক বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনরুত্থানকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এ প্রতিক্রিয়ার তিন ধরনের পরিণাম পরিলক্ষিত হয়েছে। সেগুলো হলো: সাংস্কৃতিক রূপান্তর (Acculturationist), কট্টর আদর্শ ভিত্তিক (Normative) এবং নয়া আদর্শবাদী গ্রুপের (Neo-Normative) সৃষ্টি।[৫৪] কট্টর আদর্শবাদী গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে গবেষক বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতি রাজনৈতিক দলকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ধারার অনুসারীগণ পাশ্চাত্যের আধুনিকতা ও ধ্যানধারণকে পুরাপুরি প্রত্যাখ্যান করেন বলে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীগণ ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে মৌলবাদী রাজনৈতিক দল এবং ইসলামী রাজনীতিকে মৌলবাদী রাজনীতি হিসেবে অভিহিত করেন। বিংশ শতাব্দীর ৮০ দশকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী

জাগরণকে পাশ্চাত্য মিডিয়া মৌলবাদী (Fundamentalist) হিসেবে অপপ্রচার শুরু করে। ইসলামী রাজনীতিকে খাটো করার জন্য এ ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিকে 'মৌলবাদী' এক ধরনের নিন্দাসূচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার হলেও ইসলামপন্থীরা শাব্দিক অর্থে (মৌলনীতির অনুসারী) মৌলবাদ সহজভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেন। বাংলাদেশের মৌলবাদী রাজনীতির পুনরুত্থানের জন্য অভ্যন্তরীণ কারণ হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের ব্যর্থতা, ভারত ভীতি, নেতৃত্বের বৈধতার সংকট, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, দ্রব্যসামগ্রির অগ্নিমূল্য, ইসলামী প্রতীক ও মূল্যবোধের প্রতি মুজিব সরকারের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, '৭৪-এর মন্বন্তর, রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা, রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্যাতন নিপীড়ন, বুর্জোয়া-সমাজ ব্যবস্থার সংকট মোকাবেলায় সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর ব্যর্থতা ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ইসলাম ও রাজনৈতিক সংগঠন

মানুষ সামাজিক জীব। তাদের সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে হয়। পরিবার থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান যুগে সংগঠন একটি জটিল ও সুসংগঠিত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সংগঠন হচ্ছে পিরামিড সদৃশ কাঠামো যা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গঠন করা হয়। যে কোন উদ্দেশ্য সাধন এবং কাজের পরিপূর্ণতার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল বা সংগঠন অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। রাজনৈতিক দলকে এর আদর্শ ও কর্মসূচি সম্পাদন করতে হলে একটি নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আধুনিক অর্থে প্রথম রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। উনবিশং শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ইউরোপে যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয় তার ইহজাগতিক প্রবণতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সেখানকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে খ্রিষ্ট ধর্মানুসারী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠতে থাকে।[৫৫]

সংগঠন হচ্ছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ভূমিকা রাখার একটি আনুষ্ঠানিক অভিপ্রেত কাঠামো।[৫৬] ডারউইন কার্টরাইটের (Dorwin Cartwright) মতে, সংগঠন হচ্ছে পরস্পর নির্ভরশীল অনেকগুলো শাখার সমষ্টি, মূল লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সমগ্রের (Whole) অংশ হিসেবে যে শাখাগুলোর প্রত্যেকটির একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।[৫৭] আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শক্তিশালী ও কার্যকর সংগঠন ছাড়া সরকারের পক্ষেও জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য কাজ করা দুরুহ হয়ে পড়ে।[৫৮]

ইসলামে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব অত্যধিক বেশি। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে মুসলমানদের সংগঠনভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ

হচ্ছে: তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে (ইসলামকে) ধারণ কর, বিচ্ছিন্ন হবে না।[৫৯] অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা নেতৃত্বের আনুগত্য মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছেন, হে ঈমানদারগণ! অনুগত্য কর আল্লাহ্র, আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী, তাদের।[৬০] আল কুরআনের উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে সংঘবদ্ধভাবে ইসলামকে মেনে চলা এবং নেতৃত্বের আদেশ পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সংগঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে নেতৃত্ব। আর নেতৃত্বকে মেনে চলার কথা বলে আল্লাহ্তায়ালা সংগঠনের অপরিহার্যতার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্র রাসূলও (স:) সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত হারেস আল আশয়ারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স:) বলেন, আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহ্ আমাকে ওগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন, যা হচ্ছে: সংগঠন, নেতার নির্দেশ শ্রবণ, নেতার নির্দেশ পালন, হিজরত ও আল্লাহ্র পথে জিহাদে অংশ গ্রহণ। যে লোক ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘৎ পরিমাণ দূরে সরে যায়, পুনরায় সংগঠনে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সে তার গলদেশ থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলে। আর যে ব্যক্তি যাহেলিয়াতের দিকে আহবান জানায় সে জাহান্নামী। সাহবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসুল, ঐ ব্যক্তি যদি সালাত কায়েম ও রোজা পালন করে, তবুও কি সে জাহান্নামী? রাসুল (স:) বললেন, যদি ঐ ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, রোজা পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে, তবুও (সে জাহান্নামী)।[৬১]

যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা জরুরি। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন দ্বীন তথা ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করার জন্য।[৬২] আর এ জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা অপরিহার্য ছিল। তাই আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবন যাপন এবং সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল (স:)-এর জীবদ্দশায় তাঁর নেতৃত্বের অধীনে 'আল জামায়াতে' (একমাত্র ইসলামী দল) শরিক না হলে মুসলমান থাকা সম্ভব ছিলনা। রাসুল (স:)-এর অবর্তমানে খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে মুসলিম সমাজ তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করে। সাহাবাদের অবর্তমানেও মুসলিম সমাজে ইসলামী দল বা সংগঠনের কার্যক্রম সকল সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে একই সময়ে একাধিক ইসলামী সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। রাসুল (স:)-এর অনুপস্থিতিতে 'আল জামায়াত' বা একমাত্র ইসলামী সংগঠনের বাধ্যবাধকতা নেই।

আল্লাহ্র কিতাব, রাসুলের সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতে আকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন ইসলামে সংগঠনবিহীন জীবনের কোন ধারণা নেই। জামায়াত (সংগঠন) বিহীন মৃত্যুকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৩] ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দলগুলোকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় কর্মতৎপর হয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। রাষ্ট্র

ক্ষমতা লাভ ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ অথবা কোন ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে চায়।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে কিছু মুসলিম চরমপন্থা অবলম্বন করে সশস্ত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়। বাংলাদেশে জেএমবি তাদের প্রচারপত্রে দাবি করেছে, তারা আল্লাহ্‌র আইন ও ইসলামী শাসন কায়েম করতে চায়। এ উদ্দেশ্যই তারা দেশব্যাপী বোমাবাজি এবং বিচারকদের খুন করেছে। অথচ ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুসারে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, আত্মঘাতি বোমাবাজি ও অন্যায়ভাবে মানুষ খুন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলাম এসেছে বিশ্বে শান্তি, কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। ইসলামে জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, তোমরা সমাজে বিশৃ:খলা (ফাসাদ) সৃষ্টি করো না।... বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারিদের আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না। আল্লাহ্‌ তায়ালা আরো বলেছেন,যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করলো, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো।[৬৪]

ইসলাম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ অনুমোদন করে না। মুহাম্মদ (স:) শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে পরিবর্তন এনে তাদের ইসলামের পক্ষে এনেছেন। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এবং রাসুলের প্রদর্শিত পন্থাই ইসলামের সঠিক পদ্ধতি। এর বিপরীত কার্যক্রম ইসলামের নামে হলেও তা 'ইসলাম' বলে মেনে নেয়ার অবকাশ নেই। 'জিহাদ' ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু জিহাদ এবং জঙ্গিবাদ এক নয়। জিহাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতির সাথে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোন মিল বা সাযুজ্য নেই।

ইসলাম ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

রাজনৈতিক উন্নয়ন আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লুসিয়ান পাই,[৬৫] জি. এলমন্ড[৬৬] এল বাইন্ডার[৬৭]. কে, অরগানস্কি[৬৮] প্রমুখ পাশ্চাত্যের সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের অনেকগুলো মানদন্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধারণত যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তার বর্ণনাও তাঁরা দিয়েছেন। রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত প্রপঞ্চ পূরণ ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ১. জাতীয় একাত্মতা প্রতিষ্ঠা (National Identity) ২. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা (National Integration) ৩. রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, ৪. বৈধতা, ৫. জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান, ৬. প্রতিযোগিতামূলক দল ব্যবস্থা, ৭. সামরিক বাহিনীর ওপর বেসামরকি নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ৮. ইহজাগতিক রাজনীতি, ৯. রাজনৈতিক গতিশীলতা, ১০. শিক্ষার উচ্চহার ইত্যাদি।[৬৯]

পাশ্চাত্য মণীষীদের প্রদত্ত রাজনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে ইসলামী ধারণার পার্থক্য মাত্রাগত, পরিমাণগত নয়। ইসলাম রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ বা মতামতকে আবশ্যিক হিসেবে বিবেচনা করে। বৈধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কর্তৃতের নির্দেশ পালন ইসলাম বাধ্যতামুলক হিসেবে ঘোষণা করেছে। জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে ঘোষিত জাকাত ব্যবস্থা ইসলামের অন্যতম প্রধান মূলনীতি। জ্ঞান অর্জনকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় কাজ হিসেবে মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন। ইসলাম উন্নয়নকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে। ইসলামের মতে, মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি দিকসহ সকলপ্রকার উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইসলাম মানুষের কল্যাণার্থে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার করার তাগিদ দেয়। অর্থ উপার্জন, ভোগকরা সহ ইসলাম কোন উন্নয়নের বিরোধী নয় তবে তা নীতি নৈতিকতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।[৭০] হান্টিংন্টন[৭১] গণতন্ত্রে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, একটি সমাজের বিস্তৃত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রায়শই ধর্মভিত্তিক হয়ে থাকে। গণতন্ত্র এবং প্রোটেস্টানবাদের মধ্যে হান্টিংটন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে মিশ্র সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য তিনি বলেছেন ইসলাম গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী নয়। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন।[৭২] বিশ্বের অনেক মুসলিম প্রধান দেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের পতনের পর গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে এবং ২০০০ সালে ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসকদের বিতাড়িত করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ গাম্বিয়া, সেনেগাল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের দিক দিয়ে এগিয়ে আছে।[৭৩] ক্যাথোলিক ধর্মানুসারী দক্ষিণ আমেরিকার সদস্য দেশ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় গণতন্ত্র প্রমাণ করে ক্যাথোলিক ধর্মও গণতন্ত্রের জন্য প্রতিকূল নয়।[৭৪] ফুকুইয়ামার মতে, কনফুসিয়ান আদর্শ আধুনিক গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী। তিনি বলেন, জাপানের সেমি কনফুসিয়ান সংস্কৃতি দুই প্রজন্মের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, কেন কনফুসিয়ান সামাজিক কাঠামো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্থকভাবে অবস্থান করতে পারবে না তার কোন তাত্ত্বিক কারণ নেই।[৭৫]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল, ধর্ম রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক নয়। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করাসহ রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের সরকারই বৈধতার সংকটে নিপতিত হয়। সাধারনত যে সকল রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত না হয়ে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বা অন্য কোন

উপায়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সকল দেশের সরকার বৈধতার সংকটে নিমজ্জিত হয়। তখন শাসকগণকে তাদের বৈধতার সংকট দূরীভূত করার জন্য অনেক সময় ধর্মকে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। বিশিষ্ট রাজনৈতিক গবেষক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল হাকিম[৭৬] মত প্রকাশ করে বলেন, যেখানে বৈধতার সংকট অত্যন্ত প্রকট সেখানে ধর্ম একটি রাজনৈতিক বৈধতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাঁর মতে, তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সকল শাসনকালেই শাসকগণ তাদের বৈধতার মাত্রা অনুযায়ী জনগণের সমর্থন লাভের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক ভুঁইয়া মোঃ মনোয়ার কবির[৭৭] বলেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং পরবর্তী সামরিক শাসকগণ বৈধতার হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন এবং এই ব্যবহারের চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা গেছে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনকালে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। এখানকার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ সমাজে সংহতি আনার জন্য ইহজাগতিকতা মনস্ক রাজনীতিকরাও ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব এতোই শক্তিশালী যে, এখানকার যে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনে ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৭৮] দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনগণের প্রাথমিক মূল্যবোধেও ধর্মের উচ্চ স্থান রয়েছে। এসব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে নেতৃত্বের বৈধতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।[৭৯]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল এবং শ্রেণীবিন্যাস

বিশ্লেষকগণ বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা এবং রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিন্যাস বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। একজন গবেষকের মতে, বাংলাদেশে চার ধরনের রাজনীতি আছে। ওগুলো হচ্ছে: ধর্মীয় জীবনবিধান বিরোধী রাজনীতি, ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি, ধর্মপরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি এবং ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি।[৮০] তাঁর মতে ধর্মীয় জীবন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে সাবেক কম্যুনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ। ধর্মীয় নীতি-আদর্শ ও বিধি বিধান দ্বারা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি পরিচালিত হোক, এরা তা চাচ্ছে না। ধর্মনিরপেক্ষ দল হলো আওয়ামী লীগ। এই দল ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু কার্যত নীতি ও আচরণের দিক দিয়ে ধর্মীয় জীবন বিরোধী দলগুলোর সাথে এর কোনই পার্থক্য নেই। ধর্ম পরিচয়ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো হলো বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি, মুসলিম লীগকেও এই দলেই ফেলা যায়। এই দলগুলো ইসলামের কথা বলে, ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলে, ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষার কথা বলে এবং ধর্মাচরণমূলক কাজও অনেক করে কিন্তু ইসলামী নিয়ম নীতি ও বিধি বিধান দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজের যাবতীয় কাজ কর্ম পরিচালিত হোক এবং সকল আইনের উৎস হোক পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ, তা তারা চায় না। এ ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ঠিক ধর্মনিরপেক্ষদের মতই। ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জামায়াতে

ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতি।

একজন গবেষক ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনীতির শ্রেণীবিভাগ নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে দেখিয়েছেন:[৮১]

নং	শ্রেণী	বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ
১.	ধর্মীয় জীবন বিধান বিরোধী রাজনীতি	ধর্মীয় নীতি-আদর্শ ও বিধি-বিধান দ্বারা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি পরিচালিত হোক, এরা তা চাচ্ছে না। ধর্মীয় জীবন বিধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে সাবেক কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ।
২.	ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি	এরা ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্ত্র কার্যত নীতি ও আচরণের দিক দিয়ে ধর্মীয় জীবন বিধানবিরোধী দলগুলোর সাথে-এর কোনোই পার্থক্য নেই। যেমন আওয়ামী লীগ, গণফোরাম, এনডিপি প্রভৃতি।
৩.	ধর্ম পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি	এই দলগুলো ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলে, ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষার কথা বলে এবং ধর্মচারণমূলক কাজও অনেক করে, কিন্তু ইসলামী নীতি-নিয়ম ও বিধি-বিধান দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হোক এবং সকল আইনের উৎস হোক পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এ বিষয়টি তারা এড়িয়ে চলে। এ ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ঠিক ধর্মনিরপেক্ষদের মতোই। ধর্ম পরিচয়ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো হলো বিএনপি ও জাতীয় পার্টি।
৪.	ধর্মভিত্তিক রাজনীতি	ধর্মীয় নীতি-আদর্শ ও বিধি-বিধান দ্বারা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি পরিচালনাই এদের লক্ষ্য। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী পার্টি, খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত প্রভৃতি। ওগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীই প্রধান এবং পঁচাত্তর উত্তর সবগুলো সংসদেই তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল।

গবেষক আবুল আসাদের মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল চার শ্রেণীর হলেও রাজনৈতিক ধারা মূলত: দু'টি। এর একটি হলো ইসলামী জীবন বিধান ও স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্তা বিরোধী ধারা, অন্যটি ইসলামী ও স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক ধারা। প্রথম ধারাটির আদর্শিক নেতৃত্ব দিচ্ছে বাম সমাজতন্ত্রী দলগুলো। এই ধারাকে সহায়তা দিচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ এবং এই ধারার রাজনীতির যা পুরস্কার, তা ষোলআনাই আওয়ামী লীগ ভোগ করছে। ১৫ দলীয় জোট, ৮ দলীয় জোট, ১৪ দলীয় জোট ইত্যাদির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই রাজনীতির ফল ভোগ করে আসছে। অন্যদিক দ্বিতীয় ধারার রাজনীতির আদর্শিক নেতৃত্বে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি তাদের ক্ষমতায় যাওয়া অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু এই রাজনীতিকে সহায়তা দিয়ে আসছে এবং এই রাজনীতির সুফল ভোগ করছে।

রাজনৈতিক গবেষক আমজাদ হোসেনের অনুসন্ধানে বাংলাদেশে তিন ধরনের দল দেখা যায়। তাঁর মতে, প্রথম ধারায় পড়ে সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ মুৎসুদ্দী দল যেমন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দল; দ্বিতীয় ধারায় পড়ে জাতীয় ও পেটি-বুর্জোয়া দল যেমন ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ গোষ্ঠীয় দল, পিপল্‌স লীগ ইত্যাদি, তৃতীয় ধারায় পড়ে প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট দল- যেমন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি।[৮২] বিশ্বাস এবং কর্মনীতির প্রেক্ষাপটে অনেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে ডানপন্থী, বামপন্থী এবং মধ্যপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

চিত্রে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর এ ধরনের একটি শ্রেণীবিভাগ প্রদর্শিত হলো: [৮৩]
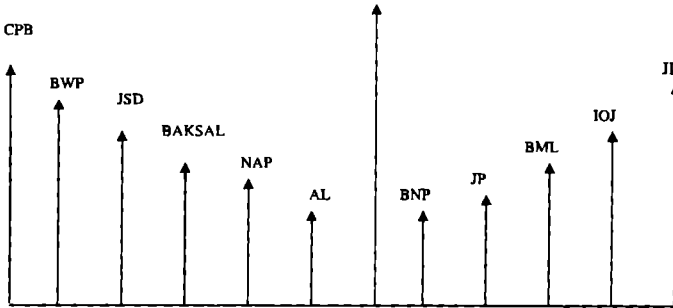
আদর্শিক পরিচিতি এবং কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থী, সমাজতন্ত্রী, উদারপন্থী প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের একজন রাজনীতিকের মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে সমাজতন্ত্রী, বাংলাদেশপন্থী এবং আমেরিকানপন্থী হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়।[৮৪] রাজনীতি বিজ্ঞানের একজন গবেষক ১৯৯১ সালের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর আলোকে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের আদর্শিক ও কর্মসূচিগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। নিচের সারণীতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৫]

দলের নাম	আদর্শ ও কর্মসূচী
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী নীতিমালা, পাশ্চাত্যমনস্কতা বাজার অর্থনীতি, রাষ্টপতি শাসিত সরকার।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক, মিশ্র অর্থনীতি, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার, মুজিব হত্যাকারীদের বিচার দাবি।
জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী নীতিমালা, পাশ্চাত্য মনস্কতা, রাষ্ট্রপতি এবং সংসদের ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয়।
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী জাতীয়তাবাদ, ভারতবিরোধী মানোভাব, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ইসলামের আলোকে জীবন ও সমাজ গঠন।
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সোভিয়েত মনস্কতা, সমাজতন্ত্র, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার।

ওপরের সারণী থেকে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জাতীয় পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কর্মসূচি এবং আদর্শগত বেশ কিছু সামঞ্জস্য রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী জীবন ও সমাজকে ইসলামীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। আদর্শগত ও কর্মসূচিগত দিক থেকে জামায়াতে ইসলামী অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলো থেকে ভিন্ন। বিএনপি এবং আওয়ামীলীগ দু'টো দলই জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হলেও বিএনপি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যেহেতু এতদিন রাজনৈতিক দলের কোন রেজিস্ট্রেশন প্রথা ছিলনা তাই-এর সঠিক সংখ্যাও কেউ নির্ধারণ করতে পারেনি। নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন বলেন, দেশে ১৭৭টি রাজনৈতিক দল রয়েছে বলে শোনা যায়।[৮৬] দেশে প্রায় দেড় শতাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে বলে পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন থেকে নির্ধারিত প্রতীকপ্রাপ্ত দলের সংখ্যা প্রায় একশ'র কাছাকাছি।[৮৭] এক অনুসন্ধানে ২০০টি রাজনৈতিক দলের নাম ও পরিচয় পাওয়া গেছে।[৮৮] বাংলাদেশে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দল থাকলেও অধিকাংশই নামসর্বস্ব। স্বাধীনতার পর অনুষ্ঠিত প্রথম আটটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমপক্ষে ১টি আসনে বিজয়ী হয়েছে এমন রাজনৈতিক দলের সংখ্যা হচ্ছে ২৩ টি। দলগুলো হচ্ছেঃ ১। আওয়ামী লীগ ২। বিএনপি, ৩। জাতীয় পাটি (এ) ৪। জাতীয় পার্টি (জে পি) ৫। জামায়াতে ইসলামী ৬। বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ৭। মুসলিম লীগ, ৮। ডিমোক্র্যাটিক লীগ ৯। ন্যাপ (মোঃ) ১০। জাতীয় একতা পাটি

১১। সিপিবি ১২। জাসদ (রব) ১৩। জাসদ (সিরাজ) ১৪। ওয়ার্কার্স পার্টি ১৫। ইসলামী ঐক্যজোট ১৬। ন্যাশন্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১৭। গণতন্ত্রী পার্টি ১৮। ফ্রীডম পার্টি ১৯। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (জেপি) ২০। ন্যাপ ২১। কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) ২২। সাম্যবাদী দল ২৩। ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট ।[৮৯]

একজন গবেষক ১৫৬টি রাজনৈতিক দলের নামের তালিকা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে ৩০টি রাজনৈতিক দলের নামের সাথে ইসলাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৯০] গবেষক স্টালিন সরকার ১৬৩টি রাজনৈতিক দলের সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে ৩৯টি ইসলামিক দলের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।[৯১] আমজাদ হোসেন ৭৬টি ইসলামপন্থী দলের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে এমন অনেক দল রয়েছে যেগুলোর শুধু সভাপতির নাম খুজে বের করা সম্ভব হয়েছে। এমন কিছু দলের নামও উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর কর্মকান্ড সম্পর্ক কোন তথ্য তার পক্ষে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

২০০৮ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর রেজিস্ট্রেশন প্রদান শুরু করে। এ পর্যন্ত ৩৯টি রাজনৈতিক দল রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। আরো কয়েকটি দল রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অবশ্য শতাধিক রাজনৈতিক দল রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের শর্তসমূহ পূরণ করতে না পারায় আবেদনকারী অধিকাংশ দল রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার যোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

তথ্য সংকেত ও টীকা

১। Carlton Clymer Rodee (eds.), *Introduction to political Science*, Mcgraw Hill Book Company, New York, 1976, P. 2

২। Max Weber, "Politics as a Vocation" excerpted in A. Pizzorzo (ed) *Political Sociology*, Penguin Book Ltd. England 1971, P. 28

৩। Harold Lasswell, *The Politcal writings of Harold Lasswell*, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1951, P. 295

৪। Murice Duverger, *Political Parties: Their Organisation and Activities in the Modern State,* London Methuen and Co. Limited, 1967, PP. 63-64

৫। OstogorsKz, M.Y. *Democracy and The organised Political Parties*, NewYork, Macmillan, 1992

৬। *International Encyclopaedia of Britannica*, Vol-12, New York, McMillan, 1986, P. 677

৭। R.M. MacIver, *The Web of Government,* Collier Macmillan Limited, London, 1965, P. 64

৮। H.J Laski, *Parliamentary Government in England*, London, Allen & Unwind Limited, 1963, P. 71

৯। J. Lapalambara and Myron Weiner 'The Origin and Development of Political Prties' in their (eds) *Political Parties and Political Development*, New Jersey, Princeton University Pres, 1967, P. 3

১০। Rafiqul Islam Chowdhury, *Recruitment of Political Elite and Political Development in India and Nigeria*, Ph-D. Dissertation, Oregon, University of Oregon, 1964, উদ্ধৃতঃ হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঃ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. 8

১১। Philip K. Hitti, *Islam and the West*, Van Nostrand Company Inc.Princeton, 1962, P.8, উদ্ধৃতঃ ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১২। Golam Sarwar, *Islam: Belief and Teaching*, The Muslim Education Trust, London, P. 13

১৩। *আল কুরআন*, সুরা মায়েদা, আয়াতঃ ৩, উদ্ধৃতঃ শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ, *দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য*, অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, IIFSO, ১৯৭৮, পৃ. ১৭-১৮

১৪। Robin Wright, *The Islamic Resurgence : A New Phase*. উদ্ধৃতঃ আবুল আসাদ, *বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম*, পৃ. ১৬

১৫। H.A.R Gibb, *Mohammadanism*, The New American Library, New York, 1955, P. 72

১৬। অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, আল-আযামী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৫

১৭। অধ্যাপক গোলাম আযম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫

১৮। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ১৯৯৬, পৃ. ১৮

১৯। ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্য সম্পাদকবৃন্দ, *সামাজিক শব্দকোষ*, অনন্যা, ২০০১, পৃ. ২৭৬

২০। *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, London Oxford University Press, 1970, P-1048 & Chambers Twentieth Century Dictionary, New Delhi, Allied Publishers Limited 1976, P. 1141

২১। মোহাম্মদ আবদুর রশিদ,"ধর্ম ও রাজনীতিঃ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৮২, পৃ. ৩৯

২২। এ.জি. আফানাসিয়েভ, *মার্কসীয় দর্শন:সরল রুপরেখা*, পৃ. ৩৭৫-৭৬

২৩। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

২৪। See, Robert E. Hund, *The world's Living Religion*, New York, 1959

২৫। K.C. Chaudhury, *Role of Religion in Indian Politics*, Sundeep Prakashani, Delhi, 1978, P.1

২৬। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

২৭। See, James S. Coleman "The Political Systems of the Developing Areas"in G. A. Almond and J. S. Coleman (eds), *The politics of the Developing Areas*, New Jersey, Princeton University press, 1971, P. 537

২৮। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৪ঠা জুলাই, ২০০৮, (সিনেটর বারাক ওবামার আত্মজীবনী 'প্রত্যাশার স্পর্ধা' থেকে)

২৯। *পূর্বোক্ত*, ২০শে অক্টোবর, ২০০৭, পৃ-. ৬

৩০। *পূর্বোক্ত*, ৫ মার্চ, ২০০৮

৩১। *পূর্বোক্ত*, ৫ই মার্চ, ২০০৮

৩২। নুর হোসেন মজিদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব*, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংকৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৮

৩৩। মোঃ মামুন হোসাইন, ''মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও মুসলমান," *ছাত্র সংবাদ*, জুলাই, ২০০৭, পৃ. ৪৩

৩৪। A.K.S Lambton. "Islamic Political Thought" in Joseph Shachat and C.E. Bosworth (eds), *The Legaey of Islam*, Oxford University Press 1979, P.404. উদ্ধৃতঃ হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

৩৫। Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective*, Macmillan Press Ltd, 1996, P. 19

৩৬। *আল কুরআন*, সুরা বাকারা, আয়াতঃ ২০৫

৩৭। Abdul Rashid Moten, *op.cit.* P. 20

৩৮। John L Esposito, *Islam and Politics*. Syracuse University Press, Syracuse, New York, 1987, P. 1

৩৯। I. H. Qureshi, *Pakistan First Constituent Assembly Debates*, Vol-5, No.5, P. 96

৪০। G.W. Chowdhury, *Islam and The Contemporary World*, Academic Publishers, Dhaka, 1991, P. 37

৪১। See, Khurshid Ahmad, Introduction to Abul A'la Mawdudi, *Towards Understanding Islam,* revised edition, UK, 1979, P. 10

৪২। Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, First Published Colifomia, 1961, New Edition Gibraltar, 1980, PP. 2-4

৪৩। Details, Mohammad Fazlur Rahman, *The Quranic Foundation and The Structure of Muslim Society,* Vol-2, Karachi, 1977, PP. 342-4

৪৪। *আল কুরআন*, সুরা সাফ, আয়াত: ৯

৪৫। *পূর্বোক্ত*, সুরা আহযাব; আয়াত ২১

৪৬। Details, Syed Abul Ala Mawdudi, *Khilafat wa Mulakiat* (Laore; Idarah Tarjuman al Quran, 1975.

৪৭। Abdul Rashid Moten, *op.cit,* P-22

৪৮। *Ibid,* PP. 22-25

৪৯। Quoted in Rosenthal, E.I.J. *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, Cambridge University Press, 1968, P. 39

৫০। Ibn Khaldun, *The Muqaddimah : An Introduction to History*, tr. F Rosenthal, ed, N. J. Dawood, Princeton, N.J. Princeton University Perss. 1981, P. 155

৫১। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৫ মার্চ, ২০০৮

৫২। *পূর্বোক্ত*, ৫মার্চ, ২০০৮

৫৩। See, Jeff Haynes, *Religion In Third World Politics*, Open University Press, Buckingham, 1993, P. 69

৫৪। *সমাজ নিরক্ষণ*, ২৬ সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৮৭ , পৃ. ২

৫৫। Alfred de Gragia, *Political Behavior*, (New York, The Free Press, 1966) PP.188-215, উদ্ধৃত: হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৫৬। Heinz Weihrich, Harold koontz, *Management, Global Perspective*, Tenth Edition, McGraw-Hill International Editions, 1994, P. 244

৫৭। হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৫৮। Myron Weiner, *Party Building in a New Nation : The Indian National Congress,* The University of Chicago press, Chicago, 1967, PP. 3-4.

৫৯। *আল কুরআন*, সুরা আল এমরান, আয়াত: ১০৩

৬০। *আল্ কুরআন*, সুরা আন নিসা, আয়াত: ৫৯

৬১। *আল হাদিস*, তিরমিজী, উদ্ধৃত, হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

৬২। *আল কুরআন*, সুরা ফাতাহ, আয়াত: ২৮

৬৩। মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দালন ও সংগঠন*, প্রকাশনা বিভাগ, (জা ই বা), ২০০৪, পৃ: ৫১

৬৪। *সুরা বাকারাহ*, আয়াতঃ ১১, সুরা মায়েদা, আয়াতঃ ৩২, ৬৪

৬৫। Lucian W. Pye, "Political Culture and Political Development" in Lucian W. Pye and Sidney Verba, eds, *Political Culture and Political Development*. New Jersey, Princeton University press, 1965, P. 13

৬৬। G.Almond, Quoted in Alfred Diament, "Political Development: Approaches to Theory and Strategy" in John D. Montagomery and William J. Siffin eds, *Approaches to Development : Politices, Administration and Change*, Mcgraw Hill Book Company, New York, 1966, P. 16,

৬৭। Leonard Binder, "Crisis of Political Development" in L. Binder et. al, *Crisis and Sequences in Political Development*, Princeton University Press, New Jersey, 1971, P. 65

৬৮। A.F.K. Organski, *The Stages of Political Development*, New York, 1965, P. 7

৬৯। হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৭০। বিস্তারিত, *সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ২৭

৭১। Samuel P. Huntington, "Will More Countries become Democratic?" *Political Science Quaterly*, 99:2 (Summer, 1984) PP. 207-209

৭২। Mustafizur Rahman Siddiqui, *Movement For Democratization in Bangladesh During the Ershad and Khaleda Goverments*, Ph.D Thesis, 2002, C.U, P.29

৭৩। Axel Hadenius, *Democracy and Development*, Cambridge University Press, 1995, P.120, উদ্বৃত, Mustafizur Rahaman, *op.cit*, P.29।

৭৪। Ali Reza Abootalebi, *Islam and Democracy : State Society Relations in Developing Countries, 1980-1994*, P.52, Garland Publishers Inc. New York, 2000.

৭৫। Francis Fukuyama, "The Primacy of Culture," *Journal of Democracy*, 6:1 (December) 1994.

৭৬। Muhammad. A. Hakim, "The use of Islam as a Political Legitimization Tool: The Bangladesh Experience, 1972-1990", *Asian Journal of Political Science*, Vol.6, No.2, 1998, PP. 98-117

৭৭। Bhuian Md. Monoar Kabir, "Resurgence of Religio- Poilitical Froces in Bangladesh Polity: A Stady of Jammat-I- Islam" in Verinder Grover ed. *Encyclopaedia of SAARC NATIONS (Bangladesh Part)*, Deep & Deep Publication, New Delhi, 1997, PP. 234-56

৭৮। Myron Weiner, "The Politics of South Asia" in G.A.Almond and J.S. Coleman, eds, *op.cit*, P.179, জাতীয় সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে ধারনার জন্য দেখুন: D. E. Smith, *Religion and Politics in Burma*, New Jersey, Princeton University Press, 1965, P.320

৭৯। হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৮০। আবুল আসাদ, *একশ' বছরের রাজনীতি*, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪ পৃ. ৩০৭

৮১। এম. জহিরুল হক শাকিল, "বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি", তারেক শামসুর রহমান (সম্পা) *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক*, শোভা প্রকাশ, ২০০৯, পৃ:- ১৭৭

৮২। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ১৯৯৬, পৃ. ১৭

৮৩। Shamsul Islam Khan, S. Aminul Islam, Imdadul Haque, *Political Culture, Political Parties and The Democratic Transition in Bangladesh*, Academic Publishers, Dhaka, 1996, p. 106

৮৪। অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, আল-আযমী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩, পৃ. ৫৫-৫৬।

৮৫। Muhammad A. Hakim, *The Shahabuddin Interregnum*, University Press Ltd. Dhaka, 1993, P. 50-51

৮৬। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট, ২০০৭

৮৭। *পূর্বোক্ত।*

৮৮। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৮৯। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগষ্ট, ২০০৭

৯০। এ.কে.এম এমদাদুল হক, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ১৯৯১-২০০২: রাজনৈতিক দলসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ*, ২০০৩, এম.ফিল থিসিস, চ.বি, পৃ. ৩২-৩৫

৯১। স্টালিন সরকার, বাংলাদেশের রাজনীতি, রুমা পাবলিকেশন, ২০০১, পৃ. ১০১-১০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও বাংলাদেশের রাজনীতি

বাংলায় ইসলাম

আরব ভূখন্ডে সপ্তম শতাব্দীতে হযরত মোহাম্মদ (স:)-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয়। অত:পর তাঁর সহযোগিদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌছে যায়। তারই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশের এতদাঞ্চলের ইসলামের প্রচার শুরু হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে। উমাইয়া খিলাফতের সময় সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন। সে বিজয়ের মাধ্যমে আরব মুসলমান ও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয় যার ফল হয় সুদূরপ্রসারী।[১] বাংলাসহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির প্রবেশ ঘটে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্ণৌতিকে (গৌড়) রাজধানী করে সে শাসন শুরু হলেও ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলায় এর বিস্তার ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলায় ঈস্ট ইন্ডিয়া কামপ্যানির কর্তৃত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই অঞ্চল মুসলমান শাসনকর্তাদের অধীন ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার পরাধীনতার সূচনা হয় এবং তা অব্যাহত থাকে পরবর্তী প্রায় ১৯০ বছর। দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন কখন হয়েছিল তা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে যে এ ভূখন্ডে মুসলমানদের আগমন তা অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায়। রাজশাহীর পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রার ওপর নির্ভর করে ড. এনামুল হক বলেন, "হিন্দু সভ্যতার কোন কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব পারস্যের মুসলিম সাধক ও ধর্ম প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের বিশ্বাস, অনুরূপ কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারে খলিফার এই মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবত: তিনি এই মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে সেখানে ইসলাম প্রচার করতে যান। তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারান এবং তাঁর মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হস্তগত হয়"।[২] বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার মূলত: তিনভাবে সংঘটিত হয়। প্রথমত আরব বণিকদের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত: মুসলিম সুফী সাধকদের দ্বারা এবং তৃতীয়ত: মুসলিম রাজশক্তির মাধ্যমে। বাংলায় ইসলাম আগমনের পূর্ব থেকেই আরব বণিকগণ এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত

করতো। প্রথম যুগের মুসলমানগণ ধর্ম প্রচারকে তাদের জীবনের মিশন হিসেবে নিয়েছিলেন। তাই ব্যবসায়ীগণ শুধু ব্যবসার ব্যাপারে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেই ক্ষান্ত হতেন না তারা একইসাথে ইসলামের বাণীও প্রচার করতেন। ধারণা করা হয় যে, বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকুলে এভাবে মুসলিম বণিকদের সাহায্যে প্রথম যুগেই ইসলামের বাণী প্রবেশ করে।[৩] ড. এ. রহিম তাঁর "সোশ্যাল এন্ড কালচ্যারাল হিসটরি অভ বেঙ্গল" শীর্ষক গ্রন্থে বাংলার উপকূলভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, এমনকি চাটগাঁ নামটাও আসলে তাদেরই দেয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপ বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটি অবস্থিত বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় শাতি-উল-গঙ্গ (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ)। তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁও, চিটাগাঙ্গ এ রূপান্তর ঘটেছে।

বাংলায় ইসলাম প্রচারে সুফী-দরবেশ এবং ইসলাম প্রচারকদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ধার্মিকতা, মিশনারি উদ্দীপনা, অনুপম চরিত্র, জনহিতকর কর্মকান্ডের কারণে সাধারণ জনগণের মধ্যে সুফীদের প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং সে জন্য তারা জনগণকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুফীদের খানকাহ্গুলো বাংলার বিভিন্ন জনপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং ওগুলো ছিল ধর্মীয়, মানবীয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামের প্রচার এবং মুসলিম সমাজের উন্নয়নে এসকল খানকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।[৪] সুফীবাদ বহু তরিকত বা শ্রেণীতে বিকাশ লাভ করেছিল। ওগুলোর মধ্যে চারশ্রেণীর সুফী ভারতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। যেগুলো হচ্ছে চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, কাদেরীয়া এবং নকশ্বন্দীয়া। পরবর্তীকালে অন্য যে সব সম্প্রদায় প্রকাশ লাভ করেছিল সেগুলো সবই ছিল এ চারটির উপ-শ্রেণী।[৫] সুফী-সাধকগণ মূলতঃ আরব, ইয়েমেন, ইরাক, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আগমন করেন। এই সকল সুফী ও ইসলাম প্রচারক যে সময় বাংলায় আগমন করেন তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ইসলাম প্রচারের সম্পূর্ণ বৈরী। স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু রাজারা ইসলাম প্রচারকদের কখনও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি। কখনও কখনও এসব প্রচারকের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকেন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের অগ্রগতি ব্যাহত করার প্রয়াস পান। ফলে ইসলাম প্রচারক সুফী ও আলেমদের অনেককে এদেশের হিন্দু সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। সে যুদ্ধে কেউ কেউ জীবনও হারান। কিন্তু তাদের জীবন, কর্ম, চরিত্র ও চিন্তা চতুষ্পার্শস্থ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারের ধারাও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকা ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সুফী ও দরবেশগণের অনেকেই নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও আলৌকিক শক্তির (কারামত) সাহায্যে সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করেন বলে জানা যায়। কিন্তু জনগণের ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণের মূলে এ আলৌকিক শক্তির তাড়না যতটুকু ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল

ইসলামের অন্তর্নিহিত সম্মোহনী ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব। ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ অনাবিল এক ঈশ্বরবাদ (তৌহিদবাদ) এবং নরপূজা, প্রতীকপূজা, পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের অভিশাপমুক্ত একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বর্ণ, সম্প্রদায় ও অস্পৃশ্যতার কলুষমুক্ত এক ভ্রাতৃ সমাজে পরিণত করার আদর্শই বাংলার ধর্ম বিভ্রান্ত ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিগৃহীত জনগোষ্ঠীকে পতঙ্গের ন্যায় ইসলামের আলোকরশ্মির দিকে ধাবিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৬]

বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বিজয়ের মাধ্যমে এ ভূখন্ডে মুসলিম শাসন শুরু হয়। এরপর প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর বাংলা মুসলিম শাসনের অধীন ছিল। তুর্কী, আফগান, মুঘলরাই প্রধানতঃ বাংলায় মুসলিম শাসন পরিচালনা করেন। তাঁদের শাসনামলে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি এবং রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুলতানগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে তৎপর ছিলেন। বর্ণহিন্দু, বিশেষত ব্রাহ্মণদের নারকীয় অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জীবন রীতিমতো অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। দুর্নীতি, বর্ণবিদ্বেষ, কুসংস্কার, অনাচার পুরো সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মুসলিম শাসকগণ তা থেকে মুক্তি দেন সাধারণ মানুষকে। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও মুসলিম অভিযানের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিনয় ঘোষ লিখেছেন: "শাস্ত্রের বিধিনিষেধ, কুসংস্কার, বর্ণবিদ্বেষ, অনাচার আর ব্যাভিচারের খানা ডোবা, জলা জঙ্গলে তার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়; জাতি ও সভ্যতার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে, এ সময় ইসলাম তার নবীন উদ্যমে, নবীন আদর্শ ও বিজয়ী ধর্মের প্রেরণা নিয়ে এদেশে এলো"।[৭]

ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের কারণে অনেকে বলতে চেয়েছেন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 'তরবারির মাধ্যমে'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দাবি তথ্য ও যুক্তিনির্ভর নয়। বাংলায় এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি কেবল তরবারির মাধ্যমে বা জোরপূর্বক হয়নি। যদি তাই হতো, তাহলে দীর্ঘ ৫০০ বছর দিল্লী ও আগ্রা মুসলিম শাসনের কেন্দ্রবিন্দু থাকার কারণে সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানেও দিল্লীর জনসংখ্যার এক দশমাংশ এবং আগ্রার জনসংখ্যার মাত্র এক চতুর্থাংশ মুসলিম।[৮] এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, ভারত এবং বাংলায় ইসলামের বিস্তার মূলতঃ মুসলিম রাজশক্তির তরবারী বা সহিংস আচরণের মাধ্যমে হয়নি।[৯] ইসলামের প্রচার এবং বিস্তার হয়েছে মূলতঃ তার অন্তর্নিহিত আদর্শ তথা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ন্যায়বিচারের কালজয়ী আদর্শের কারণে। ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের মুক্তির অবলম্বন হিসেবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এজন্য উল্লেখযোগ্য গবেষক ইসলামের প্রচার ও বিস্তারের জন্য এই 'ধর্মান্তরিতকরণকে' অন্যতম মূল কারণ

হিসেবে মনে করেন। উত্তর ও পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য বৃটিশ প্রশাসনিক ও জনসংখ্যা কর্মকর্তাগণও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ব্যাপক ধর্মান্তরিতকরণকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। যেমন বিভারলি (Beverly) লিখেছেন: "Probably the real explanation of the immense preponderance of the Mussalman religious element in this portion of the delta is to be found in the conversion to Islam of the immense low castes (The Chandals and Ravibansis) which occupied it".[১০]

সেকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজে মুসলমানরা তরবারির জোরে ইসলাম কায়েম করেননি, বরং ভারতবর্ষের নির্যাতিত বৌদ্ধ এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনগণ বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার, বর্ণবিদ্বেষ, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ও মার্কসবাদী পন্ডিত মানবেন্দ্র নাথ রায় (এম.এন. রায়) অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখেছেন: "বৌদ্ধ মতাদর্শের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, বিচার-বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক বিশৃংখলার মধ্যে ডুবে গেল। বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত সমাজ তখন ধ্বংস ও বিলুপ্তির ভয়াবহ কবলে পড়ে গিয়েছিল। এ জন্য নিপীড়িত জনগণ ইসলামের পতাকার নিচে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। আর ইসলামেও রাজনৈতিক সমাধান না হোক, অন্তত তাদের সামাজিক ও মানবাধিকার দিল।"[১১]

ইসলাম ও বাংলার মুসলিম সমাজ

সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) লক্ষাধিক সাহাবীর উপস্থিতিতে বিদায় হজ্বের ভাষণ দেন। তিনি ইসলামকে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার আহবান জানান। রাসূলের (সা:) সেই নির্দেশ পালন করার জন্য সাহাবাগণ দিক-বিদিক ছুটে গিয়েছেন ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদিন (চার খলিফা) ইসলামী রাষ্ট্রকে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁদের তিরোধানের পর ইসলামী সাম্রাজ্য আর সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারেনি। উমাইয়া খিলাফত ও আব্বাসীয়া খিলাফতের সময় ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ইসলামকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে শাসকগণ ইসলামকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। ইসলামী আদর্শ ভুলে গিয়ে বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক ধারা চালু করা হয়েছিল। সংঘাত-সংঘর্ষ, আত্মকেন্দ্রিকতা, আরাম-আয়েশ তাদের ওপর জেঁকে বসেছিল। আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ নিজেদের কঠিন দায়িত্বের কথা একেবারে ভুলে যান। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী শরিয়তের কিছু নিয়ম-কানুন পালিত হলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অধিকাংশ শাসক

ছিলেন অনৈতিক এবং আত্মগুজারী। অষ্টম শতাব্দীতে বাংলায় ইসলামের বাণী প্রচার হতে শুরু করে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দির শুরুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলায় মুসলিম শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। দীর্ঘ সময়কাল মুসলিম শাসনের অধীন থাকার পর বাংলা এবং ভারতে মুসলিম শাসনের পতনের জন্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষকগণ বিভিন্ন কারণকে দায়ী করেন।

ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে এক বিরূপ পরিবেশে ইসলাম বাংলায় আগমন করে। "ভারতে মুসলমানদের আগমনে এক যুগের অবসান ঘটে-পুরাতন ব্যবস্থা হয় অবমুক্ত। অন্য কোন দেশে ইসলামীকরণের এ আন্দোলন-এর চেয়ে বেশি নবযুগ সূচনাকারী নয়। বিশ্ব বিজয়ের গতিপথে মুসলমানরা যেসব বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল তাদের মধ্যে ভারতবাসীদের চেয়ে অন্য কেউ আদর্শগতভাবে তাদের চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণ বিপরীতে হতে পারেনা।"[১২]

সুফী সাধক এবং ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইসলামের সাধাশুরু সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। শোষণ, অনাচার ও বর্ণপ্রথার নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণ হয়েছিল বেশি। এ বিপুলসংখ্যক ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দীর্ঘদিনের মূল্যবোধ ও রীতিনীতি এবং এমনকি প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য প্রীতি বজায় রেখেছিল। তারা ইসলামের নির্ভেজাল তৌহিদের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেনি। মুসলিম শাসকগণ এ বিপুলসংখ্যক সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানদের সঠিক ইসলামী শিক্ষা প্রদানের তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সুফি সাধকদের খানকাহ এবং মকতবগুলোই ছিল মূলতঃ ইসলামী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। তাই সমাজের অনেক লোকপ্রিয় (Popular) উপাদান এবং কুসংস্কার ইসলামী সংস্কৃতির ভেতর অনুপ্রবেশ করে। ওগুলোর মধ্যে পীর প্রথা, মোল্লাপ্রথা এবং রাসূলল্লাহ (সাঃ)-এর পদচিহ্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত গবেষক রাফী উদ্দিন আহমেদ তাঁর 'The Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Identity' বই'র ৫৯-৬৯ পৃষ্ঠায় এ সকল অনুপ্রবেশ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন।

পীর ফার্সি শব্দ। পীর শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ। পীর শব্দটি ইসলামের সুফী বা অতীন্দ্রয়বাদীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক নির্দেশক বা পথ প্রদর্শককে বোঝায়। সাধারণত যে সব শিক্ষকের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাদের বোঝাতে পীর শব্দটি ব্যাবহৃত হয়। সুফী সাধকগণ ইসলামের প্রথম যুগে নবদীক্ষিত মুসলমানদের ইসলামের মৌলিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে পীর প্রথা চালু হওয়ার পর অনেক ইসলাম বিরোধী কাজ পীর প্রথার মাধ্যমে সমাজে প্রচলন হতে দেখা যায়। পীরের অতিমানবীয় শক্তির ধারণা এবং দরগাহকে কেন্দ্র করে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ (কবরপূজা, পীরপূজা) ইসলামী মৌলিক শিক্ষার পুরাপুরি

বিপরীত। হিন্দু এবং বৌদ্ধ সমাজে অনুরূপ প্রথা থাকায় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ পীরবাদে তাদের নিজেদের ঐতিহ্যের কিছু সামঞ্জস্য দেখতে পায়। বাংলার বিভিন্ন অংশে বিশেষত: পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ পূজা বিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করা গেছে। পাঁচ পীরের পূজা পীর প্রথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং মেদিনীপুর ও বর্ধমানের মত বাংলার কিছু জেলায় পাঁচপীরের পূজা করা হতো। পশ্চিম বঙ্গে পাঁচপীর শুধু মুসলমানদের নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও পূজার অন্যতম প্রধান বিষয়। পরবর্তীকালের রীতি থেকে দেখা যায় যে, বহু কাল্পনিক পীর সহজ বিশ্বাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করে। এ সব পীরকে মানিকপীর, ঘোড়াপীর এবং মাদারীপীরের মত বিভিন্ন নাম দেয়া হয়। বিভিন্ন রকম লাভের জন্য প্ররোচিত হয়ে এবং বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁদের নৈবেদ্য দেয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় মানিক পীরকে নৈবেদ্য হিসেবে দুধ ও ফলমূল দেয়া হয়। বিভিন্ন জেলায় মানিক পীরের গান নামে পরিচিত লোক-গীত রচনা ও গাওয়া হয়। ঘোড়াপীরের আশীর্বাদে পঙ্গুশিশুরা সুস্থ্য হয়ে ওঠে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ঘোড়াপীরকে নৈবেদ্য হিসেবে মাটির ঘোড়া দেয়া হয়।[১৩] পীরদের অতিমানবীয় গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাদের নিকট কিছু চাওয়া বা তাদের নামে কোন বস্তু পূজা দেয়া, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অর্থাৎ তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম নির্ভেজাল তাওহীদ ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। যে কোন প্রকার শির্ক, পৌত্তলিকতা, মূর্তিপূজা, প্রতিকপূজা, অবতারবাদ এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে তিলার্ধ পরিমাণ অংশীদার যে কোন শক্তি ও সত্তাকে ইসলাম অস্বীকার করে। এ ধরণের কোন শক্তি ও সত্তাকে সামান্য পরিমাণ বিশ্বাস করে বা এদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ করে কোন ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারে না।[১৪] কোরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, আল্লাহ্ মানুষের সকল গুণাহ ও পাপ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু তাঁর সাথে কোন পর্যায়ে শির্ক ও অংশীদারিত্বের কোন ক্ষমা নেই।[১৫]

সুফী সাধকদের মাধ্যমে প্রথম যুগে এ ভূখন্ডে ইসলামের বাণী বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছায়। তাঁদের খানকাহ্‌গুলো ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। মূলত: বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফী ও দরবেশগণই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের সুফীবাদের সাথে প্রথম যুগের সুফী দরবেশদের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর জীবদ্দশায় সুফীবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অনেক পরে সুফীবাদের উদ্ভব ঘটে। ইসলাম হচ্ছে দ্বীন বা জীবন পদ্ধতি। ব্যবহারিক জীবনের সাথে রয়েছে ইসলামের গভীর সম্পর্ক। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁর সমগ্র ব্যবহারিক জীবনেই এ জীবনব্যবস্থা বা দ্বীন ইসলাম পালন করে গেছেন। ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। পরিপূর্ণ ইসলাম পালনের জন্য সংসার জীবন সম্পূর্ণ অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা:) ঘোষণা করেছেন- "লা রাহবানীয়্যাত ফিল ইসলাম"। এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি সংসার বৈরাগ্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের

পন্থাকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, কিছু ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে থাকার পরও কৃচ্ছ্রতা সাধনা শুরু করে। কালক্রমে তাঁরাও সুফী নামে অভিহিত হন।[১৬]

সুফীবাদ আরও পরবর্তীকালে শরিয়তের প্রধান বিষয়গুলো থেকে বিচ্যুত হয় এবং বিভিন্ন রকমের বিদয়াতের জন্ম দেয়। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী তাঁর "তারিখে তাসাউফকে চান্‌দ আওরাক" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছেন: "প্রথম যুগের সুফীদের গ্রন্থাদি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যাবে যে, পূর্ববর্তী সুফীদের কর্মপদ্ধতি ইসলামী শরিয়ত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে যেসব বিদ'আতকে তাসাউফের নিদর্শন বলে ধরে নেয়া হয়েছে তরিকতের প্রধান আলেমগণ তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত"।[১৭] পরবর্তীকালের পীর-সুফিদের একটি অংশের নেতিবাচক (ইসলাম বিরুদ্ধ) তৎপরতা সত্ত্বেও প্রথমদিকে বাংলায় ইসলাম প্রচারে- সুফিদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জেমস ওয়াইজ তাঁর 'Eastern Bengal' বইতে (৫৪-৫৪ পৃষ্ঠায়) উনিশ শতকের বাংলা অঞ্চলের পীর- দরবেশদেরকে প্রথমবারেরমত দুই ভাগে বিভক্ত করেন। একটি দল 'সালিক' শরীয়াহ বা ইসলামী আইন অনুযায়ী সচেতনভাবে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে। অপরটি 'মাজযুব' অচেতন হয়ে আল্লাহর ভালবাসায় মত্ত হয়ে পার্থিব নিয়মকানুন অনুযায়ী ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের বিপর্যয়ের জন্য তুর্কী এবং মোঘল শাসকদের কার্যকলাপও অনেকাংশে দায়ী। তুর্কী শাসকগণ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে কৃতিত্বের দাবিদার হলেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেনি। মোঘল শাসকগণের অনৈতিক ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বাংলার মুসলিম সমাজেও। বাদশাহ আকবরের হিন্দু সংস্কৃতি প্রীতি এবং "দীন-ই-ইলাহী" প্রবর্তন ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। আকবর ও তাঁর পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজ দুর্দশার কোন স্তরে উপনীত হয়েছিল আবদুল মান্নান তালিব "বাংলাদেশে ইসলাম" গ্রন্থে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজকে নৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করে। একদিকে একদল সুফীর ক্রটিপূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতি এবং অপরদিকে কুরআন হাদিসের শিক্ষা প্রসারিত করার ব্যাপারে মুসলিম শাসকদের অনীহা, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় কুসংস্কারগুলো দূর করতে সক্ষম হয়নি। একদিকে সুফীবাদের আল্লাহ্‌কে "প্রেমাস্পদ" মনে করা এবং অন্যদিকে চৈতন্যের "কৃষ্ণপ্রেমের" মধ্যে সামঞ্জস্য থাকায় তারা অতি সহজেই এ "কাম ধর্মের" প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অচিরেই মুসলমানদের মধ্যে আউল, বাউল, কর্তাভজা, তান্ত্রিক, সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা শুরু হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের ফকীর ও পীর সম্প্রদায় উদ্ভব হয়। তারা মারেফাতকে শরীয়ত থেকে আলাদা করে নেয় এবং শরীয়তের বিভিন্ন

ব্যাপারে আরেকটি অন্তর্নিহিত বা মারেফতী অর্থ বের করে আনে। যেমন- শরীয়তে নিষিদ্ধ মদ ও গাঁজা সেবন করাকে তারা মারেফাতে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উপায় হিসেবে গণ্য করে। বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাবে মুসলিম সমাজের একটি বিপথগামী অংশের মধ্যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় তৎপরতার নামে যৌন সম্পর্ককে এত অবাধ ও উম্মুক্ত করা হয়েছে যে, তা কোন সভ্য ও সুশীল সমাজের মানুষের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব।[১৮]

বাংলার মুসলিম সমাজে চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তি সত্ত্বেও নৈষ্ঠিক ইসলামের অনুসারী মুসলমানরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস, সালাত বা নামাজ এবং রোজা পালন করতো। কুরআন হাদিসের চর্চায় ও তারা নিবেদিত ছিল। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচন্ডিতে কবি কোন এক মুসলিম বসতির কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, তারা খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে এবং লাল পাটি (বিছানা) বিছিয়ে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে। সোলেমানী পুঁতিগুণে তারা পীর ও পয়গম্বরের (নবী) ধ্যান করে এবং পীরের দরগাহ্‌তে বাতি দেয়। দশ বিশজন একসাথে বসে তাঁরা কুরআন-কিতাব পড়ে ও আলোচনা করে, অন্যরা তখন বাজারে বসে পীরের শিরনি (দরগাহে মিষ্টি বা অন্য মিষ্টান্ন দ্রব্য) বিতরণ করে, ঢোল বাজায় এবং পতাকা ওড়ায়। তারা অত্যন্ত দানিশমন্দ বা জ্ঞানী, কারও পরওয়া করেনা এবং জীবন থাকতে তারা কখনও রোজা বাদ দেয় না।[১৯]

সাতচল্লিশ পূর্ব রাজনীতি ও মুসলিম সমাজ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলমানগণ ছিলেন শাসকশ্রেণীভূক্ত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পর তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায়। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও মুসলমানরা বিপর্যয়ের শিকার হয়। পলাশীর ষড়যন্ত্রের যুদ্ধে নির্মম পরাজয়ের পর লর্ড ক্লাইভ সামরিক ক্ষমতা কোম্পানীর অধীনে নিয়ে নেন। দেশীয় সামরিক বাহিনী বিপুল সংখ্যায় হ্রাস করা হয়। অপরদিকে অফিসার পদে ইংরেজদের নিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আস্তে আস্তে রাজস্ব বিভাগ এবং দেওয়ানী আদালতেও ইউরোপীয়ানদের নিয়োগ দেয়া শুরু হয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বময় ক্ষমতার মালিক হন। গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নতুন উপাধি ধারণ করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী ক্ষমতা লাভের পর মুর্শিদাবাদের নবাব বৃত্তিভোগী ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে মুসলিম জমিদারগণ তাদের জমিদারী হারায়। তাদের বদলে নব্য হিন্দু বিত্তবানরা জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমান আমলে লাখেরাজ বা নিষ্কর রায়তিসত্ত্বের অধিকারী ভূমি মালিকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। সমাজের উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা ও জ্ঞানী-গুণীগণ এ সব লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। মসজিদ, দরগাহ্‌ নির্মাণ, ধর্মানুষ্ঠান পালন, নিঃস্ব অসহায় ব্যক্তিদের জন্য

লাখেরাজ দান স্বত্ব ছিল। কিন্তু ১৮২৮ সালের 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন' প্রণীত হওয়ায় এ সব সম্পত্তির অধিকাংশ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার দীন-হীন হয়ে পড়ে। ইংরেজরা ক্ষমতা গ্রহণের পরও দীর্ঘদিন ফার্সী রাজভাষা ছিল এবং আদালতে তা চালু ছিল। মুসলমানগণ ফার্সীতে অধিকতর দক্ষ হওয়ায় আদালতগুলোতে তাদের কর্মসংস্থান বেশি ছিল। কিন্তু ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী রাজভাষা ঘোষণা করা হয়। ধীরে ধীরে আদালতগুলো থেকেও মুসলমানরা চাকরি হারাতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নতুনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন, ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবে। ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আস্তে আস্তে সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে হিন্দুগণ ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণ করে অফিস আদালতের চাকরিতে প্রাধান্য বিস্তার শুরু করে। ১৮৩৫ সালে লর্ড টমাস ব্যবিল্টন মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী আইন হয় যে, কেবল ইংরেজী বিদ্যালয়গুলো সরকারি সাহায্য পাবে। অন্য প্রতিষ্ঠান পাবে না।[২০]

১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন, ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন, ১৮৩৭ সালের রাজভাষার পরিবর্তন, ১৮৪৪ সালের চাকরির নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন-পরপর এসব নিয়মের ফলে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এতে অনেক শিক্ষক, মৌলভী, মুন্সী জীবিকা হারান ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হন। ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার, ও ত্রিহুত এই পাঁচটি জেলায় ফারসী ভাষার হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ৭১৫ জন। ১৮৭২-৭৩ সালে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর ও কলকাতা জেলায় হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৯ ও ৮ জন।[২১] ১৭৮৫ সালেই লর্ড হেষ্টিংস এই পতন দেখেছিলেন। তিনি ২১ জানুয়ারী ১৭৮৫ সালের এক 'মন্তব্যপত্রে' পতনের চিত্রটি বর্ণনা করেছেন এভাবে : "Since the management of revenues has been taken into our hands, it has chiefly been carried on by the English servants of this Company, and by the Hindus, ...In consequence of this change Mohamedan families have lost their sources of private emoluments which would enable them to bestow much expence on the education of their children, and are deprived of the power which they formerly possessed of endowing and patronizing public seminaries of learning".[২২] বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তিস্বত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফারসী রাজভাষাচ্যুতি পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসকশ্রেণী নিঃস্ব, রিক্ত, নিরক্ষর, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়।[২৩]

১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত নূন্যাধিক এই পঁচিশ বছর মুসলমান সমাজের পতনের চূড়ান্ত কাল ছিল। এ সময় পর্যন্ত মুসলমান সমাজ ছিল কান্ডারী শূন্য। ছিন্নপাল, ভগ্ন হাল নিয়ে তা অকূলে ভেসে গেছে।[২৪] কিন্তু হিন্দু সমাজের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজা রাম মোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) মত শক্তিশালী নেতা আবির্ভূত হয়েছিল হিন্দু সমাজে। তাই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই হিন্দু সমাজ আধুনিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ সংস্কার প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। অপরদিকে সামগ্রিকভাবে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কৃতির কোন সংস্কার আন্দোলন মুসলিম সমাজে পরিলক্ষিত হয়নি। এ সময় কলকাতার মুসলমান সমাজ নিষ্ক্রিয় থাকলেও বাংলার বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন জোরেশোরে পরিচালিত হয়। ওগুলোর মধ্যে চব্বিশ পরগনায় তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১) আন্দোলন, ফরিদপুরে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও তাঁর ছেলে দুদু মিয়ার (১৮১৯-৮২) ফরায়েজী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।[২৫] সমসাময়িককালে উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদের 'ওয়াহাবী আন্দোলনের' প্রভাবও বাংলায় পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রায় মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়। এর সঙ্গে তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেও অধ:পতন শুরু হয়। এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি সংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আরব দেশের অন্তর্গত নেজদের অধিবাসী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৭০৩-৯২) এক সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশিত সরল আদর্শে মুসলিম সমাজকে পূণ:প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর সংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর নেজদের শেখ মুহম্মদ ইবন সউদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আরবের বিভিন্ন স্থানে তা প্রসারের ব্যবস্থা করেন। মক্কা ও মদীনায় প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে হজ্বের সময় মুসলমানদের নিকট সংস্কারের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।[২৬]

বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান নির্বিশেষে জমিদার-নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এরা সোচ্চার ছিল। স্থানীয় জমিদারদের সাথে এদের সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। তারা এদের দমন করতে ব্যর্থ হয়। এদের সামাজিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য বৃটিশ সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরী করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বীরত্বের সাথে লড়াই করে এক অসমযুদ্ধে ১৮৩১ সালে তিনি শহীদ হন। হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং দুদু মিঞা জমিদার ও নীলকরদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেন। উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর তৃরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন বা জিহাদী আন্দোলনেও বাংলার মুসলমানেরা অংশগ্রহণ করেছে। তারা অর্থ ও মুজাহিদ সংগ্রহ করে এ আন্দোলনে সহযোগিতা করেছে। উইলিয়াম হান্টার তাঁর "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থে উল্লেখ

করেছেন "মাসের পর মাস বাংলাদেশ হইতে নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগৃহীত হইয়া সীমান্তের এই শত্রুর উপনিবেশে প্রেরিত হইয়াছে।... বাংলাদেশ হইতে অর্থ ও লোক সংগৃহীত হইয়া নিয়মিতভাবে দুই হাজার দূরবর্তী উপনিবেশে প্রেরিত হইত"।[২৭]

বাংলার ফরায়েজী আন্দোলন এবং উত্তর ভারতের সাইয়েদ আহমেদের জিহাদী আন্দোলন মূলত: অনুপ্রেরণা লাভ করেছে আরবের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এর ইসলামী সংস্কার আন্দোলন থেকে। বৃটিশ ও পাশ্চাত্য লেখকগণ এ সংস্কার আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করেন। মূলত সংস্কার আন্দোলনকে বিতর্কিত এবং গুরুত্বহীন করার জন্য 'ওহাবী আন্দোলন' নাম প্রদান করা হয়। 'ওহাবী আন্দোলনের' গুরুত্ব উপলব্ধি করে গোপাল হালদার উল্লেখ করেছেন "ওয়াহাবী আন্দোলন রাজনীতির ক্ষেত্রে ঝড় তুললো। বিদ্রোহ হিসেবে সে এক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সম্প্রদায়ের গৌরবের কথা। পরবর্তী সময়ে আমিন খানের ওয়াহাবী মামলা সেদিন ইংরেজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের স্বাধীনতা স্পৃহাকে প্রেরণা দেয়, হিন্দুদের মনেও ইংরেজ বিরোধ বাড়িয়ে তোলে। আর্থিক ক্ষেত্রেও বাংলার ওয়াহাবী আন্দোলন দেশের অত্যাচারিত প্রজা-রায়তের, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সহায়তা পেয়েছিল"।[২৮]

ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার আন্দোলন এবং জিহাদী আন্দোলনের কারণে উনিশ শতকের প্রথমদিকে নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব মুসলমান জাতি সম্বিত ফিরে পায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদতার কারণ তারা বিশ্লেষণ করে। ইংরেজদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ১৮৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[২৯] যুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয় জনগণের স্বতস্ফূর্ত: অংশগ্রহণ থাকলেও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা, সুসমন্বিত পরিচালনা এবং সামরিক প্রস্তুতির দুর্বলতার কারণে সে যুদ্ধে ভারতীয়দের পরাজয় হয়। তাই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশেষত: মুসলমানদের এর জন্য চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয়। বিদ্রোহ সংশ্লিষ্টতার খোঁড়া অজুহাতে অনেক নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় অনেক নেতা কর্মী। অমানবিক বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয় যাতে ভবিষ্যতে কেউ বিদ্রোহের চিন্তাও করতে না পারে। বিদ্রোহের পরিণতি হিসেবে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়া সারা ভারতে রানির শাসন ঘোষণা করে নিজে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন।

যুদ্ধোত্তর এই করুণ পরিস্থিতি থেকে মুসলমান জাতিকে উদ্ধারের চেষ্টায় যে ক'জন মুসলিম জ্ঞানী গুণী এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮) এবং সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)। সৈয়দ আহমদ খান অনগ্রসর মুসলিম জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার

জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। মুসলমান বৃটিশ কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত নয়- এ ধরনের প্রচারণার বিরুদ্ধে তিনি লেখালেখি করেন। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন স্বাধীন ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দয়ার পাত্রে পরিণত হবে। উনিশ শতকের শেষার্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। সৈয়দ আহমেদ খান শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এই দুর্দশার কথা বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিতে নেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সৈয়দ আহমেদ খানের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ১৮৭৬ সালে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীতে শিক্ষা আন্দোলনে এই কলেজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে "আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়" এ পরিণত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরবর্তীতে ভারতের মুসলমানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৮২ সালে সৈয়দ আহমদ খান শিক্ষা কমিশনে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন যাতে তিনি উল্লেখ করেন, ১৮৫৮-৭৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩১৫৫ জন স্নাতক (ডিগ্রীধারী ব্যক্তি) বের হয়। তন্মধ্যে মুসলিম স্নাতক মাত্র ৫৭। অনুরূপভাবে রোবকী সিভিল এ্নজিনীয়ারিং কলেজ থেকে ১৮৫০-৭১ সময়কালে ২২৬ জন প্রকৌশলী ডিগ্রী লাভ করে যার মধ্যে মাত্র ৩ জন প্রকৌশলী ছিলেন মুসলিম।[৩০]

নবাব আবদুল লতিফ মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেন এবং কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল মোহামেডান লিটার‍্যারী সোসাইটি (Muhammedan Literary Society) স্থাপন করেন। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা এবং তাদের পরিবর্তিত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা ছিল সে সমিতির উদ্দেশ্য ।

সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণে বিশেষ অবদান রাখেন। মুসলিম আইন ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর পান্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয়। ঊনিশ শতকের ভারতীয় মুসলমানদের গভীর ঘুম থেকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। তিনি মুসলমানদের পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ইসলামের সঠিক এবং মৌলিক শিক্ষা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কংগ্রেসের মাধ্যমে হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি একটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ভীষণভাবে অনুভব করেন। এরই ফলে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল মোহামেডান অ্যাসোশিয়েশন্ নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী নিজেই লিখেছেন "আমি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিপত্তি দেখতে পাই। এ জন্য আমি ১৮৮৭ সালে ন্যাশন্যাল মোহামেডান অ্যাসোশিয়েশন্ প্রতিষ্ঠা করি।"[৩১] মোহামেডান অ্যাসোশিয়েশন বৃটিশ লর্ড ও ভারতীয় সচিবদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের নকিট স্মারকলিপি পেশ করে এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ আদায় ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালায়।

১৮৮৫ সালে ভারতের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু-মুসলিমের সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কংগ্রেসকে অভিহিত করা হলেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে মুসলিমরা ছিল বঞ্চিত। এরপর সৈয়দ আহমদ খান ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণাকে ধীরে ধীরে জোরদার করেন। ভারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কংগ্রেসে যোগদান না করারও আহবান জানান। ১৮৮৩ সালে তিনি গাভারনার জেনার‍্যালের কাউন্সিলে পৃথক নির্বাচকমন্ডলী গঠনের আহবান জানান। ১৮৮৬ সালে সৈয়দ আহমদ খান ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ তুলে ধরার জন্য বার্ষিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৩২]

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ বৃটিশ ভারতের রাজনীতিতে একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রধানত: প্রশাসনিক সুবিধের জন্য বাংলা ভাগ করে। কিন্তু তাতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় শুরু থেকেই কংগ্রেস এবং এর হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। হিন্দু নেতৃবৃন্দের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হিন্দু-মুসলমানের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গণে এক সুদূরপ্রসারী আলোড়নের সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯০৬ সালে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সালের ১লা অক্টোবর আগাখানের নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল সিমলায় (বৃটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী) ভারতের ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদল ভারতের মুসলমানদের পৃথক স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করে তাদের বিভিন্ন দাবির প্রতি লর্ড মিন্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কবল থেকে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সহযোগিতা কামনা করেন। উত্তরে লর্ড মিন্টো ভারতের পরবর্তী যে কোন প্রশাসনিক পুণর্গঠনে মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন। বিপুল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে প্রতিনিধিদল লর্ড মিন্টোর নিকট পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি জানান। হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে এবং তারা এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটাকে তাঁরা জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি বলে আঘাত বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁরা এটাকে মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণ বলে উল্লেখ করেন।[৩৩]

কলকাতার হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিন ১৬ অক্টোবর জাতীয় শোক দিবস পালন করে। তারা স্বদেশী আন্দোলনের নামে সারা ভারতে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেয়। এর পরিনামে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা প্রদান করেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করার ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কোন আলোচনা না করায় তারা ক্ষোভ জানান। তাতে করে বৃটিশদের প্রতি মুসলমানদের সন্দেহ-অবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ রদের দরুণ মুসলিম যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণী তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের রাজভক্তির নীতির প্রতি সমালোচনামূখর হয়ে ওঠেন এবং মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আমুল পরিবর্তনের দাবি তোলেন। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ভারত সরকার ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী এক ইশতেহারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রকাশ করলে হিন্দু নেতাগণ তার বিরোধিতা করেন। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উনিশ শতকের শেষদিকে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৩ সালে কলকাতা মোহামেডান লিটার‍্যারি সোসাইটি এবং ১৮৭৭ সালে সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল মোহামেডান অ্যাসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটলে মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় চিন্তাভাবনা শুরু করে। ১৮৯৩ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় মুসলমানদের খুব অসুবিধে ভোগ করতে হয়। সেই অসুবিধের দরুণ ১৮৯৩ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা সংসদ (Defence Association) নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিলো এটার উদ্দেশ্য।[৩৪]

বঙ্গভঙ্গ উত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯০৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব ওয়াকার-উল-মূলকের সভাপতিত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতাদের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে এক সার্কুলারের মাধ্যমে নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে সম্মেলনে আসার জন্য বলা হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক নবাব সলীমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (All India Muslim League) গঠনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। গঠিত হয় ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল। পরবর্তীতে এই মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে জাতীয় কংগ্রেস ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেনি। কংগ্রেসের হিন্দু

নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসকেই হিন্দু-মুসলমানের একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচনা করার জন্য ইংরেজদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিন পর্যন্ত কংগ্রেস মুসলিম লীগকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন এবং প্রথমবারের মত লীগ-কংগ্রেস ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে ভারতীয় জনগণের স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবির প্রতি কংগ্রেস একমত পোষণ করে। লীগ-কংগ্রেসের সেই চুক্তির ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরো তীব্র হয়। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে লক্ষ্ণৌ চুক্তির শর্তগুলো পরবর্তীতে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়নি। ১৯২৮ সালের নেহরু রিপোর্টে চুক্তির অধিকাংশই পরিবর্তন করা হয়। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তা মেনে নিতে পারেননি এবং এর প্রতিউত্তরে তিনি ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভায় তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা দাবি পেশ করেন। পরবর্তীতে ১৯২৯ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে মুসলিম লীগের এক বিশাল জনসমাবেশে ১৪ দফা গৃহীত হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবি ছিল মূখ্য। জিন্নাহ ১৯৩০-৩১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন এবং তাঁর ১৪ দফার ওপর অনড় থাকেন। গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বৈঠক ব্যর্থ হয়। ইহার পর ১৯৩২ সালে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়। তাতে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা স্বীকৃতি লাভ করে এবং আইন সভায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে মুসলমানদের দাবি মেনে নেয়া হয়েছে বলে কংগ্রেস প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এতে ড. আনসারীসহ আরো কিছু মুসলিম নেতা মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের সংরক্ষণ সম্বলিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরোধিতা করা হলে তারা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের হুমকি দেন।[৩৫]

ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলার মুসলমানদের অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ ভাল ফলাফল করে। তখন পর্যন্ত মুসলিম লীগ সাধারণ জনগণের সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। তারপরও ১১৯টি সংরক্ষিত মুসলিম আসনের ৪০টি পায় মুসলিম লীগ এবং ৩৮টি পায় কৃষক প্রজা পার্টি। অবশিষ্ট ৪১টি আসন পায় স্বতন্ত্র সদস্যগণ। যুক্ত প্রদেশ মুসলিম লীগ কিছু আসন পেলেও অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম লীগের নির্বাচনী ফলাফল আশাব্যঞ্জক ছিল না। নির্বাচনের পর বাংলায় কৃষক-প্রজাপার্টি এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করে। বাংলার জনপ্রিয় নেতা প্রজাপার্টির এ.কে.এম. ফজলুল হক মূখ্যমন্ত্রী হন।[৩৬]

হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে একাধিকবার সমঝোতা হওয়ার পরও

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তাদের ঐক্য বারবার বাধাগ্রস্ত হয়। অবশেষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। উক্ত ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস প্রায় আড়াই বছরের শাসনে মুসলিম স্বার্থরক্ষায় কোন ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি। বরং মুসলমানদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের আচরণে মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব প্রকট আকার ধারণ করে। মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণতি নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠে। বৃটিশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে কার কর্তৃত্বের অধীন হচ্ছে, আদৌ মুসলমানদের কোন মুক্তির পথ রচনা করবে কিনা সে সম্পর্কে ভাবনা শুরু হয়। কংগ্রেস এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দের ওরকম আচরণ লক্ষ্য করে বিংশ শতাব্দীর তিরিশ এর দশক থেকে মুসলিম মণীষীগণ মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির চিন্তা শুরু করেন। ১৯৩০ সালে স্যার মুহাম্মদ ইকবাল মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। এই সময়ে বিলাতে প্রবাসী পাঞ্জাবী ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী উত্তর ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি এই রাষ্ট্রের নাম দেন পাকিস্তানঃ যা পাঞ্জাব, আফগানিয়া (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধু প্রদেশ, তুখারিস্তান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান নিয়ে গঠিত হবে। এর প্রত্যেকটির নামের প্রথম বর্ণ নিয়ে তিনি পাকিস্তানের নাম রচনা করেন।[৩৭]

১৯৩৯ সালে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন "দ্বি-জাতি" তত্ত্ব প্রকাশ করেন। জিন্নাহ মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন, হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলে মনে করেন। ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে লন্ডনের টাইম্‌স পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জিন্নাহ লিখেন যে, হিন্দু ও মুসলমানেরা দু'টি পৃথক জাতি এবং নিজের মাতৃভূমির শাসন ব্যাপারে উভয়রেই অবশ্য অংশগ্রহণ থাকতে হবে।[৩৮]

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন জোরদার হয়। ২৩ মার্চ (১৯৪০) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে বাংলার মূখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপঃ "That it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial adjustments as may be necessary, that the area in which the Muslims are numerically in a majority, as in the

North-Western and Eastern Zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituted units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specially provided in the constitution for minorities in the units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them".[৩৯]

প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নির্ধারণ এবং উক্ত অঞ্চলগুলোতে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন, সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয়, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য শাসনতন্ত্রে অত্যাবশ্যকীয় রক্ষাকবচের বিধান নিশ্চিত করা। উপর্যুক্ত মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য অধিবেশন কার্যনির্ধারক কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করে। কংগ্রেসের হিন্দু নেতাগণ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। কংগ্রেস নেতা এম.কে গান্ধী ভারত বিভাগকে পাপ বলিয়া মন্তব্য করেন। কলকাতার হিন্দু পত্রিকাগুলো লাহোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে। পরবর্তিতে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যগণের এক সভায় (৯ এপ্রিল) বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের নেতাগণ উপলব্ধি করেন যে, একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাস্তবসম্মত হবেনা। তারা মনে করেন, যেহেতু পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে নির্বাচনে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন পাওয়া গেছে তাই একক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির কারণে পূর্ব বাংলার মত ছোট অঞ্চলগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না।[৪০]

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগ অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের কয়েকটি রক্ষকবচের দাবি থেকে মুখ ফিরিয়ে হিন্দু এবং মুসলমান দুই জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভাগের দাবি তোলেন। কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকার ভারতের অখন্ডতার পক্ষে ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিকে ভারতের পূর্বপ্রান্তে বিরোধী শক্তির সৈন্য সমাবেশ, অপরদিকে ভারতের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে সংকটে ফেলে দেয়। বৃটিশ জনগণকে শান্ত করার জন্য এবং যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা আদায় করার লক্ষ্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধশেষে বিভিন্নদলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে ভারতের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার ঘোষণা দেয়। বৃটিশ সরকার ১৯৪০ সালের ৮ আগস্ট ভারতীয় নেতাদের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব করেন। এটি আগস্ট প্রস্তাব নামে

অভিহিত। বড়লাটের কর্মপরিষদের আয়তন বৃদ্ধি, যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধশেষে গণপরিষদ গঠন এই প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ছিল। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে সমঝোতা পৌছানোর লক্ষ্যে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৪২ সালে 'ক্রীপস মিশন' পাঠানো হয়। কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে ৩০ মার্চ স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপস শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ কারো নিকট উক্ত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। ক্রীপস মিশন ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে গান্ধী ভারত ছাড় (Quit India) আন্দোলন শুরু করেন। অপরদিকে সরকার কঠোরহস্তে সে আন্দোলন দমন করেন। গান্ধীসহ কংগ্রেসের অনেক নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়। ভারতের রাজনৈতিক সংকট সমাধানকল্পে লর্ড ওয়াভেল একটি অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য সিমলায় ১৯৪৫ সালের ২৫ জুন এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। ওয়াভেল প্রস্তাব করেন, বড়লাটের কর্মপরিষদ অন্তর্বর্তী সরকারে পরিণত হবে এবং এ পরিষদে হিন্দু-মুসলমানের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। অন্তর্বর্তী সরকারে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেস-লীগ নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। জিন্নাহ দাবি করেন, মুসলিম লীগ মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাই পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচন করবে মুসলিম লীগ। অপরপক্ষে কংগ্রেস দাবি করে, কংগ্রেস ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তাই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে কংগ্রেস। মতানৈক্যের দরুণ সিমলা বৈঠকও ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৯৪৫-৪৬ সালে বৃটিশ ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস ও লীগসহ সকল দল উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

মুসলিম লীগ নির্বাচনে অভূতপূর্ব ফলাফল লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার সংরক্ষিত ৩০টি আসনের সবকটি এবং প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪৯৪ আসনের মধ্যে ৪৩৯টি আসন মুসলিম লীগ লাভ করে। বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরাট সাফল্য অর্জন করে। ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ পায় ১১৩টি আসন। নির্বাচনে পাকিস্তান দাবির প্রতি বাংলার জনগণের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন প্রকাশ পায়। নির্বাচনের পর বৃটেনের লর্ড এটলীর সরকার ভারতে তিন সদস্যের একটি মিশন পাঠায় যা "মন্ত্রি মিশন" নামে খ্যাত। মিশনের সদস্যগণ ছিলেন প্যাথিক লরেন্স, স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস এবং এ.ভি আলেকজান্ডার। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পদ্ধতি, সংবিধান সভা গঠন এবং বড়লাটের শাসন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মিশনকে ভারতে পাঠানো হয়। মিশন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করে। আবার যৌথ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দল দু'টির সাথে সমঝোতায় পৌছাতে ব্যর্থ হয় কমিশন। কেননা কংগ্রেস অখন্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা এবং লীগ স্বাধীন ও সার্বভৌম পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবিতে অনঢ় থাকে। পরিশেষে ১৬ জুন (১৯৪৬) মন্ত্রিমিশন তাদের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ঘোষণায়

ভারতের প্রদেশগুলোকে ৩টি গ্রউপে বিভক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতির কথা বলা হয়। দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় এবং যোগাযোগ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকার ভোগ করবে। লোকসংখ্যা অনুপাতে প্রত্যেক প্রদেশ ও সম্প্রদায়ের জন্য গণপরিষদের আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আইনসভার সদস্যরা গণপরিষদে তাদের সদস্য নির্বাচন করবেন। মন্ত্রিমিশন ভারতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যও সুপারিশ করে।

মুসলিম লীগের নেতা জিন্নাহসহ সকল পক্ষ এ পরিকল্পনার ব্যাপারে একমত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান নেহেরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে একটি দুর্ভাগ্যজনক উক্তি করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস ইচ্ছে করলে এই পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবে। নেহেরুর এই উক্তিতে জিন্নাহ খুবই ক্ষুব্ধ হন। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে সরকারের গড়িমসিতে বৃটিশদের দূরভিসন্ধি সম্বন্ধে লীগের সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। তারা বৃটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ না করার ব্যাপারে লীগের বক্তব্য প্রকাশের জন্য ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস (Direct Action Day) ঘোষণা করে। ডাইরেক্ট একশন দিবসে কলকাতার জনসভায় লাখ লাখ মুসলমান সমবেত হয়। এ প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তাতে ৭২ ঘন্টায় ৫ হাজার লোক প্রাণ হারায়। এ ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতবাসী ইতোপূর্বে আর কখনো দেখেনি। সে নজিরবিহীন ও লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারত বিভক্তিকে অনিবার্য করে তোলে। কলকাতার এই দাঙ্গা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরবর্তী এক বছরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় ২০ হাজার লোক মারা যায়।[৪১]

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যকার মতানৈক্যে, অন্তর্বর্তী সরকারের অচলাবস্থা এবং হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে বৃটিশ সরকার দ্রুত সময়ের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেয় এটলি সরকার। ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস এবং লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করে বুঝতে পারেন মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবেনা। অপরদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের অচলাবস্থা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ভারত বিভাগের পক্ষে নমনীয় হতে দেখা যায়। ২রা জুন মাউন্টব্যাটেন নেহেরু, প্যাটেল, জে.বি. কৃপালনী, জিন্নাহ, লিয়াকত, আবদুর রব নিশতার ও বলদেব সিংহ এই সাতজন নেতাকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁর শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। এই পরিকল্পনায় ভারত বিভাগ এবং বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব করা হয়। মাউন্টব্যাটেন সকলের সম্মতি লাভ করতে সমর্থ হন। ৩রা জুন পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয় এবং নেহেরু,জিন্নাহ এবং বলদেব সিংহ বেতার ভাষণে আপষমূলকভাবে তা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। ৪ঠা জুন এক

সাংবাদিক সম্মেলনে মাউন্টব্যাটেন জানান, ১৫ আগস্ট বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। ৩রা জুনের এই ঘোষণা মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি "পাকিস্তান" রাষ্ট্রের জন্ম হয়। করাচী নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করা হয়। প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রী হন যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য মুসলমানদেরকে বিশেষ করে মুসলিম লীগকে দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনগণ। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের কারণে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় নিহত হয় হাজার হাজার মুসলমান এবং হিন্দু।

পাকিস্তান পরবর্তী মুসলিম রাজনীতি

মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর লীগের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই "রাষ্ট্রভাষা" ইস্যুতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও একগুঁয়েমি মনোভাবের কারণে "রাষ্ট্রভাষা" আন্দোলন রক্তাক্ত অধ্যায়ের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে পাকিস্তানের প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রামে। ভাষা আন্দোলন অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে সব সময় চিরভাস্বর হয়ে আছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে মাত্র ১০টি আসন এবং প্রাপ্ত ভোটের শতকরা ১৬.২৯% ভাগ পায়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি প্রমাণ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ লীগ নেতৃবৃন্দের হঠকারী সিদ্ধান্ত ও বৈষম্যপূর্ণ ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলনা। ১৯৭০ সালের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তায় আরো ধস নামে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান এর মতে, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন এলীটদের সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণে গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কৌশলের সাথে লীগ নেতৃবৃন্দের সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। এটিই ছিল পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ। সকল দলের রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র ছিল ছাত্রসমাজ। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের কারণে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ছাত্রসমাজের বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। তাই ষাট এর দশকে পূর্ব বাংলার যুবকদের মধ্য থেকে নতুন কোন কর্মীসংগ্রহ মুসলিম লীগের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু প্রবীণ লীগ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন।[৪২]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটলেও '৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে দেশটিকে "ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান" হিসেবে ঘোষণা করার পাশাপাশি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রটি পরিচালিত হবার কথা বলা হয়েছে। যদিও তা ছিল অনেকটা আক্ষরিক অর্থে। ইতোপূর্বে ১৯৪৯ সালের মার্চে প্রথম গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান যে "আদর্শ প্রস্তাব" (Objective

Resolution) উপস্থাপন করেন তাতে ইসলাম কর্তৃক ঘোষিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক সুবিচারের মূলনীতিগুলো পালন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।[৪৩] দীর্ঘ প্রায় নয় বছর পর পাকিস্তান একটি সংবিধান পেলেও এটি কার্যকর করা যায়নি। ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দর মির্জার সামরিক আইনজারি এবং এবং ২০দিনের মাথায় আইয়ুব খান কর্তৃক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের কার্যকারিতা পুরপুরি শেষ হয়। আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জন্য আরেকটি সংবিধান প্রণয়ন করেন যাতে রাষ্ট্রপতিকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রদান এবং রাষ্ট্রের চরিত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় থেকে কেন্দ্রীকতার প্রতি জোর দেয়া হয়। সে সংবিধানের অন্যতম আলোচিত বৈশিষ্ট্য ছিলো "মৌলিক গণতন্ত্র"। এ ব্যবস্থায় পাকিস্তানের উভয় অংশের ৮০,০০০ (আশি হাজার) সদস্যের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয়। আইয়ুব খানের ক্ষমতারোহণের পরবর্তী চার বছর বাস্তবিক অর্থে কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছিল না। ১৯৬২ সালের সংবিধানের "মৌলিক গণতন্ত্রের" আওতায় ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুব খান "সম্মিলিত বিরোধীদলের" প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সে নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলের সাথে ইসলামী দলগুলোও ঐকবদ্ধ ভূমিকা রাখে।

পাকিস্তান সৃষ্টির নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ষাটের দশকে বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মূলত: লীগে কোন "ক্যারিজম্যাটিক্" (সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন) নেতা ছিল না। একক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে নেতাকর্মীগণ কৌটারী (Cotery) স্বার্থে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "আইয়ুব খান সরকারের" সমর্থনে মুসলিম লীগের একটি অংশ মুসলিম লীগ "কনভেনশন গ্রুপ" নামে আলাদা দল গঠন করে। এই গ্রুপের নেতাকর্মীরা সরকারি আনুকূল্যে লাইসেন্স-পারমিট, সরকারি ঠিকাদারী পাওয়াসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে ভোগ করে। লীগের আরেকটি গ্রুপ নিজেদের "কাউন্সিল" মুসলিম লীগ হিসেবে অভিহিত করে আইয়ুব সরকারের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা সংসদীয় গণতন্ত্র পূনরুদ্ধারের পক্ষে অবস্থান নেয়। লীগের অন্য একটি গ্রুপ ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠন করে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি ডি পি)।[৪৪] জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলামীর তৎপরতা মূলত: গোঁড়া উলেমা এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

পাকিস্তান আমলে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতের তৎপরতা কম ছিল। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সিংহভাগেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। জামায়াতে ইসলামী হিন্দ্ ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে জামায়াত দলগতভাবে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি। অনেকে জামায়াতকে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতাকারী

হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু জামায়াতের সাহিত্য-রচনাবলীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধিতার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। কংগ্রেসের এক জাতীয়তার (ভারতীয়) বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তার পক্ষে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা 'মওদূদীর' বক্তব্য পাকিস্তানের পক্ষেই গিয়েছে বলে দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।[৪৫] পাকিস্তান আন্দোলনের চূড়ান্ত একটি অধ্যায়ে ১৯৪১ সালে জামায়াত ইসলামী হিন্দ্ এর প্রতিষ্ঠা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জামায়াতে ইসলামী "জামায়াতে ইসলামী হিন্দ" এবং "জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান" নামে যথাক্রমে ভারত এবং পাকিস্তানে কাজ শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের কাজ পুরোদমে শুরু হয় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদূদী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংগঠনিক সফর করে। চল্লিশদিন স্থায়ী এ সফরের সময় তিনি এখানকার জনগণের নিকট 'জামায়াত' আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। মূলত: এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের পরিচিতি লাভ করে। ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের ৩০টি শাখা এবং ১৭৭জন সদস্য ছিল বলে জানা যায়।[৪৬] আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনে জামায়াত ও নেজামে ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। "সম্মিলিত বিরোধীদল" (Combined Opposition Party-COP) "পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন" (Pakistan Democratic Movement-PDM) এবং 'ডাক' (DAC-Democratic Action Committee) আন্দোলনে জামায়াতসহ অন্যান্য ইসলামপন্থী দলগুলো সক্রিয়ভাবে তাদের ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং পরবর্তী শাসক ইয়াহিয়া খানের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে "আওয়ামী লীগ" বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে যার পরিণতি আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মূলত: পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের ব্যক্তি ও 'কোটারী' স্বার্থের কাছে বিশেষত: পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের অধিকার ছিল ভূলুণ্ঠিত। ইসলামী আদর্শের কথা সংবিধানে রাখা হলেও ইসলাম পরিপন্থী সকল কাজের সাথে ছিল নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ইসলামের সর্বজনীন আদর্শের কথা ভূলে গিয়ে লীগ নেতৃবৃন্দ সংকীর্ণ আঞ্চলিক স্বার্থের প্রাধান্য দিতে অধিক তৎপর ছিলেন। ইসলামী আদর্শ, গণতন্ত্র, সাম্য, সহিষ্ণুতা, সুবিচার প্রতিষ্ঠার সামান্য প্রচেষ্টাও তারা চালিয়েছেন বলে মনে হয়না। তাদের অদূরদর্শিতা, সংকীর্ণতা, এবং বৈষম্য ও দমননীতির পেক্ষাপটে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান চব্বিশ বছরের ব্যবধানে দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। যার পরিণতি আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের রাজনীতি, ইসলাম ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল

এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল সমভাবে অংশগ্রহণ করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা মূলত: তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়।[৪৭] আওয়ামী লীগের

নেতৃত্বে মূল ধারাটি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তারা অস্ত্র প্রশিক্ষণ লাভ করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেরিলা কায়দায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কয়েকটি বামধারার রাজনৈতিক দল বিশেষত: চীনপন্থী বাম দলগুলো দেশের অভ্যন্তরে থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এদেরকে দ্বিতীয় ধারায় বিবেচনা করা হয়। তৃতীয় ধারায় জামায়াত, নেজাম-ই-ইসলামী মুসলিম লীগসহ সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল এবং নেতৃস্থানীয় উলেমা ও পীরসহ ইসলামী ব্যক্তিত্বগণকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। তারা অখন্ড পাকিস্তানের স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনসহ পাকিস্তানের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ইসলামী দলগুলো আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দলগুলোর সাথে ঐকবদ্ধ ভূমিকা রাখে। কিন্তু পাকিস্তান বিভক্ত করার ইস্যুতে তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের বিরোধিতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংগঠনটির তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান গোলাম আযম বলেন, প্রধানত আদর্শগত এবং ভারতের মুসলিম বিরোধী ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে জামায়াত মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। জামায়াত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা এবং সকল বৈষম্যের অবসান করতে চেয়েছিল।[৪৮] আদর্শিক ও রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতার কারণে তখন অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিলনা বলে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোলাম আযম বলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের শ্লোগান তুলতেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা যদি তারা না হতেন, তাহলে ইসলামপন্থীদের পক্ষে ঐ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা খুবই স্বাভাবিক ও সহজ হতো"। রাজনৈতিক, আদর্শিক এবং পরিবেশগত সংকটে নিপতীত হয় ইসলামী দলগুলো। আদর্শিক কারণে তারা অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। অপরদিকে শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ভারতে তাদের পক্ষে আশ্রয় নেয়াও সম্ভব ছিলনা। অথচ ইয়াহিয়া সরকারের নৃশংসতার বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রয়োজনে এবং বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া ছাড়া বিকল্প তেমন ছিলনা। জামায়াত নেতার মতে ইসলামপন্থী ও ভারত বিরোধিরা উভয় সংকটে পড়ে যায়। তারা ইয়াহিয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমননীতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতেন। কিন্তু তবু এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কোন সাধ্য ছিলনা। বিরোধিতা করতে হলে তাদের নেতৃস্থানীয়দের অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।[৪৯]

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-কর্মীদের ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাংবাদিক আবুল আসাদ বলেছেন: ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের প্রতি ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বৈরিতার কারণের শিকার হয়ে তাঁদের অনেককে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে উভয়

সংকটের মোকাবেলায় এক বিদঘুটে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।[৫০] মুক্তিযুদ্ধে ইসলামী দলগুলোর বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক গবেষকের মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে হবে, ইয়াহিয়া সামরিক জান্তার বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করতে হবে আবার প্রয়োজনে অথবা বাধ্য হলে আশ্রয় পেতে ভারতে যাবার 'চিন্তাও' করা যাবেনা, এমনি এক "মিল অযোগ্য সমীকরণের ক্রান্তি দশার" শিকার হয়েই ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলে বাহ্যত প্রতীয়মান হয়।[৫১] শুধু ইসলামপন্থী নয় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের নির্বিঘ্নে ভারতে প্রবেশ ছিল অত্যন্ত কঠিন। এমনকি ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো সর্বজন পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবং বিশেষ সুপারিশের পর ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টিই তিনি অনেকটা বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এ সংক্রান্ত নিম্মোক্ত খন্ডচিত্রগুলো থেকে আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্যান্য দলের সম্বন্ধে ভারতের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

খন্ডচিত্র-১: ন্যাপ নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুক্তিযুদ্ধকালে আসাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের আগে তাঁর কয়েকজন সাথী সীমান্ত পার হয়েছিলেন অবস্থা যাচাইয়ের জন্য। অবস্থা যাচাইকারীদের মাওলানা ভাসানীর এক অসমীয় মুরিদ একজন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নিয়ে যায়। তারপরের ঘটনা:

> বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে পঞ্চায়েত প্রধান বললেন, আপনারা কি আওয়ামী লীগের লোক?
>
> না।
>
> আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া বর্ডার পার হবার অর্ডার নাই।
>
> যারা রাজনীতি করে না। তাদেরও?
>
> তারা বর্ডার পেরুবেন কেন?
>
> জান বাঁচানোর দায়ে।
>
> পঞ্চায়েত প্রধান কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ভোট দিয়েছেন কোন দলকে?
>
> আমরা "ন্যাপের" লোক,। আবার কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে তিনি বললেন, আপনারা বরং ফিরে যান। জানাজানি হলে অসুবিধে হতে পারে। অবস্থা আঁচ করে মাওলানা সাহেবের কথা পঞ্চায়েত প্রধানের কানে তুললাম না। নানা দ্বিধাদ্বন্ধ নিয়েই সামাদ সাহেবের (মাওলানার অসমীয় মুরিদ) বাড়িতে বসলাম। মন জুড়ে একটা প্রশ্ন চেপে বসলো, পাকিস্তান দলমত নির্বিশেষে সব বাঙালিকে মারছে। এমনকি সেমসাইড করে দু'চারশ পাকিস্তানপন্থীদেরও মারছে। অথচ ভারত কেবল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগপন্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাহলে অন্য বাঙালীরা যাবে কোথায়?[৫২]

খন্ডচিত্র- ২: সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপিসহ আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনো কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে বক্তব্য শুনে তিনি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তিবাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। আমি বলি যে,... আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কাউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে জনাব তাজউদ্দীন জানান যে, তাঁকে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর।... আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি। দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং এর ডাক বাংলোয়। সেখানে আমাকে সাতদিন রাখা হয়। সাতদিনব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়।[৫৩]

খন্ডচিত্র- ৩: আগরতলার বাস ধরার জন্য মোস্তফাসহ বেরিয়ে পড়লাম। বাসে উঠে খানিকটা আসতেই হঠাৎ রাস্তার পাশে এক জায়গায় বেশ কিছু লোকের একটা জটলা চোখে পড়ল দেখালাম কিছু লোক লম্বা দাঁড়িওয়ালা একজন লোককে মারধর করছে এবং লোকটি দু'হাতে মার ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। লোকটিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম, এ যে শেখ নুরুল্লাহ, একজন মুসলিম লীগ নেতা। একে বহুদিন ধরে চিনতাম।... ঘটনাটি দেখে আমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লাম।[৫৪] মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং এর অঙ্গ দলগুলোকে প্রথমদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ২৫ বছর মেয়াদী- "ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি" স্বাক্ষরের পর রাশিয়ার চাপে অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ৬ মাস পর সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টিকে (সিপিবি) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি ও সমর্থন প্রদান করে।[৫৫] শুধু তাই নয়, জাতীয় নেতা অলী আহাদের মতো রাজনীতিকদেরকেও গ্রেফতার এড়ানোর জন্য ভারত থেকে পালিয়ে আসতে হয়।[৫৬] সামগ্রিকভাবে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার পেছনে যে কারণগুলো নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে, গবেষক ও ভাষ্যকারগণ তা নিম্নলিখিত উপায়ে উল্লেখ করেন:

১. আওয়ামী লীগ ও ভারতভীতি;

২. ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি;

৩. সব দলকে সাথে রাখতে আওয়ামী লীগের অনীহা;

৪. জনগণের করণীয় ও স্বাধীনতা বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা;

৫. স্বাধীনতা ঘোষণায় সমাজতন্ত্রীদের অতি উৎসাহ;

৬. যুদ্ধের স্বরুপ উপলব্ধিতে ব্যর্থতা ও
৭. পাকিস্তান প্রীতি।[৫৭]

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠী মুজিবনগর সরকারকে ভারতের পুতুল সরকার বলে আখ্যায়িত করে। একইসাথে চীনের রাজনৈতিক স্রোতধারাকে সঠিক মনে করে তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। নিম্নে তাদের বর্ণনা দেয়া গেল:

১. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) তোয়াহা : বাংলাদেশের মাটিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের সাহায্যে নয়,
২. শ্রমিক আন্দোলন (সিরাজ সিকদার):পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ ; কিন্তু ভারতীয় দালাল মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়াই।
৩. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) আবদুল হক: মুক্তিযুদ্ধের নামে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আগ্রাসন-অতএব মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই।
৪. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) মতিন ও আলাউদ্দিন: চারু মজুমদারের লাইন সঠিক; সুতরাং বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক।[৫৮]

সিরাজ সিকদার পরবর্তীতে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সর্বহারা পার্টি বাংলাদেশকে ভারতের ঔপনিবেশ তৈরির রুপরেখা মনে করত। সিরাজ সিকদারের মতে, মনি সিংহ ও মোজাফফর ছিলেন সংশোধনবাদী, তাঁর মতে এরা সকলেই সর্বহারা শ্রেণী ও জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আওয়ামী লীগের বিরদ্ধে অভিযোগ এরা পূর্ববাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও সামন্তবাদীদের প্রতিনিধি। আওয়ামী লীগ ও মনিসিংহ-মোজাফ্ফর চক্র নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ববাংলা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতার লোভে সাড়ে সাত কোটি জনগণের জাতীয় সত্তা সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দেয়। পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের উৎখাতের জন্য তাদের ডেকে আনে।[৫৯] চীন পন্থী মাওবাদী বামপন্থি সংগঠনগুলো জাতীয় ভিত্তিতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মূলত: তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে অঞ্চল ভিত্তিক। যেমন আবদুল হকের নেতৃত্বে যশোরাঞ্চল, মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে নোয়াখালী অঞ্চল, সিরাজ শিকদার এর নেতৃত্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে নরসিংদী অঞ্চলে চীনবাদী বামপন্থি নেতা-কর্মীরা সংগঠিত হয়ে দেশের ভেতর থেকেই মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মূলধারার দাবিদার আওয়ামী লীগের সশস্ত্র যুদ্ধের কোন প্রস্তুতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বলতে গেলে পরিকল্পনাহীনভাবে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর পরিচালিত "অপারেশন সার্চ লাইট" নামের গণহত্যাযজ্ঞ জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী, ইপি আর,

পুলিশ, আনসার বাহিনীভূক্ত দেশপ্রেমিক বাঙালি সদস্যগণকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করে। অনেকটা নিরুপায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। এই "নিরুপায়" অবস্থাটিকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়:

"সামরিক আক্রমণের অবর্ণনীয় ভয়াবহতার ফলে সাধারণ মানুষের চোখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অস্তিত্বের অবশিষ্ট যুক্তি রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়।... যারা আক্রান্ত অথবা বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তারা অচিরে জড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধ লড়াইয়ে। মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এই স্থানীয় এবং খন্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হবার বিষয়টি এদের জন্য মূলতঃ ছিল অপরিকল্পিত, স্বত:স্ফূর্ত এবং উপস্থিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার।... বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তান বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে, এদের জন্য পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। 'কোর্ট মার্শাল' নতুবা স্বাধীনতা এ দু'টি ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে।"[৬০]

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীদের বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। ভারতীয় লেখক অশোকা রায়না মুক্তিযোদ্ধাদের চারভাগে ভাগ করেছেন:

১. ১৫-২০ বছর বয়স্ক সর্বস্তরের তরুণ যুবক;
২. আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী তরুণ যুবক সমন্বয় একদল;
৩. আধা সামরিক বাহিনী (ই পি আর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ, ফ্রন্টিয়ার গার্ডস);
৪. নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকবৃন্দ বিশেষ করে ঈষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।[৬১]

অপরদিকে মঈদুল হাসান মুক্তিযোদ্ধাদের ৩টি "স্বতন্ত্র ধারার" কথা বলেছেন:

১. ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই পি আর এর অফিসারবৃন্দ;
২. "মুজিব বাহিনী" গঠনকারী শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ চার যুবনেতার (সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ) অনুগত তরুণ যুবকবৃন্দ;
৩. আওয়ামী লীগের সমগ্র নেতা-কর্মীবৃন্দ।[৬২]

কোন সুনির্দিষ্ট "কমান্ডের" অধীনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়নি। বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেকে জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে, কেউ কেউ সুবিধে অর্জনের লোভ লালসায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম.এ. জলিলের

মূল্যায়নে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রেক্ষাপট ছিল নিম্নরূপ:

> এর [ছাত্রলীগের ক্ষুদ্রাংশ ও কমিউনিস্টদের] বাইরে যে ছাত্রসমাজ বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছিল গতানুগতিক দেশ প্রেমিকদের দায়িত্বস্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধের উপরোক্ত নির্দিষ্ট চেতনায় [স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র] উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী, ই পি আর, পুলিশ, আনসার অন্যান্য চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি মহলের ক্ষেত্রে এ কথাই প্রযোজ্য। ওদের মধ্যে অনেকেই আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে একান্তই বাধ্য হয়ে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। কেউ কেউ করেছে পদ-যশ অর্জনের সুযোগ হিসেবে, কেউ তারুণ্যের অন্ধ আবেগে এবং উচ্ছ্বাসে এবং কতিপয় লোক অংশগ্রহণ করেছে "এ্যাডভেঞ্চারইজম"-এর বশে। এ সকল ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, এবং সততারও তীব্র তারতম্য ছিল।[৬৩] উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে পাক-হানাদার বাহিনীর অতর্কিত নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। নিরুপায় একটি পরিস্থিতি সাধারণ জনগণ এবং আধাসামরিক ও সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের বাধ্য করেছে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। ২৫ শে মার্চ '৭১ সন্ধ্যা নাগাদ সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত জানার পরও শেখ মুজিবুর রহমান "সম্ভাব্য সমঝোতার" ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যা ৬ টায় প্রফেসর রেহমান সোবহান শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাঁকে সুস্পষ্টভাবে বলেন "সেনাবাহিনী সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে''।[৬৪]

২৫শে মার্চ রাত সাড়ে দশটায় শেখ মুজিব তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ড. কামালের কাছে ইয়াহিয়ার প্রধান আলোচক জেনারেল পীরজাদার সমঝোতার বিষয়ে সম্ভাব্য "টেলিফোন বার্তা" সম্পর্কে জানতে চান। ড. কামাল জানান তিনি জেনারেল পীরজাদার পক্ষ থেকে কোন "টেলিফোন বার্তা" পাননি।[৬৫] প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে রাজনৈতিক সমঝোতায় আশাবাদী শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় পত্রিকা অফিসগুলোতে যে ইশতেহার বিলি করা হয়েছিল তাতে বলা : প্রেসিডেন্টের সহিত আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি। আশা করি প্রেসিডেন্ট এবার তা ঘোষণা করবেন।[৬৬] জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে শেখ মুজিবের ভূমিকাকে গবেষক এবং বিশেষজ্ঞগণ মূল্যায়ন করেছেন বিভিন্নভাবে। অনেকের মতে,

ক. শেখ মুজিব "স্বাধীনতার" জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।[৬৭]

খ. তাই তিনি ভারতের সাথে এজন্য যোগাযোগ করতে যেয়েও করেন নি।[৬৮]

গ. তাজউদ্দীনসহ দলীয় শীর্ষ নেতাদের ঢাকার আশে পাশেই আত্মগোপনের নির্দেশ দেন।[৬৯]

ঘ. কাউকেই ভারতে যাবার নির্দেশ দেন নি যা ভারতের বিষয়ে তাঁর অনাস্থার পরিচায়ক[৭০] এবং

ঙ. মুক্তিযুদ্ধকে আপন শ্রেণী স্বার্থের বিরোধী বিবেচনা করে শেখ মুজিব "অবসম্ভাবী ভয়াবহ যুদ্ধের" কথা জেনেও "অপ্রস্তুত জাতিকে প্লাবনে ডুবিয়ে" মধ্যযুগীয় নাইটের মতো বীরত্বসহকারে আত্মসমর্পণ করেন।[৭১]

শেখ মুজিব দেশবাসীকে সুস্পষ্ট কোন দিকনির্দেশনা না দিয়ে ২৫ মার্চ রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে গ্রেফতার হন।[৭২] মুক্তিযুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত দেশবাসী পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বগ্রাসী আক্রমণের মুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।[৭৩]

ওপরে বর্ণিত বিশ্লেষকদের আলোচনা মন্তব্য সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতে হবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন। শেখ মুজিব ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। দিকনির্দেশনাহীন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় এ জাতি সম্বিত ফিরে পায় ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান) সাহসী ঘোষণায়। রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত সে ঘোষণায় তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং তিনি নতুন এ জাতির রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের সব জায়গায় বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য তিনি সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি আহবান জানান। তাঁর ঐতিহাসিক আহবানের মাধ্যমে একটি নতুন জাতির বীরত্বগাঁথা অধ্যায়ের সূচনা হয়।[৭৪] স্বাধীনতা ঘোষণার পর সর্বস্তরের ছাত্র-যুবক, কৃষক, এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হাজার হাজার নিরীহ নাগরিক আশ্রয় নেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। তারা প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের। পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে ভারতের সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতের সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অবশেষে পাকিস্তানের বিশাল সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণের ওপর অতর্কিত নৃশংস হামলাকে কেউ কেউ ভূট্টো এবং পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অফিসারদের পাকিস্তান বিভক্তির জন্য দায়ী করেন। পাকিস্তানের দু'টি অংশকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তারা শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তে রক্তাক্ত পন্থা বেছে নেন বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন। একজন বিশ্লেষক লিখেছেন:

২৫শে মার্চের রাতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সাড়ে চারশতাধিক এম এন এ-এম পি এ এবং ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও শ্রমিকলীগের নেতৃবৃন্দ ঢাকা ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই যদি ভূট্টো-টিক্কা গং-এর লক্ষ্য থাকতো তাহলে তা তারা অনায়াসেই করতে পারতেন। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজনও মারা পড়লেন না বা গ্রেফতার হলেন না। অথচ নিরীহ মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হলো। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্তানের হেফাজত করা পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তে রক্তাক্ত পন্থায় পাকিস্তানের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য পাকিস্তানের ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব যতটুকু ধৈর্যধারণের পক্ষপাতি ছিলেন, ক্ষমতা লোলুপ ভূট্টো পাকিস্তানের অপরাংশের প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য অতটুকু অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। এই জনযুদ্ধের সৃষ্টি করে

বিচ্ছিন্নতাকে ত্বরান্বিত করাই ছিল ভূট্টো এবং তাঁর অনুগত সামরিক অফিসারদের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকেই এই পরিস্থিতি অনুধাবনে ভুল করলেন। পাকবাহিনীর এই অভিযানকে পাকিস্তান রক্ষার অভিযান মনে করলেন।[৭৫]

স্বাধীনতা অর্জনের পর গঠিত প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকার কারণে সব ইসলামী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ধর্মীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় যাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার যাতে না হয়। তার জন্য সংবিধানে আইন তৈরী করা হয়।[৭৬] ধর্মভিত্তিক সংগঠন বা এর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ঘোষণাটি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয় এইভাবে:

> "জন শৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্যকোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্যকোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবেনা"।[৭৭]

সর্বোপরি ইসলামী আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭২ এর সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়: "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভুত এইভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হবে।"[৭৮] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ এদেশের মানুষের হাতে পুরোপুরি ছিলনা। ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণও করে ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের কমান্ডারের নিকট। তাই বাধ্য হয়েই মুজিব সরকার ভারতীয় সংবিধানের অনুকরণে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের চাপে মূলনীতিগুলো ঘোষণা করলেও সেগুলোর প্রতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন ছিলনা। '৭৫ পরবর্তী রাজনীতি এবং ঘটনাসমূহ তার প্রমাণ। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের শর্তগুলোর বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ঘোষণা করা হয়। সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র। স্বাধীনতার মাত্র ৫ বছর ব্যবধানে এ সকল মৌলিক পরিবর্তন করা হলেও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তা মেনে নিয়েছে। ২য় থেকে ৮ম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একটি নির্বাচনেও "ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের" শ্লোগানধারী রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করতে পারেনি। ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ২য়

বারের মতো ক্ষমতায় আসলেও এককভাবে সরকার গঠনের মত আসন পায়নি। "ঐকমত্যের" সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়েছে আওয়ামী লীগ। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বিশেষত: ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও মুজিব সরকারের বেশকিছু কার্যক্রমকে গবেষক ও বিশ্লেষকগণ "ধর্মনিরপেক্ষ" মূলনীতির বিপরীত কার্যক্রম বলে মনে করেন। মুজিব শাসনামলে উল্লেখযোগ্য ইসলামী কার্যক্রমগুলো হচ্ছে: ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও আই সি)'র সদস্যপদ গ্রহণ এবং এর শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মহানবী (সা:) জীবন ও আদর্শভিত্তিক আলোচনার সীরাতুন্নবী (সা:) সমাবেশ (মাহফিল) ও সম্মেলন আয়োজনের অনুমতি প্রদান, কবি দাউদ হায়দার কর্তৃক মহানবী (সা:)-এর প্রতি অসম্মানসূচক কবিতা প্রকাশের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের মূলে দাউদ হায়দারের নির্বাসন, দালাল আইন প্রত্যাহার ইত্যাদি। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার হয় শেখ মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের আমল থেকে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিব ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রক্রিয়া শুরু করার পেছনে তৎকালীন অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট কাজ করেছিল।[৭৯] ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালে ২৮ জুলাই সরকার রাজনৈতিক দল বিধিনিষেধ (পিপিআর) ঘোষণা করে। পিপিআর এ ছিল:

১. বিদেশী সাহায্য ও সহযোগিতায় কোন দল গঠন, সংগঠন বা আহবান করা যাবে না, এমনকি কোন ব্যক্তি এ ধরনের দলের সঙ্গে কোনরুপ সম্পর্কও রাখতে পারবেনা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখন্ডতা, নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কোনরুপ প্রচারণা ও আপত্তিকর কার্যকলাপে লিপ্ত কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না।

৩. প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে দলীয় তৎপরতা শুরু করার পূর্বে এই দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, গঠনতন্ত্র, কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, দলীয় তহবিলের উৎস, জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানকল্পে দলের পরিকল্পনা সম্বলিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পেশ করতে হবে।

৪. সকলপ্রকার গোপন কার্যকলাপ ও সশস্ত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দলের কোন সশস্ত্র বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বা অনুরুপ কোন সংগঠন থাকতে পারবে না।

৫. সকল রাজনৈতিক দলকে আদায়কৃত চাঁদা, প্রাপ্ত সাহায্য ও দানের রশিদ প্রদান করতে হবে এবং দলীয় তহবিল সরকার অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।

৬. কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোনরুপ ব্যক্তি পূজা বা ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৭. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রেও কতিপয় শর্তারোপ করা হয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে পূর্বাহ্নে কতিপয় বিষয় পেশ না করে কোন রাজনৈতিক দল কোন প্রকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

৮. রাজনৈতিক দলবিধি অমান্যকারির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই শাস্তি সম্পত্তি তহবিল বাজেয়াপ্তসহ দলটিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিলোপ করা যাবে।

৯. সরকার ইচ্ছেমত সময় সময় নির্দেশ জারি করে যে কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

১০. সাময়িকভাবে বলবৎ অপরাপর আইন যা-ই থাকুক না কেন, রাজনৈতিক দলবিধির কার্যকারিতা ঠিক থাকবে।[৮০]

ঘোষিত রাজনৈতিক দলবিধির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ধর্মভিত্তিক বা ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল গঠনে কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। রাজনৈতিক দলবিধি জাররি পর ইতোপূর্বে শেখ মুজিব সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ একটি দলের আওতায় ঐকবদ্ধ হবার চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী সর্বাধিক সংগঠিত দল ছিল। জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দলটি ১৯৭৬ সালের ৫ ও ৬ আগস্ট ঢাকায় একটি কনভেনশনের আয়োজন করে। তাতে দলটির দায়িত্বশীল পর্যায়ের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ৯৩ জন প্রতিনিধি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দলীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মাত্র ৬ জন প্রতিনিধি জামায়াতে ইসলামী নামে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। অবশিষ্ট ৮৭ জন নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামী দল গঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। সভায় একটি ঐকবদ্ধ ইসলামী দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৮১] পরবর্তিতে সমঝোতার ভিত্তিতে ঢাকায় অ্যাড্ভোকেট শফিকুর রহমানের বড়িতে সাতটি ইসলামী দলের ঐক্যের সনদ স্বাক্ষরিত হয়। তাতে বলা হয়: "আমরা অধুনালুপ্ত কতিপয় ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ আল্লাহকে হাযির নাজির জেনে অঙ্গীকার করছি যে, আমরা অতীতের পরিচিতি ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন নামে একটি মাত্র ইসলামী দল গঠন করবো।"[৮২]

এরপর ১৯৭৬ সালের ২৪ আগস্ট ঢাকায় অ্যাড্ভোকেট আবদুল জলিলের ঝিকাতলাস্থ বাসভবনে ইসলামপন্থী দলসমূহের নেতা-কর্মীদের সম্মিলিত কনভেনশনে সর্বসম্মতভাবে ঐকবদ্ধ ইসলামী দলটির নাম রাখা হয় ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)। আইডিএলএ যুক্ত হওয়া দলগুলো ছিল: নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি), বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি (বিডিপি) ও ইমারত পার্টি ।[৮৩] নব গঠিত আই ডি এল এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বিশিষ্ট আলেম ও খতিবে আযম নামে খ্যাত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (নেজামে ইসলামী পার্টির নেতা), সীনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা আবদুর রহীম

(জামায়াত) এবং অ্যাড্ভোকেট শফিকুর রহমান নিযুক্ত হন জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে। ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ ১৯৭৭ সালের গণভোটে জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দান করে। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ, আই ডি এল জোট যৌথভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। জোট ২০টি আসন লাভ করে, তন্মধ্যে জামায়াতের ছিল ৬টি আসন। ঐকবদ্ধ প্রথম ইসলামী দল আইডিএল শুরু থেকেই অন্ত:কলহে লিপ্ত হয়। জামায়াত আইডিএল এর মূল শক্তি হলেও তারা তাদের পৃথক পরিচয় সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে রাজি ছিল না। এরই ফলে ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে আইডিএল প্রথমবারের মত ভেংগে দু'ভাগ হয়। নতুন অংশের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মাওলানা আবদুর রহীম। এরপর ১৯৭৮ সালে গোলাম আযম দেশে ফেরার পর জামায়াতের নামেই রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর জোর দাবি ওঠতে থাকে। জামায়াতের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বাধীন আইডিএল থেকে বের হয়ে এসে 'জামাযাতে ইসলামী' নামে রাজনৈতিক দল গঠনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। অবশেষে পি পি আর এর বিলুপ্তির পর ১৯৭৯ সালের মে মাসে ঢাকায় এক সম্মেলনের মাধ্যমে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নামে নতুনভাবে কাজ শুরু করা হয়। অবশ্য পি পি আর এর আওতায় জামায়াত ইতোপূর্বে স্ব-নামে দল গঠনের অনুমতি চাইলেও সরকার অনুমতি দেয়নি।[৮৪] পরবর্তিতে মাওলানা সিদ্দিক আহমদের নেতৃত্বাধীন আইডিএল অংশ পুনরায় নেজামে ইসলাম পার্টি নামে, মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বাধীন আইডিএল ১৯৮৪ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' নামে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। সংবিধানের বাধ্যবাধকতার মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ নভেম্বর ১৯৮১। উক্ত নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম, কওমী মাদ্রাসা ধারার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, অশীতিপর মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অনেক পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে পেছনে ফেলে তৃতীয় স্থান লাভ। নির্বাচনের পর ১৯৮১ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি "খেলাফত আন্দোলন" নামে নতুন দল গঠন করেন। খেলাফত আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়: ক. বিশ্বব্যাপী খেলাফত আন্দোলনের তৎপরতা সম্প্রসারিত করা এবং খ. আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র খিলাফত কায়েম করা। কওমী মাদ্রাসার আলেমগণ খেলাফত আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে। কওমী ধারার বিশিষ্ট আলেম শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক শুরুতে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর তাঁর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলনের একটি অংশ এবং ইসলামী যুবশিবির একীভূত হয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস গঠন করা হয়। বাংলার জমিনে আল্লাহ্র খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নবতর সমন্বয়ধর্মী ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য চেতনা সমৃদ্ধ আপসহীন নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন

গড়ে তোলার লক্ষ্যে খেলাফত মজলিস আত্মপ্রকাশ করে।[৮৫] চরমোনাই পীর এবং খেলাফত আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা মাওলানা ফজলুল করীমের নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে।

দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং অগ্রগতির গ্যারান্টি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে যৌথনেতৃত্ব ভিত্তিক ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন গঠন করা হয়েছে।[৮৬] বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপর্যুক্ত ইসলামী দলগুলোই মূলতঃ ভূমিকা রেখে আসছে। ওগুলোর মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে দেশব্যাপী সাংগঠনিক বিস্তৃতি। অন্য দলগুলোও বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় তাদের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উপর্যুক্ত দলগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি ইসলামী দল রয়েছে যাদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড খুব বেশি চোখে না পড়লেও বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তারা ভূমিকা রাখে। তন্মধ্যে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, খেলাফতে ইসলামী পার্টি, বাংলাদেশ ফরায়েজী জামায়াত উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ বিভিন্ন ইসলামী জোটের মাধ্যমে এ সকল দলকে ভূমিকা রাখতে দেখা যায়। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে ১০টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত "সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ", এবং এরশাদ সরকারের পতনের পর গঠিত "ইসলামী ঐক্যজোট" এ উক্ত সংগঠনগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে চারদলীয় জোটের অন্যতম শরিকদল ছিল ইসলামী ঐক্যজোট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ জোট থেকে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হন।

ওপরে উল্লেখিত আলোচনায় বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ইসলাম প্রসারের কারণসমূহ, এতদাঞ্চলের মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন আমলে মুসলমানদের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরব বণিক ও সুফী সাধকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এতদাঞ্চলে ইসলামের বাণী পৌঁছে। পরতবর্তিতে ত্রয়োদশ শতাব্দির পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত এ ভূখন্ডে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুসলিম জণগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থায় নিপতিত হয়। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত) পর নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের একটি প্রভাবশালী অংশ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বিষয়ে মুসলমানদের সচেতন করে তোলেন এবং দূরবস্থা থেকে পরিত্রাণের প্রচেষ্টা চালান। মুসলিম জনগণ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়। বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান এবং পরবর্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলো রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

তথ্য সংকেত ও টীকা ঃ

১। ড. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৮

২। ড. এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, পৃ. ১২ উদ্ধৃতঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৬২

৩। আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, পৃ. ৬৫

৪। Dr. A.K.M. Ayub Ali (et.al), *Islam in Bangladesh through the Ages*, Islamic Foundation Bangladesh, July, 1995, Dhaka, PP.16-17

৫। ড. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

৬। আবদুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৭। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃত*, পৃ.৮৮, উদ্ধৃতঃ রইসউদ্দিন আরিফ, *উপমহাদেশে ধর্ম রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা-১৯৯৯, পৃঃ ১৯

৮। U.A.B. Razia Akter Banu, *Islam in Bangladesh*, E.J. Brill, Leiden, New York, Koln, 1992. p.2

৯। T.W. Arnold, *The Preaching of Islam: A History of the propagation of the Muslim faith* (Lahore: Shirkat-i-Islam. n.d) pp-256-278)

১০। *Census Report of Bengal*, 1872, P. 1

১১। মানবেন্দ্র নাথ রায়, *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান*, শতদল প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৬১-৬২

১২। ড. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮

১৩। এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, পৃ.২৩৮-৪১, উদ্ধৃত, ড. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ২৩৬-৩৭

১৪। আবদুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬

১৫। *আল্ কোরআন*, সূরা আন্ নিসা, আয়াত- ৪৮

১৬। বিস্তারিত, আবদুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮-৬০

১৭। মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

১৮। বিস্তারিত, আবদুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬-৮৭

১৯। ড. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ২৩০

২০। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ৭ মার্চ, ১৮৩৫ সালের ১৯ ধারার প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ: "His Lordship in Council is of the opinion that great of the British Government ought to be promotion of European Literature and Science amongst the natives of India, and all the funds appropriated for purposes of education would be best employed on English education alone".

২১। W.Adam, *Third Report on the state of Education in Bengal 1938 :General Report of public Instruction in Bengal*. 1872-73, p. 411

২২। ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩

২৩। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

২৪। *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫

২৫। Dr. Muin-ud-din Ahmad Khan, History of the Fara'di Movement, Islamic Foundation Bangladesh,1984, PP. 52-57.

২৬। এম.এ.রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, আহমদ পাবলিসিং হাউস, ১৯৯৪, পৃ. ৭৪

২৭। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

২৮। গোপাল হালদার, *বাঙালী সংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৫২-৫৩

২৯। ইংরেজগণ এ যুদ্ধকে সিপাহী বিদ্রোহী হিসেবে প্রচার করলেও এ যুদ্ধের বিস্তৃতি, প্রকৃতি ও অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এটিকে সামান্য সিপাহী বিদ্রোহ বলা যায় না। সিপাহীগণ বিদ্রোহ করলেও কালক্রমে এটি গণবিদ্রোহ এবং এ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। *লন্ডন টাইম্‌স ও হিন্দু প্রেট্রিয়ট* পত্রিকায় ইহা ভারতীয় প্রজাদের বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করে। দেখুন, এমবি রায় চৌধুরী, *থিউরীজ অব ইন্ডিয়ান মিউটিনি*, পৃ. ১৩১, উদ্ধৃত: এম.এ.রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

৩০। Salahuddin Ahmed, *Bangladesh Past and Present,* APH Publishing Corporation, New Delhi, 2004, P. 73

৩১। এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৩২। Salahuddin Ahmed, *op.cit*, p. 73

৩৩। এম.এ.রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯

৩৪। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১

৩৫। W.C.Smith, Modern Islam in India, A Social Analysis. p. 258, উদ্ধৃত: Salahuddin Ahmed, *op.cit*, p. 75

৩৬। এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

৩৭। বিস্তারিত, আই.এইচ. কুরেশী, মুসলিম ষ্ট্রাগল ফর পাকিস্তান, পৃ. ১১৯-২৪, উদ্ধৃত: *এম. এ. রহিম বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ. ২১৫

৩৮। এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬

৩৯। Moudud Ahmed, *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy*, The University Press Limited, 1991. p. 3

৪০। *Ibid*, P. 5

৪১। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১২ আগষ্ট, ১৯৯৭ (টাইম সাময়িকী অবলম্বনে রচিত প্রতিবেদন)

৪২। Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath,* University Press Limited, 1988, p.31.

৪৩। Moudud Ahmed, *Op.cit.* P. 17

৪৪। Talukder Maniruzzaman, *op. cit,* p. 31

৪৫। আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (১ম খন্ড)*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ১৬৭

৪৬। হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৯

৪৭। মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, ইউ পি এল, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৭-৮

৪৮। গোলাম আযম, *আমার দেশ বাংলাদেশ*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪০-৪২

৪৯। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯

৫০। আবুল আসাদ, *কালো পঁচিশের আগে ও পরে*, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃঃ- ২৩৫

৫১। ড.তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজ ভূমিকাও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৪

৫২। সাইফুল ইসলাম, *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*, ঢাকা, বস্তু প্রকাশন, ১৯৯৩, পৃ. ৮

৫৩। সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের সাক্ষাৎকার, হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, খন্ড-২*, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫, পৃ. ২০১-২০২

৫৪। এম. এ. মোহাইমেন, *ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর*, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪২

৫৫। বিস্তারিত, ন্যাপের ৩০ বছর, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৯৮৭, উদ্ধৃত, তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

৫৬। অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি (২য় সংস্করণ) ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৫০৭

৫৭। বিস্তারিত, ড. তারেক মুহাম্মদ তওফীকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৩

৫৮। আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, *৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, পান্ডুলিপি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫২

৫৯। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩

৬০। মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-৭

৬১। অশোকা রায়না, *ইনসাইড 'র' দি হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস*, ঢাকা মিথারা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৬৭

৬২। মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮

৬৩। মেজর এম.এ. জলিল, *মেজর জলিল রচনাবলী*, ঢাকা, মেজর জলিল পরিষদ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৯

৬৪। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯০

৬৫। *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২৭৮

৬৬। মাহবুবুল আলম, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৮২ পৃ. ৪০, উদ্ধৃত, ড. তারেক তওফীকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৬৭। মাহবুবুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০

৬৮। মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৬৯। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯

৭০। মতিউর রহমান চৌধুরী, "শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন" *সাপ্তাহিক খবরের কাগজ*, ঢাকা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৯০

৭১। আলী রিয়াজ, *শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা, আনন্দধারা, ১৯৮২ পৃ. ২৬

৭২। ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

৭৩। *পূর্বোক্ত।*

৭৪। Moudud Ahmed, *op.cit*, P. 234

৭৫। মুহাম্মদ নূর হুসাইন শওকত, *আই ডি এল, একটি বিপ্লবী চেতনা*, ঢাকা, দীয়া প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃ. ১৩

৭৬। *বাংলাদেশের সংবিধান*, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৯৭২, ঢাকা, পৃ. ১২

৭৭। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩

৭৮। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

৭৯। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা), *বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, প্রেরণা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪

৮০। এম.এ. ওয়াদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা, রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৯-১৪০

৮১। ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ- ৮৩

৮২। নূর হোসেন মজিদী, *মাওলানা আবদুর রহীম (রঃ): একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা, সাথী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৬৩

৮৩। ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

৮৪। অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৩০

৮৫। মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা*, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৯৯

৮৬। *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪মার্চ, '৮৭।

তৃতীয় অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশের রাজনীতি

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী অন্যতম একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৪১ সালের ২৬শে আগস্ট অবিভক্ত ভারতে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে এ দলের সূচনা হয়েছিল। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী এ দলের প্রতিষ্ঠাতা।[১] ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত স্বাধীন হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে যথাক্রমে 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান' ও 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে পৃথকভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্টীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (জাইবা) কাজ করতে থাকে।[২] ২০০৮ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করার জন্য রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হলে জামায়াত নির্বাচন কমিশনের আইন মোতাবেক রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করে। তখন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর নাম সংশোধন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নামকরণ করে।

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

১৯৪১ সালে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ্' প্রতিষ্ঠার সময়ে পাকিস্তান আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। বিশেষ করে ১৯৪০ সালের মার্চে মুসলিম লীগ কর্তৃক 'লাহোর প্রস্তাব' (পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত) উপস্থাপনের পর মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের মুসলমানরা একটি পৃথক রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। একদিকে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে বৃটিশদের নমনীয়তা, কংগ্রেসের এক জাতীয়তার আন্দোলন অপরদিকে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলামানদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ফলে বৃটিশ-ভারতের রাজনীতি এক জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়। সে সময় মুসলমানদের 'রাজনৈতিক ইস্যুকে' গুরুত্ব না দিয়ে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে আরো একটি নতুন দলের প্রতিষ্ঠা অনেকের মনে প্রশ্ন এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। এ সম্পর্কে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী বলেন

> "মূলত এটা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এটা এমন কোনো ঘটনাও ছিলনা যে, কোনো ব্যক্তির মনে হঠাৎ একটা দল গঠনের ইচ্ছে গজিয়ে ওঠলো আর সে এমনি কিছু লোক সংগ্রহ করে একটা দল খাড়া করে ফেললো। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল আমার দীর্ঘ বাইশ বছরের অবিশ্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, চিন্তা-গবেষণা ও অনুশীলনের ফল যা তখন একটা পরিকল্পনার রূপ পরিগ্রহ করে এবং সে পরিকল্পনা অনুসারেই জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়।"[৩]

খিলাফত আন্দোলনের সময় হতে পরবর্তী পনের বছরের ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন মাওলানা মওদূদী। মওদূদীর বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জামায়াতের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান (মরহুম) সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেনঃ

> "উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে একটা বৈষম্য-বৈপরীত্য বিরাজ করছিল যে, তার থেকে স্বভাবতই মানুষের মনে বহু প্রশ্নের উদয় হতো। কিন্তু খেলাফত আন্দোলন চলা পর্যন্ত এসব প্রশ্ন মনের মধ্যেই চাপা ছিল। একদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ অদম্য প্রেরণা ছিল যে, তুরস্কের খেলাফত এবং পবিত্র স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। অপরদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড সারা দেশে প্রতিহিংসার দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে, যার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে পড়ে। তারপর গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং অসহযোগ আন্দোলন, অতঃপর তুর্কী জাতীয়তাবাদ ও তার প্রত্যুত্তরে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান, তারপর খেলাফতের বিলোপ সাধন ও ভারতে খেলাফত আন্দোলনের পতন, শুদ্ধি আন্দোলন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা, মুসলমানদের প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতা, ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার আগ্রাসী হামলা, ধর্মহীন ভৌগোলিক রাষ্ট্র গঠনের জন্যে এক জাতীয়তাবাদের কলরব ও হিন্দু মুসলিম ঐক্য ভেঙে যাওয়ার পর দেশব্যাপী হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাহিত্যের মধ্যে নাস্তিকতা, অশ্লীলতা ও কমিউনিজমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, জওহরলাল নেহেরুর সমাজতন্ত্রের পুরোধার পদে সমাসীন হওয়া প্রভৃতি সবকিছুই ১৯২৪ সালের পর থেকে পরবর্তী পনেরো বছর পর্যন্ত এমন সব ঘটনা যার প্রত্যেকটির ওপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা।[৪]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দুরে থেকে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মাওলানা মওদূদী বলেন-

> "এ সময় আমার নিকট যে কাজ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো মুসলমানদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা যে, তারা অন্যান্য জাতির মত নিছক একটি জাতিমাত্র নয় এবং একটি জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারেনা বরং তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। মুসলমান হচ্ছে একটি প্রচারক জাতি, একটি মিশন্যারি জাতি। তাদের মিশন কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের উচিত এমন একটি রাষ্ট্র কায়েম করা যা দুনিয়ার বুকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হবে।"
> তিনি আরো বলেন,
>
> "১৯২৫ সাল থেকেই আমি এ বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, একটি মিশন্যারি জাতিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেই মুসলমানদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। মুসলিম জাতি হিসেবে বিশ্বে তার একটি মিশন ও লক্ষ্য রয়েছে এবং অন্যান্য জাতির মত মুসলমানরা একটি সাধারণ জাতি মাত্র নয়। সে কথা তাঁর বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এ জন্য আমি সর্বপ্রথম এ সংকল্প গ্রহন করলাম যে, যাদের মধ্যে এরূপ মিশন্যারি প্রেরণা বিদ্যমান, যারা নিজেদেরকে একটি মিশন্যারি তথা আন্দোলনমুখী জাতির অংশ বলে মনে করে এবং মুসলিম জাতিকে একটি আন্দোলনমুখী জাতিতে পরিণত করতে সংঘবদ্ধ তাদের সংঘবদ্ধ করা।"[৫]

জামায়াতে ইসলামী নামে দল গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ হিসেবে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী তিনটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথমত দেশ বিভক্ত না হলে

মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য কী করা যেতে পারে? দেশ বিভক্ত হলে যে সব মুসলমান ভারতে থেকে যাবে তাদের জন্য কী ব্যবস্থা করা দরকার? দেশ বিভক্ত হলে যে দেশ মুসলমানদের অংশে পড়বে তাকে মুসলমানদের পরিচালিত অনৈসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া থেকে কী করে রক্ষা করা যায় এবং তাকে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত?[৬]

মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব থেকেই ইসলামী আন্দোলনের কাজ করে আসছিলেন। মাত্র তেইশ বছর বয়সে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার বই 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' রচনা করেন। তৎকালীন সারা ভারত ব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় ইসলাম ও ইসলামী জিহাদের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তিনি বইটি রচনা করেন। বইটিতে তিনি ইসলামী জিহাদের মর্যাদা, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, সংস্কারমূলক যুদ্ধ, ইসলাম প্রচার ও তরবারি, যুদ্ধ ও সন্ধি, বিভিন্ন ধর্মে যুদ্ধনীতি এবং বর্তমান সভ্যতার অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ সন্ধিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করেছেন। বইটি মূলত দিল্লী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আকুল আহবানে সাড়া দিয়ে রচনা করেন। ১৯২৬ সালে শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক মুসলমান যুবক দ্বারা নিহত হলে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা যেখানে সেখানে মুসলিম বস্তিসমূহ আক্রান্ত হতে থাকে। লুন্ঠিত হতে থাকে মুসলমানদের জাল-মাল, ইজ্জত-আব্রু। হিন্দু নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে সকল দোষ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ইসলাম ও ইসলামী জিহাদের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার দ্বারা ভারতের সর্বত্র চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকেন তারা। ইসলামের বিরুদ্ধে এসকল অত্যাচারের প্রতিবাদ না করে আলেম সমাজ নিরবতা প্রদর্শন করেন। খতিব মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর প্রায় প্রতিদিনই দিল্লী জামে মসজিদে জিহাদের ওপর বক্তৃতা করতে গিয়ে কেঁদে বুক ভাসাতেন এবং শ্রোতাদেরও কাঁদাতেন। একদিনের বক্তৃতায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন "হায়! আজ যদি ভারতের বুকে এমন কোন আলেমে দ্বীন থাকতেন"। উক্ত সভায় শ্রোতা হিসেবে বসে ছিলেন তেইশ বছরের যুবক মাওলানা মওদূদী। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি আলেমে দ্বীন না হলেও এ কাজ ইনশাআল্লাহ করবো।[৭]

একটি ইসলামী দল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১৯৫১ সালের তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা "এক সালেহ জামায়াত কি জরুরি" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন,

> দুনিয়াকে ভবিষ্যতের অন্ধকার যুগ থেকে রক্ষা করে তাকে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, এখানে ইসলামের সঠিক ধারণা ও মতবাদ বিদ্যমান আছে। বরঞ্চ সঠিক মতবাদের সাথে একটি সত্যনিষ্ঠ দলেরও প্রয়োজন। এদলের সদস্যদের ঈমানের দিক দিয়ে সুদৃঢ় ও অবিচল হতে হবে এবং আমলের দিক দিয়ে হতে হবে

প্রশংসনীয় ও উচ্চমানের। কারণ, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির ভ্রান্ত ব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে এবং এ পথে আর্থিক কোরবানী থেকে শুরু করে কারাদন্ড, এমনকি ফাঁসির ঝুঁকি নিতে হবে।

একচল্লিশের মার্চ মাসে তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা মওদূদী 'জামায়াতে ইসলামীর গঠন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখার ফলে কতিপয় সমমনা লোক প্রবন্ধের ব্যাখ্যা দাবি করে মাওলানাকে পত্র লিখতে থাকেন। তার জবাবে এপ্রিল মাসের তর্জুমানুল কুরআনে বলা হয় যে, যাঁরা উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত পদ্ধতিতে কাজ করতে চান, তাঁরা আপন আপন জায়গায় কাজ শুরু করতে পারেন এবং সংগে সংগে যেন তাদের নাম ও ঠিকানা তর্জুমান অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয় যাতে করে একটা সম্মেলনের রূপ দেয়ার পথ বেরোয়। এভাবে দেড়শ' লোকের একটা তালিকা তৈরী হয় এবং এ তালিকা অনুযায়ী ২৫ আগস্ট পুঞ্চ রোড, মুবারক পার্কে (লাহোর) অবস্থিত তর্জুমানুল কুরআন কার্যালয়ে তাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। তদনুযায়ী সারা ভারত থেকে পঁচাত্তর জন ব্যক্তি উপস্থিত হন। সম্মেলনের কাজ ২৬ আগস্ট সকাল আটটায় শুরু হয়। মাওলানা মওদূদী সমবেত ব্যক্তিদের সামনে যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন তার সারমর্ম থেকে জামায়াত গঠনের প্রেক্ষাপট জানা যায়। তিনি বলেন,

"এক সময় ছিল যখন আমি স্বয়ং গতানুগতিক ও বংশানুক্রমিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম ও তার ওপর আমল করতাম। যখন জ্ঞান হলো, তখন মনে হলো নিছক এধরনের (যে কাজ বাবা-দাদাকে করতে দেখেছি) অনুসরণ অর্থহীন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কেতাব ও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। তারপর ক্রমশ ইসলামের সামগ্রিক ও বিস্তারিত ব্যবস্থা জানার ও বোঝার চেষ্টা করলাম। তারপর যখন আল্লাহ্ তায়ালা আমার মনকে এদিক থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত করে দিলেন তখন তার দাওয়াত অন্যের কাছে দেয়াও শুরু করলাম এবং এ উদ্দেশ্যে তর্জুমানুল কুরআন চালু করি।

প্রথম কটি বছর মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করতে এবং দ্বীনের একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করতেই কেটে গেল। তারপর দ্বীনকে একটা আন্দোলনের আকারে চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে প্রথম প্রদক্ষেপ ছিল 'দারুল ইসলাম' সংস্থার প্রতিষ্ঠা। এটা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। তখন চারজন মাত্র আমার সহকর্মী ছিলেন। এ ছোট সুচনাটি তখন অত্যন্ত নগণ্য মনে করা হয়েছিল। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, আমরা হতাশ হয়ে পড়িনি। ইসলামী আন্দোলনের দিকে দাওয়াত দেয়ার এবং মন মস্তিষ্ক জাগ্রত করার কাজ ক্রমাগত করতে থাকি। দেশের বিভিন্ন অংশে সমমনা লোকের ছোট ছোট চক্র গড়তে থাকে। অতঃপর আন্দোলনের প্রভাব পর্যালোচনা করার পর মনে হলো যে, এখন জামায়াতে ইসলামী গঠন করার এবং ইসলামী আন্দোলন সংগঠিত ভাবে শুরু করার জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের এ হচ্ছে উপযোগী সময়। তারই ভিত্তিতে এ সম্মেলন আহবান করা হয়েছে।"[৮]

এ সম্মেলনের মাধ্যমে ২৬ আগষ্ট ১৯৪১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ গঠন করা হয়।

পাকিস্তান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের অন্যতম হচ্ছে জামায়াত ভারতীয় মুসলিমদের জন্য পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু জামায়াত তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। জামায়াতের বক্তব্য হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সময় জামায়াতের সাংগঠনিক শক্তি বা জনসমর্থন এমন পর্যায়ে ছিলনা যার দরুণ পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে তার কার্যকর কোন ভূমিকা রাখার সামর্থ্য ছিল। বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুর্বার আন্দোলনের সময় জামায়াতের সাথে আন্দোলনকারীদের যাতে কোন সংঘাত বেধে না যায় সেজন্য জামায়াত তাদের অফিস পর্যন্ত শহর থেকে (পাঠানকোট থেকে) গ্রামে (দারুল ইসলামে) স্থানান্তরিত করে। জামায়াতের পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করাতো দুরের কথা, জামায়াতের বক্তৃতা বিবৃতি বা আন্দোলনের ব্যাপারে পাকিস্তান বিরোধী কোন ধরনের বক্তব্য ছিলনা বলে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। এ প্রসংগে মাওলানা মওদূদী বলেন,

> "জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হবার দশ মাস পর আমরা কেন্দ্রীয় অফিস লাহোর থেকে বাইরে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ১৯৪২ সালের জুন মাসে আমরা পাঠানকোট থেকে ৪ মাইল দূরবর্তী গ্রাম দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হই। তখন দেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এক দুর্বার আন্দোলন চলছিল। তাই শহরে বসে আমরা কাজ চালাই আর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ আন্দোলনের সাথে একটা দ্বন্দ্ব বেঁধে যাক তা আমাদের কাম্য ছিলনা, এ জন্য আমরা শহর ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পাকিস্তান আন্দোলনের কোন প্রকার বিরোধিতা করার কথা জামায়াতে ইসলামী কখনো কল্পনাও করেনি। আজ যে কোন ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে যা খুশি অপবাদ রটাক কিন্তু জামায়াতের কোন প্রস্তাব, কোন সম্মেলনের কার্যবিবরণী এবং কোন বিবৃতি থেকেই একথা প্রমাণিত হয়না যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল। আমরা শুধু চেয়েছিলাম কোন নির্জন গ্রামে গিয়ে নিরিবিলিতে আমাদের সদস্য ও মুত্তাফিকদের ট্রেনিং দিতে ও সংগঠন মজবুত করতে। আমরা নিজেদের পাকিস্তান আন্দোলনের সম্ভাব্য ব্যর্থতার পর সারাদেশে মুসলমানদের ওপর যে দূর্দশা নেমে আসবে, তার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করছিলাম। আর পাকিস্তান আন্দোলনের সাফল্যের পর ভারত মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার এবং পাকিস্তানে ইসলামের প্রতি যে ঔদাসীন্য প্রদর্শনের আশংকা ছিল, তা প্রতিহত করার জন্যও আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।"[১]

খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ভারতীয় মুসলমানরা নেতৃত্বহীন অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। এহেন হতাশাজনক পরিস্থিতিতে মাওলানা মওদূদী ইসলামের মৌলিক আদর্শকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করতে শুরু করেন এবং নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ও সমাজতন্ত্রের আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উম্মোচন করে ফেলেন। এর পর চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইসলামের সামাজিক অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক সমস্যাবলী নিয়ে যে অস্থিরতায় নিমর্জিত ছিল মাওলানা মওদূদী ইসলামের আলোকে সেগুলোর সমাধান পেশ করেন। চিন্তার পুনর্গঠনের পাশাপাশি মাওলানা মওদূদী মুসলমানদের

রাজনৈতিক করণীয় সম্পর্কেও তাদের সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা চালান। বৃটিশ আমলে ভারতীয় মুসলমানরা সবচেয়ে যে হুমকির সম্মুখীন হয় তা ছিল যুক্ত জাতীয়তার হুমকি।[১০] মাওলানা মওদূদী কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তা বা একজাতি তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। জাতীয়তাবাদের ওপর তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা সমৃদ্ধ লেখনির মাধ্যমে মুসলমানরা যুক্ত জাতীয়তা এবং পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদী চিন্তা পরিহার করে ইসলামী জাতীয়তাকেই গ্রহণ করতে শুরু করে। মুসলমান এবং হিন্দু এক জাতি নয়। বিশ্বাস, সংস্কৃতি, চিন্তা চেতনা, রুচি ও মননশীলতা, ন্যায়- অন্যায় ও হালাল হারাম নির্ণয় এ সকল দিক দিয়ে মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। মুসলমানদের এই সকল স্বত্তা, বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে মাওলানা ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধ তাঁর সম্পদিত তর্জুমানুল কুরআন এ প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে- লিখনিতে ইসলামী জাতীয়তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বলেন, ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি বংশ গোত্র এবং স্বদেশের পরিবর্তে মতবাদ-বিশ্বাস ও কার্যাদেশের ওপর স্থাপিত। ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপারে বংশ গোত্র, ভাষা ও বর্ণের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব নেই।[১১] মাওলানা মওদূদী তাঁর লেখনির মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন- বর্ণ, গোত্র, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদির কারণে ভারতের হিন্দু মুসলমান এক জাতিতে পরিণত হতে পারে না। মুসলমানদের রয়েছে নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা। হারাম-হালাল এবং ন্যায় অন্যায়ের ব্যাপারে মুসলমান এবং হিন্দুদের রয়েছে দৃষ্টিভংগীগত পার্থক্য। মাওলানা মওদূদী কংগ্রেস ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এক জাতিত্ব তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উম্মোচন করে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। 'ভারতীয়রা সবাই এক জাতি' কংগ্রেসের এ মতবাদের বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদী বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। এমনি প্রেক্ষপটে ১৯৪০ সালের ২২ শে মার্চ লাহোরের মিন্টু রোডে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ২৭তম বার্ষিক অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ

> "...হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত করে এক জাতীয়তা গঠন একটি কল্পনা বিলাস মাত্র। এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভুল ধারণাটি সীমালংঘন করে আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে পড়েছে। যথাসময়ে আমাদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হলে, ভারতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সাহিত্যাবলী আছে। তারা পরস্পর কোনদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, একত্রে পানাহার করেনা, তারা দুটি স্বতন্ত্র সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী যা দুটি বিপরীত ধারণা, বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত। তাদের জীবনের ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগীও আলাদা। একথাও সত্য যে, হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা লাভ করে। তাদের রয়েছে পৃথক মহাকাব্য, মহাগ্রন্থ, পৃথক জাতীয় বীর এবং পৃথক প্রাসংগিক উপাদান ও ঘটনাবলী। জাতির যে কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলমান একটি জাতি এবং অবশ্যই তাদের থাকতে হবে একটি আবাসভূমি, একটি ভূখন্ড বা অঞ্চল এবং একটি রাষ্ট্র।"[১২]

মুসলমানগণ আলাদা জাতি এবং তাদের পৃথক জাতীয়তা ও কৃষ্টির সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা শুরু হয় তিরিশের দশক থেকেই। মহাকবি আল্লামা ইকবাল প্রথম মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির স্বপ্ন দেখেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' প্রচার করে পাকিস্তান আন্দোলনকে বুদ্ধিভিত্তিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। এ তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার করার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর অবদানও উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে প্রবন্ধ এবং সাহিত্য রচনা করে মাওলানা মওদূদী ভারতীয় তথা এক জাতীয়তার বিরোধিতা করেন এবং ইসলামী জাতীয়তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন মুসলমান আলাদা জাতি। মাওলানা মওদূদীর ইসলামী জাতীয়তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং আলোচনার ফলে ভারতের মুসলমানরা তাদের জাতীয়তার ব্যাপারে সংবিৎ ফিরে পায়। তারা যে একটি আলাদা জাতি এবং তাদের পৃথক জাতীয়তা ও কৃষ্টির সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য যে পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন, তা তারা বুঝতে পারে। আর এ চেতানবোধ থেকে মুসালমানদের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। কিছু ব্যক্তির নেতিবাচক দৃষ্টিভংগী পোষন করার পরও প্রকৃত সত্য হলো, পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' যা উপস্থাপন করেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কিন্তু এ তত্ত্বের প্রচার, প্রসার ও তা মার্জিত করার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর অবদান উল্লেখ্যযোগ্য। এ ক্ষেত্রে মওদূদীর অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে কয়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের একান্ত সহকারী জনাব জাফর আহমদ আনছারী বলেন-

> "এ বিষয়ে মাওলানা আবুল আলা মওদূদী সাহেব মাছয়ালায়ে কাওমিয়াত (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) শীরোনামে ধারাবাহিক নিবন্ধ লিখেন। অকাট্য যুক্তি ও শক্তিশালী প্রমাণাদি এবং বলিষ্ঠ বর্ণনাভঙ্গীর কারণে তা মুসলমানদের মধ্যে অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতি অল্প সময়ে খুবই দ্রুততার সাথে মুসলিম জনগণের মধ্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যুক্ত জাতীয়তার মতবাদে নিদারুণ আঘাত হানে এবং মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি এ অনুভূতি দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। জাতীয়তা সংক্রান্ত এ আলোচনা নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা। কংগ্রেস ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের গোটা নীতি ও আদর্শের ওপর এর আঘাত পড়েছিল। হিন্দুদের সবচেয়ে মারাত্মক চক্রান্ত ছিল এই যে, মুসলমানদের মন থেকে তাদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার অনুভূতিটা কোন ভাবে উৎখাত করে তাদের জাতিসত্তার ভিত্তি নড়বড়ে করে দিতে হবে। এ আলোচনায় ধর্মীয় দিকটা অধিকতর লক্ষণীয় করে তুলে ধরার জন্য স্বয়ং মুসলিম লীগও চেষ্টা চালায়, যাতে মুসলিম জনগণ কংগ্রেসের ধাপ্পাবাজি বুঝতে পারে এবং নিজেদের ধর্ম ও ঈমানের দাবি পুরণের দিকে মনোনিবেশ করে।"[১৩]

মাওলানা মওদূদী পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ এবং 'একজাতি তত্ত্বের' বিরোধিতা করে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে চিন্তার পুনর্গঠনের পাশাপাশি ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক করুণ অবস্থা দূর করার জন্যও উদগ্রীব ছিলেন। নির্বাচন, আইন সভায়

মুসলমানদের আনুপাতিক হারের চেয়ে কিছু বেশি প্রতিনিধিত্ব, চাকরিতে কোটা পদ্ধতি গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলামানদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে মাওলানা মওদূদী তিনটি বিকল্প প্রস্তাব সম্বলিত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবও বৃটিশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করেন। আর এই বিকল্প ফর্মূলাগুলোর তিন নম্বর অর্থাৎ শেষ প্রস্তাবটি ছিল উপমহাদেশ বিভাগের। এ প্রসংগে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রাক্তন মহাসচিব সৈয়দ শরিফুদ্দীন পীরজাদা তার পাকিস্তানের বিকাশ (Evolution of Pakistan) নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ

> "১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ সাল নাগাদ প্রকাশিত এক ধারাবাহিক নিবন্ধমালার মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দেন এবং মুসলমানদের সতর্ক করে দেন। তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন, কংগ্রেসের ধর্মহীন চরিত্র উদঘাটন করেন এবং প্রমাণ করে ছাড়েন যে, ভারতের ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র বেমানান ও অচল, কেননা এক্ষেত্রে মুসলমানরা এক ভোট এবং হিন্দুরা চার ভোটের অধিকারী হবে। তিনি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেন। তিনি এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কেবল যুক্ত নির্বাচন অথবা আইন সভার আনুপাতিত্তের চেয়ে কিছু বেশি প্রতিনিধিত্ব এবং চাকরিতে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন দ্বারা মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি তিনটি বিকল্প ফর্মূলা সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করেন"।[১৪]

সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তাবগুলো হচ্ছেঃ

১। সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সমবায় বা কনফেডারেশন গঠন;

২। সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং জনসংখ্যার স্থানান্তর;

৩। দেশ বিভাগ[১৫]।

ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির ময়দানে মাওলানা মওদূদীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে তিনি হিন্দুদের একজাতীয়তার জোরদার আন্দোলনের বিপরীতে স্বতন্ত্র ইসলামী জাতীয়তাকে যুক্তিসহ প্রমাণ করেন এবং এ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণ করে যা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত। লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাবের সারমর্ম মাওলানা মওদূদীর শেষ প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত। লাহোর প্রস্তাবের প্রায় পনেরো মাস পূর্বে মাওলানা মওদূদী তাঁর এই বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে একথা ঠিক যে, মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যে পাকিস্তান আন্দোলনের শুরু হয় তার সাথে মাওলানা মওদূদী প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করতে পারেনি। পাকিস্তান আন্দোলন অংশ গ্রহণ না করার কারণ ছিল মূলতঃ লীগের কর্মপদ্ধতির সাথে তার মতবিরোধ। তার যুক্তি ছিল নিম্নরূপঃ[১৬]

ক. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে মুসলিম জনগণকে নৈতিকভাবেও গড়ে তোলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম এর জন্যে যথেষ্ট নয়। এর জন্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে, চিন্তার ক্ষেত্রে, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ময়দানে মোট কথা সর্বক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। অন্যথায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা।

খ. আন্দোলনের সর্বাত্মক এবং প্রত্যেক বিভাগ ও প্রত্যেক স্তরের নেতৃত্ব বাছাই করতে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সমাজতন্ত্রী, নাস্তিক, অধার্মিক, ভূস্বামী ও জমিদার সবাইকে নির্বিচারে একত্রিত করলে যে বিচিত্র ধরনের জনশক্তির সমাবেশ ঘটবে, তা কখনো জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবেনা। বরং তারা একে অপরের গলাকাটা এবং নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে সচেষ্ট হবে। ফলে জাতি আসল ভান্ডারের সন্ধান পাবেনা।

গ. মুসলমানরা মুলত একটি আদর্শবাদী ও আল্লাহর দিকে আহবানকারী গোষ্ঠী। কোন মূল্যের বিনিময়েই তাদের এ মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয়।

কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত ভিন্ন মতের ব্যাপারটা মাওলানা মওদূদী কোন রাখঢাক না রেখে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক পত্রের জবাবে তিনি লিখেছিলেনঃ

"আপনারা কখনো ধারণা করবেন না যে, আমি কোন মৌলিক মত পার্থক্যের দরুণ এ কাজে অংশ নিতে চাইনা। আসলে আমার সমস্যা দাঁড়িয়েছে এই যে, আমি বুঝতে পারছিনা যে, অংশ গ্রহণ যদি করি তবে কীভাবে করবো' অধিকন্তু চেষ্টা তদবীর আমার মনমানসকে মোটেও আকৃষ্ট করেনা। জোড়া তালি দিয়ে কার্যসিদ্ধিতেও আমার কখনোই আগ্রহ ছিলনা। আপনাদের লক্ষ্য যদি হতো প্রচলিত গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপ ভেঙ্গে নতুন সমাজ ব্যবস্থার সঠিক পূনঃনির্মাণ তা হলে আমি তাতে সর্বান্তকরণে যে কোন খেদমত আনজাম দিতে প্রস্তুত ছিলাম। সেটা যখন হচ্ছেনা, তখন আমার জন্য এটাই সমীচীন যে, এ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কোন কাজ না করে একজন শিক্ষার্থীর মত পর্যবেক্ষণ করতে যে, চিন্তাশীল লোকের এই আংশিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের কী কী পন্থা উদ্ভাবন করেন আর কর্মকুশলীরা তা বাস্তবায়িত করে কী ফল উৎপন্ন করেন। যদি বাস্তবিক পক্ষে তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কোন উত্তম ফল উৎপন্ন করে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে সেটা হবে আমার জন্য এক নতুন আবিষ্কার। সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, আমি তা দেখে সার্বিক সংস্কারের ধারণা পরিত্যাগ করে আংশিক সংস্কারের ধাওরূপটিই মেনে নেবো"[১৭]।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, মুলতঃ মুসলিম লীগের সাথে কর্মপদ্ধতিগত বিরোধের কারণে মাওলানা মওদূদী পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারেননি। তবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শিক ভিত্তিকে মজবুত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্তি প্রশ্নে অনুষ্ঠিত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেটের গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য তিনি জনগণকে পরামর্শও দিয়েছিলেন।

মাওলানা মওদূদী রচিত ইসলামী জাতীয়তা সম্পর্কিত রচনাগুলো খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং মুসলিম লীগ সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। মুসলিম লীগের সাথে মাওলানা মওদূদীর ইতিবাচক সম্পর্কের কারণে যুক্তপ্রদেশ মুসলিম লীগের 'ইসলামী সংবিধান কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে মওদূদী পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সংবিধান প্রণয়নে সহযোগিতা করেন। সর্বোপরি কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মাওলানা মওদূদীর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন- "মাওলানা মওদূদী যে খেদমত করেছেন, তাতে আমি মুগ্ধ কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন তাদের চরিত্র ও জীবন পরিশুদ্ধির চেয়ে অধিকতর তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।" তিনি একথাও বলেন যে, "জামায়াত ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। জামাআত একটা উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামরত। কিন্তু যে সমস্যাটার তাৎক্ষণিক সমাধান না হলে জামায়াতের কাজও অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য, মুসলিম লীগ সেই সমস্যার সমাধানই নিয়োজিত,"[১৮]

জামায়াতে ইসলামী : পূর্ব পাকিস্তানে কার্যক্রম

বিভাগ পূর্ব কালে নিখিল ভারত জামায়াতের মোট রুকন (রুকন অর্থাৎ সদস্য, জামায়াতের গঠনতন্ত্রের আলোকে বিভিন্ন শর্তাবলী পুশুরু সাপেক্ষে রুকন হওয়ার শপথ বাক্য পাঠ করার পর একজন কর্মী জামায়াতের রকন হিসেবে পরিগণিত হন) সংখ্যা ছিল ৬২৫। তন্মধ্যে ২৪০ জন ভারতে থেকে যান এবং অন্য ৩৮৫ জন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কাজ শুরু করে।[১৯]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর 'জামায়াত' পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে কাজ করলেও পূর্ব অংশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ভালভাবে কাজ শুরু হয় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে। অবশ্য প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৪১) থেকে পটুয়াখালির অধিবাসী আতাউল্লাহ জামায়াতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪২ সালের ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত জামায়াতের প্রথম মজলিসে শূরা এবং একই বছরের অক্টোবরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। শেষোক্ত শূরা বৈঠকে আমীরে জামায়াতের নেতৃত্ব ও জামায়াতের কর্মপদ্ধতি প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিলে শূরার যে চারজন সদস্য জামায়াত ত্যাগ করেন আতাউল্লা তাঁদের অন্যতম। আতাউল্লার পর মাওলানা আবদুর রহীম দ্বিতীয় বাংলাভাষী যিনি জামায়াতের রাজনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট হন। মাওলানা আবদুর রহীম ১৯৪৬ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত জামায়াতের সম্মেলনে যোগদান করেন।[২০]

ইতোপূর্বে ১৯৫২ সালে মাওলানা রাফিউদ্দিন ইন্দোরী নামক একজন অবাঙ্গালী ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তান সংগঠনের কাজ করার জন্য পাঠানো হয়। ১৯৫৩ সালে জামায়াতের মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তক্রমে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি টীম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় পাঠানো হয়। চৌধুরী আলী আহমেদ

খান এবং আসাদ গিলানী ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের যথাক্রমে আমীর এবং সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠনিক দায়িত্ব পরিবর্তনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত চৌধুরী আলী আহমদ খান ও জনাব আসাদ গিলানীকে পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। মাওলানা আবদুর রহীম প্রাদেশিক জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত হন।

১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারী প্রথম বারের মত জামায়াত প্রধান মাওলানা মওদূদী পূর্ব পাকিস্তানে সাংগঠনিক সফরে আসেন। তিনি প্রায় ৪০ দিনব্যাপী এই সফর অব্যাহত রাখেন। সফর উপলক্ষে দেশের অধিকাংশ বিভাগীয় ও জেলা সদরে জনসভা, সুধী সমাবেশ এবং বৈঠকী সমাবেশে মাওলানা মওদূদী বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর এই সফরের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং সুধী মহলে জামায়াতের আহবান ব্যাপকভাবে পৌঁছে যায়। মূলতঃ পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে বাঙ্গালি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়। মাওলানা আবদুর রহীম প্রাদেশিক ভারপ্রাপ্ত আমীর এবং গোলাম আযম সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন ১৯৫৬ সালে। অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আমীর নির্বাচিত হন। মাওলানা আবদুর রহিম ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি কেন্দ্রীয় জামায়াতের নায়েবে আমীর মনোনীত হন।[২১]

মাওলানা মওদূদীর সফরের পরই মূলত পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতের কার্যক্রম সুসংঘবদ্ধভাবে শুরু হয়। প্রাদেশিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বারের মত বিভাগীয় পর্যায়েও আমীর নিয়োগ দান করা হয়। রাজশাহী বিভাগের আমীর পদে আব্বাস আলী খানকে (শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের একান্ত সচিব), খুলনা বিভাগীয় আীমর পদে অধ্যাপক মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিনকে, চট্রগ্রাম বিভাগীয় আমীর পদে বিশিষ্ট সংগঠক আবদুল খালেককে এবং ঢাকা বিভাগীয় আমীর পদে সৈয়দ হাফিজুর রহমানকে নিয়োগদান করা হয়।[২২]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ: নীতি ও আদর্শ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি আদর্শবাদী দল।[২৩] ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জামায়াত সমাজে শান্তি,সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জামায়াতে ইসলামী নিছক কোন রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় দল নয়। জামায়াত ইসলামকে কোন সন্দেহ, সংশয় ছাড়া সম্পূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং জামায়াত রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় উভয়ই।[২৪] মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি

ও পরকালে মুক্তি লাভই জামায়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য। জামায়াতের অন্য সকল কর্মসূচী ও কার্যক্রমের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং কার্যক্রমও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেরই অংশ। জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা এর কর্মসূচী থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কাজ নয় বরং দাওয়াতের ৩য় দফা এবং কর্মসূচির ৪র্থ দফা বাস্তবায়নের অনিবার্য দাবি।[২৫] জামায়াতের গঠনতন্ত্রের[২৬] মাধ্যমে এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, স্থায়ী কর্মনীতি, দাওয়াত ও স্থায়ী কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গঠনতন্ত্রের ৩নং ধারায় এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসুল (স:) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালিন সাফল্য অর্জন করাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। গঠনতন্ত্রের ৪ নং ধারা থেকে জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি সম্পর্কে জানা যায়। স্থায়ী কর্মনীতি তিনটি। ও গুলো হচ্ছে ঃ

১। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের (স:) নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবে।

২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসেলের জন্য জামায়াতে ইসলামী এমন কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করবে না যা সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়।

৩। জামায়াত এর বাঞ্চিত সংশোধন ও বিপ্লব কার্যকর করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোকদের মন মগজ ও চরিত্রের সংশোধন এবং জামায়াতের অনুকূলে জনমত গঠন করবে।

যে সকল বিষয়ের প্রতি জামায়াত আহবান জানায় তা গঠনতন্ত্রের ৫নং ধারায় বর্ণিত আছে। জামায়াতের ৩ দফা দাওয়াত হচ্ছে ঃ

১। সাধারণভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর দাসত্ব ও রাসুলের (সা:) আনুগত্য করার আহবান।

২। ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবিদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করে খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহবান।

৩। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করে সমাজ হতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ ও অবিচারের অবসান ঘটানোর আহবান।

গঠনতন্ত্রের ৬ নং ধারা অনুযায়ী জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচী হচ্ছে ঃ

১। সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করে চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

২। ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদের সংগঠিত করা এবং জাহিলিয়াতের যাবতীয় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও ইসলাম কায়েম করার যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা।

৪। ইসলামের পূর্নাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কাঙিখত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরের সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

সংক্ষিপ্তভাবে জামায়াতের ৪ দফা কর্মসূচী হচ্ছে দাওয়াতের মাধ্যমে চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন, সংগঠন ও প্রশিক্ষণ, সমাজ সংস্কার ও সেবা এবং সরকার সংশোধনের কাজ। জামায়াত ইসলামী সমাজের উপযোগী নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। জামায়াতের দৃষ্টিতে আন্দোলনের মাধ্যমেই কাঙ্খিত নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টি সম্ভব। সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জামায়াত জোর জবরদস্তি বা সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়। জামায়াত নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পথেই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চায়।[২৭]

জামায়াত মূলত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চায়। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য জামায়াত সশস্ত্র বা অন্য কোন অগণতান্ত্রিক উপায়কে অবলম্বন হিসাবে বিবেচনা করেনা। নেতৃত্ব পরিবর্তনের একমাত্র পথ হিসেবে নির্বাচনকেই বেছে নিয়েছে জামায়াত। জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে এর সমাধানের জন্য ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর বিভাগের মাছিগোট নামক পল্লীতে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর এক সদস্য-সম্মেলন আহবান করা হয়। সম্মেলনে মাওলানা মওদুদী নির্বাচনের ব্যাপারে জামায়াতের দৃষ্টিভংগী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং দশটি ধারা সম্বলিত একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণকারী সদস্যগণকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দেয়া হয়। তিন দিনব্যাপী বিচার বিবেচনা এবং প্রতিটি মতামতের ওপর বিস্তৃত আলোচনার পর ৯২০ জন সদস্য উপস্থাপিত প্রস্তাবনার পক্ষে এবং মাত্র ১৫ জন সদস্য বিপক্ষে ভোট দান করে।[২৮] নেতৃত্ব পরিবর্তনের একমাত্র

পথ হিসাবে জামায়াত নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মাওলানা মওদুদী বলেন, আপনারা যে দেশে কাজ করছেন সেখানে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর সে ব্যবস্থায় নেতৃত্বের পরিবর্তনের একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন। একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কোন অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা শরীয়ত অনুযায়ী আপনাদের পক্ষে নাজায়েয। আর এ জন্যেই জামায়াতের গঠনতন্ত্র আপনাদের ইপ্সিত সংশোধন ও বিপ্লবের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করা আপনাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

জামায়াতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক গোলাম আজম (দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর জামায়তের আমীর ছিলেন) বলেন, জামায়াতে ইসলামী জনগণের কাছে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করতে চায়। সেই লক্ষ্যেই এর আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য জামায়াতের লোক তৈরীর বিশেষ কর্মসূচী রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে চেন্ অভ লীডারশীপ। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য লোক তৈরীর কাজটাকে জামায়াত সবচেয়ে বড় কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নৈতিকমান, চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানবিক যোগ্যতা ও ইসলামী জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য জামায়াত নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা ইসলামী সমাজ গঠনের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি অর্জনই জামায়াতের প্রধান লক্ষ্য।[২৯]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বহুল আলোচিত দল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধী ভূমিকার কারণে দলটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক বিভিন্নভাবে সমালোচিত হচ্ছে। অনেকে জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী দল হিসেবে অভিহিত করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে জামায়াতকে মৌলবাদী দল, সাম্প্রদায়িক দল, জঙ্গিদল হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্বাধীনতা বিরোধিতার ব্যাপারে জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বক্তব্য পরবর্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বদরুদ্দীন ওমর বলেন, কোন এক ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক বলা যায় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভূক্তির ভিত্তিতে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ঐ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত কোন ব্যক্তির শুধু ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে বিরুদ্ধাচরণ বা ক্ষতি করতে প্রস্তুত থাকে।[৩০] তিনি জামায়াতে ইসলামীকে সাম্প্রদায়িক দল বলে মনে করেন না। তাঁর মতে (১৯৭১সালে) জামায়াতে ইসলামী ধর্মের নামে যে হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি করেছে সেদিকে তাকালেও এ বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা কিছুটা পরিষ্কার হবে। কারণ তাদের এ সব আক্রমনের লক্ষ্য হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নয়, লক্ষ্য হলো সমাজতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী যে কোন ব্যক্তি বা দল। এ জন্য জামায়াতে ইসলামী আজ পর্যন্ত যতজন গণতান্ত্রিক কর্মীকে হত্যা

করেছে তাদের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ, খৃষ্টান কেউ এ পর্যন্ত নেই। যারা আছেন তারা মুসলমান পরিবার থেকেই আগত ছাত্র-যুবক প্রভৃতি।[৩১] বাংলাদেশে ইসলামের পক্ষে কথা বলা এবং ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকারীদের একজন গবেষক চারভাগে বিভক্ত করেছেন।[৩২]

"We may categorize the different groups of people championing the cause of Islam into four broad categories; a) The militant reformist (fundamentalist) b) Fatalist c) The Anglo-Mohammedan (opportunists and pragmatist) and d) The orthodox (including pirs and sufis, often escapist). The first two categories, which generally represent the Jamaat-i-Islami and the Tabligh Jammat respectively, are non-communal by nature"

তিনি জামায়াতকে জঙ্গী সংস্কারবাদী (মৌলবাদী) শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি উদ্ধৃত করেছেন জামায়াত তাঁর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদূদী (রা:) যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বুঝিয়েছেন, সেভাবে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে সমাজের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার চায়।

জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোকে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, সাম্প্রদায়িকতা মানে হল এক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অন্য সম্প্রদায়কে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা ও অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি গ্রুপ হিন্দু সম্পত্তি দখল ও হিন্দু মহিলাদের ওপর নির্যাতনে সম্পর্কে জরিপ চালায়। জরিপে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর এ জাতীয় ৮০ ভাগ ঘটনার সাথে আওয়ামী লীগের লোক জড়িত। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর একজন লোকও জড়িত পাওয়া যায়নি। এরশাদ সরকারের সময় মন্দিরে হামলার ঘটনা উল্লেখ করে গোলাম আযম বলেন, জামায়াতে ইসলামীর লোকদের হাতে একটি মন্দিরও আক্রান্ত হয়নি। বরং তারা মন্দির রক্ষার চেষ্টা করেছে বলে কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।[৩৩]

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, জামায়াতে ইসলামী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, একটি আদর্শবাদী দল। জামায়াতে ইসলামী তার সংগঠনকে শুধু ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দল হিসেবে নয় বরং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন মনে করে। জামায়াতের বিবেচনায় জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দল নয়। ইসলাম যেমন ব্যক্তি ও সামজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত, জামায়াতে ইসলামীও তেমনি ব্যাপক। ইসলামে ধর্মীয় জীবনের গুরুত্ব আছে বলেই জামায়াত ধর্মীয় দলের দায়িত্ব পালন করে। রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া ইসলামী আইন চালু হতে পারে না বলেই জামায়াত রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করে। সমাজ সেবা ও সামাজিক সংশোধনের জোর তাকিদ ইসলাম

দিয়েছে বলেই জামায়াত সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কারে মনযোগ দেয়। এ অর্থেই জামায়াতে ইসলামী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন।[৩৪]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ইসলামের যে পূর্ণরূপ রয়েছে এর সবটুকুই জামায়াতের আদর্শ। জামায়াতের মতে বিশ্বনবীকে শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসরণ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিকে তাঁর আদর্শ না মানা মুনাফেকির পরিচায়ক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা মানতে হবে, তেমনি রাসুল (সাঃ)-কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ নেতা হিসেবে মানতে হবে। রাসুলের অনুসরণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে সাহবায়ে কেরাম (রাঃ) যে মহান আদর্শ রেখে গেছেন তাই জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ।[৩৫] জামায়াত নেতৃবৃন্দের মতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাসী একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল [৩৬]

মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামায়াতের ভূমিকা

১৯৬৯-এর গণঅভুত্থানের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক (LFO) জারি করেন। ৪৮টি ধারা এবং বহু উপধারা সমন্বিত এ আইন কাঠামোর মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রশ্নে প্রধান দিক নির্দেশনাগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১. পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র যার নাম হবে "পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র"। ফেডারেশনের সাথে প্রদেশগুলো এমনভাবে একাট্টা হয়ে থাকবে যাতে আঞ্চলিক অখন্ডতা এবং জাতীয় সংহতি রক্ষিত হয়।

২. পাকিস্তান সৃষ্টির বুনিয়াদ ইসলামী আদর্শ সংরক্ষিত থাকবে এ রাষ্ট্রে। রাষ্ট্র প্রধান হবেন একজন মুসলমান।

৩. গণতন্ত্রের মৌলনীতি অনুসারে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ফেডারেল ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করা হবে।

৪. আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে বন্টিত হবে যাতে প্রদেশগুলো সর্বাধিক আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক অধিকার ভোগ করতে পারে। আবার অন্যদিকে ফেডারেল সরকার যাতে আইন, প্রশাসন ও আর্থিক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়াবলী পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় যথেষ্ট শক্তিশালী হন তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের মানুষ জাতীয় সকল কর্মকান্ডে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদেশগুলো এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিকসহ সকল বৈষম্য দূর হবে- এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।[৩৭]

উক্ত আইন কাঠামোর অধীনে পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাপ (ভাসানী) নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পায় ৮৮টি আসন। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের অবশিষ্ট দুইটি আসনের ১টি আসন পান পিডিপির নুরুল আমিন এবং অপরটি পান স্বতন্ত্র প্রার্থী উপজাতীয় নেতা রাজা ত্রিদিব রায়। পশ্চিম পাকিস্তানের অবশিষ্ট আসনগুলো পায় যথাক্রমে কাউন্সিল মুসলীম লীগ ৭, মুসলীম লীগ (কাইয়ুম) ৯, ন্যাপ (মস্কো) ৭, জমিয়তে উলামা ৭, জামায়াতে ইসলামী ৪, মুসলীম লীগ কনভেনশন ২, মারকাযী উলামা ৭ এবং স্বতন্ত্র সদস্য ১৪ টি আসন।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ এবং এর প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানান। আওয়ামী লীগ যাতে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেশের শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগনের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে পারে তার জন্য তিনি সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেন।[৩৮]

জনগণের রায় মেনে নিয়ে ১৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, "নির্বাচনে সকলপ্রকার অনিয়ম ও অসদুপায় অবলম্বন সত্ত্বেও জনগণের রায় স্পষ্ট। জনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখ সাহেবের প্রতি তাদের যে আস্থা প্রকাশ করেছে, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি।[৩৯] "ছয় দফা প্রশ্নে আপসের নিশ্চয়তা না পেলে তার দলের সদস্যরা আগামী ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবেনা। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বদলে শাসনতন্ত্র গ্রহণের জন্য তার দল ঢাকা যাবেনা। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে সকল প্রদেশের মতামত গ্রহণ অপরিহার্য। আপস ও সমঝোতার ব্যাপারে তাঁকে নিশ্চয়তা দেয়া হলে তিনি আজই ঢাকায় যেতে প্রস্তুত"।[৪০] জুলফিকার আলী ভূট্টোর উল্লেখিত ধরনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দল। পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী ভূট্টোর উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন,"পরিষদের বাহিরে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান করতে চাওয়া এবং পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকৃতির মাধ্যমে এ সন্ধিক্ষণে এক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্যোগ ভুল পদক্ষেপ। সঠিক পন্থা হচ্ছে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সব দলই পরিষদে তাদের নিজস্ব শাসনতান্ত্রিক খসড়া পেশ করবেন না। পরিষদে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনতান্ত্রিক খসড়া উপস্থাপন করবেন এবং শাসনতান্ত্রিক খসড়ার যে সব অংশ রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্র, দেশের ঐক্য ও সংহতি,

গণতান্ত্রিক মূলনীতি, মৌলিক অধিকার এবং প্রতিটি অঞ্চলে সমানাধিকার ও অর্থনৈতিক সুবিচারের মূলনীতির অনুকূল তা গ্রহণ করা হবে এবং যে সব অংশ এ সব মুলনীতির অনুকূল নয়, অবশ্যই সেগুলোর বিরোধিতা করতে হবে। এর পরেও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই তা গ্রহণ করার জন্য চাপ প্রদান করে, তাহলে এ ধরনের শাসনতন্ত্র গৃহীত হলেও এটা সাফল্যজনক কিছু হবে না এবং এর পরিণতির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সম্পূর্ণই দায়ী থাকবে।[৪১]

জুলফিকার আলী ভূট্টোর পিপিপি ৩ রা মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বয়কট করাসহ বানচাল করার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দলের (কাইয়ুম মুসলিম লীগ ছাড়া) সদস্যগন ঢাকায় পৌছান এবং পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন।[৪২] ভূট্টো কতৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের ঘোষনা এবং পরিষদ থেকে পদত্যাগের হুমকির কারণে পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠান যখন অনিশ্চিতের দিকে যেতে থাকে তখন ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৭১ জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে ৩রা মার্চ তারিখেই জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। সংগঠনের তৎকালীন সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী বলেন,

> "নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলের কর্মসূচীর সাথে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে কিন্তু অগণতান্ত্রিক পথে বা শক্তি প্রয়োগে সে কর্মসূচীকে নস্যাৎ করার রাজনীতিতে ইসলামী ছাত্রসংঘ শুধু অবিশ্বাসই করে এমন নয়, বরং ছাত্রসংঘ এ কলংকজনক পদ্ধতিকে সর্বান্তকরণে ঘৃণা করে। ছাত্রসংঘ মনে করে যে, প্রতিটি গণতন্ত্রকামী মানুষের উচিত বর্তমান জটিলতা ও চক্রান্তের বেড়াজাল থেকে জাতিকে মুক্ত করে যে কোন মূল্যে আগামী ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানকে সংশয়মুক্ত করে তোলা"।[৪৩]

সকল জল্পনা-কল্পনাকে সত্য প্রমাণ করে ১লা মার্চ '৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রেডিওতে এক ভাষণে ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্টের এক তরফা ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল এবং জনগণকে চরম বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সর্বস্তরের পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজমও তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, দেশ যখন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, ঠিক তখনই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, ভূট্টোর যোগসাজশে পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় বিশেষ শক্তিশালী মহল দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করছে। [৪৪]

৩রা মার্চের জাতীয় অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা জারির পর সারা দেশে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ ও হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। শেখ মুজিব

এক বিবৃতিতে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। বিবৃতিতে তিনি ৩ রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস এবং ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ৬ টা থেকে বিকাল ২ টা পর্যন্ত হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ৩রা মার্চের ছাত্র শ্রমিকদের শোকসভায় শেখ মুজিব সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে না নিয়ে যাওয়া এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সরকারের দায়িত্বভার ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলবে বলে ঘোষণা করেন। একই সময় জামায়াতের পূর্ব পাক প্রধান অধ্যাপক গোলাম আজম জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের কারণে উদ্ভূত অরাজক অবস্থার উন্নতিকল্পে শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। তাঁর বিবৃতির বিবরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

> "নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সাথে আলোচনা না করে জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখার মতো চরম দায়িত্বহীন সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে দেশে যে বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষের হৃদয়ে গভীর বেদনার ছায়াপাত হয়েছে। এ অবিবেচনাপ্রসূত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে যে বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বাধীনতাকামী জনগণ এ ধরনের ষড়যন্ত্র আর বেশি দিন বরদাশত করতে রাজি নয়। গত ২৩ বছর যাবত জনগণের শাসনের বিরুদ্ধে যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র পরিচালিত হয়ে এসেছে, এ সিদ্ধান্ত নিসন্দেহে তারই অন্যতম পদক্ষেপ মাত্র। জনগণ তাদের নিজেদের শাসনই কামনা করে এবং শক্তির মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করা হলে তারা তাদের জীবন বিলিয়ে দিতেও ইতস্তত করবেনা। এমতাবস্থায় নির্বাচনে জনগণের পরিষ্কার রায় ঘোষণা হওয়ার পর সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের আর মোটেও ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার অধিকার নেই।" গোলাম আযম সামরিক আইন প্রত্যাহার করে অবিলম্বে এ ভুল পদক্ষেপ বন্ধ করা এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়ে বলেন,"প্রিয় মাতৃভূমিকে অধিকতর দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে হলে শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বে অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। গণপ্রতিনিধিদের দেশ শাসনের সুযোগ দেয়া হোক এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে শাসনতন্ত্র রচনা করা হোক।"[৪৫]

৩রা মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, নিরীহ জনগণের হত্যাকান্ডের তদন্ত, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

ইতোপূর্বে ৬ তারিখে পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের তারিখ পুনর্নির্ধারিত হয় ২৫শে মার্চ। তাছাড়া ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবের নিকট অনুরোধ করা হয় যাতে ৭ মার্চ শেখ মুজিব এমন কোন কর্মসূচি ঘোষণা না করেন যা থেকে ফিরে আসা অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রেসিডেন্ট অতি শিগগির ঢাকা এসে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করবেন এবং ৬ দফার ব্যাপারে একটি সুন্দর সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[৪৬] কিন্তু পরিষদ অধিবেশনের তারিখ পুনর্নির্ধারণসহ ইয়াহিয়া

খানের কোন আহবানই পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ জনগণকে শান্ত করতে পারেনি। উপরন্তু ৬ মার্চ লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর ঘোষণা পরিস্থিতিকে আরো উত্তপ্ত করে তোলে। অন্যদিকে ছাত্রদের নবগঠিত সংগঠন 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয় এবং শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। ছাত্রদের এবং চরমপন্থীদের চাপে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। কামরুদ্দিন আহমেদ তখনকার অবস্থার চিত্র এঁকেছেন এভাবে, 'শেখ সাহেব তার ৭ মার্চের ভাষণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, অন্যদিকে ছাত্রদের প্রধান কার্যালয় জহুরুল হক হল থেকে ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ঈস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ বাহিনী ও আনসারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছিল। ছাত্ররা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ সাহেব তাঁর ৭ মার্চের বক্তৃতায় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হন'।[৪৭]

৬ মার্চের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটেনি বরং অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের চেয়ে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক সংকট নিরসনই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। এ সংকট নিরসনে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সব চেয়ে ভালো বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সামরিক শাসক তা না করে ভূট্টোর ষড়যন্ত্রের শিকার হন। এ সময় জামায়াতের পক্ষ থেকে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করার নিন্দা করা হয়। ৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে বলেন,

> "অধিবেশন পুনঃ আহবান স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা মোটেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে অনুকুল নয়। যদি ২৩ বছর যাবত শাসনতন্ত্র ছাড়াই দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করা উচিত। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করার কোন যুক্তি নেই।... বর্তমানে শেখ মুজিবুর রহমানই কার্যত দেশের প্রশাসক এবং সরকারি কর্মচারীসহ সকলেই একমাত্র তার নির্দেশই পালন করছে।... আমি অতি সত্তর সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্যে আমার পূর্ব দাবির পুনরুল্লেখ করছি"।[৪৮]

১৩ মার্চ দৈনিক সংগ্রামে অপর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে এবং জাগ্রত জনতার সাড়া প্রদানের ফলে প্রদেশের শান্তি ও শৃংখলা মোটামোটি পুনর্বহাল হয়েছে এবং এটা অকাট্যরূপে প্রমাণিত করছে যে, জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা।

১৩ মার্চ লাহোরে পিপিপি ছাড়া জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। বৈঠকে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে

শেখ মুজিবের জাতীয় পরিষদে যোগদানের চারদফা শর্ত মেনে নেন এবং দাবি জানায় যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠকের আগেই কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলোতে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হোক। শর্তগুলো ছিলোঃ ১। সামরিক আইন প্রত্যাহার ২। শাসন ক্ষমতা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ করা ৩। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া ৪। গণ হত্যার তদন্ত করা। বৈঠকে অন্যান্য নেতার সাথে জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্ট্যারী পার্টির নেতা অধ্যাপক গফুর আহমদ উপস্থিত ছিলেন। ভূট্টো ১৪ মার্চ করাচীর এক জনসভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ দেন।[৪৯] পরদিন করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আরো পরিষ্কার করে ভূট্টো বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্বকারী পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পিপলস পার্টিকে উপেক্ষা করে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বর্তমান সংকটের সমাধান হতে পারে না।... তাঁর দল চায়, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, তাহলে সে ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে হতে হবে। আমাদের মত এই যে, গণতান্ত্রিক বিধি মতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মিলিতভাবেই শুধু দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।[৫০] অর্থাৎ ভূট্টো 'দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তত্ত্বের' মাধ্যমে পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রী, দুই পার্লামেন্টের কথাই পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফায়েল আহাম্মদ পাকিস্তানের 'দুই অংশে দুই প্রধানমন্ত্রী' ভুট্টোর এই দাবির বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রদান করেন।[৫১] পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ভুট্টোর 'দুই পাকিস্তান তত্ত্বকে' দুরভিসন্ধিমূলক বলে অভিহিত করেন। জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্ট্যারী পার্টির নেতা অধ্যাপক গফুর আহমদ বলেন, ভুট্টো শুধু তাঁর ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে দেশ দুই ভাগে ভাগ করতে চান।[৫২]

১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। পরদিন প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ইয়াহিয়ার মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কয়েকদিন পর্যায়ক্রমে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আলোচনা চলাকালে জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে বলেন,"আমি পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং যে দলের প্রতি জনগণ পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছে, সে দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানাচ্ছি।... জনাব ভুট্টোর অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়াসের প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"[৫৩]

১৫ ই মার্চের পর ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিবের কয়েক দফা বৈঠকের পর ২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার্থে ২৫ মার্চ

অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় বৈঠক চলা কালে। অধিবেশন স্থগিত করা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন আমাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে।[৫৪] ২২শে মার্চ সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক সমঝোতা এবং মতৈক্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন। সমঝোতার শর্তগুলো তার দল পরীক্ষা করে দেখছে।... ব্যাপক সমঝোতা এবং সমঝোতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইতোপূর্বে অবহিত করেন।[৫৫] ২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক সংকট নিরসনের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে একটি সহজ ও কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অঞ্চলের উপযোগী সাধারন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্বিঘ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারেন, সে জন্য বর্তমানে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে।

১৫ মার্চের পর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত পর্দার অন্তরালে অনেক ঘটনাই সংঘটিত হয় এবং তার কিয়দংশমাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অনেক কিছুই থেকেছে অপ্রকাশিত। পর্দার অন্তরালের কর্মকান্ড যে বিষয়গুলো নিয়ে আবর্তিত হয়েছে, সে সময়কার একজন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক মওদুদ আহমদের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ থেকে একজন গবেষক নিম্মোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন।

১. জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল ।
২. প্রেজিডেন্শ্ল্ ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই একমত হয়।
৩. আওয়ামী লীগ তৈরী প্রেজিডেন্শ্ল্ ঘোষণার খসড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ভুট্টো-এর সাথে একমত হননি।
৪. ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানের পূর্ব পর্যন্তও শেখ মুজিব আলোচনার ইতিবাচক ফল আশা করেছেন।
৫. মুজিব ইয়াহিয়ার সম্মত ফর্মূলা গ্রহণ না করে পাপ করে ভুট্টো কিন্তু সামরিক হামলার শিকার হয় শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ।[৫৬]

ইয়াহিয়া ও মুজিব উপদেষ্টাদের মধ্যে শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৪ মার্চ বিকেলে। অর্থনৈতিক নীতিমালাসহ প্রায় সবগুলো বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠকগুলোতে। শুধু ইয়াহিয়া এবং মুজিবের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। সে বৈঠকের তারিখ ও সময় সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে।

ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে জেনারেল পীরজাদা জানালেন, বৈঠকের সময়সুচি টেলিফোনে পরে জানানো হবে। কিন্তু বোধগম্য কারণে আর কোন টেলিফোন আসেনি পীরজাদার পক্ষ থেকে। শেখ মুজিবও অপেক্ষায় ছিলেন ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার জন্য তাঁর সাথে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের। ২৫শে মার্চ রাত সাড়ে দশটার সময় যখন ড. কামাল হোসেন শেখ মুজিবের বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখনও শেখ মুজিব তাঁকে পীরজাদার টেলিফোনটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।[৫৭]

কিন্তু চূড়ান্ত ঘোষণা বা মুজিব ইয়াহিয়া এবং মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠকের কোন ফলাফল সরকারিভাবে ঘোষণা না করেই ২৫ শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক শুরু হয় ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সার্চ' কার্যক্রম। পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক সেনারা। নিরস্ত্র জনগণ রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেও কার্যকর কোন কিছু করতে পারেনি। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী না থাকায় নেতৃবৃন্দ যে যার মত করে পলায়ন করেন এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। কর্মী এবং জনগণ নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিবকেও গ্রেফতার করে পাক-সেনাবাহিনী। অত:পর একটি আরোপিত যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে। কোনপ্রকার পূর্ব প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা ছাড়াই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। বিশেষ করে বাঙালি সৈনিক, ই পি আর জোয়ান, পুলিশ, আনসার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে। জাতির সে এই দূর্যোগ মুহুর্তে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জাতিকে ঘুরে দাঁড়াবার সাহস প্রদান করেন এবং পাক হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের নির্দেশ দেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী দল

২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘবদ্ধ কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন না হলেও নিরস্ত্র জনতা বিচ্ছিন্নভাবে পাক বাহিনীকে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। প্রধান দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে ইয়াহিয়া-ভূট্টোর সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখলেও অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে পাকিস্তানের অস্থিতিশীল রাজনীতি নিয়ে কোন মতবিনিময় করেনি। স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক এবং আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়ে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি ঠিক করে। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে নিজ বাসভবন থেকে

গ্রেফতার হন। অপরপক্ষে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী দল পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য পাকিস্তান সরকারকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসককে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভয় দূর করার উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ অপরাহ্নে জনাব নুরুল আমিনের নেতৃত্বে পাকিস্তানপন্থী ১২জন বিশিষ্ট নেতার একটি প্রতিনিধি দল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাত করেন। মৌলভী ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, খাজা খয়ের উদ্দিন, জনাব শফিকুল ইসলাম, মাওলানা নুরুজ্জামান প্রমুখ নেতা সে প্রতিনিধিদলে ছিলেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা এবং ভারতের বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণার প্রতিবাদ করেন।[৫৮] পরবর্তীতে সাবেক জাতীয় পরিষদ নেতা আবদুস সবুর খান, জমিয়তে ওলামা ও নেজামে ইসলামের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দও পৃথক পৃথকভাবে লে. জে. টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাত করে প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি প্রচেষ্টার সাথে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।[৫৯] স্বাধীনতা যুদ্ধের ১০ দিনের মাথায় ৬ এপ্রিল, ১৯৭১, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর, সামরিক আইন প্রশাসক লে. জে. টিক্কা খানের সাথে বঙ্গভবনে জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করে। সে প্রতিনিধি দলে অন্যান্যর মধ্যে ছিলেন পীর দুদু মিয়া, আইনজীবী এ. কে. সাদী, অধ্যাপক গোলাম আযম। তাঁরা জনগণের মন থেকে ভয় দূর করার লক্ষ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন।[৬০]

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক নেতারা ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানকে রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটি গঠন করে। পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়ের উদ্দিন সে কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হন। কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন এ কিউ এম. শফিকুল ইসলাম, মৌলভী ফরিদ আহমদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া, মাহমুদ আলী, এ.এস.এম. সোলায়মান, আবুল কাশেম, আতাউল হক খান প্রমুখ। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির মোট সদস্য ছিল ১৪০[৬১]। শান্তি কমিটির অন্যতম দায়িত্ব ছিল রাজাকার নির্বাচন, নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গবেষক এ.এস.এম. শামসুল করিম বিভিন্ন পর্যায়ের শান্তি কমিটির ১২৭ জন সদস্যের তালিকা প্রদান করেছেন। তাতে অধ্যাপক গোলাম আযমসহ তিনজনের পরিচিতিতে জামায়াতে ইসলামীর নাম উল্লেখ করা হয়। শান্তি কমিটিতে মুসলিম লীগ, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ছিলেন।[৬২]

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভারতের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন। জামায়াতের দৃষ্টিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ বিচ্ছিন্নতার জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি বরং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ইস্যুতে আওয়ামী লীগ ভোট পায়। যুদ্ধের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দু:খ দুর্দশার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং শেখ মুজিবকে দায়ী করে জামায়াতে ইসলামী। নিম্নের কয়েকটি বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে জামায়াতে ইসলামীর মনোভাব সম্পর্কে পরিষ্কার ধাশুরুা লাভ করা যায়।

২০ জুন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম লাহোরে এক কর্মী সম্মেলনে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের গণভোট ছিল সর্বাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর। তিনি বিচিছন্ন হওয়ার জন্য গণভোট চাননি।

১৬ জুলাই অধ্যাপক আযম রাজশাহীতে বলেন, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করার জন্যই কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানী জানে অন্য কারো চেয়ে জনাব ভূট্টোই হচ্ছেন প্রধান অপরাধী।[৬৩]

ইসলামী ছাত্র সংঘ প্রধান মতিউর রহমান নিজামী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়:

> "আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে পাকিস্তানের সাত কোটি দেশ প্রেমিকের জীবন দুর্বিষহ করার হীন মানসে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে উত্তেজনা সৃষ্টির ঘৃণ্য ভূমিকা পালনে মেতে ওঠেছে। আইন-শৃংখলা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে গ্রাস করার পুরাতন দু:স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ, সীমান্ত বরাবর সৈন্য মোতায়েন ও পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে ভারতীয় বেতারের দূরভিসন্দিমূলক প্রচারণার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তথাকথিত স্বাধীন বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চিরতরে গোলামে পরিণত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৬৪]

অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলও ভারতীয় প্রচার যন্ত্রের অপপ্রচার ও ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব পাসসহ ভারতের অন্যান্য তৎপরতার নিন্দা ও প্রতিবাদ করে। নিম্নে কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের বিবৃতি উল্লেখ করা হল:

পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আলী ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, ভারতীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তাড়াহুড়া করে প্রস্তাব গ্রহণ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক নীতিকে পদদলিত করেছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন সমস্ত

তৎপরতাকে উৎসাহ দান এবং সাহায্য করা ছাড়াও ভারত তার রেডিওসহ সমস্ত প্রচার মাধ্যমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিষোদাগারের এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্লজ্জ মিথ্যা, বানোয়াট বিদ্বেষমূলক প্রচারণার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।[৬৫] পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের প্রেসিডেন্ট মোহসিন উদ্দিন আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে কল্পিত ও নির্লজ্জভাবে মিথ্যে খবর পরিবেশন করে আসছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর ওপর ভারতীয় পার্লামেন্টেও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ভারত এ যাবত যা করেছে তা শুধু জঘন্য ও নিন্দনীয়ই নয়, এটা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি নীতিরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি ভারতের এ সকল জঘন্য কার্যাবলীর তীব্র নিন্দা করেন।[৬৬] পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ইত্তেহাদুল উলেমার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিয়া মুফিজুল হক বলেন ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষকে চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত রয়েছে। বিবৃতিতে মাওলানা মুফিজুল হক বলেন, ভারত তাদের বেতার প্রচারণা ও সশস্ত্র লোক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিপথে পরিচালিত করছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে এই প্রদেশকে ধ্বংস করে দিতে চায়।[৬৭]

পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের এগারো নেতা সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করে বলেন, ভারতীয় পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আর একটি পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত তাই তার বেতার মারফত মিথ্যে ও অন্যায় প্রচারণা দ্বারা বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। দেশকে দখল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র সৈন্য পাঠাচ্ছে। তারা দৃঢ়কণ্ঠে ভারতের উক্ত দূরভিসন্ধিমূলক কার্যক্রমের নিন্দা করেন।[৬৮] পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) প্রধান সংগঠক কাজী আবদুল কাদের করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমস্ত অরাজকতার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে দায়ী করেন। তিনি বলেন নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান গোটা পরিস্থিতিটাকে সঠিকভাবে পরিচালিত না করার দরুণই পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। কাজী কাদের সম্মেলনে আরো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের কাছে তুলে দেয়া বা মাতৃভূমির বৃহৎ অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জনগণ নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারেতের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ ও ভারতীয় পত্র পত্রিকা ও বেতারের জঘন্য প্রোপাগান্ডার তীব্র নিন্দা করেন।[৬৯]

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর ভূমিকা এবং ওদের সাথে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী দলগুলোর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। নিম্নে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হল :

রাজাকার বাহিনী

লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স '৭১ জারি করেন। সে অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে ১৯৫৮ সালের আনসার এ্যাক্ট বাতিল ঘোষণা করা হয়। আনসার বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় সরকার নতুন আইন জারি করতে বাধ্য হয়। সে ক্ষমতাবলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল সক্ষম ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অস্ত্রে সজ্জিত করা হবে বলে জানানো হয়। ১৯৭১ সালের মে মাসে মাওলানা এ.কে.এম. ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামায়াত কর্মীর সমন্বয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে প্রথম এই বাহিনী গঠিত হয়। মওলানা ইউসুফ এ নামকরণ করেন রাজাকার। জুন মাসে সরকারি অধ্যাদেশে এই নাম রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়।[৭০] রাজাকার বাহিনী জামায়াত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো এবং জামায়াত নেতৃবৃন্দ এ বাহিনীর মূল নিয়ন্ত্রণে ছিলেন বলে ব্যাপক প্রচারণা রয়েছে। কিন্তু জামায়াত নেতৃবৃন্দ এ ধরনের প্রচারণার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাদের মতে, টিক্কা খান আনসার বাহিনীর মতো পুলিশের অক্জিলিয়্যারি ফোর্স হিসেবে রাজাকার আলবদর গঠন করে এবং রীতিমত ঢোল পিটিয়ে সার্কেল অফিসারদের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা হতো। এ সব বাহিনী জামায়াত গঠন করেছে মর্মে প্রচারণাকে জামায়াত নেতৃবৃন্দ মিথ্যে হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে, জামায়াতের আদর্শের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করতে না পারায় বিরোধিরা এ সব অপপ্রচার চালাচ্ছে।[৭১]

রাজাকার বাহিনীতে নানান শ্রেণীর লোক ভর্তি হতো। বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতার মতে প্রধানতঃ চার শ্রেণী বা গ্রুপের লোক রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। প্রথমতঃ যারা পাকিস্তান ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙালি হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে 'ইসলাম রক্ষা'র দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়তঃ যারা হত্যা, লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তৃতীয়তঃ গ্রামের দরিদ্র, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনগণ যারা নানা কারণে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে পারেনি তারা প্রলুব্ধ হয়ে বা বল প্রয়োগে বা ভীত হয়ে রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখায়, চতুর্থতঃ দেশে শুধু পেটের দায়ে অনেকেই রাজাকারে নাম লেখায়।[৭২]

রাজাকার বাহিনীতে লোক ভর্তির কারণঃ

বিপুলসংখ্যক রাজাকার রিক্রুট হওয়ার পেছনে তখন অনেকগুলো কারণ কাজ করে। বাংলাদেশে সবগুলো ইসলামপন্থী দলের কোনোটিই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। ফলে তাদের সমর্থকদের মধ্য থেকে একটা সংখ্যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজাকার বাহিনীতে শামিল হয়। প্রকৃত পক্ষে নিয়মিত ভাতা, রেশন, স্থানীয় ক্ষমতার ব্যবহার এবং সর্বোপরি হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ি ও বিষয় সম্পত্তি অবাধে লুটপাট ও ভোগ দখল করার লোভে সমাজের সুযোগসন্ধানী এক শ্রেণীর লোক ব্যাপকহারে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়।[৭৩]

কামরুদ্দিন আহমদ তাঁর স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় গ্রন্থে এ বিষয়ে একটা প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বাঙালিদের রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার কতকগুলো কারণ উল্লেখ করেনঃ

ক. দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করল, যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে ,তাদের দৈনিক তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছুসংখ্যক লোক, যারা এতোদিন পশ্চিমা সেনাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে দিন কাটাচ্ছিল, তাদের একটা অংশ সে বাহিনীতে যোগদান করে।

খ. এতোদিন পাক সেনার ভয়ে গ্রাম- গ্রামান্তরে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম উপায় হিসেবে তারা রাজকারদের দলে যোগ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

গ. এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দেয়।[৭৪] রাজাকার বাহিনী সাধারণভাবে শান্তি কমিটির নেতৃত্বাধীন ছিল। প্রতিটি রাজাকার 'ব্যাচ' ট্রেনিং গ্রহনের পর শান্তি কমিটির স্থানীয় প্রধান তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এই অনুষ্ঠানে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান রাজাকাররা কুরআন শরীফ ছুঁয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতো। এরপর রাজাকারদের কুচকাওয়াজ শান্তি কমিটির প্রধান সালাম গ্রহণ করতেন।[৭৫]

আলবদরঃ

স্বাধীনতা যুদ্ধে আলবদর বাহিনীর ভূমিকাও চরমভাবে বিতর্কিত। বুদ্ধিজীবী হত্যাসহ বিভিন্ন নৃশংস কাজে আলবদর বাহিনী জড়িত বলে ব্যাপকভাবে প্রচারণা রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতৃবৃন্দ আলবদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালনার সাথে জড়িত বলে মনে করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদ এর মতে আলবদর বাহিনীর সূত্রপাত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে ঘটেনি। এটি ঘটেছিল জামালপুর শহরে। জামালপুরে পাক বাহিনীর পদার্পণের পর পরই মোমেনশাহী জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী গঠিত হয়।[৭৬] আলবদরের প্রধান হিসেবে ইসলামী ছাত্রসংঘের তৎকালীন প্রধান এবং বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মতিউর রহমান নিজামীকে কেউ কেউ অভিযুক্ত করতে চান। কিন্তু নিজামী বলেন, এটি কেউ প্রমাণ করতে পারবেনা। ১৯৭১ সালে তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং এ ধরনের বক্তব্য প্রদান ও কোন বাহিনীর প্রধান থাকা এককথা নয় বলে নিজামী দাবি করেন। তিনি আরো বলেন, আলবদর বাহিনীর প্রধান থাকা তো দুরের কথা, কোন সাধারণ সদস্যও তিনি ছিলেন না।[৭৭]

রাজাকার, আলবদর সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের সেকরেট্যারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, রাজাকার বাহিনীর ২ টি শাখা হচ্ছে আলবদর আর আলশামছ। তৎকালীন সরকারের নির্দেশে থানা অফিসার এ বাহিনী গঠন করে। সরকারই তা পরিচালনা করে। এর সাথে জামায়াতে ইসলামীর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি আরো বলেন, আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, কামারুজ্জামান বা আমাকে একেক সময় একেক বিশেষণ দেয়া হয়। কখনো কাউকে পুরো দেশের কমান্ডার বানানো হয়, আবার কাউকে সংগঠক বানানো হয়। আসলে আমরা কমান্ডার থাকাতো দুরের কথা, কোন পর্যায়ের সদস্যই ছিলাম না।[৭৮] স্বাধীনতা যুদ্ধে হত্যা-ধর্ষণের সাথে জামায়াতের সম্পৃক্ততার অভিযোগ এনে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিহিত করে তাদের বিচার দাবি করা হয় কারো কারো পক্ষ থেকে। যুদ্ধাপরাধ এর সাথে জামায়তের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি হলে জামায়াতের সেকরেট্যারী জেনারেল সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, যুদ্ধাপরাধী তারাই যারা যুদ্ধ করত গিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ অসহায় মানুষকে হত্যা করেছে। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে কখনো অংশীদার ছিলেন না। এমনকি হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ এ চারটি অপরাধের সাথে জামায়াতের কেউই জড়িত ছিলেন না। এ ব্যাপারে পরিসংখ্যান উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৩৭ হাজার ৪৭১ জন লোকের বিরুদ্ধে দালাল আইনে যে মামলা হয়েছিল, তার মধ্যেও জামায়াত নেতাদের কেউই ছিলেন না। পরবর্তীকালে যে ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল, তাদের মধ্যেও জামায়াতের কেউ ছিলেন না।[৭৯] সেনাবাহিনীর সহায়তাকারী শক্তি হিসেবে জামায়াত ১৯৭১ সালে জনগণের ওপর জুলুম নির্যাতন করেছে মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এ প্রসংগে জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, সেনাবাহিনী জনগণের ওপর জুলুম নির্যাতন, যত রকম অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করেছে এর সাথে জামায়াতের সহযোগিতা করার কোন প্রমাণ কেউ পেশ করতে পারবে না। জামায়াতের দ্বারা কোথাও কোন মানুষের সামান্য ক্ষতি করার নজিরও কেউ দেখাতে পারবে না। অধ্যাপক আযম আরো বলেন, কোন থানায় জামায়াতের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পেশ করা হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই।[৮০]

স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কেবল ইসলামী দলগুলো বিরোধী ভূমিকা রেখেছে এমন নয়। সে সময়কার অধিকাংশ বামপন্থী রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেনি। মনি সিং এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে গিয়ে যুদ্ধ-প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করলেও অন্য বামপন্থী দলগুলো বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থান করে। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভংগী পোষণ করে তাদের ভূমিকা নির্ধারণ করে। যুদ্ধের সময় বামপন্থী অনেক নেতা পাক সেনাবাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগও রাখে। ওদের

অনেকে যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারকে ভারতের পুতুল সরকার হিসেবে অভিহিত করে। ষাটের দশকের সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ বিতর্কে বামপন্থীরা রাশিয়া-চীন দু'টি শিবিরে বিভক্ত ছিল। রাশিয়া তথা মস্কোপন্থী সমাজতন্ত্রীরা ভারতে আশ্রয় নেয় এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। অপর পক্ষে চীনপন্থী দলগুলো ভারতে না গিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বামপন্থী এই সব দলের ভূমিকাকে জনৈক গবেষক এভাবে উপস্থাপন করেন:

১. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) তোয়াহা: বাংলাদেশের মাটিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ করে, ভারতের সাহায্যে নয় ।
২. শ্রমিক আন্দোলন (সিরাজ সিকদার): পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ; কিন্তু ভারতীয় দালাল মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়াই।
৩. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (আবদুল হক): মুক্তিযুদ্ধের নামে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আগ্রাসন, অতএব মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই।
৪. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) মতিন ও আলাউদ্দিন: চারু মজুমদারের লাইন সঠিক; সুতরাং বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। উক্ত গবেষকের মতে চীন-পাকিস্তান মৈত্রী এবং পাকিস্তান সামরিক জান্তার পক্ষে চীনের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে চীনপন্থী দলগুলো দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।[৮১]

বামপন্থী দুই প্রধান নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হকের সাথে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ছিল। এ প্রসংগে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ-আরম্ভ হয়ে গেলে উক্ত দুই বিশিষ্ট বাম নেতার ভূমিকা উল্লেখপূর্বক লরেন্স লিফশুলৎস-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিশিষ্ট গবেষক ড. মোহাম্মদ হাননান বলেন,"কিন্তু ২৫শে মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন আবদুল হক এবং মোহাম্মদ তোয়াহা দুজন বিভক্ত হয়ে পড়লেন। আবদুল হক ভাবলেন, সশস্ত্র সংঘাতের সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু পাকিস্তানের অখন্ডতা ভাংগার জন্য, আর এর পেছনে মূলনায়ক হচ্ছে সোভিয়েত সমর্থিত 'ভারতীয় সম্প্রসাণ্ডরুবাদীরা'। এই তত্ত্বের আলোকে আবদুল হক মূল শত্রু হিসেবে ভারতকেই চিহ্নিত করেন এবং ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশ নিতে গিয়ে পাকিস্তানের মিত্র হিসেবে কাজ করেন ও মুক্তিযোদ্ধাদের খতমের লাইন গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ তোয়াহা আবদুল হকের এই তত্ত্বের সাথে একমত হতে পারেননি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চান। কিন্তু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনপুষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের মেনে নিতে পারেননি। ফলে তিনি একই সংগে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন। আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা, এ দু'জনের সাথেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ ছিল এবং তারা আক্রমণকারী সেনা অফিসারদের সাথে বৈঠক করেছেন, এ গুজবের

সত্যতার স্বীকৃতি পরে মেলে। একজন পাকিস্তানী সেনা অফিসারের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় হক-তোয়াহার সাথে তাদের নিয়মিত বৈঠক হতো"।[৮২]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈনিকদের আত্মসমর্পণকে বামপন্থী এই সকল নেতার ভারতের ঢাকা বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করে। অনেক নেতা তাদের সশস্ত্র কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন এবং তাদের ভাষায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারীতে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ-সিকদারের করুণ মৃত্যুর পর এ ধরনের সংগ্রামের অনেকটা পরিসমাপ্তি হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও জামায়াতে ইসলামী

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা, নিপীড়ন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দোলন অবশেষে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে আমরা বহু আকাংখিত স্বাধীনতা অর্জন করি। তাই মুক্তি যুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধ এ ভূখন্ডের তথা বাংলাদেশের জনগণের অহংকারের, চির গৌরবের বিষয়। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর একদেশদর্শিতা এবং পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে ১৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তনের নিরীহ জনগণের উপর আরোপিত হয় ইতিহাসের এক জঘণ্য হত্যাকান্ড, শুরু হয় স্বত:স্ফূর্ত প্রতিরোধ-মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার জন্য পাগলপরা মুক্তিকামী জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার কথা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দল ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। চীনপন্থী কয়েকটি বাম সংগঠন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। অপরপক্ষে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামীসহ ডানধারার সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্ব অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা রাখে।

১৯৭১ সালে জামায়াত রাজনৈতিক এবং আদর্শিক মত পার্থক্যের কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, বরং অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। শুধু জামায়াতে ইসলামীই প্যাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ছিলনা সকল ইসলামীক এক্ষং চীন পন্থী রাজনৈতিক দল ও ব্যাক্তি ভারতের অভিসন্ধি সম্পর্কে নিংসংশয় হতে না পেরে বাংলাদেশ আন্দোলনে শামিল হয়নি।[৮৩] জামায়াতের প্রাক্তন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন নি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি কারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে হলে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হতো কিন্তু ভারতে তাদের জীবনের নিরাপত্তা ছিলনা। তিনি আরো বলেন, শুধু জামায়াত নয়, মুসলিম

লীগের তিন গ্রুপ, নুরুল আমিনের পিডিপি, নেজামে ইসলামী পার্টিসহ কোন ইসলামী দলই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি।[৮৪] বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে গোলাম আযম বলেন, ভারতের আধিপত্য কায়েম হবে এব্যাপারে শংকিত হওয়ার কারণে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিতে পারেন নি। তাছাড়া স্বাধীনতার যুদ্ধকে গোলাম আযম ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টোর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি এবং চাপানো যুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করেন।[৮৫] ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে জামায়াতের দীর্ঘদিনের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, শেখ মুজিব এভাবে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ করে স্বাধীনতা অর্জনের কোন পরিকল্পনা মুজিবের ছিলনা। ইয়াহিয়া আর ভুট্টো যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। শেখ মুজিব দেশ ভাঙ্গতে চাননি। তিনি অভিন্ন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। কারণ, যে কোন সেনাপতি যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিপক্ষের হাতে গ্রেফতার হতে প্রস্তুত থাকেন না। এমন নজির বিশ্বের কোথাও নেই।[৮৬]

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা প্রসংগে গোলাম আযম বলেন, '৭১ সালের ২৩ মার্চ আমি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে দিয়ে খবর দিয়েছিলাম। শেখ মুজিবের সাথে তখন সাক্ষাৎ হলে পরিস্থিতি হয়তো ভিন্ন হতো। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা যাতে ভেঙ্গে না যায়, আলোচনা না ভাঙ্গলে তিনি অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন। কিন্তু শেখ মুজিব সময় দেননি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, আপনি প্রধানমন্ত্রী হলে যদি দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান করতে পারছি তাহলে আর আমাদের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের) সেপারেট হওয়ার দরকার পড়ছেনা।[৮৭] ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের অংশগ্রহণ না করা নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জামায়াত বিরোধী দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের বিরোধী ভূমিকাকে তুলে ধরে জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে হেয় করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞে জামায়াতের সহযোগিতা বা সমর্থন ছিল বলে অভিযোগ করা হয় এবং এজন্য জামায়াত ব্যাপকভাবে সমালোচিতও হচ্ছে। এ প্রজন্মের অনেকের কাছে ১৯৭১ সালের জামায়াতের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু জামায়াত এখন পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি প্রদান করেনি। বরং বলতে চেয়েছে, তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেনি। কিন্তু ভারতীয় অধিপত্যের কাছে বন্দী হয়ে যাওয়ার আশংকায় স্বাধীনতা আন্দোলন সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেনি। তাছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে জামায়াত ভূট্টো-ইয়াহিয়ার চাপানো যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতের পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থায় জামায়াতের সক্রিয় ভূমিকা রাখার কোন সুযোগ ছিলনা। কারণ, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল। ইয়াহিয়া খান বা আওয়ামী লীগ কারো পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল

জামায়াতে ইসলামীর সাথে কোন যোগাযোগ করা হয়নি। আর জামায়াত শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করতো এবং শেখ মুজিবুর রহমানই অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন। কিন্তু ভূট্টো ও ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়া হল না। তাছাড়া ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের আলোচনা অগ্রগতি হচ্ছে বলেও পত্রিকায় খবর প্রচারিত হয়েছে। ৬ দফার ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র রেখে একটি গঠনতন্ত্রের খসড়াও তৈরী হয়েছিল।[৮৮]

একটি ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধের কোন প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। পাকিস্তানীদের হাতে শেখ মুজিবের ধরা দেয়াকে কেউ কেউ পরবর্তী কালে আশংকা প্রকাশ করেছিল যে, বঙ্গবন্ধু শেষ পর্যন্ত একটা আপস করার আশায় ছিলেন।[৮৯] ভূট্টো-ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ জনগণের ওপর সেনাবাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। শুরু হয় ইতিহাসের নজীরবিহীন হত্যাযজ্ঞ। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদিও এর জন্য তেমন কোন পূর্বপ্রস্তুতি বা পরিকল্পনা ছিলনা।

১৯৭১ সালের মার্চের সেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে রাজনৈতিকভাবে অনেকটা গুরুত্বহীন জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা কী ছিল এবং জামায়াত কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে [৯০] অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন,

> "দেশের মানুষ সত্তরের নির্বাচনে এই দেশের একটি দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ভোট দেয়। কিন্তু ভূট্টো এবং ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্রের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়া হলনা। তারা আমাদের ওপর মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান এ ধরনের মুক্তিযুদ্ধ চাননি। যা আমি একাধিকবার বলেছি। এর প্রতিবাদ এখনও কেউ করেন নি। এমন একটা দু:খজনক ব্যাপার যখন আমাদের ওপর চাপানো হল ভারত তখন তার সুযোগ নিল, কারণ পাকিস্তান দুই টুকরা হলে তাদের প্রতিপক্ষ দুর্বল হবে। আমরা তখন মহাচিন্তায় পড়লাম। আমরা কী করি? মজলিসে শূরার বৈঠক বসল। আমাদের সামনে তিনটা বিকল্প ছিল। এক: যারা নির্বাচনে বিজয়ী হল তারা ভারতে আশ্রয় নিয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু করল। আমরা কী করি? আমরা ভারতের গোলাম হয়ে যাচ্ছি কিনা এ ভয় আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল। ভারতের সহযোগিতা নিয়ে দেশ স্বাধীন হলে তার আধিপত্য থেকে বাঁচব কী করে– এ প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয়। ক্লাইভের সহযোগিতায় মীর জাফর নবাব হয় কিন্তু তার নবাবী কি টিকে ছিল? আমাদের সামনে দু'টি সমস্যা দেখা দিল, আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাই, তবে ভারতে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের পক্ষে ভারতে যাওয়া সম্ভবপর ছিলনা। আমরা এটা বিশ্বাসই করতে পারলাম না যে, ভারতের সাহায্য নিয়ে আমরা সত্যিকার স্বাধীন হতে পারব। আরও বড় বাধা সামনে এস দাঁড়ায়– তা হল ঈমানের বাধা। যারা মুক্তিযুদ্ধে গেলেন, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা ঘোষণা করলেন। আমরা তাতে সাড়া দেই কি করে। আমরা পাকিস্তান আন্দোলনে

শরিক হয়েছিলাম ইসলাম কায়েমের জন্য। আমিও সে আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলাম। আমার চেয়েও বড় কর্মী ছিলেন শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন। তারা কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্যই আন্দোলন করেন। এ অবস্থায় বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য আমরা তাদের সাথে যাব কী করে?

এক্ষেত্রে আরেকটি বিকল্প ছিল চুপ করে থাকা। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। কর্মীদের আমরা কী বলব? তাছাড়া চুপ থাকলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মনে করত আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আছি। এ কারণে তাদের মার খেতে হত। আবার মুক্তিযোদ্ধারা মনে করত আমরা পাকিস্তানীদের সাথে ভেতরে ভেতরে সম্পর্ক রাখি। তাদেরও মার খেতে হত। তাহলে ভারতে যাওয়াও সম্ভব নয় আবার চুপ থাকাও সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আমরা করবটা কী– এ প্রশ্ন উঠল। শেষ পর্যন্ত আমরা সেনাবাহিনী ও জনগণের মাঝখানে থেকে জনগণকে রক্ষা করার চেষ্টা চালাই। সেনাবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করার সুযোগও নিলাম। আমি টিক্কা খানের সাথে দেখা করেছি বলে ছবিও দেখানো হয়। ছবিতেতো লেখা নেই, কী কারণে দেখা করেছি। আমি তার নিকট প্রতিবাদ করতেই গিয়েছিলাম। বলেছিলাম যে, এমন কিছু করা মোটেও উচিত নয়, যাতে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট কার্জন হলে এক সভা হয়েছিল জনাব নুরুল আমীনের সভাপতিত্বে। আমি সেনাবাহিনীর তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। বলেছিলাম তোমরা জনগণের সাথে যে আচরণ করছ, তাতে জনগণ পাকিস্তানের দুশমনে পরিণত হচ্ছে। ৬ সেপ্টেম্বর নর্থ ব্রুক হলে অনুষ্ঠিত সভায় আমি অত্যন্ত হতাশা ব্যক্ত করি। আমি বলেছিলাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যা করল তাতে এদেশে ভারত যা চাচ্ছে তাই হবে। আমরা এ সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি জনগণকে রক্ষা করার জন্য। প্রতিবাদ করেছি বায়তুল মোকাররমের সামনে জনসভায়ও। কিন্তু সেন্সরশীপের কারণে কোন বক্তব্যই পত্রিকায় প্রকাশ পায়নি। জনগণ দেখেছে আমরা কী করেছি। আমরা যদি জনগণের বিরুদ্ধে কিছু করতাম তবে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন ওঠত। জনগণের বিরুদ্ধে কিছু করলেতো তাদের কাছে যেতেই পারতাম না। সব কিছুই ছিল ভারতের বিরুদ্ধে বক্তব্য। মুক্তিযুদ্ধে বা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য ছিলনা।"

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াত অংশগ্রহণ করেনি বিধায় অনেক রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামী এবং তার নেতৃবৃন্দকে 'স্বাধীনতা বিরোধী' হিসেবে অভিহিত করে থাকে। জামায়াত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি মর্মেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। অনেকে আবার বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাথে এক করার ষড়যন্ত্রে জামায়াতের সম্পৃক্ততার কথাও বলেন। কিন্তু জামায়াত নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বক্তৃতা–বিবৃতি এবং পত্র পত্রিকায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এসকল অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। প্রথমত: জামায়াত নিজেদের 'স্বাধীনতা বিরোধী' হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়। তাদের মতে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা আর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এক কথা নয়।[৯১] স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শ্লোগানকে জামায়াত ভারতের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে। তাদের মতে, 'র' (RAW)-এর প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্বাধীনতার পক্ষ–বিপক্ষ শ্লোগান তোলা হয়। কারণ, ভারত বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় আর ধর্মনিরপেক্ষতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল ইসলাম। তাই জামায়াতে ইসলামী ও

অন্যান্য ইসলামী দল তাদের টার্গেট। এ কারণেই তারা ইসলাম পন্থীদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি, স্বাধীনতাবিরোধী ইত্যাদি অভীধা দিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।[৯২] জামায়াত স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। দৈনিক যুগান্তরের সাথে এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়েছি।[৯৩]

জামায়াতের বর্তমান আমীর মতিউর রহমান নিজামী দৈনিক সমকালের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসংগে বলেন, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে দেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে নিয়ে, এই দেশে রাজনীতি করছি, দেশ গড়ার রাজনীতি করছি।[৯৪] জামায়াতে ইসলামীকে বর্তমানে স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি হিসেবে অভিহিত করাকে অনেকে বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা, ১৯৭১ সালে জামায়াতের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান আর বর্তমান অবস্থান এক নয়। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর মতে, জামায়াত বাংলাদেশের ভূখন্ডেই বাঙ্গালি ইসলামপন্থী হিসেবেই নিজেদের ক্ষমতা সংহত করতে চায় এবং সে হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তারাও আগ্রহী। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জামায়াতের কথিত ষড়যন্ত্রকে তিনি কল্পনার ওপর ভর করে মতামত প্রদান বলে উল্লেখ করেন।

এ প্রসংগে অন্যতম শীর্ষ বাম বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর বলেন,"উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদকে অনেক সময় সরাসরি ব্যক্ত না করে নিজেদের স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি এবং জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করে থাকে। এটা এক চরম বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। কারণ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি এবং এখন স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি এক নয়। কাজেই ১৯৭১ সালে জামাতে ইসলামী স্বাধীনতার বিপক্ষে যেভাবে ছিল এখন আর তারা সেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী নয়। তারা বাংলাদেশে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করার অর্থ বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করা নয়। সে কাজ করে এখন আর তাদের কোন লাভ নেই। এই ভূখন্ডেই তারা বাঙ্গালি ইসলামপন্থী হিসেবেই নিজেদের ক্ষমতা সংহত করতে চায় এবং সে হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তারাও আগ্রহী। কাজেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামী এখন চক্রান্ত করছে এটা মনে করা কল্পনাকে আশ্রয় করে মতামত খাড়া করারই উদাহরণ মাত্র।"[৯৫]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর পুনর্গঠন ও আত্মপ্রকাশ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী দলের বিরোধিতা এবং সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্তর্ভুক্তির কারণে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীকে সহায়তা এবং স্বাধীন

বাংলাদেশ আন্দোলন বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমসহ ৩৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করে। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে যোগদানের জন্য অধ্যাপক আযম ২২ নভেম্বর '৭১ পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার পর আর দেশে ফিরে আসতে পারেননি। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখার জন্য সরকারের অনুমতিক্রমে দেশে ফিরে আসেন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভের পর অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা পালনকারী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবাহিনী নজিরবিহীন বিপর্যয়কর অবস্থার শিকার হয়। বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অসংখ্য পাকিস্তানপন্থী নেতা-কর্মী নিহত হয়। আত্মগোপন করে এলাকা ত্যাগকারী নেতা-কর্মীরা প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। তবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর জামায়াতের নেতা-কর্মীরা ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং গোপনে সাংগঠনিক যোগাযোগ আরম্ভ করেন। জুমার নামাযের পূর্বে অথবা নামায শেষে বক্তৃতা, মিলাদ, তাফসীর, ওয়াজ মাহফিল, দারসে কুরআন, দারসে হাদীস ইত্যাদির মাধ্যমে জামায়াত ধীরে ধীরে এর কার্যক্রম শুরু করে। এভাবে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল অর্থাৎ আইডিএল গঠন পর্যন্ত জামায়াত এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ প্রধানত: গোপনে তাদের তৎপরতা চালায়।[৯৬] এখানে উল্লেখ্য, জামায়াতের নেতৃস্থানীয় কর্মীগণ 'সাংগঠনিক হিজরতের' অংশ হিসেবে তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমেই প্রধানত: তাদের নিজস্ব এলাকা ত্যাগ করে অন্য এলাকায় গিয়ে অবস্থান করে এবং সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। এ সময় কোন পরিচিত নেতৃত্বের পক্ষে সাংগঠনিক কার্যক্রম তদারক করা অসম্ভব ছিল। অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা আবদুর রহীম নভেম্বর '৭১ থেকেই দেশে অনুপস্থিত। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সেক্রেটারী আবদুল খালেক এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী মাষ্টার শফিকুল্লাহও সংগঠন পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়ার অবস্থায় ছিলেন না। একাত্তর সালের শেষের দিকে মোমেনশাহী জেলার আমির মাওলানা আবদুল জাব্বারকে প্রাদেশিক সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ঢাকায় আনা হয়। সংগঠন শুরু করার জন্য তিনিই উদ্যোগ নেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাদেরকে তাঁর সহযোগী পেলেন তাঁরা হলেন, ঢাকা শহর জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারী মাওলানা নুরুল ইসলাম, প্রাদেশিক অফিসের সহকারী আমীনুর রহমান মঞ্জু, এবং চাষী কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারী ডাঃ সায়দুর রহমান।

মাষ্টার শফিকুল্লাহ কাকরাইল মসজিদে তাবলীগ জামায়াতের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন, আমীনুর রহমান মঞ্জু তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর পুনর্গঠনের সূচনা হয়।[৯৭] ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা এবং সাংবিধানিকভাবে সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই অধ্যায়ে জামায়াত বিভিন্ন ইসলামী জলসা এবং অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রচারণা শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে জামায়াত নেতা, বিশিষ্ট মুফাসসির ও ওয়ায়েজিন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ অন্যান্য আলেম ইসলাম বিরোধী উপরোক্ত মতবাদসমূহের বিপক্ষে জনমত গঠন করার চেষ্টা চালান। জামায়াত এবং অন্যান্য ইসলামী দল এই সময় ভারতবিরোধী বক্তব্য রেখে মুসলিম বাংলার ধারণা প্রচার করেন। এভাবে ভারত বিরোধী এবং সাধারণভাবে ভারতীয় প্রতারণার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলো পরিবেশকে তাদের পক্ষে অনুকূল করে তোলার প্রয়াস পায়।[৯৮]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এক পর্যায়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৬ সালে তিনি পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন (PPR)-এর আওতায় রাজনৈতিক দল গঠন করার অনুমতি দেন। জামায়াতের প্রতিনিধি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জামায়াত এবং আরও কয়েকটি ইসলামী দলের সমন্বয়ে নেজামে ইসলামী পার্টির মাওলানা সিদ্দিক আহমদের নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালের ২৪শে আগস্ট ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) নামে পিপিআর-এর আওতায় নতুন দল গঠিত হয়। পরবর্তী বছর মাওলানা আবদুর রহীম (পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের সাবেক আমীর) আইডিএল এর সভাপতি নিযুক্ত হন। আইডিএল গঠিত হওয়ার পর জামায়াতসহ অন্যান্য ইসলামী দলের কর্মীগণ আইডিএল এর ব্যানারে রাজনৈতিক কর্মকান্ড আবার শুরু করেন। উল্লেখ্য, সুসংগঠিত সাংগঠনিক অবস্থার কারণে এবং মাওলানা আবদুর রহীম আইডিএল চেয়ারম্যান থাকায় স্বাভাবিকভাবে আইডিএল এ জামায়াতের প্রাধান্য এবং কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। আইডিএল গঠনের সনদে জামায়াতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও মাওলানা এ কে এম ইউসুফ। আইডিএল এ যুক্ত হওয়া অন্য দলগুলো ছিল : নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি, (আইডিপি) বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি (বিডিপি) ও ইমারত পার্টি।[৯৯] আইডিএল এর ব্যানারেই জামায়াত এবং অন্যান্য ইসলামী দল তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা এবং দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ইতোমধ্যে ১৯৭৮ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে ফিরে আসলে জামায়াতের একটি পক্ষ জামায়াতের নিজস্ব নামেই সংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে মজলিসে শূরায় বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে মাওলানা আবদুর রহীম, মাওলানা আবদুস সোবহান প্রমুখ আইডিএল এর ব্যানারেই রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতের পক্ষে জামায়াত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো যারা ছিলেন তাঁরা হলেন, কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী,ব্যারিস্টার কোরবান আলী,এডভোকেট সাদ আহমদ। কিন্তু অধিকাংশ নেতা জামায়াতের স্বনামে আত্মপ্রকাশের পক্ষে মতামত পেশ করেন। কিন্তু পিপিআর রহিত না হওয়া পর্যন্ত জামায়াত নামে আত্মপ্রকাশ করা

সম্ভব হয়নি। ১৯৭৯ সালের ২য় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে পিপিআর রহিত করা হলে নির্বাচনের পর ১৯৭৯ সালের ২৫ মে, এক কনভেনশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্য ময়দানে কাজ শুরু করার ঘোষণা প্রদান করে।

স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াত নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা

১৯৭২ সালে এপ্রিল মাসেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। জুন মাসে রুকনদের ভোট সংগ্রহ করা হয়। মাওলানা আবদুল জাব্বার আমির নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে মাষ্টার শফীকুল্লাহ আমীর নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমীর নির্বাচিত হন আবদুল খালেক। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি পদত্যাগ করলে মজলিসে শূরা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলীকে অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত আমীর নির্বাচিত করে। ১৯৭৫ সালের মে মাসে মাওলানা আবদুর রহীম আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মাওলানা আবদুর রহীম তিন বছরের জন্য আবার আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে জুলাই মাসে অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে ফিরে আসার পর মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমির পদে উপনির্বাচন হয় এবং গোলাম আযম আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত বাধা থাকায় জামায়াতে ইসলামীর নামে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা সম্ভব হয়নি। আইনগত বাধা অপসারিত হলে মে মাসে আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে ইডেন হোটেলের রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করে।[১০০] মরহুম আব্বাস আলী খান ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালনকালে অধ্যাপক গোলাম আযম ছিলেন জামায়াতের মূল আমীর। পরবর্তীতে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলে ১৯৯১ সালের নভেম্বরে তাঁকে প্রকাশ্যে জামায়াতের আমীর ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর জামায়াতের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আযম ২০০০ সালে তিনি আমীরের দায়িত্ব থেকে বিদায় নিলে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আমীর নির্বাচিত হন।

জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকাঃ ১৯৭২ থেকে ১৯৮২

স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার সকল ইসলামী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর প্রকাশ্য কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে জামায়াতে ইসলামী গোপনে '৭২-এর এপ্রিলে আবার কাজ শুরু করে।[১০১] জামায়াতের কর্মীগণ প্রকাশ্যে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনি তবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং সীরাত মাহফিলসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আন্দোলনের প্রেরণা জাগ্রত রাখে।

১৯৭৬ সালের নভেম্বর জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং "বাকশাল" ব্যবস্থাকে রহিত করে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু

করার লক্ষ্যে পিপিআর ঘোষণা করেন। এই আইনের আওতায় স্বাধীনতা পরবর্তী ইসলামী দলগুলো বিশেষত: জামায়াতে ইসলামী,নেজামে ইসলামী এবং পিডিপির প্রাক্তন নেতা-কর্মীরা মিলিত হয়ে ১৯৭৬ সালে গঠন করে ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)। মূলত: জামায়াতে ইসলামীর সিদ্ধান্ত ক্রমে আইডিএল গঠিত হয়। এরপর আইডিএল-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির প্রকাশ্য কার্যক্রম আবার শুরু হয়। অবশ্য আই ডি এল এর ঘোষণা অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর বিলুপ্তি করার কথা থাকলেও তা হয়নি। আইডিএল-এর চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুর রহীম একই সময় জামায়াতেরও আমীর ছিলেন। জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকান্ড আইডিএল-এর ব্যানারেই কার্যকর করা হতো। তাই ১৯৭৭ সালে সংবিধান সংশোধন বিষয়ক গণভোট এবং ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইডিএল-এর ব্যানারেই জামায়াত ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত সংবিধান সংশোধন বিষয়ক গণভোট ইসলামী দলগুলোর জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেননা সংবিধানের সংশোধনীসহ জেনারেল জিয়ার অনুসৃত কর্মসূচী গৃহীত না হলে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। তাই গণভোটে অংশ নিয়ে 'হ্যাঁ' ভোট প্রদান করার জন্য আই ডি এলসহ ইসলামী ও ভারতবিরোধী দল ও ব্যক্তিবর্গ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এ প্রসঙ্গে গবেষক নুর হোসেন মজিদী তাঁর পুস্তকে লিখেন:

> "১৯৭৭ সালের শুরুতে এতদসহ সংবিধানের সংশোধনীর ওপর গণভোটের আয়োজন করা হয়। সংবিধানের এ সংশোধনী গৃহীত-হওয়া না হওয়ার সাথে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কেননা রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সে সংশোধনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারি ধর্মসম্পর্কহীন (সেক্যুলার) ও বামপন্থী দলগুলো উপর্যুক্ত সংশোধনীর বিরুদ্ধে ছিল। তাই আই ডি এল সারাদেশে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে জনমত গঠনের অভিযান চালায়। তাতে মাওলানা আবদুর রহীম সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেন"।[১০২]

১৯৭৮ সালের ৩রা জুন অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) সহ ৬ দলের জোট "জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের"[১০৩] প্রার্থী হিসেবে জিয়াউর রহমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর বিপরীতে আওয়ামী লীগসহ বাম ও সেক্যুলারপন্থী ৬ দলের "গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের" প্রার্থী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী।[১০৪] প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের একটি প্রভাব পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া "ঐক্যজোট" সরকার গঠন করতে পারলে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল হতো। যার ফলে ইসলামী রাজনীতি আবার নিষিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের জয় ছিল বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলও ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিক প্রেক্ষাপটে আইডিএল জেনারেল জিয়াকে সমর্থন করে। নির্বাচনে জিয়া বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। জেনারেল জিয়াউর রহমান ৭৬.৬৭%, ওসমানী ২১.৭০%, অন্যান্য প্রার্থী ১.৬৩% ভোট পান। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের গুরুত্ব এবং আইডিএল-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে গবেষক নুর হোসেন মজিদী লিখেছেন:

> "বলাবাহুল্য যে, জেনারেল ওসমানী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাঁর প্রভাবে পার্লামেন্ট নির্বাচনেও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট বিজয়ী হতো এবং সরকার গঠন করতো। এভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় পুন:প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে নি:সন্দেহে ১৯৭২-এর সংবিধান পুন:প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতো। এ কারণে ঐ মুহূর্তে আইডিএল-এর জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দেয়াই ছিল সময়ের দাবি। এছাড়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়াউর রহমান ইসলামের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং মাওলানা আবদুর রহীম (র:)-এর পরামর্শ মোতাবেক সংবিধান সংশোধন করে তাতে ইসলামী মূলনীতি সংযোজন করেন। এমতাবস্থায় তাঁকে সমর্থন করার পথে তেমন কোন বাধা ছিলনা। অন্যদিকে আইডিএল-এর পক্ষ থেকে প্রার্থী দেয়া হলে ভোট ভাগাভাগি হয়ে জেনারেল ওসমানীই জয়লাভ করতেন। তাই বাস্তবতার আলোকে মাওলানা সাহেবের নেতৃত্বে আইডিএল জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সমর্থন প্রদান করে এবং তাঁকে বিজয়ী করার জন্য দেশব্যাপী প্রচার প্রচারণা চালায়।"[১০৫]

জামায়াত প্রকাশ্যে আইডিএল-এর ব্যানারে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালালেও গোপনে জামায়াতের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিজস্ব ধারা অনুযায়ী অব্যাহত রাখে। ১৯৭৮ সালে পিপিআর রহিত হলে ১৯৭৯ সালের ২৫ মে এক কনভেনশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী স্বনামে আত্মপ্রকাশ করে। ইতোপূর্বে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইডিএল ও মুসলিম লীগ জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ২০টি আসন লাভ করে যার মধ্যে জামায়াতের আসন ছিল ৬টি।

১৯৭৯ সালে "জামায়াত" নামে প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরুর পর আধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাচিত আমীর হিসেবে জামায়াতের কার্যক্রম চালিয়ে যান। তাঁর নাগরিকত্ব না থাকায় প্রকাশ্যে তাঁকে আমীর ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। সীনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে প্রকাশ্যে জামায়াতের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যান। সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন মাওলানা আবুল কালাম মো: ইউসুফ।

১৯৭৯ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর জামায়াত সারাদেশে সংগঠনকে বিস্তৃত ও সুসংহত করার প্রচেষ্টা চালায়। এরই অংশ হিসেবে ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সারাদেশব্যাপী সাংগঠনিক পক্ষ পালন করা হয়। নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য "নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার কমিটি'র" ব্যানারে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৮০ সালের ২২শে আগস্ট গঠিত হয় আধ্যাপক গোলাম আযম নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার কমিটি। এ কমিটির আহ্বানে প্রতিটি জেলায়-মহকুমায় কমিটি গঠিত হয়। সভা, সমাবেশ, প্রস্তাব গ্রহণ, মিছিল পোষ্টারের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করে আধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধারের এক ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করা হয়।[১০৬]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করার পর পরই ১৯৮০ সালে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূলনীতি প্রণয়ন করে ২২

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করা হলেও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে পেশ করার ব্যাপারে বাস্তবে কেউ এগিয়ে আসেনি।[১০৭]

নতুন প্রেক্ষিতে কাজ শুরু করার পর জামায়াত সর্বপ্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই অংশ হিসেবে ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে রমনা রেস্তোরাঁয় এক সাংগঠনিক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খান বাংলাদেশের উপযোগী ৫ দফা সম্বিলিত 'পলিটিক্যাল সিস্টেম' জাতির সামনে পেশ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।[১০৮] জামায়াত ঘোষিত ৫ দফার পলিটিক্যাল সিস্টেম ছিল নিম্নরূপঃ

১। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টঃ

ক. বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

খ. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় একইসাথে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

গ. প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর।

ঘ. কোন কারণে প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হলে নির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেন্ট সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং

জাতীয় সংসদ অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। কোন অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেনা।

ঙ. যদি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংবিধান গুরুতরভাবে লংঘিত হয় অথবা তিনি যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহলে সংসদ সদস্যদের তিন চতুর্থাংশের ভোটে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যাবে।

২। প্রেসিডেন্টের দায়িত্বঃ

ক. শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ হাতে ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকবেনা।

খ. প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়োজনে তাঁরা দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে সক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না।

গ. নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট তাঁদের পদে বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। অবশ্য নির্বাচনের ৬ মাস পূর্বে পদত্যাগ করলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

ঘ. সরকার যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন হারান এবং অন্য কেউ যদি সরকার গঠনে সক্ষম না হন তাহলে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ৪ মাসের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

ঙ. প্রেসিডেন্টের সরকারকে উপদেশ দেয়ার অধিকার থাকবে।

৩। শাসনক্ষমতা:

ক. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই সরকার গঠনের প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে এবং জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত সরকারই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করবে।

খ. প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধানের মর্যাদা ভোগ করবেন। প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্র বহির্ভূত পন্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

গ. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন না হারানো পর্যন্ত সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী থাকবেন।

ঘ. জাতীয় সংসদ ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রীমকোর্ট সে বিষয়ে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী চূড়ান্ত ফয়সালা দেবে।

ঙ. সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে দলের টিকেট নিয়ে কোন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, সে দল ত্যাগ করলে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন বলে গণ্য করা হবে।

৪। জাতীয় সংসদ নির্বাচন:

ক. জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ৩ মাস পূর্বে মন্ত্রীসভা ও জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে।

খ. পরবর্তী নির্বাচিত সংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

গ. এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবে না।

ঘ. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবে এবং এর ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

ঙ. জাতীয় নির্বাচনের এক মাসের মধ্যেই নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

৫। নির্বাচন কমিশন:

ক. সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

খ. নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্য প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

গ. প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত করবেন।

ঘ. নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে গোটা প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

ঙ. প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন একইসাথে অনুষ্ঠান করতে হবে।[১০৯]

নিরপেক্ষ নির্বাচন স্থিতিশীল সরকার ও জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের সরকার কায়েম ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উপরোক্ত ৫ দফা কার্যকর পন্থা হিসেবে জামায়াতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনজোট এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে রূপরেখা প্রদান করা হয়, তার মূলকথা উপর্যুক্ত ৫ দফায় অন্তর্ভূক্ত ছিল। আরো পরে 'কেয়ারটেকার' সরকারের যে বিধান সংবিধানে সংযোজিত হয়, তার ফর্মূলাও এই পাঁচ দফায় সন্নিবেশিত ছিল।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৮১ সালে ইসলামী বিপ্লবের সাত দফা গণদাবি পেশ করে। এ সাত দফার ভিত্তিতে জামায়াত আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়। সাত দফার মধ্যে চার দফাই রাজনীতি সংশ্লিষ্ট। সাত দফার মূল দাবিগুলো হচ্ছে; বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা, ঈমানদার ও যোগ্যলোকের সরকার কায়েম করা, বাংলাদেশের আজাদীর হেফাজত করা, আইনশৃঙ্খলা পূর্ণরূপে স্থিতিশীল করা। কিন্তু সাত দফার আন্দোলন বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। আন্দোলন শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান লে:জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই শাসনক্ষমতা দখল করেন। শুরু হয় সামরিক শাসনের এক নতুন অধ্যায়।[১১০]

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

লে: জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকার (১৯৮২-৯০) বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিরোধী জোট ও দলের সাথে যুগপৎ আন্দোলনে জামায়াত মিছিল, সমাবেশ, হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজপথে সক্রিয় ছিল। আন্দোলনের অংশ হিসেবে জামায়াত সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং সংসদ থেকে পদত্যাগও করে। নিম্নে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জামায়াতের ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

সামরিক শাসন সম্পর্কে জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি

জামায়াতে ইসলামী একটি গণতান্ত্রিক দল। জামায়াতে ইসলামী সশস্ত্র বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়।[১১১] জনগণের সক্রিয় সমর্থনের মাধ্যমে ইসলামকে

বিজয়ী করাই জামায়াতের কর্মনীতি। সামরিক শাসন গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করে। ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে জামায়াতের জনসমর্থন বৃদ্ধি প্রক্রিয়া সামরিক শাসনের মধ্যে সম্ভব নয়। স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সুযোগ না পেলে এদেশে ইসলামের পথ কিছুতেই বাধামুক্ত হবেনা। তাই জামায়াতে ইসলামী দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করাকে দ্বীনি কর্তব্য বলে মনে করে।[১১২] জামায়াত স্বার্থহীন নেতৃত্বের অধীনে সৎ মানুষদের সংগঠিত করে জনগণকে প্রতারণাকারীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে চায়। এ অর্জনের পথে অগণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে সরচেয়ে বড় বাধা। মানুষকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দেশকে কল্যাণকর রাষ্ট্রে উন্নীত করা যাবে না। এ জন্য আদর্শগত অমিল থাকা সত্বেও জামায়াত অন্যান্য বিরোধীদের সাথে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদান করে।[১১৩]

জামায়াত নীতিগতভাবে সামরিক শাসন বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন কামনা করে। জামায়াত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের ম্যান্‌ডেট্‌ নিয়েই ক্ষমতায় যেতে চায়। এ জন্য জামায়াত ১৯৬২ সাল থেকে প্রায় সকল (১৯৭৩ সালে জামায়াত নিষিদ্ধ থাকায় বাংলাদেশের ১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি) সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। নির্বাচনে ভোট ডাকাতি বা জোরপূর্বক কেন্দ্র দখলের ঘটনা জামায়াত কর্তৃক সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সর্বোপরি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগ্রামই জামায়াতের মূল লক্ষ্য নয় বরং গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার ও সমাজের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ।[১১৪]

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকার ইতিহাস

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে অধিকতর গ্রহণীয়। আদর্শগতভাবে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত শাসকমন্ডলী কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনগণই হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের মতে, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসন। বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের বিভিন্ন রকমের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের মূলনীতির তেমন বিরোধ নেই। জনগণের ওপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। ইসলাম রাজতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। জনগণের ইচ্ছা এবং স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা করা ইসলামী রাজনীতির মূল কথা। কিন্তু ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। গণতন্ত্রের 'সার্বভৌম' শক্তির উৎস জনগণ, ইসলামের 'সার্বভৌম' ক্ষমতার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। গণতন্ত্রে জনগণ তাদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে। ইসলামে আইনের উৎস

একমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত আল কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর পথ-নির্দেশিকা। জামায়াতে ইসলামী জনগণের মতামত নিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। জনগণের নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তাই ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বরাবরই শরিক ছিল।

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ইসলামী আদর্শ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস।[১১৫] জামায়াত পাকিস্তান আমলে জেনারেল আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র এবং স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। জামায়াত আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বিরাট আঘাত হিসেবে অভিহিত করে এবং জনগণের ভোটাধিকার আদায়ের দাবিতে গণস্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করে। সরকার বিরোধী কর্মসূচী পালনের কারণে আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীসহ জামায়াতের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ৬০ জন নেতাকে গ্রেফতার করে।[১১৬] পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্ট জামায়াতকে নিষিদ্ধ ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা অন্যায় ও বেআইনী বলে রায় প্রদান করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত জামায়াত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৬৪ সালে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলামী ও এনডিএফ এর সমন্বয়ে 'সম্মিলিত বিরোধী জোট' (COP) গঠন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে জামায়াত আওয়ামী লীগ (৬ দফা বিরোধী অংশ), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী পার্টি, এনডিএফকে নিয়ে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন' (PDM) নামীয় জোট গঠন করে। ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামও PDM-এ যোগ দেয়। তখন এ জোটের নামকরণ করা হয় DEMCORATIC ACTION COMMITTEE (DAC)। এ কমিটি আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আন্দোলনের কারণে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় এবং এর জন্য বারবার সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করা হয়।[১১৭]

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আদর্শগত এবং কৌশলগত কারণে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে তথা গণতন্ত্র বহালের আন্দোলনে যথাসাধ্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জামায়াত অন্যান্য দলের সাথে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ শুরু করে। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে এ রকম একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বি.এন.পি'র কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল মতিন চৌধুরীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অফিস

কক্ষে।[১১৮] সে বৈঠকে বি.এন.পি'র ক্যাপটেন আবদুল হালিম চৌধুরী, আবদুল মতিন চৌধুরী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং মুহাম্মদ কামারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৮৩'র মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠতে থাকে। ছাত্র মিছিলে হামলা ও সংঘর্ষের পর রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক সরকারের ফ্যাসিস্ট আচরণের তীব্র নিন্দা জানায় এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনের চিন্তাভাবনা জোরদার হয়ে ওঠে। চাপের মুখে বাধ্য হয়ে এরশাদ ১লা এপ্রিল '৮৩ থেকে 'ঘরোয়া রাজনীতি' শুরু করার অনুমতি দেন। সে সময় রাজনৈতিক মহলে সংবিধান সংক্রান্ত একটি বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। আওয়ামী লীগ এবং সমমনা দলগুলো ৪র্থ সংশোধনীর পূর্ববর্তী বাহত্তর সালের সংবিধান পুণ:প্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়।[১১৯] কেউ কেউ ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান বহালের দাবি তোলেন। এ সময়ে সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে জাতীয় পরিষদে ও শাসন ব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের দাবি ওঠানো হয়।[১২০]

বিভিন্ন দলের এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক সরকারের শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিতে শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সামরিক সরকারের হাতে দিলে রাজনৈতিক সংকট আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সশস্ত্র বাহিনী রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে। জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে এ জাতীয় রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও বিভেদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।[১২১] শাসনতান্ত্রিক এ বিতর্ক বাদ দিয়ে মুলতবী সংবিধান পুনর্বহালের এবং এর ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়ে জামায়াত ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর পূর্বেই ১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ প্রচারপত্র বিলি করে। জামায়াতে ইসলামীর বিলিকৃত সে প্রচারপত্র তখন রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া জাগায়। বিলিকৃত প্রচারপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে দেশের একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়।[১২২] প্রচারপত্রে বলা হয়, দেশের বর্তমান মূলতবী সংবিধানে হাত দিলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। কেননা সংবিধান জনগণের আস্থা হারালে দেশের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবে। তাছাড়া বর্তমান সংবিধান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রণীত এবং বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত। সংশোধনের ব্যাপারে যত মতই থাকুক, সেগুলোও কোনটা জাতীয় সংসদে গৃহীত, কোনটা গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত। তাছাড়া প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, সকল সংশোধনসহ বর্তমান মূলতবী সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনই দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবচাইতে নিরাপদ পন্থা। সারাদেশে কয়েক লক্ষ প্রচারপত্র বিলি এবং দৈনিক ইত্তেফাকে সংবাদ পরিবেশন করায় জামায়াতের এ বক্তব্য সচেতন মহলের নিকট পৌছে যায়। জামায়াতের বক্তব্য যুক্তিসংগত হওয়ায় পরবর্তীতে শাসনতান্ত্রিক পূনর্বহালের প্রশ্নে জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। আওয়ামী লীগও এ সংক্রান্ত এর দাবি পরিত্যাগ করে।

সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাবি

১৯৮৩ সালের ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ অক্টোবর ঢাকার রহমত উল্লাহ মডেল হাই স্কুল মাঠে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের চারদিনব্যাপী সদস্য (রুকন) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত সম্মেলনে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়,

> "এ সম্মেলন বর্তমান সরকারের নির্বাচনী সময়সূচীকে সত্যিকার গণতান্ত্রিক নীতির উপযোগী মনে করেনা। দেশের শাসনতন্ত্রকে মূলতবী রেখে দুর্নীতি দূর করার সাময়িক উদ্দেশ্য ঘোষণা করে সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল। প্রথমে শাসনতন্ত্র সংশোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেও বর্তমান সরকার মূলতবী শাসনতন্ত্রকে বহাল রাখার গণদাবি মেনে নিয়েছে। এ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদই দেশ পরিচালনার অধিকারী। বর্তমানে একজন প্রেসিডেন্ট গদীনসীন আছেন। যদিও তিনি নির্বাচিত নন। কিন্তু জাতীয় সংসদের অস্তিত্বই নেই। তাই মূলতবী শাসনতন্ত্র বহাল করতে হলে জাতীয় সংসদের নির্বাচনই প্রথম হওয়া স্বাভাবিক যাতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বর্তমানে প্রেসিডেন্ট ও নব নির্বাচিত জাতীয় সংসদের হাতে সরকারের দায়িত্ব তুলে দিয়ে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। এ সম্মেলন বর্তমান সরকারের ঘোষিত নির্বাচনের সময়সূচিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দেয়া গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের সহায়ক নয় বলে মনে করে। সরকার গণতন্ত্রের দোহাই দিয়েই এ ব্যবস্থাকে জাতির ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু আইয়ুব খানের আমল থেকে জাতির এ তিক্ত অভিজ্ঞতাই হয়েছে যে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত লোকদের রাজনৈতিক স্বার্থের লোভ দেখিয়ে সামরিক একনায়কগণ দেশের সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী লোকদের সমন্বয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং তাদের সাহায্যে গণতন্ত্রের নামে শাসনতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। এ সম্মেলন সবদিক বিবেচনা করে দেশ ও জাতির স্বার্থে সামরিক শাসন দ্রুত প্রত্যাহার করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করছে এবং সে লক্ষ্যে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছে। সম্মেলনে আশা করে, সরকারের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হবে এবং সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রের পথ সুগম করবে।"[১২৩]

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কটের আহ্বান

১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এরশাদ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তিনি ঘোষণা করেন, '৮৪'র মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জামায়াত এরশাদের এ ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং জরুরি কর্ম পরিষদের বৈঠক আহ্বান করে এ ঘোষণাকে গণতন্ত্র বিরোধী কৌশল হিসেবে উল্লেখ করে। "জামায়াত ইসলামী '৮৪'র মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণাকে গণতন্ত্র বিরোধী কৌশল হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে।" জরুরি বৈঠকে (২৭শে অক্টোবর ৮৩ অনুষ্ঠিত) জামায়াতের কর্মপরিষদ অবাধ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের স্বার্থে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানায়।[১২৪]

কেয়ারটেকার সরকার দাবি

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম কেয়ারটেকার সরকারের দাবি জানানো হয় বলে দাবি করা হয়। আন্দোলনরত ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট তখনও পর্যন্ত কেয়ারটেকার বা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করেনি। ১৯৮৩ সালের ২০শে নভেম্বর প্রকাশ্য রাজনীতির শুরুতেই জামায়াত বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেট এ আয়োজিত এক বিরাট গণসমাবেশে এরশাদ সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান উপর্যুক্ত সমাবেশে কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মূলা জামায়াতের পক্ষ থেকে উত্থাপন করেন। তিনি একটি অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার গঠন করে এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরে দাড়ানোর দাবি জানান। সামরিক আইন প্রত্যাহার, শাসনক্ষমতা প্রধান বিচারপতির কাছে হস্তান্তর এবং সশস্ত্রবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবি জানানো হয় উক্ত সমাবেশ থেকে।[১২৫] '৮৪'র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সংলাপে জামায়াত কেয়ার-টেকার সরকারের দাবি জানায় এবং ১৫ ও ৭দলীয় জোটকেও এ দাবি জানানোর আহ্বান জানায়।[১২৬] কিন্তু ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এ দাবি অন্তর্ভূক্ত করেনি। জোট দুটি ভিন্ন ভাষায় এ দাবি জানায় ১৯৮৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। ৭ দলীয় জোট '৮৪র ২৭শে ডিসেম্বর এক সমাবেশে ৫ দফার অতিরিক্ত ৭টি পূর্বশর্ত আরোপ করে '৮৫ সালের মার্চের মধ্যে নির্বাচন দাবি করে। এর মধ্যে অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের দাবি।[১২৭] ১৫ দলীয় জোটও এদিন বায়তুল মোকাররমের সমাবেশে '৮৫'র এপ্রিলের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের দাবি জানায় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পাঁচ দফা ছাড়াও ৬টি পূর্বশর্ত আরোপ করে। এর মধ্যে নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবি ছিল।[১২৮] উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫ দফা দাবি উত্থাপন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলও একই ৫ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে জামায়াতের তৎকালীন অঘোষিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে অধ্যাপক গোলাম আযম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কেয়ার-টেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।[১২৯] ১৯৮৪'র এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সরকারের সাথে সংলাপে কেয়ারটেকার সরকারের প্রস্তাবটি বিবেচনায় আনার জন্য তিনি আন্দোলনরত দল ও জোটগুলোর প্রতিও আহ্বান জানান। কিন্তু আন্দোলনরত দল ও জোটগুলো কেয়ারটেকার সরকার দাবির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ায় এরশাদের সাথে অনুষ্ঠিত সংলাপে ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট এ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট উত্থাপন করেনি।

আনুষ্ঠানিকভাবে কেয়ারটেকার সরকারের প্রস্তাব ও রাজনৈতিক সংলাপঃ

এরশাদ ঘোষিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়ে উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা দেন। অপরদিকে বিরোধীদলগুলোকে সংলাপে বসার আহ্বান জানান। জামায়াত এবং ১৫ ও ৭ দলীয় জোট প্রথম সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি। প্রথম পর্যায়ে ছোটখাট ৫২টি দল অংশগ্রহণ করে। জামায়াত এবং ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে জানানো হল, উপজেলা নির্বাচন বাতিল করা না হলে তারা সংলাপে যাবেনা। আন্দোলনের চাপের মুখে এরশাদ উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। ১৯৮৪ সালে ১০ এপ্রিল জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের কর্মপরিষদের ৭ সদস্য বিশিষ্ট ডেলিগেশন সরকারের সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ করে। সংলাপে জামায়াতের মূল দাবিই ছিল সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকার গঠন। জামায়াতের পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে এও আশংকা প্রকাশ করা হয়, সংসদ নির্বাচনের দাবি মানার পরও যদি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করা না হয়, তাহলে সংলাপের পরও সংকট নিরসন হবে না।"সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবিটি মানা সত্ত্বেও সরকার যদি অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ সরকার গঠনের ব্যবস্থা না করে, তাহলে সংলাপের পরও সংকট নিরসন হবে না।"[১৩০] সংলাপে জামায়াতের পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার সরকার প্রশ্নে দুটো বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একটি হচ্ছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রধান সামরিক প্রশাসকের নেতৃত্বে অরাজনৈতিক সরকার গঠন। সংলাপে জামায়াত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, "আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত না হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায় না। এমন একটি সরকার থেকেই নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায়, যে সরকারের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিগণ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা নেতা থাকবেন না এবং সরকারি পদে থাকাকালীন নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না। আমরা নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে যে অরাজনৈতিক সরকার গঠনের দাবি করছি এর জন্য দুটো বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিলে তিনি অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। অথবা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিজেও অরাজনৈতিক সরকারের নেতৃত্ব দিতে পারেন। এ অবস্থায় সরকারকে অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ মর্যাদায় উন্নীত হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. তিনি রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে ঘোষণা দিতে হবে।
২. তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৩. তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভার কোন সদস্য রাজনৈতিক দলের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।[১৩১]

১০ এপ্রিল প্রথম বার সংলাপের পর ১৭ এপ্রিল জামায়াত নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় বার সরকারের সাথে সংলাপে অংশ গ্রহণ করেন। সরকারের সাথে সংলাপের পর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি পুনরায় ব্যক্ত করেন। প্রেস ব্রিফিং এ তিনি বলেন, যদি বিরোধী দলগুলোর সাথে সম্মিলিতভাবে আলোচনা হতো তাহলে সংলাপ তাড়াতাড়ি এবং কার্যকর করা যেত।[১৩২] উল্লেখ্য, সংলাপের সফলতার স্বার্থে জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল সম্মিলিতভাবে সংলাপে অংশগ্রহণ অথবা কেয়ারটেকার সরকারের একই দাবি উত্থাপনের জন্য।[১৩৩]

সংসদে জামায়াত ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

২১শে মার্চ '৮৫ গণভোট অনুষ্ঠানের পর ১লা অক্টোবর থেকে আবার ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া হয়। ১লা জানুয়ারী '৮৬ থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে বাধা নিষেধও প্রত্যাহার করা হয়। জামায়াতসহ বিরোধীদল ও জোটের আন্দোলনের মুখে সরকার সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। সরকার ২৬ এপ্রিল তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। বিরোধীদলগুলো এরশাদ সরকারের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। এক পর্যায়ে দু'জোট নেত্রী ১৫০+১৫০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সরকার আইন করে সে প্রচেষ্টা ব্যাহত করে দেয়।[১৩৪] মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখের একদিন পূর্বে আওয়ামী লীগ ও ১৫ দলীয় জোটের কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘোষণা দেয়। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সকল দল একমত ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৩৫] ২১ শে মার্চ '৮৬ জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষণা করেন, বিরোধীদল যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাঁর সরকার কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ক) উপযুক্ত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনকে পরামর্শ দান, খ) নির্বাচনে প্রার্থী মন্ত্রীবর্গ পদত্যাগ করবেন। গ) আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক, উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক, জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও অফিস এবং সামরিক আইন আদালত বিলুপ্ত করবেন" ইত্যাদি।[১৩৬] যুগপৎ আন্দোলনের শরিক জামায়াতে ইসলামীও তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন মারাত্মক সন্ত্রাস এবং সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়। ব্যালট ডাকাতি, সন্ত্রাস মিডিয়া ক্যু এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ১৯৮৬ সালের ৭ই মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল নিম্নের সারণি থেকে জানা যায়।

মে '৮৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল [১৩৭]

দল/স্বতন্ত্র	বিজয়ী আসন	বিজয়ী আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত মোট ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার (প্রদেয় মোট ভোটের ভিত্তিতে)
জাতীয় পার্টি	১৫৩	৫১.০০	১,২০,৭৯,২৫৯	৪২.৩৪
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬	২৫.৩৩	৭৪,৬২,১৫৩	২৬,১৬
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০	৩.৩৩	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	০৫	১.৬৬	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	০৫	১.৬৬	২,৫৯,৭২৮	০.৯১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	০৪	১.৩৩	৭,২৫,৩০৩	২.৫৮
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	০৪	১.৩৩	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক (সিরাজ)	০৩	১.০০	২,৪৮,৭০৫	০.৮৭
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	০৩	১.০০	১,৯১,১০৭	০.৬৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	০৩	১.০০	১,৫১,৮২৮	০.৫৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০২	০.৬৬	২,০৩,৩৬৫	০.৭১
অন্যান্য দল	০০	০০	৪,৯০,৩৮৯	১.৭৩
স্বতন্ত্র	৩২	১০.৬৬	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯

১৯৮৬ সালের ৫ই জুলাই জামায়াত সংসদ সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। ১০ জুলাই '৮৬ সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলেও জামায়াত সে অধিবেশনে যোগ দেয়নি। অধিবেশনের দিন রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে জামায়াত এবং বিএনপি। রাজপথে আন্দোলন এবং সংসদের ভেতর সরকারের বিরোধিতা দুটোই চলতে থাকে। সপ্তম সংশোধনী পাস হওয়ার পর জামায়াতের মজলিসে শূরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংসদ সদস্যদের সংসদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদি জামায়াতের ১০ জন সদস্য না যান, তাহলে সরকার পরবর্তীতে উপনির্বাচনের মাধ্যমে ভোট ডাকাতির সাহায্যে ঐ সব আসনে দলীয় প্রার্থী দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশের সমস্যা সমাধান করে নিতে পারে। তাই সংসদে গিয়ে সরকারের বিরোধিতার ভূমিকার জন্য জামায়াত সংসদ সদস্যগণকে সংসদে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়।[১৩৮] সংসদে যোগদানের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজনে সংসদ থেকে সদস্যগণ পদত্যাগ করবেন এ সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়। পরবর্তিতে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করার লক্ষ্যে জামায়াত এম.পিগণ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮৭ স্পীকারের নিকট পদত্যাগপত্র জমা দেন। জামায়াত সদস্যগণ সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার দুই দিনের মধ্যে এরশাদ সরকার তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

বিরোধী দলের সাথে জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলন

লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক আইন জারির এক বছরের মাথায় সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১লা এপ্রিল ১৯৮৩ থেকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হলে বিরোধী দলগুলো সামরিক সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে এবং সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবি জানায়। ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিলে জামায়াতসহ অন্যান্য জোট ও দল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানায়। জামায়াত জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করার চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের আলোকে যুগপৎ আন্দোলন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্যাপ্টেন (অব:) আবদুল হালিম চৌধুরী, কাজী জাফর আহমদসহ আরো কয়েকজন নেতার উদ্যোগে বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হলে তাঁরা জামায়াতকেও জোটে অন্তর্ভূক্তির চেষ্টা চালান।[১৩৯] কিন্তু জামায়াত নিজ অবস্থান থেকে বিরোধী জোটগুলোর সাথে যুগপৎ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে ১৫ দল, ৭ দল এবং জামায়াতের সাথে অনুষ্ঠিত সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার পর বিরোধী জোট ও দলগুলো সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিরোধী জোট ও জামায়াত ২৭ সেপ্টেম্বর '৮৪ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। সরকার হরতালে বাধা প্রদান করে। হরতালের দিন আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজ উদ্দিন নিহত এবং বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মী আহত হন। সরকারের সন্ত্রাস, গ্রেফতার এবং নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোটের পাশাপাশি জামায়াতও ৩রা অক্টোবর প্রতিবাদ দিবস পালন করে। সে দিন ফুলবাড়িয়ায় জামায়াতের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার, কেয়ারটেকার সরকার গঠন এবং এর অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানানো হয়।[১৪০] সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত জোট ও দলগুলো ঢাকায় জাতীয় সমাবেশের ডাক দেয়। ১৯৮৪ সালের ১৪ অক্টোবর ১৫ দল, ৭ দলের সাথে জামায়াতের উদ্যোগেও ঢাকায় মতিঝিলের শাপলা চত্বরে জাতীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবি জানান। তিনি বলেন, জামায়াত সব সময় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে।[১৪১] সমাবেশে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জামায়াত কর্মী সমর্থকগণ মিছিল নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে ব্যাপক উপস্থিতি ঘটে। জামায়াতের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে দেশের প্রথম সারির একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, "মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গণসমাবেশ। সকাল ১১টা থেকে এ সমাবেশ যোগদানের জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জামায়াতের কর্মী ও সমর্থকগণ মিছিল সহকারে আসতে শুরু করে। ১৪ অক্টোবর মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান

রাস্তার সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে বায়তুল মোকাররম পর্যন্ত গণসমাবেশের বিস্তৃতি ঘটেছিল।[১৪২]

ঢাকায় যুগপৎভাবে অনুষ্ঠিত ৩টি মহাসমাবেশের পর আন্দোলনে নতুনভাবে গতিসঞ্চার করলে সরকার ২০শে ডিসেম্বর দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে সরকার ১৯৮৫ সালের ৬ই এপ্রিল সংসদ নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা দিলে জামায়াতসহ অন্যান্য বিরোধী দল ও জোট সে নির্বাচন বর্জন করার ঘোষণা দেয়। ১৯৮৫ সালে স্থগিত উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলে জামায়াতসহ অন্যান্য দল এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। সরকার বিরোধীদলের ওপর জেল জুলুম নির্যাতন চালিয়ে বিরোধীদলবিহীন উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করে নেয়। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিরোধীদলের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। সরকার '৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে সরকারের ব্যালট ডাকাতি ও নজিরবিহীন সন্ত্রাসের প্রেক্ষাপটে প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানায়। নির্বাচনের দিন ৮ দল, ৭দলের পাশাপাশি জামায়াতও হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে। হরতালের কারণে ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। তারপরও জেনারেল এরশাদের পক্ষে বিপুল ভোট দেখিয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। জামায়াতে ইসলামীসহ সকল দল ও জোটের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জনের মধ্যদিয়ে সরকার বিরোধী ঐকবদ্ধ আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

১৯৮৭ সালের শেষ দিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১০ নভেম্বর ঘোষণা করা হয় ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি। অবরোধ কর্মসূচির পূর্বে বিরোধী দলের খবর প্রচারের দাবিতে দুই জোটের পাশাপাশি জামায়াতের সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। মৌচাকে সমাবেশের পর জামায়াত ঢাকার রামপুরাস্থ টি.ভি কেন্দ্রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১৪৩] ১০ নভেম্বর রাজধানী ঢাকা অবরোধের এ কর্মসূচি সারা দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশের সর্বত্র "ঢাকা অবরোধ" কর্মসূচির প্রস্তুতি চলতে থাকে। এরশাদ সরকার এতে দিশেহারা হয়ে ৮ নভেম্বর ঢাকা মহানগরীতে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং ঢাকার সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।[১৪৪] সরকারের সকল প্রকার বাধা, বিপত্তি, গ্রেফতার, সন্ত্রাস, ১৪৪ ধারা জারিকে উপেক্ষা করেই জামায়াত ও অন্যান্য জোট ও দল ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এ দিনের অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে কমপক্ষে ৪ জন বিরোধী দলীয় কর্মী নিহত হয় এবং আহত হয় ১০০ জন। এ দিন সমাবেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে বিনা রক্তপাতে পদত্যাগ করার জন্য এরশাদের প্রতি আহ্বান জানান। সকাল ১০টায় ফুলবাড়িয়া এবং বাদ জোহর বায়তুল মোকাররমে সমাবেশ করে জামায়াত।

জামায়াতের মিছিল গুলিস্তান এলাকার কাছে পৌঁছলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং বহু জামায়াত কর্মী আহত হয়।[১৪৫]

১০ নভেম্বর বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে হত্যা, সন্ত্রাস, গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ১১ ও ১২ নভেম্বর হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১০ নভেম্বর ও এর পরবর্তী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে ১৩ নভেম্বর বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ পাশে সর্বদলীয় গায়েবানা জানাজা ও উত্তর পাশে জামায়াতের দোয়া সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা ও দোয়া সমাবেশ শেষে জামায়াত ও অন্যান্য দল ও জোট ২টি পৃথক মিছিল বের করে। আহুত ১৫ নভেম্বর হরতাল উত্তর এক সমাবেশে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর বেলা আড়াইটা পর্যন্ত দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন।[১৪৬] ১৫ নভেম্বর সারাদেশে অর্ধদিবস এবং শিল্পাঞ্চলে ৪৮ ঘন্টা হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[১৪৭] ১৭ নভেম্বর হরতাল শেষে অন্যান্য জোট ও দলের সাথে জামায়াত ২১ ও ২২ নভেম্বর সারাদেশে বিরামহীন ৪৮ ঘন্টার হরতাল আহ্বান করে। এ সময় জামায়াত কর্মপরিষদের এক জরুরি বৈঠকে খালেদা-হাসিনাসহ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তিদাবি এবং কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণের আহ্বান জানানো হয়।[১৪৮] আন্দোলনের এ পর্যায়ে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বা দল সরকারের সাথে গোপনে আপস এবং আলোচনার চেষ্টা চালান। জামায়াতের পক্ষ থেকে এ ধরনের গোপন আপস আলোচনার বিরুদ্ধে সতর্কতা উচ্চারণ করে বলা হয় এ আলোচনায় ব্যক্তিস্বার্থ বা দলগত কিছু সুবিধে আদায় হতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে না। জামায়াতের তৎকালীন সহকারী মহাসচিব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সে প্রেক্ষাপটে দৃঢ় ঘোষণা উচ্চারণ করে বলেন, জনগণের দাবির প্রশ্নে জামায়াত আপস করবেনা।[১৪৯] অন্যান্য জোট ও দলের সাথে জামায়াতের পক্ষ থেকেও ২৯শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭২ ঘন্টার লাগাতার হরতাল আহ্বান করা হয়।[১৫০] জামায়াতসহ বিরোধী জোট ও দলের লাগাতার হরতাল কর্মসূচীতে সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে। সরকার ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। জামায়াতের পক্ষ থেকে সকল বিরোধী দলের সংসদ সদস্যকে ঐকবদ্ধভাবে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। জামায়াত সদস্যগণ ৩রা ডিসেম্বর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সরকার ৫ই ডিসেম্বর রাতে বিভাগীয় শহরগুলোতে কারফিউ জারি করে এবং তা কয়েকদিন বলবৎ থাকে। ৬ ডিসেম্বর সরকার জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং একই সাথে ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়।

১৯৮৭ সালের নভেম্বরে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠার পর ব্যর্থ হয়ে যায়। আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক গবেষক মুহাম্মদ আবদুল হাকিম ৪টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন।[১৫১] (১) এরশাদের মূল সমর্থক সামরিক বাহিনী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় এরশাদের পক্ষে ছিল। (২) আন্দোলনে গণমানুষের অংশ গ্রহণ কম ছিল। মূলত:

রাজনৈতিক কর্মী দ্বারাই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। (৩) কর্মসূচীর মাধ্যমে একটি কমন প্লাটফরম থেকে প্রধান ২টি জোট আন্দোলন পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে জন্য আন্দোলন সুসংঘটিত ছিল না। (৪) আন্দোলনের প্রধান দুই নেত্রী খালেদা ও হাসিনা একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছেন। দু'নেত্রীর মধ্যকার অবিশ্বাস আন্দোলনের তীব্রতাকে অনেকাংশে হ্রাস করতে সহায়তা করেছে। এরশাদ সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের নিষ্ফলতা বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতসহ সকল প্রধান রাজনৈতিক দল চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে। কিন্তু এরশাদ বিরোধী দলের বয়কট সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এ প্রেক্ষাপটে তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, একটি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা এবং সফলতা রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্ভর করেনা বরং জনগণের অংশ গ্রহণ এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে।[১৫২] বিরোধীদলহীন সংসদ নির্বাচন এরশাদের বৈধতার সংকটকে আরো প্রকট করে তোলে। বিরোধীদলের আন্দোলনও অব্যাহত থাকে। ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এমন মাস খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে, যে মাসে অন্তত: দেশব্যাপী একদিন হরতাল পালিত হয়নি।[১৫৩]

নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকট বৈধতার সংকট কাটতে ব্যর্থ হয়ে এরশাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ১লা জুন সরকার রাষ্ট্রধর্ম বিল উত্থাপন করেন। এ বিলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করা হয়। সাত জুন ২৫৪ ভোটে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল তথা রাষ্ট্রধর্ম বিল পাস করা হয়। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী সম্পর্কে ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "রাষ্ট্রপতি নিজেই অবৈধ, সংবিধানে কোন সংশোধনী আনার তাঁর কোন অধিকার নেই"। তিনি বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা জনগণের কোন দাবি নয় এবং এটি দেশের বিরাজমান সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্য করতে পারবে না।[১৫৪] ৮ দলীয় জোট নেত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এ সম্পর্কে বলেন, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে এ বিল আনা হয়েছে। এরশাদ সরকারের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, যেহেতু এ সরকার জনগণের সরকার নয় তাই এ সরকারের ক্ষমতায় থাকা বা কোন বিল আনা বা সংবিধান পরিবর্তন করার কোন অধিকার নেই। তিনি বলেন, বর্তমান সংসদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেনা যেহেতু সংসদ সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নন।[১৫৫] রাষ্ট্রধর্ম বিল সম্পর্কে জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার বহি:প্রকাশ নয় বরং জনগণকে বিভ্রান্ত এবং তাদের ইসলামী আন্দোলন থেকে বিমুখ করার লক্ষ্যে এটি ঘোষণা করা হয়েছে।[১৫৬] অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের পক্ষ থেকে ১২ জুন হরতাল আহ্বান করা হয়। ১৯৮৮

সালের জুন মাসে ঢাকায় এক প্রতিবাদ সমাবেশে শেখ হাসিনা অষ্টম সংশোধনী সম্পর্কে বলেন, তাঁর দল কখনো সুযোগ পেলে তা বাতিল করবে। তিনি অভিযোগ করেন, অষ্টম সংশোধনী স্বাধীনতা যুদ্ধকে ধ্বংস করার এবং বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত করার সূদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।[১৫৭] বেগম খালেদা জিয়া বলেন, অষ্টম সংশোধনী গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জাতিকে বিভক্ত এবং সাম্প্রদায়িক উসকানি সৃষ্টির জন্য ধর্মকে অপব্যবহার করার একটি উদ্যোগ।[১৫৮] বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ইসলামিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশ সিরাত মিশন, মুজাহিদুল ইসলাম পার্টিসহ[১৫৯] আরো কয়েকটি ছোট ছোট ইসলামী দল সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী তথা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণায় সরকারকে অভিনন্দন জানালেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একে ইসলামকে সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ইসলামী দলগুলোর আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য সরকারের ধূর্ত এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে। জামায়াত এটিকে সরকারের পক্ষে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রতারিত করার পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে।[১৬০]

অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোকে ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[১৬১] এরশাদ সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ ৬ জুন, ৮৮ জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রধর্ম বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, রাষ্ট্রধর্ম আইন দেশে ইসলামী মৌলবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করা হয়নি বরং ইসলামী মৌলবাদ ক্ষমতায় আসার পথ বন্ধ করার জন্য করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশ একটি "খোমেনী রাষ্ট্র" হতে না পারে।[১৬২] প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জীবনাচার এবং মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়নি বরং তাঁর সরকারের বৈধতার সংকট কাটানোর লক্ষ্যে ইসলাম প্রিয় জনগণের সমর্থন পাওয়ার রাজনৈতিক লক্ষ্যে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল পাস করা হয়েছে। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়নি বা ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনাও সরকারের ছিলনা। বরং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হবে।[১৬৩]

১৯৮৮ সালের শেষদিকে যুগপৎ আন্দোলনে ছেদ পড়ে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ৮ দলীয় জোট বিশেষত: আওয়ামী লীগ এবং বাম দলগুলো জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। দলগুলো স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়।[১৬৪] ৫ দলের পক্ষ থেকে জামায়াত শিবির চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়া হয়।[১৬৫] জামায়াত সরকার ও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসকে উসকানি দেয়ার অভিযোগ তোলে। জামায়াত

তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ সন্ত্রাসকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার কথা ঘোষণা দেয়। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান এক প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, শেখ হাসিনাসহ কতিপয় নেতা ও দল জামায়াত-শিবিরকে নির্মূল করার যে আহ্বান জানিয়েছেন তা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা হবে।[১৬৬] জামায়াতের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন এবং সন্ত্রাসে সরকারের ইন্ধন ছিল বলে জামায়াতের বিশ্বাস। জামায়াতের মতে দলীয় সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের কারণে তৃতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে হয়েছে বলে এরশাদ জামায়াতের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে মেতে ওঠেন এবং একটি জোটকে বাগে এনে জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন।[১৬৭] ১৯৮৮ ও ৮৯ সালে সরকার বিরোধী যুগপৎ আন্দোলন কোন ঐকবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বিভিন্ন জোট ও দলের মধ্যে অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে জামায়াত ও অন্যান্য বিরোধী দল ও জোট পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে আবার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়।[১৬৮]

১৯৯০ সালের অক্টোবর মাস থেকে আন্দোলন আবার তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বিরোধী জোট ও দলগুলোর মধ্যে আবার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে তিন জোট ও জামায়াতের পক্ষ থেকে ১০ অক্টোবর ঢাকা সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ১০ অক্টোবরের কর্মসূচি দীর্ঘদিন পর গণতন্ত্রমনা মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দও এ কর্মসূচিকে দীর্ঘদিন পর বিরোধী দলের আন্দোলনের ঐকবদ্ধ প্রয়াসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে। এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্রী পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য প্রবীণ বাম নেতা পীর হাবিবুর রহমান বলেন, আগামী ১০ অক্টোবরের কর্মসূচী দীর্ঘ প্রায় তিন বছর পর একটি সমন্বিত প্রোগ্রাম। এ কর্মসূচি বিরোধী দলের রাজনীতির জন্য শুভ লক্ষণ। সামগ্রিক দিক থেকে ১০ অক্টোবর একটি ঐক্যমুখী আন্দোলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আগামী ১০ অক্টোবরের কর্মসূচী পালনের মধ্যদিয়ে ঐকবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠবে বলে আমি মনে করি।[১৬৯] সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ৮,৭ ও ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী পৃথক পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠান করে। জামায়াতে ইসলামী দৈনিক বাংলার মোড়ে সমাবেশ করে। কাকরাইলেও অনুরূপ সমাবেশের আয়োজন করে। দুটো সমাবেশেই তারা পুলিশের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। কর্মসূচি পালনকালে হত্যা, সন্ত্রাস, গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে জামায়াত অন্যান্য জোট ও দলের সাথে ১১ অক্টোবর হরতাল কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। ১০ অক্টোবর ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে পুলিশ বাহিনী এবং সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের গুলিতে ছাত্রসহ ৫ জন নিহত হয়। অসংখ্য বিরোধী দলীয় কর্মী আহত ও গ্রেফতার হয়। ৭ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ অনেক বিরোধী দলীয় নেতাও আহত হন। সচিবালয় অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে পুলিশ ও সরকারের সমর্থকদের গুলিতে ৫ ব্যক্তি নিহত ও শত শত ব্যক্তি আহত হওয়া এবং পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর হরতাল পালন ছাড়াও জামায়াত অন্যান্য

দল জোটের সাথে যুগপৎ দেশব্যাপী ১৬ অক্টোবর অর্ধদিবস ও ১০ নভেম্বর পূর্ণদিবস হরতালসহ অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১৭০] পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭, ৮ ও ৫ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আহ্বানে ১৬ অক্টোবর হরতাল পালিত হয়। হরতাল পালন শেষে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে ঢাকা মহানগরী জামায়াত আয়োজিত সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, এখন প্রয়োজন গোটা জাতির ঐকবদ্ধ আন্দোলন, ঐকবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ, যার লক্ষ্য হবে স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সর্বাগ্রে পার্লামেন্ট নির্বাচন।[১৭১] এর আগে ১৩ অক্টোবর পুলিশের গুলিতে ঢাকা পলিটেকনিকের একজন ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ অক্টোবর অন্যান্য দলও জোটের সাথে জামায়াতও ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালন করে। হরতাল কর্মসূচি শেষে জামায়াত বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে এক সমাবেশের আয়োজন করে। পূর্বঘোষিত কমূসূচী অনুযায়ী ৫ নভেম্বর ছিল বিরোধীদল ও জোটগুলোর বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র ঘেরাও কর্মসূচি। ৮, ৭ ও ৫ দলের পাশাপাশি জামায়াতও সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে। ৬ নভেম্বর ৮, ৭, ৬ দলীয় জোট এবং জামায়াত সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকায় পৃথক পৃথক সমাবেশের আয়োজন করে। জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ মগবাজার চৌরাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জনতার দাবি মেনে নিয়ে পদত্যাগ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।[১৭২] ৮, ৭, ৬, ৫ দল ও জামায়াতসহ জোট ও দলের আহ্বানে ১০ নভেম্বর সারাদেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতাল কর্মসূচি শেষে জোট ও দলগুলো সরকারের পদত্যাগ এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি হিসেবে ২০ ও ২১শে নভেম্বর ৪৮ ঘন্টা হরতালের ডাক দেয়। ৪৮ ঘন্টা হরতাল ছাড়াও আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন জোট ও দলের সাথে যুগপৎ জামায়াত ১১ থেকে ১৯ নভেম্বর সভা সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১৭৩]

আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব : জামায়াতের কর্মসূচি

১০ নভেম্বর হরতাল শেষে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জামায়াতের সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান গোটা জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এরশাদের প্রতি আহ্বান জানান।[১৭৪] হরতাল শেষে ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক দেশব্যাপী সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সারা দেশ সফর এবং সভা সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে জামায়াত এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে জনসভার আয়োজন করে। ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জনসভায় বিরোধী দলের ঐক্যকে সংহত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে সবাইকে

সজাগ থাকতে হবে। অন্যথায় ৮৭, ৮৮, ৮৯ সালের মত সরকারি মহল বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ছাত্র জনতার ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়দা ওঠাতে সক্ষম হবে।[১৭৫] ১৯ নভেম্বর '৯০ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিন ৩ জোট ও জামায়াতের পক্ষ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলা পেশ করা হয়। ৮দল, ৭দল, ৫দল যৌথভাবে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলায় স্বাক্ষর করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলা পেশ এবং যৌথ ঘোষণাকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেদিন বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে জামায়াত আয়োজিত সমাবেশে জামায়াতের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করেন। জনাব খান সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে বলেছেন, সরকার যদি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম হয়, তাহলে গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ ঘটনা স্মরণীয় হয়ে থাকবে"। জামায়াতের কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা নিম্নরূপ ছিল:[১৭৬]

১। সংবিধানের ৭২(১) ধারায় ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট বর্তমান জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করবেন এবং সংবিধানের ৫৮(৫) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবেন।

২। সংবিধানের ৫১(ক)(৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করবেন।

৩। প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৫৫(ক)(১) ধারা অনুযায়ী একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন যিনি আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হবেন।

৪। সংবিধানের ৫১(৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

৫। ৫১(৩) ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের সাথে সাথে সংবিধানের ৫৫(১) ধারা অনুযায়ী নবনিযুক্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

৬। ৫৮ ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আন্দোলনরত দলগুলোর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করবেন।

৭। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং কেয়ারটেকার সরকারের সদস্যবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৮। সংবিধানের ১১৮(১) ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

৯। সংবিধানের ১২৩(৩) খ অনুযায়ী সংসদ বাতিল হবার দিন হতে ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১০। নবনির্বাচিত সংসদই দেশের ভবিষ্যৎ সরকার পদ্ধতির অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকবে, না সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে, তা নির্ধারণ করবে।

যৌথভাবে তিনজোট এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলা ঘোষণা করার পর সরকার বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। ২০ নভেম্বর সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন পেশাজীবী এবং জনগণ বিরোধীদলের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সকল মহলের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের। ২১শে নভেম্বর ঢাকায় এক সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান অবিলম্বে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে বলেন, কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এখন জাতীয় দাবি।[১৭৭] সরকার আন্দোলনকারী বিরোধীদলীয় কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন এবং দমনের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীবাহিনী লেলিয়ে দেয়। এরশাদের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীগোষ্ঠী ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। ২৭ নভেম্বর ৯০ এরশাদের লেলিয়ে দেয়া চিহ্নিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। সে দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিহত হন বি.এম.এ নেতা ডাঃ শামসুল আলম মিলন। ডাঃ মিলনের হত্যাকান্ডের খবর সারাদেশে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ৭ দল, ৮ দল, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও জোটের তীব্র আন্দোলন থেকে আত্মরক্ষার সর্বশেষ কৌশল হিসেবে ২৭শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে সংবিধানের ১৪১ (ক) ধারা বলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ২৭শে নভেম্বর রাতে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের খোঁজে বাসায় বাসায় তল্লাশি চালানো হয়। জামায়াতের নায়েবে আমীর আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ গ্রেফতার হন। গ্রেফতার, নির্যাতন ও গুলির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এরশাদ সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করে। বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন এবং জনগণের পক্ষ থেকেও জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করা হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রতিবাদে সাংবাদিকগণ ২৭ নভেম্বর থেকে সকল পত্রিকা বন্ধ করে দেন। জনগণ জরুরি অবস্থা ও কারফিউ ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরে চলতে থাকে মিছিলের পর মিছিল। এরশাদের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর গুলিতে ৩ জন জামায়াত কর্মীসহ বহুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা কর্মী ও নিরীহ লোক নিহত হন।[১৭৮] বিএমএ নেতা ডাঃ মিলনের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করার জন্য ৭, ৮, ৫ দল জামায়াতকে অনুরোধ করে।[১৭৯] জামায়াত এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করে।

৩০ ডিসেম্বর বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় নিহতদের উদ্দেশ্যে গায়েবানা জানাজা। জানাজার শেষে কারফিউ ভঙ্গ করে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বিপুলসংখ্যক জামায়াত কর্মী অংশ নেন। জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং ঢাকা মহানগরী আমির আবদুল কাদের মোল্লা অন্যান্য জোট ও দলের নেতৃবৃন্দের সাথে মিছিলের নেতৃত্ব দান করেন।[১৮০] আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৩রা ডিসেম্বর রাতে নতুন কৌশলে একই দিন প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথে মনোনয়নের ১৫ দিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন। জামায়াত এবং অন্যান্য সকল দল ও জোট তাঁর এ ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ৪ঠা ডিসেম্বর রাতেই জেনারেল এরশাদ স্বীয় পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। ৫ই ডিসেম্বর তিনজোট ও জামায়াতে ইসলামী প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদকে কেয়ারটেকার সরকার প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দানের কথা ঘোষণা করে। জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস আলী খান কেয়ারটেকার সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদের নাম ঘোষণা করেন।[১৮১] এদিন সন্ধ্যার পর জামায়াত নেতৃবৃন্দ মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের (নায়েবে আমীর) নেতৃত্বে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাসভবনে যান। প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক অবিলম্বে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের পর ৫ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং ৫ দলীয় জোট নেতা রাশেদ খান মেনন জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও এবং টেলিভিশনে ভাষণ দেন। আব্বাস আলী খান তাঁর ভাষণে "স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যে জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জনগণের এ বিজয়কে অর্থবহ করে দেশে সত্যিকারের একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে হলে যে কোন মূল্যে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে"। অবশেষে বিরোধী জোট ও দলের ঐকবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এরশাদ সরকারের পতনের পর ৭ ডিসেম্বর জামায়াত দেশব্যাপী শোকরানা দিবস পালন করে। ঢাকায় শোকরানা সমাবেশে জামায়াত প্রধান আব্বাস আলী খান বলেন, আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ধৈর্য, সহনশীলতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা ও পরমতসহিষ্ণুতা ব্যতীত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, আসুন আমরা একে অপরকে ভালবাসতে শিখি, অতীতের সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলি। তিনি বলেন, একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপরই দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।[১৮২] ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদল ৯ ডিসেম্বর দুপুরে প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েটে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে এক আনুষ্ঠানিক

বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখার জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। স্বৈরশাসনের পতনের পর জাতির আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী একটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।[১৮৩]

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর নেতা কর্মীদের ভূমিকা

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের নেতা কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জামায়াতের যুগপৎ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নেতাকর্মীদের জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ১৯৮২ সাল থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত এরশাদ সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে জামায়াতের অনেক নেতাকর্মী নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে শত শত কর্মী। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ জামায়াতের অনেক নেতাকর্মী কারাবরণ করেছেন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন চলাকালে (১৯৮২-৯০) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অনেক নেতাকর্মী নিহত হন।[১৮৪]

নিহত নেতা কর্মীদের নাম	ঠিকানা	নিহত হওয়ার তারিখ
১। সোহেল পারভেজ	গুংগাদিয়া বাজার, উপজেলা-বিয়ানী বাজার, সিলেট	২৩ মে, ১৯৮৬ (আহত ১০মে, ৮৬)
২। শাহবাজ উদ্দিন	সিরাজগঞ্জ, জেলা সদর।	২৮ সেপ্টেম্বর '৮৮
৩। মফিজুল ইসলাম	সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। (নিহত কুমিরা, চট্টগ্রাম।)	৮ অক্টোবর '৮৮
৪। আতাউর রহমান	রংপুর জেলা সদর।	১২ নভেম্বর '৮৮
৫। আবু তাহের	চট্টগ্রাম মহানগরী	৪ মে, ১৯৮৯
৬। মো: ফরহাদ	খুলনা মহানগরী	২৩ জুলাই ১৯৮৭
৭। আকবর আলী	খুলনা মহানগরী	৩০ নভেম্বর ১৯৯০

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৮৫ সালের ১৭ এপ্রিল সকাল ১১ টায় উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণার জন্য জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে পৌছালে পুলিশ চারজন জামায়াত কর্মী ও ড্রাইভারসহ তাঁকে গ্রেফতার করে।

১৯৮৫ সালের ২২শে এপ্রিল বাদ আছর ঢাকায় ১৪৪ ধারা ও সামরিক আইনের বিধি ভঙ্গ করে উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবে যাওয়ার পথে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর শামসুর রহমান, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য

এডভোকেট নজরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি আবদুল কাদের মোল্লা, ঢাকা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি নাজিম উদ্দিনসহ ৪২ জন নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। প্রায় চার মাস কারাভোগের পর তাঁরা ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট মুক্তি লাভ করেন।[১৮৫] এ ছাড়া এ সময়ে কুষ্টিয়ার জেলা আমীর ডাঃ আনিসুর রহমান ও ফরিদপুর জেলা আমীর অধ্যাপক শাহেদ আলীকেও গ্রেফতার করা হয়। মাগুরায় জামায়াত নেতা শামসুল আলম ও ইসলামী ছাত্র শিবির নেতা এরশাদ উল্লা অহিদকে উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে মিছিল করার কারণে সামরিক আদালতে ৫ বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।[১৮৬] ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীর সময় এরশাদ সরকার বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়, গ্রেফতার করা হয় অনেক নেতাকর্মীকে। ২৫ অক্টোবর ৮৭ মধ্যরাতে জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী আমীর আলী আহসান মুজাহিদকে (বর্তমানে সেক্রেটারি জেনারেল) ঢাকায় তাঁর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। একই রাতে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুস সোবাহান, পাবনা, অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ, অ্যাডভোকেট আবদুল কাদের, নারায়ণগঞ্জ, মাওলানা শামসুদ্দিন,চট্টগ্রাম, মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, চট্টগ্রাম, মুফতি মাওলানা আবদুস সাত্তার, খুলনা, ডাঃ আবুল হোসাইন, নড়াইল, মাওলানা আবদুল বারী, লালমনিরহাট, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের, মেহেরপুর, মুঃ শহীদুল্লাহ, রাঙ্গামাটি প্রমুখ নেতাসহ প্রায় ৩৭ জন নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে। অত:পর ২৬ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বরের মধ্যে সারাদেশে বেশ কয়েকজন জেলা ও উপজেলা আমিরসহ দু'শতের অধিক নেতা ও কর্মীকে আটক করা হয়।[১৮৭] এরশাদের পতন আন্দোলন যখন চুড়ান্ত পর্যায়ে তখন ২৭ নভেম্বর ১৯৯০ রাতে জামায়াতের নায়েবে আমীর আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফকে তাঁর ঢাকার বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি প্রস্তুতি ও তা বাস্তবায়নকালে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার ১৭ জন সদস্য ও আড়াই'শ কর্মীকে আটক করে।[১৮৮]

ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভূমিকা

১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের অনুগামী ছাত্র সংগঠন এবং জোটের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরও (ইছাশি) এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। ই ছা শি ছাত্র সমাবেশ, মিছিল, গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে ছাত্র জনতাকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। এরশাদের পতন এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ই ছা শি জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে একাধিক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। এরশাদের পতনের লক্ষ্যে "সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য" গঠিত হলে ছাত্র শিবির সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সাথে যুগপৎভাবে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ই ছা শি ১০ই

নভেম্বর, ১৯৯০ হরতাল শেষে ঢাকার বায়তুল মোকাররমের সমাবেশ থেকে অবিলম্বে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরপূর্বক এরশাদ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১৮৯]

কর্মসূচিগুলো ছিলঃ

১১ ই নভেম্বরঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাশে যোগদান।

১২ ই নভেম্বরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপচেষ্টা ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল।

১৩ই নভেম্বরঃ দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সমন্বিত ও তীব্রতর করার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবী সমাবেশ।

১৫ই নভেম্বরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ৯০ সহ যাবতীয় কালাকানুন বাতিলের দাবিতে জেলা পরিষদ কার্যালয় ঘেরাও।

১৬ ই নভেম্বর; ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক সমাবেশ।

১৭ ই নভেম্বরঃ স্বৈরাচার ও তার দোসর, দালালদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ দিবস।

১৮ই নভেম্বরঃ ছাত্র-শ্রমিক-সংহতি দিবস পালন।

১৯ই নভেম্বরঃ স্বৈরাচার পতনের আহ্বান জানিয়ে হরতালের সমর্থনে দেশব্যাপী মিছিল-সমাবেশ।

২০ ও ২১ নভেম্বরঃ বিভিন্ন জোট ও দলের আহুত সর্বাত্মক হরতাল পাঁলন।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে পুলিশ এবং সরকারি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ১০ জন কর্মী নিহত হয়। এ সময় আওয়ামী লীগসহ বিএনপি'র ছাত্র সংগঠনের হাতে নিহত হয় আরো ২৫ জন শিবির কর্মী।[১৯০]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ: জামায়াতের লাভ-ক্ষতি

জামায়াতে ইসলামী ১৯৭৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশ স্বনামে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের তিন বছরের মধ্যে সামরিক শাসন জারির কারণে জামায়াত নিয়মিত সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে বাধার সম্মুখীন হয়। পুনরায় আত্মপ্রকাশের পর ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর রমনা রেস্তরাঁয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খান অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং দেশে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ৫ দফার "পলিটিক্যাল সিস্টেম" ঘোষণা করেন। অত:পর ১৯৮১ সালে জামায়াতে ইসলামী ৭ দফা গণদাবি পেশ করে এবং এর ভিত্তিতে জামায়াত আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ৭ দফার আন্দোলন নিয়ে বেশি দূর এগুবার আগেই ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন

জারি করেন। সামরিক শাসন জারির কিছুদিন পরই জামায়াত এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট (পরবর্তীতে ৮দল) এবং বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের সাথে যুগপৎভাবে জামায়াত এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। জামায়াত আল্লাহ্‌র আইন এবং সৎলোকের শাসন কায়েমের পথে সামরিক শাসনকে বাধা হিসেবে বিবেচনা করে। জামায়াতের মতে, "দেশকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না যতক্ষণ না জনগণকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা দেয়া হয়। জনগণকে যদি সরকার নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়া না হয় তাহলে তারা কীভাবে দেশ গঠনে সাহায্য করবে? এ জন্য জামায়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উৎসাহী এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সাথে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।[১৯১] দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর জামায়াত এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে অন্যান্য জোট ও দলের সাথে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এ আন্দোলনে জামায়াতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। অবশ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে সাংগঠনিক স্বাভাবিক কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কেননা জামায়াত দাওয়াত এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে সচেতনতা এবং চরিত্র ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে আগ্রহী। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, সভা-সমাবেশ, ওয়ার্কশপ এবং সামাজিক তৎপরতার মত শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ইসলামী সচেতনতা সৃষ্টি জামায়াতের অন্যতম কর্মসূচি।[১৯২] কিন্তু সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের কারণে জামায়াতের গঠনমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কারণে জামায়াতের ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি হয়েছে বলে জামায়াত নেতৃবৃন্দ মনে করেন। জামায়াত নেতার মতে,[১৯৩] ষাট এর দশকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ফলে জামায়াতের গণভিত্তি রচিত হয়েছে। দীর্ঘ ৯ বছর এরশাদ বিরোধী অন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে জামায়াত একটি স্বীকৃত শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তার মতে, ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র তীব্র মেরুকরণের মধ্যে জামায়াতের ১৮টি আসন লাভ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ফসল।

জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক পথে ইসলামী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্যেই জামায়াত সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকে। জামায়াত সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে জামায়াত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ১০% ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত, নেজামে ইসলাম ও খেলাফত রব্বানী পার্টি সমন্বয়ে গঠিত ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) মুসলিম লীগের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। জোট ২০টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে জামায়াতের আসন ছিল ৬টি।[১৯৪] এরশাদ সরকার

বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৮৬ সালে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের (বিএনপি ব্যতীত) সাথে জামায়াত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে জামায়াত ৭৬ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ব্যাপক সন্ত্রাস, ব্যালট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াত ১০টি আসনে বিজয়ী হয় এবং ১৫টি আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জামায়াত আইনগত মর্যাদা লাভ করে।[১৯৫] ১৯৮৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠলে জামায়াত সংসদ সদস্যগণ সংসদ থেকে পদত্যাগ করে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। জামায়াতসহ অন্যান্য জোট ও দলের আন্দোলনের ফলে এরশাদের পতনের পর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াত প্রথমবারে ২১৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা এবং সক্রিয়ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনী পরিবেশ বিরাজ করায় জামায়াত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম এর লক্ষ্যে এর কর্মসূচি পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়। ৫ম সংসদ নির্বাচনে জামায়াত প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১২.১৩ ভাগ পেয়ে ১৮টি আসন লাভ করে। প্রায় অর্ধশত আসনে জামায়াত প্রার্থী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

নিম্নের সারণি থেকে নির্বাচনে জামায়াতের ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন এবং সফলতার চিত্র পাওয়া যায়:[১৯৬]

বছর	কত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট ভোট
১৯৭৯	৬২	৬	৭,৫০,০০০
১৯৮৬	৭৫	১০	১৩,১৪,০৫৭
১৯৯১	২১৮	১৮	৪১,২৪,৮৬৮

পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে ১৯৯১ পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচনে জামায়াত অংশ গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠিত ৫ম সংসদ নির্বাচনে এই দল সবচেয়ে বেশি আসন এবং শতকার হিসেবে বেশি ভোট অর্জন করেছে। ৯১'র সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতের সাফল্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায়, আশির দশকে এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আপসহীন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার জন্য অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় জামায়াতের ব্যাপক গণভিত্তি রচিত হয়েছে।[১৯৭] যদিও বরাবরই জামায়াতে ইসলামী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। তারপরও কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি জামায়াতের আন্দোলনকে ভিন্ন চোখে মূল্যায়ন করতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে জামায়াত রাজনৈতিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হচ্ছে।[১৯৮] এ প্রসঙ্গে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে

জামায়াতের ভূমিকাকে খাটো করার জন্য এটি একটি প্রপাগ্যান্ডা। জামায়াত এর আদর্শিক কারণে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। জামায়াত সামরিক একনায়কত্বকে ইসলাম এবং জাতির জন্য ক্ষতিকর মনে করে। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক শাসনের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরোক্ষ মদদ আছে বলে তিনি মনে করেন।[১৯৯]

নব্বইয়ের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা আন্দোলনরত তখনকার রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান জোট ১৫ দলের প্রধান এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন- "জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান রাজনৈতিক ভূমিকা গণতন্ত্র উত্তরণের পথে সহায়তা করেছে"। অপর প্রধান জোট ৭ দলের অন্যতম শরিক গণতান্ত্রিক পার্টির নেতা সিরাজুল হোসেন খান বলেছেন, "সামরিক শাসনের অবসান করে সার্বভৌম জাতীয় সংসদ এর নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এর ইস্যুটি হচ্ছে ৫ দফার মূল দাবি। এ দাবির প্রশ্নে আজ একটা অপ্রতিরোধ্য ঐক্যমত গড়ে ওঠেছে। এ কনসেন্সাসকে জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে এবং নিজ অবস্থান থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ আন্দোলন আমার মতে ৫ দফা আন্দোলনের সহায়ক। ইউ পি পির নেতা (পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) কাজী জাফর আহমদ বলেছেন- "৭ দলীয় ঐক্যজোট ও ১৫ দল যুগপৎভাবে জাতীয় দাবি ৫ দফার ভিত্তিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তাতে জামায়তে ইসলামী সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।"[২০০] গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে এরশাদ সরকারের পতনের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াতের সাফল্যে দেশী-বিদেশী ইসলামবিরোধী শক্তি অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। তারা জামায়াতের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বিভিন্ন কমূসূচী হাতে নেয়। এক্ষেত্রে কিছু বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও গণমাধ্যম জামায়াত এবং ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম হাতে নেয়।[২০১] কারণ কিছু কিছু এনজিও'র মতে, জামায়াতের শক্তি বৃদ্ধি পেলে মিশন্যারি কার্যক্রমসহ নারীদের ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষার প্রসার, এবং সামাজিক রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশ গ্রহণ কর্মসূচী বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কয়েকটি পত্রিকা আদর্শগত এবং কৌশলগত কারণে জামায়াতের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে। তারা জামায়াতের ইসলামী সমাজ কায়েমের প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করে থাকে। জামায়াতের উত্থানকে তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করে।

পঞ্চম সংসদ নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতি : জামায়াতের ভূমিকা

দীর্ঘ নয় বছরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। এরশাদ

বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রধান ৩ জোট (৮ দল, ৭ দল, ৫ দল) এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ ৭৫টি রাজনৈতিক দল ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আনন্দঘন উৎসবমূখর পরিবেশে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় সংসদের ৫ম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অভূতপূর্ব পরিবেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষকগণ একটি অনন্য ও অত্যন্ত সফল নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ করেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসা বৃটিশ সংসদীয় দলের নেতা পিটার শোরসহ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে দেখা করে বলেন, ৫ম সংসদ নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ৬ জন সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত জাপানি প্রতিনিধি দলটিও অস্থায়ী রাষ্ট্রতির সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, নির্বাচন প্রকৃতপক্ষেই অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। উভয় পর্যবেক্ষক দল ৫ম সাধারণ নির্বাচনকে অনন্য, প্রভাবসৃষ্টিকারী ও অত্যন্ত সফল হিসেবে উল্লেখ করেন।[২০২] কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ উল্লেখ করে একে বাংলাদেশের এযাবতকালের অতুলনীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করেন।[২০৩]

পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দেশীয় রাজনীতিবিদদের মন্তব্যও ছিল ইতিবাচক ও প্রশংসাসূচক। আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রেসিডিয়াম সদস্য বর্তমান গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেন, এবারের নির্বাচন ভাল হয়েছে। জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাশীল থেকে দেশে সুষ্ঠু, সুন্দর পরিবেশ রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের আরেক সদস্য আবদুল মান্নান বলেন, আমরা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়েছি। অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার জন্য প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব, অসত্য ও দূর্ভাগ্যজনক অপপ্রচার নির্বাচনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ওর্য়াকার্স পার্টির নেতা ও ৫দল নেতা রাশেদ খান মেনন বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার জনগণ তাদের ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে। ভোট গ্রহণকালে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে তা অতীত দু:শাসনের অবশেষ মাত্র। জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠান 'ভাল' বলা চলে। এই প্রথম ক্ষমতাসীনদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ছাড়া একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনোত্তর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন– ভোটাররা আমাদের ভোট দিয়েছেন। কিছু চিহ্নিত অগণতান্ত্রিক শক্তি সূক্ষ্ম কারচুপি, কালো টাকা, সন্ত্রাস এবং এক অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভোটের রায়ের ফল থেকে ভোটারদের বঞ্চিত করেছে।[২০৪] অবশ্য শেখ হাসিনার এ ধরনের মন্তব্য যুগপৎভাবে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং দেশবাসীকে হতবাক করেছে। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অনেককে ক্ষোভ প্রকাশ করে বের হতে

দেখা যায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে শেখ হাসিনা কার্যনির্বাহী কমিটির সভা চলাকালে আকস্মিকভাবে পদত্যাগপত্রও পেশ করেন।[২০৫]

নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একক দল হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৪০টি আসন লাভ করে। প্রধান দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৮৮টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন পায়। ফলাফলে দেখা গেল এককভাবে কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে সমর্থ নয়। একদিকে অন্যতম প্রধান দল আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ সংবিধান সংশোধনক্রমে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানায়। অপরদিকে এককভাবে সর্বোচ্চসংখ্যক আসনে বিজয়ী বিএনপির পক্ষ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে ৫ই এপ্রিলের (১৯৯১) মধ্যে সংসদ অধিবেশন আহবানের দাবি জানানো হয়।[২০৬] শুধু সরকার গঠন না করার আহবানের মধ্যেই আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিলনা। বরং বিএনপিকে সরকার গঠন করতে দিলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আন্দোলনে যাওয়ার হুমকিও প্রদান করা হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিএনপি থেকে কোন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে রাষ্ট্রপতির নিরপেক্ষতা না হারানোর জন্য অনুরোধ করেন। আওয়ামী লীগের তখন বক্তব্য ছিল, বিএনপি সংসদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি। যেহেতু সরকারের ধরন সংসদীয় পদ্ধতির নয়, সেহেতু একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মন্ত্রী পরিষদ গঠনের অধিকার নেই।[২০৭] আওয়ামী লীগের সাহায্য ছাড়া বিএনপি সরকার গঠন করতে পারবেনা বলেও নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন।[২০৮] অন্যদিকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠনে কোন বাধা নেই বলে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে মতামত জানানো হয়। জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী বলেন, যে দল সংখাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে তারাই সরকার গঠন করবে। জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা নিজামী আরো বলেন, দেশে কোন অবস্থাতেই যাতে সাংবিধানিক সংকট ও জটিলতা সৃষ্টি না হয় এবং দেশে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে পার্লামেন্টে জামায়াত সংসদ সদস্যগণ অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর এহেন বক্তৃতা-বিবৃতি রাজনৈতিক সচেতন মহলকে চিন্তিত করে তোলে। নির্বাচন উত্তর দেশ এক চরম সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট নিপাতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ৭ মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত ঢাকায় এক জনসভায় শেখ হাসিনার আক্রমণাত্মক বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। তিনি বলেন "আমরা সরকার গঠন করতেও জানি, সরকার নামাতেও জানি। আওয়ামী লীগের কর্মীদের গায়ে একটি আঁচড় দিলে আমরা দু'টি আঁচড় দেব"। বিএনপির পক্ষ থেকেও হুংকার ছাড়া হয়। খালেদা জিয়া এক জনসভায় বলেন, জনগণ বিএনপিকে রায় দিয়েছে;

ক্ষমতা হস্তান্তরের বাধাও ঠেকাবে।[২০৯] আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রথম সভায় শেখ হাসিনা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কোন দলকে মন্ত্রীসভা গঠনে ডাকতে পারেন না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় অবিলম্বে সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়। নির্বাচন পরবর্তী উদ্ভূত রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে জামায়াতের ভূমিকা ছিল দূরদর্শী এবং ঐতিহাসিক। দেশে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনে জামায়াত বিএনপি'র সংসদীয় দলকে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্বলিত জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খানের একটি চিঠি জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিজামী ১১ মার্চ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তর করেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে গণতন্ত্রের এই অভিযাত্রাকে অব্যহত রাখার লক্ষ্যে নির্বাচনের ফলাফলকে ধরে রাখার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন জানাবে। বিএনপি'র মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদারের কাছে লেখা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের সমর্থন পত্রের একটি কপিও অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় বিএনপির নেতা সাইফুর রহমান, আবদুল মতিন চৌধুরী এবং জামায়াতের সহকারী মহাসচিব আলী আহসান,মোহাম্মদ মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন।[২১০]

সরকার গঠনে জামায়াতের সমর্থনের পটভূমি

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি ঝুলন্ত পার্লামেন্টের সৃষ্টি হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে 'কোয়ালিশন সরকার' প্রতিষ্ঠার কথা ওঠে আসে। আওয়ামী লীগ বিরোধী একটি মহল এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য বিএনপির নিকট জামায়াতের জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয় দাবী করলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে জামায়াতের সাথে উক্ত মহলটি পূর্বাহ্নে আলোচনা করেননি। স্বত:স্ফূর্তভাবে বিএনপি-জামায়াতের শুভাকাংখী হিসেবে তারা এ উদ্যোগ নেন। কিন্তু জামায়াত যেহেতু সরকারে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়নি তাই এ উদ্যোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে সফল হয়নি। ৫ম জাতীয় সংসদে 'ব্যালেন্স অভ পাওয়ার' জামায়াতের হাতে থাকায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও কোয়ালিশন সরকার গঠন করার জন্য জামায়াতের নিকট প্রস্তাব করা হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু এ ব্যাপারে জামায়াত নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সরকার গঠনে তাদের আগ্রহের কথা জানান। কিন্তু মুজাহিদ দলীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া এ ব্যাপারে কোন কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করলে আমু বিদায় নেন।[২১১] নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক সংকট নিরসনে এগিয়ে আসেন ব্যক্তিগতভাবে তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান লে. জে. নুরুদ্দীন এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর জি. ডব্লিউ চৌধুরী। জনাব চৌধুরীর মধ্যস্থতায় ২৮ ফেব্রুয়ারী রাতে সেনাবাহিনী প্রধানের বাসভবনে অধ্যাপক গোলাম আযম এবং জেনারেল নুরুদ্দীন এর মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেনাবহিনী প্রধান সরকার গঠনে বিএনপিকে

সমর্থন দানের জন্য জামায়াতের আমীরের নিকট অনুরোধ করেন। উত্তরে অধ্যাপক আযম বলেন, বিএনপি যদি জামায়াতের সহযোগিতা চায় তাহলে তারা যেন যোগাযোগ করেন এবং অনুরোধের বিষয়টি লিখিতভাবে জামায়াতকে জানান। এরই ধারাবাহিকতায় ৮ মার্চ, ১৯৯১ ড. চৌধুরীর বাসভবনে বেগম খালেদা জিয়া, লে. জে. নুরুদ্দীনের সাথে জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এবং মতিউর রহমান নিজামীর এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা শুরু করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "আমার এ ধারণা হয়েছে যে, বিএনপিকে সরকার গঠনে সহযোগিতা করার বিষয়টি জামায়াতে ইসলামী বিবেচনা করছে। তাই আমি আপনার সহযোগিতা পাওয়ার আশায় এখানে এসেছি"। বেগম জিয়ার বক্তব্যের উত্তরে জামায়াতের আমীর বলেন, চমৎকার একটি জাতীয় নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর নির্বাচিতদের সরকার গঠনে বিলম্ব হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। জনগণ আপনাকে যে সংখ্যক আসন দিয়েছে এর সাথে জামায়াতের ১৮ জন এমপি সমর্থন দিলেই সরকার গঠন সম্ভব। তাই আপনি সমর্থন চাইলে আমরা সমর্থন দেব বলেই এসেছি। আমাদের সমর্থন নিয়ে আপনি সরকার গঠন করতে পারেন এবং প্রেসিডেন্টকে এ কথা জানাতে পারেন। পরদিন ৯ মার্চ ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের একটি প্রতিনিধি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি বিএনপিকে সমর্থনের ব্যাপারে জানতে চাইলে আব্বাস আলী খান ইতিবাচক জবাব দেন। অত:পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ সমর্থনদানের বিষয়টি লিখিতভাবে জানানোর জন্য জামায়াতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বেগম জিয়া এবং গোলাম আযমের মধ্যকার বৈঠকের আলোচনার ফলে ১০ মার্চ বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব ব্যারিষ্টার আবদুস সালাম তালুকদার জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বরাবর সরকার গঠনে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধপত্র পাঠান।

সরকার গঠনে জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন দেবে কিনা এ বিষয়ে ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনা পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ক্ষমতার অংশীদার না হয়ে সরকার গঠনে বিএনপিকে সহযোগিতা করতে হবে যাতে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নত হয়। ১১ মার্চ জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহামন নিজামী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দানের জামায়াতের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।[২১২] নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রত্যাশিত ফলাফল না করায় তারা ক্ষুব্ধ ছিল। 'সুক্ষ কারচুপির' অজুহাত তুলে প্রথমদিকে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশী বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তাই আওয়ামী লীগ পরবর্তিতে সাংবিধানিক বিতর্কের অবতারনা করে। সরকার গঠন প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার

জন্য আওয়ামী লীগ সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সরকারের জন্য সংবিধান সংশোধন করে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানায়। কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সার্বভৌম সংসদই ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে বলে দাবি জানানো হয়।[২১৩]

সংসদে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী অন্যতম বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিও কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠেন। একক ভাবে বিএনপিকে সরকার গঠনে আহ্বান জানাতে তিনি ধীরনীতি অনুসরণ করেন। জামায়াতের ১৮ এমপির সমর্থন পাওয়ার পর সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরও সরকার গঠন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। সর্বদলীয় সরকার গঠন করার জন্য তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। সাংবিধানিক জটিলতা নিরসন পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদেরও সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের পক্ষে মৌন সম্মতি ছিল। এরই অংশ হিসেবে তিনি সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে ১৮ মার্চ ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক আহবান করেন। মূলতঃ সর্বদলীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যই রাষ্ট্রপতি বৈঠক ডেকেছিলেন। কিন্তু বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলের অনেকটা ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির কারণে তাঁর সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিএনপি নেতৃত্ব প্রেসিডেন্টের উপর্যুক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা পায় এবং এ নিয়ে কোন আলোচনায় অংশ নিয়ে নতুন বিতর্কে নিজেদেরকে জড়াতে চায়নি। বিএনপি নেতৃবৃন্দ জনগণের রায়কে সম্মান জানিয়ে তাদের মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২১৪]

পরিশেষে সকল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ জামায়াতের সমর্থন প্রাপ্ত একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী বিএনপিকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান এবং ১৯ মার্চ বিএনপির চেয়ারপার্সন এবং সংসদীয় দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। বিশ মার্চ ১০ মন্ত্রী ও ২০ প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মন্ত্রীসভা গঠন করে বিএনপি সরকার গঠন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের এক সভায় মন্ত্রীসভা গঠন অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষতা ও ওয়াদা ভঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[২১৫] সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশ এক সাংবিধানিক ও জটিল রাজনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। দীর্ঘদিন পর দেশ আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পথ চলা শুরু করে। মূলত: সরকার গঠনে বিএনপিকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সমর্থনের ফলে দেশ তখন গভীর সংকট থেকে মুক্তি পায়। 'ব্যালেন্স অভ পাওয়ার' হিসেবে জামায়াত সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিল বলে সচেতন নাগরিকগণ তখন জামায়তের প্রশংসা করেছেন। অবশ্য সরকারে জামায়াত অংশগ্রহণ না করলেও কয়েকটি অলিখিত শর্তে জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন করেছিল। ও গুলোর মধ্যে ছিল সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংখ্যানুপাতে আসন প্রদান, উপনির্বাচনে এরশাদের ছেড়ে দেয়া ২টি আসনে বিএনপি প্রার্থী না দেয়া এবং অধ্যাপক গোলাম

আযমের নাগরিকত্ব প্রদান। তবে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয় শুধু সংসদে ২টি মহিলা আসন প্রদান ছাড়া আর কোন শর্ত বিএনপি পূরণ করেনি।[২১৬]

আওয়ামী লীগও সরকার গঠনে জামায়াতের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। দলের সভানেত্রীর পক্ষে আমির হোসেন আমু জামায়তের তৎকালীন ঢাকা মহানগরী আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের নিকট প্রস্তাব করেন 'আপনারা আমাদেরকে সরকার গঠনে সমর্থন দিলে তিন জন কেবিনেট মন্ত্রী এবং দু'জন প্রতিমন্ত্রী ও ৭ জন মহিলা এমপি দেব।[২১৭] কিন্তু জামায়াত সার্বিক পারিস্থিতি বিবেচনা করে বি এন পি কে সরকার গঠনে সমর্থন প্রদান করে।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদানের জন্য লাহোর গমন করেন। বৈঠক শেষে ৩রা ডিসেম্বর করাচী থেকে বিমানযোগে ঢাকায় রওয়ানা হলেও ভারতীয় বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণে তেজগাঁও বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিমানটি নামতে না পেরে পাকিস্তান ফিরে যায়। তনি আর দেশে ফিরতে পারেননি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৩ সালে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অধ্যাপক গোলাম আযমসহ ৩৯ জন ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করে। ১৯৭৬ সালে তদানীন্তন সরকার অযোগ্য ঘোষিত নাগরিকদের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিলে অধ্যাপক গোলাম আযমও লন্ডন হতে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট দরখাস্ত দেন।[২১৮] পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নিকট পুনরায় আবেদন করেও কোন সাড়া পাননি তিনি। অবশেষে বৃদ্ধা অসুস্থ মায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে অধ্যাপক আযমকে ১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই তিন মাসের ভিজিট ভিসায় বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে সরকার তাঁকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিলে তিনি লিখিতভাবে জানান দেশত্যাগ তার পক্ষে সম্ভব নয়।[২১৯] ১৯৭৮ সালের ৮ নভেম্বর সরকারের কাছে তিনি পাকিস্তানী পাসপোর্ট সারেন্ডার করেন এবং ১৯৮১ সালের ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।[২২০] ১৯৮৬ সালে একবার সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে কীভাবে আছেন তা জানতে চেয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমকে শোকজ নোটিশ ইস্যু করা হলে নোটিশের জবাবে তিনি বলেন "জন্মসূত্রে এদেশের নাগরিক হিসেবে তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন"[২২১]

১৯৮০ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে পাঁচবার জাতীয় সংসদে অধ্যাপক গোলাম আযম ইস্যু উত্থাপিত হলে প্রতিবারই দীর্ঘসময় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[২২২] ১৯৭৮ সালে দেশে ফেরার পর গোলাম আযম জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন এবং সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে প্রকাশ্যে তিনি আমীর হিসেবে ঘোষিত ছিলেন না। ১৯৯১ সালের ২৯ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর আমীর

হিসেবে প্রকাশ্যে গোলাম আযম এর নাম ঘোষণার পর বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর বিচারের দাবিতে আন্দোলনের সূচনা হয়।[২২৩] জামায়াত ১৯৮০ সাল থেকেই অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত জামায়াতের কর্ম পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে মাওলানা আবদুল জব্বারকে সভাপতি এবং জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে সেক্রেটারী করে নাগরিকত্ব পুনর্বহাল কমিটি গঠন করা হয়।[২২৪] ১৯৮১ সালের ৬ মার্চ অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে প্রেসিডেন্টের নিকট মিছিল সহকারে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়- নাগরিকত্ব তাঁর জন্মগত অধিকার, মৌলিক ও মানবিক অধিকার। আবেদন জানানোর পর দীর্ঘদিন তাঁকে নাগরিকত্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা একটি সুস্পষ্ট জুলুম এবং অন্যায়। স্মারকলিপিতে এই জুলুমের অবসান ঘটিয়ে অনতিবিলম্বে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিক অধিকার পুনর্বহালের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট জোর দাবি জানানো হয়। নাগরিকত্ব পুনর্বহাল সংগ্রাম কমিটি সভা,সমাবেশ, মিছিল, প্রস্তাব গ্রহণ, পোষ্টারের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। এ জন্য কমিটির আহ্বানে ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে দেশব্যাপী দাবি দিবসও পালন করা হয়।[২২৫] প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ভাষায় স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানী নাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর আমির নির্বাচিত করায় নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। ২রা জানুয়ারী '৯২ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের এক জরুরি সভায় অধ্যাপক গোলাম আযমকে আমীর করার ব্যাপরে সরকারের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করা হয়।[২২৬] অধ্যাপক গোলাম আযমের আমীর নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ মিছিল বের করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (আহাদ-আজিজ)-এর ঢাকা ইউনিট। ৩১ ডিসেম্বর '৯১ অনুষ্ঠিত সে মিছিলে অধ্যাপক গোলাম আযমের কুশপুত্তলিকা দাহ এবং তাঁর বহিষ্কার দাবি করা হয়।[২২৭]

১৯৯২-এর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্নেল (অব:) নুরুজ্জামানের উদ্যোগে তাঁর বাসায় কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০ জানুয়ারী শহীদ রুমীর মা জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়।[২২৮] ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ২৬ মার্চ '৯২ প্রকাশ্যে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের ঘোষণা দেয়। এ লক্ষ্যে তারা আওয়ামী লীগ, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, পাঁচ দলের নেতৃবৃন্দের সাথে ২৭ জানুয়ারী এক বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্মূল কমিটির কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি একত্রিত হয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারী "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি" (সমন্বয় কমিটি) নামকরণ করে। সমন্বয় কমিটির একটি স্টীয়ারিং কমিটি ছিল। সদস্যগণ ছিলেন সর্বজনাব আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ হাসান ইমাম, কাজী আরেফ আহমেদ, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আবদুল আহাদ চৌধুরী ও অধ্যাপক

আবদুল মান্নান চৌধুরী।[২২৯] ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি তাদের প্রচারপত্রে যে ১০টি কারণে ২৬ মার্চ গণআদালতে বিচারের ঘোষণা দেয়-তন্মধ্যে "বিদেশী নাগরিক হয়ে বাংলাদেশে বেআইনীভাবে বসবাস করে এদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার" অভিযোগ আনা হয়।[২৩০] সমন্বয় কমিটি ২৬ মার্চ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে 'গণআদালতে'র কর্মসূচী ঘোষণা করে। "গণআদালত" গঠন সম্পর্কে সুপ্রীমকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীদের অনেকে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক 'সমন্বয় কমিটি'র প্রস্তাবিত 'গণআদালতে'র সমালোচনা করে বলেন, ২৬ মার্চ 'গণআদালতে' গোলাম আযমের বিচারের কোন আইনগত ভিত্তি নেই। 'গণআদালত' গঠন মানে হচ্ছে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া। এটি গণতন্ত্র, ও সভ্য আচরণ বিরোধী কাজ। বর্ষীয়াণ বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী 'গণআদালতে'র আইনগত ভিত্তি এবং কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, "বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত আইন আদালতের মাধ্যমে এই বিচার কেন হতে পারবেনা তা আমার বোধগম্য নয়।"[২৩১] গণআদালতে'র কার্যক্রমকে অবৈধ ঘোষণা করার পাশাপাশি সরকার ২৩ মার্চ অধ্যাপক গোলাম আযমকে শো-কজ নোটিশ ইস্যু করেন। ভোর রাতে "শো-কজ" নোটিশ পাঠানো হয় অধ্যাপক গোলাম আযমের নিকট। শো-কজ নোটিশে বলা হয়- অধ্যাপক গোলাম আযম একজন নিবন্ধনকৃত বিদেশী।

১৮ এপ্রিল, ১৯৭৩ তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক থাকার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কাজ করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হয়েছেন। ২৪ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেন তাঁকে বাংলাদেশ হতে বহিষ্কার করা হবে না এবং আইনগত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা।[২৩২] ২৪ মার্চ অধ্যাপক গোলাম আযম শো-কজ নোটিশের জবাব দেন। জবাবে তিনি নোটিশে প্রদত্ত সকল অভিযোগ মিথ্যে, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বর্ণনা করেন। সরকার তার পরিকল্পনা মোতাবেক ২৪ মার্চ '৯১ গভীর রাতে অধ্যাপক গোলাম আযমকে তাঁর পৈতৃক বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। অপরদিকে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়ার অভিযোগে জাহানারা ইমাম ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্যদের ওপরও নোটিশ জারী করে। গোলাম আযমের গ্রেফতার, গণআদালতের কার্যক্রমকে অবৈধ ঘোষণা এবং সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দকে "শো-কজ" নোটিশ ইস্যু করার পরও ২৬ মার্চ "গণআদালত" অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মার্চ গণআদালতের চেয়ারপার্সন জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। পরদিন সেই ২৪ জন সুপ্রীমকোর্টে জামিনের আবেদন করলে আদালত তাদের গ্রেফতার না করার নির্দেশ দেয়।[২৩৩] অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারের পর ২৫শে মার্চ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশী

নাগরিক এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ বাংলাদেশের ভূ-সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক গোলাম আযম যেহেতু বাংলাদেশের জন্মগত নাগরিক তাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে। এটা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়। আব্বাস আলী খান তাঁর লিখিত বক্তব্যে সরকারি পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যারা ঘোষণা দিয়ে আইন হাতে তুলে নিলো এবং দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাল এবং এখনো যারা তৎপর, তাদের ব্যাপারে সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন। যারা সংবিধান লংঘন করলো, আদালত অবমাননা করলো, প্রকারান্তরে সরকার তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।[২৩৪] গোলাম আযমের গ্রেফতারের পর জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক এবং আইনগতভাবে অগ্রসর হয়। ২৪ মার্চ গভীর রাতে গোলাম আযম এর গ্রেফতারের পর রাজধানীসহ সারাদেশে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ মার্চ জামায়াতের মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শূরার বৈঠকে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার প্রদানের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১। ঢাকায় মহাসমাবেশ করা।

২। বৃহত্তর জেলাসমূহে গণসমাবেশ।

৩। ব্যাপক পোষ্টারিং করা।

৪। বিভিন্ন দেশ থেকে সরকারের নিকট তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

শূরার এই অধিবেশনে দু'টো প্রস্তাব সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়। ১. অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং তাঁর আশু মুক্তি দাবি। ২. তথাকথিত গণআদালতীদের অপতৎপরতার নিন্দা জ্ঞাপন, তাদের অপপ্রচার বন্ধ এবং উদ্যোক্তাদের আইনগত শাস্তি দাবি।[২৩৫] জামায়াত সাংবাদিক সম্মেলন, জাতীয় সংসদে বক্তব্য প্রদান, ঢাকাসহ সারাদেশে বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠান, স্পীকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ, পেশাজীবীদের বিবৃতি প্রকাশসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুর্নবহালের আন্দোলন বলিষ্ঠতার সাথে অব্যাহত রাখে। জামায়াত বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে ইসলামপন্থিদের ঐকবদ্ধ রাখার কৌশল গ্রহণ করে। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির (ঘাদানিক) কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতীবের উদ্যোগে ইসলামী শক্তির একটি বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালের ২০ মার্চ। দেশবরেণ্য বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের আহ্বানে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, আজ যারা উৎখাত ও নির্মূলের কথা বলছে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে উৎখাত করা

তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা এদেশ থেকে টুপিওয়ালা, দাঁড়িওয়ালা তথা ইসলামের অনুসারীদের উৎখাতের তৎপরতা চালাচ্ছে। বক্তারা আরো বলেন, ইসলামকে পদদলিত করার জন্য আজ মৌলবাদ উৎখাতের কথা বলা হচ্ছে। আর কয়েকদিন পর বলবে, মৌলবাদীদের ধর। বিদেশী শক্তি এই তৎপরতার ইন্ধন যোগাচ্ছে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখেন, শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার প্রিন্সিপ্যাল মুফতি ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা কারী ওবায়দুল্লাহ, বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহ্‌র যুগ্ম মহাসম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন খানসহ নেতৃস্থানীয় আলেমগণ। ইসলামী শক্তির এই মহাসম্মেলন জামায়াতের নামে না হলেও জামায়াতের প্রত্যেক্ষ সহযোগিতা ছিল। সমাবেশের বক্তব্য প্রকারান্তরে জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মসূচীর পক্ষে বিরাট ভূমিকা রাখে। ইসলামী দলগুলোর ঐক্য যে বিরাট শক্তিতে পরিণত হতে পারে মাত্র ২দিনের প্রচারণায় বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হল।[২৩৬]

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিপক্ষ হিসেবে তখন ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি, যুবকমান্ডসহ কয়েকটি সংগঠনের জন্ম হয়। তারা সমন্বয় কমিটির পাল্টা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। সংসদে গোলাম আযম ইস্যু নিয়ে দীর্ঘসময় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ এপ্রিল '৯২ সংবিধানে বর্ণিত আইন অনুযায়ী বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে বলে সংসদে একটি প্রস্তাব পাস হয়। গণআদালতে বিচারের রায় বাস্তবায়নের জন্য সমন্বয় কমিটি সারাদেশে গণস্বাক্ষর কর্মসূচী পালন করে। এ দাবিতে তারা ১৮ মে, ২১ জুন দেশব্যাপী হরতালও পালন করে। ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি ও যুবকমান্ডের আহ্বানে নির্মূল কমিটির তৎপরতার বিরুদ্ধে ২০ জুন ঢাকায় হরতাল পালন করা হয়।[২৩৭] গ্রেফতারের পর জামায়াত নেতা গোলাম আযমের পক্ষ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে দু'টো মামলা দায়ের করে। একটি রীট পিটিশন করা হয় নাগরিকত্ব বাতিল আদেশ অবৈধ ঘোষণার প্রার্থনা করে এবং অপরটি তাঁর আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণার আবেদন জানিয়ে। নাগরিকত্ব মামলার রায় ১২ আগস্ট (১৯৯২) ঘোষণা করা হয়। বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার এবং বিচারপতি বদরুল আহসান চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের বিভক্ত রায়ের কারণে তৃতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হন জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরী। ২২ এপ্রিল (১৯৯৩) বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী তাঁর রায়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের আপিল বিভাগে আবেদন জানানোর ফলে সুপ্রীমকোর্ট-এর অ্যাপিলেট বেঞ্চে নাগরিকত্ব মামলার চূড়ান্ত রায় নির্ধারিত হয়। বিচারপতি মোঃ হাবীবুর রহমান, বিচারপতি এটি এম আফজাল, বিচারপতি মোস্তফা কামাল এবং বিচারপতি লতিফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে ১৯৯৩ সালের ৪ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে বেঞ্চের সীনিয়র বিচারপতি

মো: হাবীবুর রহমান সরকারের আপীল বাতিল করে দিয়ে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুর্নবহাল সংক্রান্ত হাইকোর্ট রায় নিশ্চিত করেন।[২৩৮]

আটকাদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার রায় ১৩ জুলাই (১৯৯৩) ঘোষণা করা হয়। হাইকোর্ট এর রায়ে অধ্যাপক গোলাম আযমকে আটক রাখা বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। আদালতের রায়ের পর ১৫ জুলাই তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।[২৩৯] রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে জেল থেকে মুক্তি লাভ এবং পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক অধ্যাপক গোলাম আযম এর "বাংলাদেশের নাগরিক" হিসেবে স্বীকৃতি জামায়াতে ইসলামীর জন্য বিরাট ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। নাগরিকত্ব বহালের আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীর নেতা কর্মীদের তৎপরতায় গতি সঞ্চার করে। জামায়াত কর্মীদের মধ্যে বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে টিকে থাকার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের মধ্যে সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। এ আন্দোলনের ফলে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দলগুলোর পরস্পর কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছে। ইস্যুভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করায় ইসলাম তৃতীয় বিকল্প শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তি এবং নাগরিকত্ব পুনর্বহাল আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জামায়াতের অনেক নেতাকর্মীকে নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। ঘাদানিক এবং জামায়াতের মধ্যকার দেশব্যাপী সংঘর্ষে হতাহত হয়েছে অগণিত নেতাকর্মী। শুধু ১৯৯২ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৮ জুলাই সময়কালে জামায়াতের ১০জন নেতাকর্মী শহীদ হন।[২৪০] ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যক্রম মূলত: অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের আন্দোলনকে ঘিরে পরিচালিত হয়। সরকারের একাংশের উদ্যোগে ঘাদানিক গঠিত হয়েছে মর্মে জামায়াতের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কারণে বিএনপি, জামায়াতের সম্পর্ক শিথিল হতে শুরু করে।[২৪১] পরবর্তী কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের যুগপৎ ও ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি এ সম্পর্ককে শূন্যের কোটায় নিয়ে যায়।

সাংবিধানিক তত্ত্ববধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও জামায়াত

সাংবিধানিক আইনে (Constitutional Law) তত্ত্ববধায়ক সরকারের কোন উল্লেখ না থাকলেও বিভিন্ন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে উইনসটন চার্চিল যে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন স্যার আইভর জেনিংস তাকে তত্ত্ববধায়ক সরকার বলে বর্ণনা করেছেন।[২৪২] ভারতের সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারর কোন ব্যবস্থা (Provision) না থাকলেও মাঝে মাঝে ভারতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন ১৯৭৯ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরন সিং পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং একই সাথে পরবর্তী মন্ত্রীসভা গঠন পর্যন্ত

কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। অনেকে পদত্যাগ পরবর্তী সময়কার চরন সিং এর সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২৪৩] বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর পতনের পর প্রথমবারের মত সর্বদলীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এটি ছিল এযাবতকালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ভবিষ্যতে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' শিরোনামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল বিলটি সংসদে আলোচনার অনুমতি প্রদান করেনি। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' সম্বলিত ২টি পৃথক বিল সংসদে আলোচনার জন্য পার্লামেন্ট সচিবালয়ে জমা দেয়া হয়[২৪৪] কিন্তু উক্ত বিল দু'টিও ক্ষমতাসীন দল আলোচনা করার সুযোগ দেয়নি। বিরোধী দল তাদের প্রস্তাবসমূহের আলোকে সংবিধান সংশোধনক্রমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য সরকারকে ১৯৯৪ সালের ২৬শে জুন সময়সীমা বেঁধে দেয়। সরকার নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দাবি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় বিরোধীদল ১৯৯৪ সালের ৩রা জুলাই রাজপথে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক সংকট গভীর হলে তা সমাধানের জন্য কমনওয়েলথ সেক্রেটারী অ্যামিকা আনিয়াকু বাংলাদেশ সফর করেন। কিন্তু তিনি বেশি দুর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁর চলে যাওয়ার পর তাঁর বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান (অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল) বাংলাদেশে আসেন। একটি রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হবার জন্য তিনি ১৯৯৫ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে প্রায় ৪০ দিন প্রচেষ্টা চালান। তিনি রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটির সারমর্ম ছিল বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই থাকবেন এবং তিনি একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে দেবেন যাতে সরকার ও বিরোধীদল থেকে ৫ জন করে সদস্য থাকবেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে কোনপ্রকার সফলতা ছাড়াই তিনি ২০শে নভেম্বর '৯৫ বাংলাদেশ ত্যাগ করেন।[২৪৫] রাজনৈতিক সংকটের এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। ব্যাপক বিশৃংখলা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মধ্যে ৬ষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা ছিল আরো ভয়াবহ। বিরোধীদলের একটানা হরতাল, অবরোধ ও ধর্মঘটের ফলে বাধ্য হয়ে বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য সংবিধান সংশোধনে অগ্রসর হয়। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ২৫ মার্চ রাতব্যাপী সংসদ অধিবেশন অব্যাহত রেখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সংক্রান্ত

১৩তম সংবিধান সংশোধনী পাস করা হয়। ২৮ মার্চ সংবিধান সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করেন এবং সেদিনই গেজেট প্রকাশিত হয়। ৩০ মার্চ, ১৯৯৬ ষষ্ঠ সংসদ বিলুপ্ত করা হয় এবং বিএনপি সরকার পদত্যাগের ঘোষণা প্রদান করে। নিম্নে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা করা হলো:

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবার কথা বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম ২২ বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় বাংলাদেশ সামরিক শাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। ১৯৮২ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নয় বছরের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশ লাভ করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'কেয়ারটেকার' বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যা দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।[২৪৬] নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯০ সালের শেষের দিকে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সংবিধানে অন্তর্ভূক্তি লাভ করে ১৯৯৬ সালে।

এরশাদ সরকারের পতনের প্রথম বার্ষিকীতে ঢাকায় ১৯৯১ সালের ৬ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক জনসভায় জামায়াত নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতে নির্বাচনগুলো কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি জানান। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জামায়াতের মজলিসে শূরার এক প্রস্তাবে জামায়াত কর্তৃক জমাকৃত 'কেয়ারটেকার বিল' এ সমর্থন দেয়ার জন্য সরকার এবং বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[২৪৭] ১৯৯৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী জামায়াতের সংসদীয় দলের এক সভায় ভবিষ্যতের সকল নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে করার জন্য চলতি সংসদে বিল পেশের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানায়। একই সালের ৪ মে জামায়াতের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলনেতা মতিউর রহমান নিজামী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ঐকবদ্ধ। বিএনপি সংসদকে পাশ কাটিয়ে জাতিকে একটি সংকটে ঠেলে দিচ্ছে এবং জনগণের কেয়ারটেকার সরকারের দাবিকে অবজ্ঞা করছে।[২৪৮] ১৭ জুলাই, ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত জামায়াতের মজলিসে শূরায় বলা হয়, কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি গণদাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অধিবেশনে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধানে ব্যবস্থা (Provision) করার দাবি জানানো হয়।

২০ নভেম্বর, ১৯৯৪ জামায়াত কেয়ারটেকার সরকার দিবস পালন করে। সে উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, কেয়ারটেকার সরকারের দাবি গ্রহণের বিরোধীতা করে বিএনপি তার অস্তিত্বকে প্রশ্নবোধক করে তুলেছে। বিএনপি 'কেয়ারটেকার সরকারের' সুবিধাভোগী। নেতৃবৃন্দ কেয়ারটেকার সরকারের দাবিকে

অবজ্ঞা করে দেশকে মারাত্মক সংকটের দিকে ধাবিত না করার জন্য সরকারের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিরোধী দলের সাথে সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেয়ারটেকার সরকার ইস্যুতে সরকারি দলের সাথে জামায়াতের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৪ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সংলাপ সফল না হওয়ায় বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে ঢাকা অবরোধসহ অন্যান্য কর্মসূচী পালন করে। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিরোধী দল তাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়। এমন এক অবস্থায় ৬ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত ইসলামীর উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত সমাবেশে তিন দলের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি মানা না হলে তারা সংসদ থেকে পদত্যাগ করবেন। ৭ ডিসেম্বর তিন দলের ডাকে কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সরকার ও বিরোধী দল পুনরায় কেয়ারটেকার সরকার প্রশ্নে একটি সমঝোতায় উপনীত হবার চেষ্টা চালায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিরোধী দল ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। জামায়াত, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির ১৪৭ জন সদস্য স্পীকারের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন।

সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর জামায়াত এবং অন্যান্য বিরোধী দল তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। কেয়ারটেকার সরকার দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিরোধী দলের আহবানে ১৯৯৫ সালের ২, ৩ ও ৪ জানুয়ারী হরতাল পালিত হয়।[২৪৯] দেশকে রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। ১৯৯৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী জামায়াতের জেলা আমীরদের এক সম্মেলনে তিনি দেশকে সংঘাত ও সংকটের দিকে ঠেলে না দিয়ে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই অকার্যকর সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেশ বাঁচানোর জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।[২৫০] ২৮ মার্চ, ১৯৯৫ জামায়াত, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির আহবানে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। অবরোধ শেষে তিন দলের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচি ঘোষণা করেন সংগঠনের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল ঃ

১-৭ এপ্রিল– গণসংযোগ সপ্তাহ, বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মিছিল;

৮ এপ্রিল– জেলা সদরে খাদ্য ও সারের দাবিতে সমাবেশ;

৯ এপ্রিল– বিভাগীয় সদরে হরতাল;

১০ এপ্রিল– সারাদেশে হরতাল;

১৬ এপ্রিল– ঢাকায় কৃষক-শ্রমিক সমাবেশ।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতীয় পার্টির মিজানুর রহমান চৌধুরীও একই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম চাপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও বরিশালের বিভিন্ন জনসভায় উপস্থিত থেকে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।[২৫১] বিরোধীদলবিহীন অকার্যকর সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টির আহবানে ১২ ও ১৩ মার্চ, ১৯৯৫ সারাদেশে একটানা ৪৮ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়। স্বত:স্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে পালিত সে হরতাল শেষে ১৩ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর। কর্মসূচিগুলো ছিল :

১৬ মার্চ : খাদ্য ও সারের দাবিতে থানা প্রশাসন ঘেরাও, ঢাকায় খাদ্য ভবন ঘেরাও।

১৯ মার্চ : খাদ্য, সার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য কমানোর দাবিতে ঢাকায় জেলা প্রশাসকের অফিস ঘেরাও।

২৩ মার্চ : সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে সারাদেশে সড়ক, রেলপথ অবরোধ।

২৪-২৭ মার্চ : ঢাকা অবরোধ সফল করার লক্ষ্যে ব্যাপক সভা সমাবেশ ও গণসংযোগ।

২৮ মার্চ : ঢাকা অবরোধ।

কর্মসূচি ঘোষণা কালে সাংবাদিক সম্মেলন অধ্যাপক গোলাম আযম কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরুর প্রেক্ষাপট, সরকারি দলের নেতিবাচক মনোভাব এবং বিরোধী দলের হরতাল- অবরোধ কর্মসূচির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বিশদ বক্তব্য রাখেন।

১৬ এপ্রিল, ১৯৯৫ ঢাকায় কৃষক শ্রমিক সমাবেশ থেকে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। কর্মসূচি ছিলঃ সংবিধান লংঘন করে অন্যায়ভাবে একদলীয় সংসদ অধিবেশন চালানোর প্রতিবাদে ২৪ এপ্রিল সকাল ১০ টায় পদত্যাগকারী সকল সংসদ সদস্যের সম্মিলিতভাবে স্পীকারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন এবং বিকেলে সরকারের পদত্যাগ, পঙ্গু সংসদ বাতিল এবং কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে সারাদেশে সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠান হবে। জামায়াত সদস্যগণ তাদের সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে ২৪ এপ্রিল বিকাল ৩ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত স্পীকারের চেম্বারের সামনে করিডরে অবস্থান গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি ছিল প্রধানত: ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগপত্র প্রত্যাখ্যানের প্রতিবাদ স্বরূপ। অকার্যকর সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে মার্চ–এপ্রিল মাসে কক্সবাজার, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বরিশাল,

কুমিল্লা, লক্ষীপুর, জয়পুর হাট, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও জেলায় বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এ সকল জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।[২৫২] জামায়াতসহ বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১ মাস পূর্বে পদত্যাগ করার ঘোষণা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে ১২ জুন জামায়াতের মজলিসে শূরার অধিবেশনে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, নির্বাচনের ১ মাস পূর্বে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়ে কার্যত: তিনিও কেয়ারটেকার সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কাশুরু, তাঁর সরকারের অনুপস্থিতিতে দেশতো কোন সরকার চালাবে এবং নির্বাচন সেই সরকারের অধীনেই হবে। সেই কেয়ারটেকার সরকারের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে তার রূপরেখা নিয়ে আলোচনায় বসার জন্য বিরোধী দলের নিকট প্রস্তাব দিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান। বছরের শেষ দিকে কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলন আরো গতি লাভ করে। জামায়াতসহ বিরোধী দলের উদ্যোগে সেপ্টেম্বর মাসে যথাক্রমে ২ দিন (২ ও ৩ সেপ্টেম্বর) ও ৩ দিনের (১৬-১৮ সেপ্টেম্বর) লাগাতর হরতাল পালিত হয়।

৮ অক্টোবর বিরোধীদল আহুত বিভাগীয় শহরে ৩২ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়। কেয়ারটেকার আন্দোলনের কর্মসূচি আরো কঠোরতর হতে থাকে। আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ বিরোধী দলগুলো প্রথম বারের মত দেশে একটানা ৯৬ ঘন্টার হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হয় এ কর্মসূচি। হরতাল পালন উপলক্ষে ঢাকাসহ সারাদেশে জামায়াত, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য বিরোধী দল বিক্ষোভ মিছিল করে।[২৫৩] আন্দোলনের এ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলের দাবির মুখে ১৫ অক্টোবর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য প্রদান করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে খালেদা জিয়া বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে ১১ সদস্যের। ৫ জন থাকবেন সরকারি দলের ও ৫ জন থাকবেন বিরোধী দলের। প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করবেন বেগম খালেদা জিয়া। বিরোধী দলের ৫ জনকে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে হবে।[২৫৪] টানা ৪ দিনের হরতালের ২য় দিনে ঢাকায় এক জনসমাবেশে জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে আন্দোলনের আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে। তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে টানা আরো ২ দিন হরতাল পালনের আহবান জানান। জামায়াতের মহাসচিব মাওলানা নিজামী টানা ৯৬ ঘন্টা হরতালের পটভূমি উল্লেখ করে বলেন, আমরা বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ বর্জন করলাম, সরকার কোন ব্যবস্থা নিলনা। বর্জনকারীদের দাবি মেনে তাদের সংসদে ফিরিয়ে আনার চেষ্ট করলো না। বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর এই সংসদ অবৈধ হয়ে গেছে। এই সংসদ এখন মৃত। কাজেই সরকারের উচিত ছিল সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয় নির্বাচন করা। কিন্তু আবেগ অনুভূতিহীণ সরকার বলে তারা কিছু করলো না বরং অগণতান্ত্রিক আচশুরু শুরু করলো। মাওলানা নিজামী বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে

আন্দোলন করছি। প্রথমে অর্ধদিবস, তারপর ২৪, ৩২, ৪৮ এবং ৭২ ঘন্টা হরতালের পর এবার ৯৬ ঘন্টার হরতাল ডাকা হয়েছে।[২৫৫] টানা ৪ দিন ৪ রাত হরতাল পালনের পর আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ২১ অক্টোবর ১৯৯৫ ঢাকায় পৃথক পৃথক জনসভার আয়োজন করে। জনসভাগুলো থেকে কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনের আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জামায়াতের জনসভায় মহাসচিব মাওলানা নিজামী বলেন, আমরা জাতীয় সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল উত্থাপন করেছিলাম। এ ব্যাপারে আলোচনা করার সুযোগই দেয়া হয়নি। যদি এ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে জাতীয় সংসদ বর্জনের ঘটনা হয়তো ঘটতো না। জামায়াতে ইসলামীর মহাসচিব ২৮ অক্টোবর থেকে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করার জন্য দলীয় নেতা ও কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।[২৫৬] জামায়াতের জনসভায় আন্দোলনের যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় তার মধ্যে ছিল :

২৮ অক্টোবর : থানায় থানায় সমাবেশ এবং টিএনও অফিসের সামনে বিক্ষোভ।

৩০ অক্টোবর : জেলা প্রশাসন ঘেরাও।

১-৫ নভেম্বর : ঢাকাসহ সকল মহানগরীর ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিক্ষোভ।

৬ নভেম্বর : সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ।

যদি ১০ নভেম্বরের মধ্যে দাবি আদায় না হয় তাহলে ১১ নভেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালনের ঘোষণা দেয়া হয়।

ওপরোক্ত কর্মসূচি পালনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে আলোচনার জন্য চিঠির মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানান।[২৫৭] চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত নেতৃবৃন্দের এক সভা ২৯ অক্টোবর আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ ছাড়াও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং জামায়াতের আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন।[২৫৮] বৈঠকে মত ব্যক্ত করা হয়- কী এজেন্ডার ভিত্তিতে আলোচনা হবে প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে সে কথা উল্লেখ ছিল না। তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেয়ার সম্মতি প্রধানমন্ত্রী জানালেই কেবল আলোচনা হতে পারে বলে বৈঠকে মত ব্যক্ত করা হয়। ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর চিঠির জবাব দেন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে চিঠি চালাচালি এবং বিভিন্ন পক্ষের 'সমঝোতা উদ্যোগ' অব্যাহত থাকলেও বিরোধী দলের ঘোষিত কর্মসূচি পালন অব্যাহত থাকে।

বিরোধী দল ঘোষিত পরিবর্তিত সময়সূচী অনুযায়ী সারাদেশে ৬ দিনের হরতাল শুরু হয় ১১ নভেম্বর থেকে।[২৫৯] হরতাল পালনের প্রস্তুতি হিসেবে ১০ নভেম্বর জামায়াত, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ (রব), জাগপা, ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল করে।[২৬০] 'কেয়ারটেকার সরকার' দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিরোধী দলের ৬ দিনের হরতাল সংঘর্ষ ও গ্রেফতারের মধ্যে সমাপ্ত হয়। বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব না দিয়ে সরকারি দল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে নজর দেয়। প্রয়োজনে বিএনপি একা নির্বাচন করবে বলে প্রধানমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৬১] উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ২১ নভেম্বর বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানান। আওয়ামী লীগ, জামায়াত এবং জাতীয় পার্টি প্রধানমন্ত্রীর এ আহবান প্রত্যাখ্যান করেন।[২৬২] ২২ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৪৫টি শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ১৫ ডিসেম্বর এ উপনির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। আন্দোলরত তিন বিরোধী দল উপনির্বাচনের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সালাম আজাদের বাসভবনে তিনি ছাড়াও তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ নাসিম, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, জাতীয় পার্টির ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জামায়াতে ইসলামীর আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মো. কামারুজ্জামান ও আবদুল কাদের মোল্লা উপস্থিত ছিলেন। তিন দলের বৈঠকে ঘোষিত তফসিল প্রত্যাখ্যান করে যে কোন মূল্যে তা প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।[২৬৩] বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার লিখিত পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস ২৪ নভেম্বর ৫ম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন।[২৬৪] নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের ১৮ জানুয়ারী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধাগুরু করে।

বিরোধী দল নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে ৯-১১ ডিসেম্বর ৭২ ঘন্টার হরতাল আহবান করে।[২৬৫] কেয়ারটেকার সরকারের দাবি না মেনে নির্বাচন ঘোষণা করে সরকার গণতন্ত্রকে হুমকির মুখোমুখি করেছে মর্মে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। বিরোধী দল সংসদ নির্বাচন প্রতিরোধের জন্য সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। অপরদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে পদত্যাগ করবেন না বলে বিরোধী দলকে হুমকি দেন। আন্দোলনরত প্রধান তিন বিরোধী দল ৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে গণমিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করে। জামায়াতের গণমিছিল পূর্ব সমাবেশে দলের মহাসচিব মাওলানা নিজামী বলেন, জনগণের দাবির মুখে নতি স্বীকার করেই সরকারকে উপনির্বাচন বাতিল এবং মেয়াদ পূর্তির আগে সংসদ ভেঙ্গে দিতে হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকারের দাবিও মানতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা সংবিধানে কোন বাধা নেই, খালেদা জিয়ার হঠকারিতাই বাধা।[২৬৬] ৯-১১ ডিসেম্বর জামায়াতের হরতাল পালনকালে আহত এক জামায়াত কর্মী নিহত হয়। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিষয়ে আলোচনার জন্য নির্বাচন কমিশনের আহুত বৈঠক বয়কট

করে আন্দোলনরত তিন প্রধান দল। কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনে জামায়াতের সক্রিয় ভূমিকা বিএনপি ভালোভাবে নেয়নি। তাই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনপির ছাত্রসংগঠনের সাথে ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৭ ডিসেম্বর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের হামলায় চার শিবির নেতা নিহত হন।[২৬৭] ১৮ ডিসেম্বর জামায়াত, আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির এক যৌথ সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করাতে প্রেসিডেন্টকে উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানানো হয়।[২৬৮] ৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন ও বাছাইয়ের দিন ৮ ও ৯ জানুয়ারী, ১৯৯৬ আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলো হরতাল পালন করে। ১০ জানুয়ারী বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেটের জনসভা থেকে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রতিহত করার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১৩-১৫ জানুয়ারী : সভা-সমাবেশ, গণসংযোগ।

১৬ জানুয়ারী : দেশব্যাপী সমাবেশ।

১৭ জানুয়ারী : সকাল সন্ধ্যা হরতাল।

১৮ জানুয়ারী : নির্বাচন কমিশনসহ সারাদেশে নির্বাচনী কার্যালয়সমূহ ঘেরাও।[২৬৯]

১৫ জানুয়ারী তিন দলের যৌথ সভাশেষে একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য নেতা-কর্মীদের সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকারের আহবান জানান হয়। নির্বাচন কমিশন তফসিল পরিবর্তন করে ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের পরিবর্তিত তারিখে ঘোষণা করলে জামায়াতসহ আন্দোলনরত বিরোধী দল নির্বাচন প্রতিরোধের জন্য আরো ৬ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম নিম্নোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[২৭০]

১০ ফেব্রুয়ারী : ঢাকায় সমাবেশ ও মিছিল।

১১ ফেব্রুয়ারী : দেশব্যাপী সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল।

১২ ফেব্রুয়ারী : পেশাজীবী সমাবেশ।

১৩ ফেব্রুয়ারী : রাজপথ, রেলপথ, নৌপথ অবরোধ।

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী : দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল।

অপরদিকে বিরোধী দলের দাবি ও আন্দোলনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে এগিয়ে যায়। এক সাংবাদিক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, নির্বাচনের পরই বিরোধী দলকে আলোচনার আহবান জানাবো। নির্বাচন প্রতিহত করার কর্মসূচি সফল করতে ঝিনাইদহের কোট চাঁদপুরে বোমা হামলায় এক শিবির কর্মী নিহত হয়।[২৭১] বিরোধী দলের ডাকে ১৫ ফেব্রুয়ারী অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। নির্বাচনের দিন ১% ভোটারও ভোট কেন্দ্রে যায়নি উল্লেখ করে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এই সরকারের ক্ষমাতায় থাকার সাংবিধানিক

বৈধতা নেই।[২৭২] নির্বাচনের পর ২৪ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারী ৩ দিনের অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করে বিরোধী দল। এ কর্মসূচী সফল করার জন্য আয়োজিত এক পেশাজীবী সমাবেশে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নিজামী দেশ বাঁচাতে প্রেসিডেন্টকে কেয়ারটেকার সরকারের ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানান।[২৭৩] অসহযোগ আন্দোলনের সময় সারাদেশ অচল হয়ে পড়ে। সরকার আন্দোলন দমন করার পন্থা হিসেবে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা শুরু করে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা তোফায়েল আহমদ, জামায়াতের প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা, জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মওদুদ আহমদসহ অনেক নেতা গ্রেফতার হন।

প্রথম দিনের অসহযোগ কর্মসূচি পালন শেষে ঢাকায় জামায়াতের এক সমাবেশে মাওলানা নিজামী প্রেসিডেন্টকে সাহসী ভূমিকা নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেশ ও জনগণকে বাঁচানোর আহবান জানান।[২৭৪] আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ২৯ ফেব্রুয়ারী বায়তুল মোকাররমের জনসভা থেকে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ৯ মার্চ '১৯৯৬ হতে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে ১৫ মের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান। জনাব নিজামী বলেন, বর্তমান সরকার পদত্যাগ করল প্রেসিডেন্ট ১৯৯১-এর মত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সভা করে সমঝোতার ভিত্তিতে কেয়ারটেকার সরকার গঠন করে ১৫ মের মধ্যে নির্বাচন দিতে পারেন। জামায়াত ঘোষিত কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১ মার্চ: গায়েবানা জানাজা

২ মার্চ: শোক মিছিল

৩-৮ মার্চ: দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ

৯ মার্চ হতে লাগাতার অসহযোগ[২৭৫]

বিরোধী দল কর্তৃক লাগাতার অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে সংকট নিরসনে তিন দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে :

১. দেশ ও জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত এই সরকার দৈনন্দিন সরকারি কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করবে; কোন নতুন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করার পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকবেন।

২. ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আমরা এ বিষয়ে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিল আনব। যথাশীঘ্র এই সংশোধনী বিল সংসদে পাস করানোর এবং সংবিধান অনুযায়ী গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. অত:পর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।[২৭৬]

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী খোলামনে উক্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং আহ্বান আওয়ামী লীগ, জামায়াত এবং জাতীয় পার্টি যৌথভাবে আলোচনা শেষে প্রত্যাখ্যান করে। আন্দোলনরত প্রধান তিন দল জামায়াত, আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা থেকে বলা হয়– বিরোধী দল আলোচনার পক্ষে তবে তা হতে হবে প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে। অবৈধ খালেদা জিয়ার সরকারের সাথে কোন আলোচনা হবে না।[২৭৭] যৌথ সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, আমির হোসেন আমু, জামায়াতের আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মো. কামারুজ্জামান এবং জাতীয় পার্টির কাজী জাফর আহমদ ও মনিরুল হক চৌধুরী। বিরোধী দলের ঐকবদ্ধ প্রত্যাখ্যান এবং লাগাতার অসহযোগ কর্মসূচীর মুখে বাধ্য হয়ে বিএনপিও প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে আলোচনায় একমত ঘোষণা করে।[২৭৮] লাগাতার অসহযোগ কর্মসূচী শুরুর প্রাককালে জামায়াতের এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ৩১ মার্চের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

অসহযোগ কর্মসূচীর ২য় দিনে ১০ মার্চ প্রেসিডেন্টের সাথে আন্দোলনরত বিরোধী দলের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকের সময় তিন দলের অভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব উত্থাপন করে।[২৭৯] প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যগণ হচ্ছেন: সর্বজনাব মাওলানা আবদুস সোবহান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মো. কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা, মাষ্টার শফিকুল্লাহ, অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম ও এটিএম. আজহারুল ইসলাম। দাবিসমূহ ছিল: ১৫ ফেব্রুয়ারীর জালিয়াতির নির্বাচন বাতিল, পুন:নির্বাচন ও গণহত্যা বন্ধ করা, অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগ, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও শপথ অনুষ্ঠান, মে মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা, নিহত-আহত নেতা-কর্মীদের ক্ষতিপূরণ, হত্যাকান্ডের তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান।[২৮০] বিএনপি প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও মে মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবির সাথে একমত হলেও নির্বাচন ও সংসদ বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানায়।[২৮১] প্রেসিডেন্টের সাথে বিরোধী দলের আলোচনা এবং লাগাতার অসহযোগের মধ্যে ১৯ মার্চ জাতীয় সংসদের

অধিবেশন আহবানের ঘোষণা করা হলে বিরোধী দল ১৯ মার্চকে 'কালো দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে সংসদ ঘেরাও কর্মসূচি দেয়। বিএনপি ১৯ মার্চ নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে। ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই বিএনপি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায় সরকারের অধীনে ভবিষ্যতের সব নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল চূড়ান্ত করে। মন্ত্রীসভায় অনুমোদনকৃত বিলে ৪ টি বিকল্প প্রস্তাব রাখা হয়। প্রথম প্রস্তাবে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে থেকে কাউকে সরকার প্রধান (প্রধান উপদেষ্টা) করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা মন্ডলী গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়। প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ না হলে ২য় প্রস্তাবে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এটি গ্রহণযোগ্য না হলে তৃতীয় প্রস্তাব দেশের প্রখ্যাত বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কাউকে সরকার প্রধান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা মন্ডলী গঠনের কথা বলা হয়। এটিও গ্রহণ যোগ্য না হলে চতুর্থ প্রস্তাবে দলীয় সরকার সংসদ নির্বাচনের ৯০ দিন আগে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। রাষ্ট্রপতি ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করে সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করবেন।[২৮২] অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ১৯ মার্চ সংসদ অধিবেশন বসে। ২১ মার্চ ক্ষমতাসীন বিএনপি সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের বিল উত্থাপন করে।[২৮৩] অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সচিবালয় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের পেশাজীবী জনগণ অসহযোগ কর্মসূচীর প্রতি স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন জানায়, 'জনতার মঞ্চ' 'কেয়ারটেকার মঞ্চ' গঠন করে ঢাকাসহ সারাদেশের রাজপথ দখলে নেয় বিরোধীদল। অবশেষে রাতভর আলোচনার পর ২৬ মার্চ ভোররাতে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের একমাত্র অধিবেশনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ১৩ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস হয়। অবশেষে ৩০ মার্চ বেগম খালেদা জিয়ার সরকার পদত্যাগ করে। সেদিনই সংবিধান মোতাবেক বিচারপতি হাবিবুর রহমানের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের মাধমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। সফল সমাপ্তি ঘটে দীর্ঘ দু'বছরের কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলন।

শেখ হাসিনার শাসনকাল (১৯৯৬-২০০১)ঃ জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা

আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ বিরোধী দলসমূহের আন্দোলনের ফলে বি.এন.পি সরকার ২৬ মার্চ ১৯৯৬ ৬ষ্ঠ সংসদের একমাত্র অধিবেশনে 'কেয়ারটেকার সরকার বিল' পাস করে। ৩০ মার্চ রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং সংবিধান মোতাবেক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেন। নির্বাচন কমিশন ১২ জুন, ১৯৯৬ ৭ম সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধাশুরু করেন। আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির সাথে যুগপৎ আন্দোলন করলেও নির্বাচনে জামায়াত কোন দলের সাথে জোটবদ্ধ না হয়ে এককভাবে অংশগ্রহণ করে। মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই প্রথম জামায়াত ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম

আযম সারাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসমাবেশ উপস্থিত থেকে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের নিকট ভোট প্রার্থনা করেন। জনসভাগুলোতে ব্যাপক লোক সমাগমও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল জামায়াত মাত্র ৩টি আসন লাভ করেছে। ভোট প্রাপ্তির দিক থেকেও পূর্বের (১৯৯১ সালের) নির্বাচন থেকে অনেক কম ভোট পেয়েছে। সব মিলে একটি নির্বাচনী বিপর্যয়ে পতিত হয়েছিল জামায়াত। দেশে বিদেশে জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণ উদঘাটনের জন্য নির্বাচন পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতের মজলিসে শূরার অধিবেশনে (১৯ মার্চ) সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে আহবায়ক করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট 'পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হয়।[২৮৪] কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন সর্বজনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান (সদস্য সচিব), আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, আবু নাসেব মুহাম্মদ আবদুজ জাহের, মকবুল আহমদ, মাওলানা রফীউদ্দীন আহমদ, মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবু তাহের, ডাঃ শফীকুর রহমান, তাসনীম আলম, মুহাম্মদ ইযযতুল্লাহ, সাইফুল আলম খান মিলন, অধ্যাপক একে এম. নাজির আহমদ ও ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক। পর্যালোচনা কমিটি তাদের রিপোর্ট সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় উপস্থাপন করে। রিপোর্টের আলোকে নির্বাচনে বিপর্যয়ের উল্লেখযোগ্য কাণ্ডরুগুলো হলোঃ।[২৮৫]

এক ঃ ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দান সত্ত্বেও আমীরে জামায়াতের সাথে বিএনপির ব্যবহার এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের ওপর ছাত্রদলের হামলা বা ছাত্রদল শিবির সংঘাত, বিএনপির ভারত তোষণনীতি এবং ইসলামের প্রতি বিএনপি'র বৈরী আচরণ ইত্যাদি কারণে জামায়াত ও বিএনপি'র মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলন করে বিএনপি সরকারের পতনের প্রচেষ্টাকে আমাদের ভোটারদের উল্লেখযোগ্য অংশ ভালভাবে নেয়নি। যেহেতু বাংলাদেশের ভোটারগণ দুই ধারায় বিভক্ত; সেহেতু সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দান, আওয়ামী লীগসহ আন্দোলন, সংসদ থেকে পদত্যাগ ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে ভোটারদের আস্থা হ্রাস পায়। অনেক ভোটার বিরাগ হয়ে বিএনপিকে অথবা কোন কোন স্থানে জাতীয় পার্টিকে সমর্থন দিয়েছে। জামায়াতের সাধারণ বা ভাসমান ভোটারগণ বিএনপি বা জাতীয় পাটির দিকে চলে গেছে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে বিজয়ী ১৮ আসনের ফলাফল থেকে তাই প্রতীয়মান হয়। এ দেশের জনগণ বিএনপি ধরনের দলকেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের (যার সাথে একটু একটু ইসলামিক Flavour আছে) প্রতীক মনে করে।

দুই ঃ কেয়ারটেকার আন্দোলনে লাগাতার হরতাল, অবরোধ, দীর্ঘ অবরোধে মানুষের কষ্ট, সম্পদ বিনষ্ট, গাড়ি ভাঙ্গা, মানুষকে দিগম্বর করার মতো ঘটনা সংঘটিত

হয়েছে। তাই আন্দোলনে জামায়াতের সংশ্লিষ্টতাকে জামায়াতের প্রতি অনেক সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও জামায়াতের আদর্শের সাথে অসংগতিপূর্ণ মনে করেছেন। ফলে জামায়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ভোটারদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

তিন ঃ জামায়াতের রাজনীতিতে ১৯৭১ সালের ভূমিকা একটি বড় ধরনের অন্তরায়। বিশেষ করে '৯১-এর নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামী সংসদের ভেতরে ও বাইরে ইসলামের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করে এবং বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এ কারণেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জামায়াতকে কোনঠাসা করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক)সহ ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হিসেবে নতুন প্রজন্মের নিকট প্রতিষ্ঠিত করতে অনেকাংশে সফল হয়।

চার ঃ ইসলামী দলগুলোর কোন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া। তাছাড়া ইসলামী মহল বলে পরিচিত কতিপয় সংস্থা ও ব্যক্তি জামায়াতের বিরোধিতা করেছে সক্রিয়ভাবে। জামায়াত যাতে নির্বাচিত হতে না পারে এজন্য চরমোনাইয়ের পীর সাহেব ঐক্যজোটের নামে চরম বিরোধিতা করেছেন। অনেক স্থানে এসব বিরোধিতায় কারণে জামায়াতের ভোটারগণ বিভ্রান্ত হয়েছে।

পাঁচ ঃ তত্ত্বাবধায়ক স রকারের উপদেষ্টাগণের কেউ কেউ দল বিশেষের পক্ষে কাজ করেছে। কেয়ারটেকার সরকারের গোটা মেশীনারি অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ব্যবহার করেছে।

ছয় ঃ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিরোধী চক্রের এজেন্ট হিসেবে বিদেশী এনজিওগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে। এনজিওগুলো জামায়াতের বিরুদ্ধে এবং বড় দুটি দলের পক্ষে কাজ করেছে। এসব এনজিও নির্বাচনে এতটা ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে এব্যাপারে জামায়াতের সতর্কতার অভাব ছিল।

তাছাড়া জালভোট ও কালো টাকার ছড়াছড়ি, দলের নির্বাচনী ফান্ডের অপ্রতুলতা, সংগঠনের জনশক্তির নির্বাচনী কাজের অনভিজ্ঞতা, নেতা-কর্মীদের একটি অংশের অসন্তোষজনক ভূমিকাও নির্বাচন বিপর্যয়ের বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর কয়েকমাস পর্যন্ত জামায়াত এর নেতাকর্মীদের মানসিক সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে। বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে বাহ্যিক কারণসমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি জামায়াত আদর্শিকভাবে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। নেতৃবৃন্দ বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জামায়াত কাজ করছে; নির্বাচনের বিপর্যয়কে জামায়াত পরম পরাজয় হিসেবে বিবেচনা করেনা। জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন এ পৃথিবীতে কোন পরাজয়ই চূড়ান্ত নয়, ...পরকালের বিজয়ই চূড়ান্ত বিজয়।[২৮৬] নির্বাচনের পর জামায়াত আওয়ামী লীগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের প্রতি

কিছুটা নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। ছাত্রলীগ দ্বারা ছাত্রশিবিরের নিয়ন্ত্রিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করা ছাড়া আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও জামায়াতের প্রতি আক্রমনাত্মক কোন কর্মসূচি পরিলক্ষিত হয়নি। আওয়ামী লীগের আক্রমনের মূল লক্ষ্য ছিল বেগম খালেদা জিয়া এবং জিয়াউর রহমান।[২৮৭] আওয়ামী লীগ ক্ষমতাগ্রহনের কয়েক মাসের মধ্যে ভারতীয় শিল্পী সাহিত্যিকের বাংলাদেশে আগমন এবং তাদের বক্তব্য বিশেষ করে এক বাংলা, এক সংস্কৃতি, ১৯৪৭ সালের বিভাগ 'ভুল' সংক্রান্ত বক্তব্যের ব্যাপারে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী দল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।[২৮৮]

জামায়াত ধীরে ধীরে গঙ্গা নদীর পানির হিস্যা, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী, ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলাপ নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান শুরু করে।[২৮৯] বাংলাদেশ ভারত ৩০ বছর মেয়াদী পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। এ চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশ সর্বনিম্ম ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে। ৩০ বছর মেয়াদ পূর্ণ হবার পর চুক্তি আবার নবায়ন করা যাবে, চুক্তির অধীনে ৫ বছর অন্তর বন্টন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বংলাদেশ ভারত পানি বন্টন চুক্তিকে ইতিহাসের একটি মাইল ফলক হিসেবে অভিহিত করেন। অপরদিকে সংসদের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তিকে অসম, অসম্পূর্ণ ও স্ববিরোধী হিসেবে উল্লেখ করে।[২৯০] গঙ্গা পানি চুক্তি সম্পাদনের পরের দিন (১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৬) জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এক সভায় বলা হয় পানি চুক্তি, শুধুমাত্র প্রহসনই নয় বরং বাংলাদেশের স্বার্থের বিরোধী। বাংলাদেশের জন্য কোন গ্যারান্টি ক্লজ ছাড়া সম্পদিত চুক্তিতে ভারতের জন্য ৩৫ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অথচ শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহ ৫০-৫৫ হাজার কিউসেক এর বেশী নয়। তাই বাংলাদেশ আদৌ ২৫,০০০ কিউসেক পানি পাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে বলে জামায়াতের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়।

চুক্তির ৮, ৯, ১০, ১১ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে জামায়াত কর্মপরিষদ বাংলাদেশ ভারতের চানক্য কুটনীতির শিকারে পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করে। চুক্তির ৯নং অনুচ্ছেদে অভিন্ন নদীসমূহের ব্যাপারে ভারতকে হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়াকে জামায়াত 'ব্ল্যাংক চেক' হিসেবে অভিহিত করেছে। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে ভারত একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের কারণে বিগতবছর গুলোতে বাংলাদেশের ৬০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে উল্লেখ করে জামায়াতের কর্মপরিষদ পানি চুক্তিতে সে জন্য কোন ক্ষতিপুরনের ব্যবস্থা না থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে।[২৯১] জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এক সভায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী যে কোন উদ্যোগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান হয়। কর্মপরিষদের সভায় আওয়ামী সরকারের দেশের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং

ইসলাম বিরোধী ভূমিকার উল্লেখ করা হয়। 'গ্যারান্টি ক্লজ' ছাড়া সম্পাদিত প্রহসনের পানি চুক্তি, প্রচন্ড লোডশেডিং এর অজুহাতে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী, ভারতকে করিডর সুবিধে প্রদানের উদ্যোগ এবং উপ আঞ্চলিক জোট গঠনের মাধ্যমে সাম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠীর হাতকে শক্তিশালী করার বিষয়ে কর্মপরিষদ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।[২৯২] আওয়ামী লীগের কর্মকান্ডে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রসমূহের গেরিলা সংগঠনসমূহ ক্ষুব্ধ হয়ে বাংলাদেশের উপর আঘাত হানার হুমকিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় কর্মপরিষদ সভায়। সার্ককে নিষ্ক্রিয় রেখে উপআঞ্চলিক জোট গঠনের প্রস্তাব এতদঅঞ্চলের ছোট ছোট রাষ্ট্রসমূহের ওপর ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসেবে উল্লেখ করে জামায়াতের সভায় বলা হয়, এই ফোরাম ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের বিদ্রোহীদের দমন করার কাজেও ব্যবহৃত হবে।

পার্বত্য অঞ্চলের 'শান্তিবাহিনীর' নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের আলোচনায় সংবিধান ও দেশের সাবভৌমত্ব বিরোধী শর্তগুলো অপ্রত্যাশিত বলে উল্লেখ করা হয়। আইন শৃংখলা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ উল্লেখ করে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জামায়াতের মজলিসে শূরায় অভিমত ব্যক্ত করে বলা হয় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতা, প্রশাসনকে দলীয়করণ এবং সরকার দলীয় ছাত্রফ্রন্ট কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হলসমূহ দখলের ঘটনায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সরকারের সদিচ্ছার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আওয়ামী সরকারের প্রথম ৫ মাসে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চিত্র উল্লেখ করে মজলিসে শূরায় বলা হয়, উক্ত সময়ে সন্ত্রাসীদের দ্বারা ৩০ জন নিরীহ লোক নিহত হয়, ৯৭টি চাঞ্চল্যকর ডাকাতি, ১৮৯টি ধর্ষণ, ১০৩০টি নারী ও শিশু নির্যাতন, ১১০৪টি চুরি এবং গড়ে প্রতিদিন ১০টি ছিনতাইয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।[২৯৩]

মজলিসে শূরায় ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার উদ্যোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় এর মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় স্বাধীনতা এবং সাবভৌমত্বও হুমকির সম্মুখীন হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের আলোচনায় যাতে সংবিধান বিরোধী কোন পদক্ষেপ বা দাবি মেনে নেয়া না হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যেন সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা না হয় তার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানানো হয়। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সভায় জোর দিয়ে বলা হয়, দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতির ক্ষতির জন্য জনগণ কাউকে রায় দেয়নি।[২৯৪] বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জামায়াত ১৭ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৭ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াত এ সকল দাবী উত্থাপন করে এবং ২ মাসের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৭ দফার উল্লেখযোগ্য দাবিসমূহ হচ্ছেঃ বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা, বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল, কুরআন এবং সুন্নাহকে রাষ্ট্রের আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া, ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, গঙ্গার

পানি এবং অন্যান্য নদীর ব্যাপারে ন্যায্য হিস্যা আদায় করা, ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা এবং তাকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান না করা। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা, বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান করা এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন ও বেতারকে জাতি গঠনের কার্যক্রমে ব্যবহার করা ইত্যাদি।[২৯৫]

আওয়ামী লীগ ক্ষমতাগ্রহণের পর ভারতের সাথে তার ঐতিহাসিক সুসম্পর্ক আরো জোরদার করে। ক্ষমতাগ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় আগমন করেন। স্বাধীনতার পর গঠিত আওয়ামী সরকার ভারতের সাথে ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে ১৯৭২ সালের ১৮ মার্চ। সে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ দিন পূর্বে ১২ মার্চ, ১৯৯৭ শেখ হাসিনার সরকার ভারতকে ট্রানজিট দানের সম্মত বিবরণী স্বাক্ষর করে। ১২ মার্চ দিল্লীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দোর কুমার গুজরালের সাথে ট্রানজিটের দলিল স্বাক্ষর করেন।[২৯৬] কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে এরকম একটি চুক্তি হলেও আওয়ামী সরকার সংসদকে পাশ কাটিয়ে এবং প্রকাশ্য কোন ঘোষণা না দিয়েই এ সম্মত বিবরণীতে স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশের সাতটি পয়েন্টে ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়। সরকারের এই চাতুর্যপূর্ণ কর্মকান্ডের প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াত, জাগপা এবং বামফ্রন্ট ১৯ মার্চ ঢাকায় সমাবেশের আয়োজন করে। জামায়াতের সমাবেশে মাওলানা নিজামী বলেন, ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তি ও বিদ্যুৎ আমদানী, গ্যাস রপ্তানীসহ অসম পানিচুক্তি ও উপ আঞ্চলিক জোট গ্রহনের নামে বর্তমান সরকারের জাতীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কর্মকান্ডের এবং ভারতীয় স্বার্থ রক্ষায় সরকারের নির্লজ্জভূমিকার জন্য রাস্তায় না নেমে পারা যায়না।[২৯৭] ট্রানজিট প্রদানের প্রতিবাদ সহ অন্যান্য ইস্যুতে বিএনপি ২৩ মার্চ, ৬-২টা পর্যন্ত দেশ ব্যাপী হরতাল পালন করে। বিএনপিই প্রথম ট্রানজিটের বিরুদ্ধে হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে। জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দে তাদের মহাসমাবেশে ট্রানজিট প্রদানের প্রতিবাদ করে। জাতীয় পাটি নেতা কাজী জাফর আহমদ মহাসমাবেশে বলেন, ৮টি পয়েন্টে ভারতকে ট্রানজিট দেয়া হয়েছে। আজমীর শরীফের নামে ধর্মীয় অনুভূতিকে তারা এ কাজে ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন সংসদ চালু থাকা অবস্থায় তারা সংসদে আলোচনা না করেই কিভাবে ট্রানজিট দেবার সাহস পেল?[২৯৮]

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষে 'শিখা চিরন্তন' প্রজ্জলনকে দেশের ওলামা মাশায়েখ ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী হিসেবে অভিহিত করেন। তারা শিখা চিরন্তনকে শিরক হিসেবে ঘোষণা করেন। জামায়াত ৩রা এপ্রিল '৯৭ ভারতকে ট্রানজিট প্রদান, বিদ্যুৎ আমদানী, গ্যাস রপ্তানী, অসম পানিচুক্তি ও উপআঞ্চলিক জোট গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রেপরিণত করা এবং পৌত্তলিক সংস্কৃতি আমদানীর

প্রতিবাদে ঢাকায় জনসভার আয়োজন করে। জনসভায় জামায়াতের মহাসচিব মাওলানা মতিউর রহামন নিজামী বলেন শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বান দু'টোই অগ্নিপূজার শামিল এবং প্রকাশ্য শিরক। এটি দেশের মানুষ মেনে নিতে পারেনা।[২৯৯] ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বসী বুদ্ধিজীবীদের একটি বিরাট অংশ 'শত নাগরিক কমিটির' ব্যানারে ঢাকায় তিনদিন ব্যাপী জাতীয় সংহতি সম্মেলনের আয়োজন করে। ৫-৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।[৩০০]

সম্মেলনে জামায়াতের প্রতিনিধি মতিউর রহমান নিজামী বর্তমান সরকারের আত্মীয়করণ, দলীয়করণ, প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং ভারতের তাঁবেদারীর প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলনের ব্যাপারে সবাইকে প্রস্তুতি নেয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচি চুড়ান্ত করতে হবে।[৩০১] উক্ত সংহতি সম্মেলন জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী দলগুলোকে উজ্জীবীত করে। সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয় যা পরবর্তীতে সরকার বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৭ দলীয় জোটের শরিক দলগুলো ছিল বিএনপি, জামায়াত, মুসলিম লীগ, খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জাগপা, কৃষক শ্রমিক পার্টি।

সপ্তম সংসদ নির্বাচনের পর ধীরে ধীরে জামায়াত বিএনপির সম্পর্কের উন্নয়ন হতে থাকে। পানি চুক্তি, ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দান, পার্বত্য চুক্তি ইত্যাদি ইস্যুতে জামায়াতে বিএনপি একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করলেও দু'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কোন বৈঠক ২৯ অক্টোবরের পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৯৭ সালের ২৯ অক্টোবর বিরোধী দলীয় নেতার সরকারি বাসভনে (২৯ মিন্টো রোড) বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্য ঐকবদ্ধ আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে দুই নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দুই নেতার বৈঠকে চট্টগ্রাম পার্বত্য চুক্তি, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, মানবাধিকার লংঘন, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে প্রস্তাবিত পার্বত্য চুক্তিসহ দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী শক্তির সাথে যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৩০২] ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদিত হলে জামায়াত, বিএনপিসহ জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী দলগুলো তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ জানায়। চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে জামায়াত, বিএনপিসহ সমমনা ৭ দল চার নভেম্বর '৯৭ ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল এবং ৩০ নভেম্বর ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে হরতাল

পালন করে। চুক্তি সম্পাদনের প্রতিবাদে ৭ ডিসেম্বর সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ১০ ও ১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয। ২১ ডিসেম্বর বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি জামায়াতের সংসদ সদস্যগন কালো ব্যাচ ধাগুরু এবং কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেন। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যূ নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নিতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন।[৩০৩] 'শান্তি চুক্তির' প্রতিবাদে জামায়াত ও বিএনপির আহবানে ২১ ডিসেম্বর '৯৭ থেকে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে ৪৮ ঘন্টার হরতাল এবং ২২ হিসেম্বর রাঙামাটিতে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও লং মার্চ কর্মসূচি

১৯৯৮ সালের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের লং মার্চ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। জামায়াত-বিএনপিসহ ৭ দল পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমূখে এ লং মার্চের আয়োজন করে। লং মার্চের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৩৪ সালে ৯০ হাজার অনুসারী নিয়ে দীর্ঘ ৬ হাজার মাইলের লং মার্চ করেছিলেন চীন বিপ্লবের নায়ক মাও সেতুং। মানব মুক্তির সংগ্রামে এ লং মার্চ অবিস্মশুরুীয় ঘটনার সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশেও ফারাক্কার বিরুদ্ধে লং মার্চ হয়েছিল। মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গঙ্গার এক তরফা পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালের ১৬ মে ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ আহবান করেছিলেন। লক্ষ্য জনতার ঐ ফারাক্কা মিছিল ছিল বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রামের প্রতীক। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের আগে ও পরে জামায়াত বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সারাদেশে হরতাল বিক্ষোভসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।[৩০৪]

সংসদে আলোচনা না করে চুক্তি সম্পাদনের প্রতিবাদে বিএনপি এবং জামায়াত দীর্ঘদিন সংসদ অধিবেশনও বর্জন করেছিল। জামায়াত এবং বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ৪ টি বিলে স্বাক্ষর প্রদান না করার জন্য প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিলগুলোর প্রতিবাদে এবং সংসদে বিলগুলোর ওপর আলোচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে ১৩ মে ১৯৯৮ পল্টন ময়দানে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ সকাল সন্ধ্যা অনশন কর্মসূচি পালন করে। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিলগুলো যখন আইনে পরিণত হলো তখন থেকে পরিস্থিতি জটিলতর হতে থাকে। বিএনপি-জামায়াতসহ সাত দল এ চুক্তি বাতিলের পক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধি এবং বহিঃবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষনের লক্ষ্যে লংমার্চের কর্মসূচি ঘোষণা করে। লং মার্চ কর্মসূচিকে ঘিরে সারাদেশে একটা সাজ সাজ রব ওঠেছিল। মিছিল মিটিং পোষ্টারে সরাদেশে একই শ্লোগান "চল চল পার্বত্য চট্টগ্রাম চল, কালো চুক্তি বাতিল কর। সংবিধান বিরোধী কালো চুক্তি মানিনা মানবোনা" ইত্যাদি। লং

মার্চকে কেন্দ্রকরে রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে বিএনপি এবং জামায়াত পৃথকভাবে ৯ জুন '৯৮ লং মার্চ শুরু করে। বিএনপির লং মার্চ শুরু হয় পল্টন ময়দানে বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণের পর। জামায়াত রমনা ময়দানে লং মার্চ পূর্ব এক সমাবেশের আয়োজন করে। লং মার্চ শুরুর পর ঢাকা থেকে ১০ কি.মি. দূরে কাঁচপুর ব্রীজের কাছে লংমার্চ ব্যারীকেডের সম্মূখীন হয়। দীর্ঘ ৯ ঘন্টা সেখানে লংমাচের গাড়ির বহর আটকা পড়ে। বেগম খালেদা জিয়াসহ লং মার্চে অংশ গ্রহণকারী বিএনপি-জামায়াতের নেতৃবৃন্দের অনঢ় মনোভাবের কারণে সরকার বাধ্য হয়ে ব্যারিকেড পরিস্কার করে। অতঃপর সন্ধ্যার পর লং মার্চ পুনরায় যাত্রা শুরু করে ১০ জুন সকালে চট্টগ্রামে পৌছে। বিএনপির গাড়ি বহর পৌছে আউটার স্টেডিয়ামে, জামায়াতের বহর একত্রিত হয় প্যারেড ময়দানে। চট্টগ্রামে ৪/৫ ঘন্টা বিরতির পর লং মার্চ আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিশাল গাড়ি বহর খাগড়াছড়ি পৌছে এবং বিশাল সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি কালোচুক্তি বাতিল করে সম্মান এবং মর্যাদার ভিত্তিতে চুক্তি করার আহবান জানান। অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে লংমার্চের গাড়ি বহর রাঙামাটিতে পৌছে এক বিশাল সমাবেশে মিলিত হয়। লং মার্চে বাধা সৃষ্টি এবং হামলার প্রতিবাদে বিরোধী দলে পক্ষ থেকে ১৮ জুন দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচি ঘোষনা করা হয়।[৩০৫]

সরকার (১৯৯৬-২০০১) বিরোধী আন্দোলন ঃ জামায়াতের জোটবদ্ধ রাজনীতি

১৯৯৮ সালের ১০ ডিসেম্বর পাবনা- ২ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট কারচুপি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিএনপি এবং জামায়াতসহ ৭ দল ১৩ ডিসেম্বর '৯৮ দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। পাবনা- ২ উপনির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীর প্রতি জামায়াত সমর্থন জানিয়েছিল।[৩০৬] ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের এ আসন আওয়ামী লীগ অল্প ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেও উপনির্বাচনে প্রায় ২০ হাজার ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয়ী হয়। উল্লেখ্য ১৯৯৬ সালের ৭ম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬৭২৫০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। বিএনপি ৬৫৭৪৫ ভোট এবং জামায়াত পায় ৩৯৯৭ ভোট। বিএনপি এবং জামায়াতের সম্মিলিত ভোট সংখ্যা ছিল ৬৯৭৪২। ১৩ ডিসেম্বর হরতাল পালনের আহবান জানিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বলেন পাবনা- ২ উপনির্বাচনে সরকারের ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভোট কারচুপির প্রতিবাদে হরতাল দিতে বাধ্য হয়েছি।[৩০৭] পাবনার উপনির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াতের যুগপৎ এবং ঐকবদ্ধ আন্দোলন আরো জোরদার হয়।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৫ জানুয়ারী ১৯৯৯ বেগম জিয়ার সাথে তাঁর ২৯ মিন্টো রোডের বাসায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[৩০৮] এক ঘন্টা স্থায়ী সে বৈঠকে যুগপৎ আন্দোলনের রুপরেখা ও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা

হয়। প্রতিনিধি দলে জামায়াতের অপর দুই সদস্য ছিলেন মোঃ কামারুজ্জামান ও এটিএম আজহারুল ইসলাম। বৈঠকে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে ছিলেন দলের মহাসচিব মোঃ আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার জাহিদ, এম মোর্শেদ খান ও এম. শামসুল ইসলাম।

সরকার বিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের রুপরেখা ঘোষণা উপলক্ষে জামায়াত আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখলের আড়াই বছরের মধ্যেই গণতন্ত্র বিপন্ন ও অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়েছে। একদলীয় কায়দায় দেশ শাসনের মাধ্যমে প্রশাসনকে শতকরা ১০০ ভাগ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার কারণে দেশবাসী উদ্বিগ্ন। ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সারা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ভারতমুখী করে দিয়ে মুসলিম জাতিসত্ত্বা ও দেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে দিয়েছে। তিনি বলেন, এ সরকার ক্ষমতায় এসে ৩০ সালা পানিচুক্তি, বিদেশীদের কাছে গ্যাস ক্ষেত্র ইজারা দিয়ে এবং ভারতকে দেশের এক দশমাংশ এলাকা ও ট্রানজিট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। অধ্যাপক আযম আরো, বলেন পাবনা-২ আসনের নির্বাচনের পর বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে পৌরসভা, উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এমন মনে করা যায় না। তিনি বলেন, সরকার ক্ষমতায় এসে নির্যাতন, নিপীড়ন, গ্রেফতার, মামলা, হয়রানি, সন্ত্রাস ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিরোধী দলকে দমন করা সরকারের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। পুলিশ বাহিনীকে রক্ষীবাহিনী স্টাইলে বিরোধী দল দমনে ব্যবহার করছে। জামায়াতের আমীর সম্মেলনে আরো বলেন, আওয়ামী সরকার ধর্মীয় বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে নগ্নতা, অশ্লীলতা, ও পাপাচারের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। অগ্নি সংস্কৃতি ও মুর্তি নির্মাণের নামে পৌত্তলিক সংস্কৃতির আমদানি করছে। ২৩ বছর পূর্বের ধর্মহীন 'কুদরাতে খুদা শিক্ষা কমিশন' রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচন এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে যুব চরিত্র ধ্বংস করছে। এ অবস্থায় আগামী ৩০ দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ভোটারদের আইডি কার্ড প্রদান এবং রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের মুক্তি প্রদান এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা না হলে ঐকবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে দাবী মানতে বাধ্য করা হবে।[৩০৯] জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির এই বৃহত্তম ঐক্যকে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন জামায়তের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম।[৩১০] পৌরসভা নির্বাচন বন্ধ ও বিরোধী দলের ঘোষিত ৪ দফা দাবী আদায়ের জন্য ২৬ জানুয়ারী ১৯৯৯ পালিত হয় ৪ দলের আহুত দেশব্যাপী হরতাল। সংঘর্ষ, হামলা, গুলি, বোমা, টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ ও গ্রেফতাদের মধ্য দিয়ে হরতাল পালিত হয়। হরতালে বিরোধী দলের ৩ জন কর্মী নিহত হয়। হরতাল শেষে

এক সমাবেশে নিজামী বলেন দেশবাসী সারাদেশে হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে তারা সরকারের প্রহসনের পৌরসভা নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।[৩১১]

বিরোধী দলের চার দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আয়োজিত ঢাকায় এক সমাবেশে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নিজামী বলেন, নীল নকশার নির্বাচন হলে সরকার তার পতনের পথ খোলাসা করবে। তিনি বলেন, ৪ দফা দাবির উদ্দেশ্য হচ্ছে গত আড়াই বছরে সরকারের গণবিরোধী, ইসলাম বিরোধী ও দেশ বিরোধী কাজের প্রতিবাদ জানানো এবং নীল নকশার নির্বাচনের মাধ্যমে বাকশালী শাসন ঠেকানো। নিজামী বলেন, '৭৩-এ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তারা যে কায়দায় নির্বাচন করে বিরোধী দলকে আসতে দেয়নি, এবার ক্ষমতায় আসীন থেকে তারা একই কায়দায় পাবনা- ২ আসনের নির্বাচন করেছে। তিনি দাবি আদায়ে ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ শান্তিপূর্ণ ৪৮ ঘন্টা হরতাল সফল করার আহবান জানান। সমাবেশ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারী বিভাগীয় সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৩১২] সরকারের সন্ত্রাস ও তীব্র উস্কানীর মুখে দেশব্যাপী লাগাতর ৬০ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় নিহত হয় মোট ৬ জন। হরতাল চলাকালে জামায়াত কার্যালয়ে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। ১১ ফেব্রুয়ারী আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলোর লিয়াজোঁ কমিটির এক প্রেস ব্রিফিং জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালায়ে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিফিং এ বিএনপির শামসুল ইসলাম, আনোয়ার জাহিদ ও সাদেক হোসেন খোকা এমপি, জাতীয় পার্টির কাজী জাফর আহমদ ও সাইফুর রহমান, জামায়াতের মতিউর রহমান নিজামী ও আজহারুল ইসলাম এবং ইসলামী ঐক্যজোটের এ.আর.এম আবদুল মতিন বক্তব্য রাখেন। মতিউর রহমান নিজামী জামায়াতের মিছিল ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশের সহায়তায় সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলার ঘটনা উল্লেখ করেন এবং হামলাকারীদের প্রতি ধিক্কার জানান। প্রেস ব্রিফিং এ গায়েবানা জানাজা ও শোক মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৩১৩] বিরোধী দল ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের লালদীঘির বিশাল জনসভায় জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, বর্তমান সরকারের হাতে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ত্ব, ইসলাম, গণতন্ত্র নিরাপদ নয়। অর্জিত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং ইসলামকে হেফাজত করতে হলে এক দফার আন্দোলনের মাধ্যমে এ তাবেদার সরকারকে হঠাতে হবে। বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঘোষণা দিয়ে রাজপথে সন্ত্রাস করে এ সরকার তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে বলে অধ্যাপক আযম উল্লেখ করেন।[৩১৪]

পৌরসভা নির্বাচন প্রতিহত করা সহ ৪ দফা আদায়ের লক্ষ্যে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে লাগাতর ৩ দিনের হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, বিরোধী দলকে পাশ কাটিয়ে পৌর নির্বাচন করা হলে পরিণতি ভয়াবহ হবে।[৩১৫] তিনদিনের লাগাতার ৬৬ ঘন্টার হরতাল পালনে জামায়াত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

হরতাল পালনকালে জামায়াতের দক্ষিণ জেলা আমীর শাহজাহান চৌধুরীর বাড়ীতে হামলা সংঘটিত হয়। গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে পৌরনির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক সভায় সরকারের পদত্যাগ ও মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবি করা হয়।[৩১৬] জামায়াতসহ চারদল পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সার সংকটের সমাধানের দাবিতে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির প্রতিবাদে ১৮ এপ্রিল '৯৯ দেশব্যাপী সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। ১৭ এপ্রিল '৯৯ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সভাপতিত্বে জাতীয় পাটির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনে জামায়াত নেতা কামারুজ্জামান বক্তব্য রাখেন। ৩রা মে '৯৯ জামায়াতসহ চার দলের গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল পূর্ব এক সমাবেশে দলের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ এবং সকল নির্বাচনের আগে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। তিনি ১১ মে দেশব্যপী অর্ধদিবস হরতাল, ১৩ মে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের যৌথ মিছিল এবং ১৬ মে সাতক্ষিরা পথে রোড মার্চ কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[৩১৭]

১৬ মে সাতক্ষিরা অভিমূখে জামায়াতের রোড মার্চ অধ্যাপক গোলাম আযম ও মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে আরম্ভ হয়। তিনদিন ব্যাপী সেই রোডমার্চ খুলনায় গিয়ে শেষ হয়। রোড মার্চে অধ্যাপক গোলাম আযম ২৩ টি বৃহৎ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ২০০ গাড়ি নিয়ে মার্চ শুরু হলেও পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে চারশতাধিক এ পৌছে।[৩১৮] পার্বত্য কালো চুক্তি, অসম পানি চুক্তি, হত্যা ধর্ষণ, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে এবং বিদ্যুৎ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ সরকারের পদত্যাগ ও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ২৪ মে জামায়াতের এমপিদের নেতৃত্বে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গণমিছিল পূর্ব সমাবেশে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ২৭ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে সন্তু লারমার অভিষেক দিবসে দেশব্যাপী কালো দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[৩১৯] গণবিরোধী বাজেট, গ্যাস বিক্রি ও করিডোর প্রদানের ষড়যন্ত্র, সকল স্তরে সরকারের দুর্নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, বিদ্যুৎ ও পানি সংকট, সরকারের দুঃশাসন, লুটপাট ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদে জাময়াত সহ চারদল ৮ জুলাই '৯৯ দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালন করে।[৩২০] ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা বন্ধ করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ১৬ জুলাই বায়তুল মোকাররমে জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে নিজামী বলেন, সরকার দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ইসলাম নির্মূলের সর্বনাশা খেলায় মেতে ওঠেছে। সমাবেশ শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয।[৩২১]

সরকারের পদত্যাগসহ চার দফা দাবীতে বিএনপি-জামায়াত সহ চারদলের দ্বিতীয় পর্যায়ের রোডমার্চ ২৫-২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের রোডমার্চ ঢাকা থেকে শুরু

হয়ে বগুড়া, পাবনা হয়ে চাপাই নবাবগঞ্জে গিয়ে শেষ হয়। প্রায় তিনশতাধিক বাস, মিনিবাস, কার ও মাইক্রোবাস সহকারে রোডমার্চ বগুড়া থেকে পাবনা রওয়ানা করে। বগুড়া থেকে পাবনা যাওয়ার পথে ১২টি পথসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গোলাম আযম। রোড মার্চের সামবেশগুলোতে অধ্যাপক গোলাম আযম অবিলম্বে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের পদত্যাগ ও মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহবান জানান।[৩২২] রোড মার্চ শেষে ঢাকা ফিরে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, লোড শেডিং ও বিদ্যুৎতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনরত বিরোধী দলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০ আগস্ট সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভের ঘোষণা দেন।[৩২৩]

ট্রানজিট প্রদানের বিরুদ্ধে আন্দোলন

ভারতকে ট্রানজিট সুবিধে প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৩২৪] ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট ২রা আগষ্ট '৯৯ সকাল ৬টা থেকে এটানা ৩০ ঘন্টা হরতাল পালন করে। ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর প্রদানের প্রতিবাদে ও আওয়ামী শাসনের অবসানের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ১৮ আগস্ট ডিসি অফিস ঘেরাও এবং স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি পালিত হয়।

চারদলের লিয়াজোঁ কমিটি চারদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্মসূচিসমূহ ছিল ঃ

১৯ আগস্ট ঃ সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ;

২০ আগস্ট ঃ বাদ জুম্মা গায়েবানা জানাজা ও শোকমিছিল;

২১ আগস্ট ঃ হরতালে সমর্থনে মিছিল সমাবেশ;

২২ আগস্ট ঃ ৮ ঘন্টার হরতাল।[৩২৫]

চারদলের কর্মসূচির অংশ হিসেবে জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে সিলেটে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়[৩২৬] ট্রনজিটের নামে ভারতকে করিডোর প্রদানের প্রতিবাদে এবং জামায়াতের ভাষায় ব্যর্থ ও তাবেদার আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ৩০ আগস্ট বিরোধী দলের গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি'র গণমিছিল পল্টন ময়দান থেকে এবং জামায়াতের গণমিছিল শুরু হয় মুক্তাঙ্গন থেকে। গণমিছিল পূর্ব সমাবেশে জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বিরোধী দলের আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস দমন আইন প্রণয়নের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।[৩২৭]

বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী সরকার প্রস্তাবিত ট্রান্সশিপমেন্ট এর সুবিধা অসুবিধে নির্ণয়ের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। ১২ সদস্য

বিশিষ্ট সে টাস্কফোর্সের আহবায়ক করা হয় তত্ত্বধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীকে। টাস্কফোর্সের প্রধান উপদেষ্টা করা হয় প্রাক্তন মন্ত্রী এম. সাইদুজ্জামানকে। ভারতকে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধে প্রদানের জন্য সংসদে প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়। ভারতের সাথে ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি স্বাক্ষর সংক্রান্ত সংসদে প্রস্তাব উত্থাপনকালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ বলেন, আমরা ভারতকে ট্রানজিট দেইনি। ট্রানজিট দিয়ে গেছে সাবেক বিএনপি সরকার। আমরা ট্রানজিটের পরিবর্তে ট্রান্সশিপমেন্টের সুবিধে দিচ্ছি এবং এতে আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বেশি। তিনি আরো বলেন, ট্রানজিটের পরিবর্তে ট্রান্সশিপমেন্টের সিদ্ধান্ত দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।[৩২৮]

ভারতকে ট্রান্সশিপমেন্ট প্রদান ঃ সরকারের সিদ্ধান্ত

২৮ জুলাই, ১৯৯৯ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভা ভারতকে বাংলাদেশের ভূখন্ডের ওপরদিয়ে সড়ক পথে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহে যাতায়াতের সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৩২৯] মন্ত্রিসভার বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আঞ্চলিক সহযোগিতা, উপআঞ্চলিক সহযোগিতার নীতি এবং ১৯৮০সালের ৪ঠা অক্টোবর সম্পাদিত ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তির ৮ম অনুচ্ছেদ ও ১৯৯৩ সালের সম্পাদিত সাপটা চুক্তির ১২ অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের ভূখন্ড দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহনের এই নীতিগত অনুমোদন দিয়ে বলা হয়, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশ প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল ভারতের সীল করা কন্টেনারের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের জন্য এক কিংবা দুইটি রুট (সড়ক পথ) ব্যাবহারের অনুমতি দেবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভূখন্ডের সড়কপথে সীলকরা কন্টেনারটি বহন করতে বাংলাদেশের ট্রাক এবং ট্রাকের শ্রমিকও হবে বাংলাদেশেরই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সড়কেপথে ব্যবহারের রয়েলটি, ট্রাকভাড়া, প্রতিট্রাকে অন্ততঃ ৯ জন শ্রমিকের মজুরি, সড়কপথের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ইত্যাদি ভারত বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশকে পরিশোধ করবে। দুইদেশের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এই সব বিষয়ের মীমাংসা হবে।

প্রস্তাবিত করিডোর ট্রান্সশিপমেন্ট বিরোধীদের মতে পুরাপুরিভাবে একটি দ্বিপাক্ষিক (বাংলাদেশ ভারত) বিষয়। এর সঙ্গে সার্ক, সাপটা বা অন্য কোন আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্পর্ক নেই। করিডোর বা ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা কেবল ভারতের কাজে লাগবে। বাংলাদেশ আপাতঃ দৃষ্টিতে আর্থিকভাবে অতি সামান্য লাভবান হলেও দীর্ঘমেয়াদীভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও নিরাপত্তাগত দিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অসুবিধের সম্মুখীন হবে।[৩৩০]

জননিরাপত্তা আইন ঃ জামায়াতের ভূমিকা

ছিনতাই, চাঁদাবাজি, গাড়ি ভাঙ্চুর, সম্পত্তি বিনষ্ট, অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, ত্রাস সৃষ্টি, অগ্নি সংযোগ, যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধ দমন এবং

জনগণের জানমালের হেফাজত করার উদ্দেশ্যে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয়। খসড়া আইন অনুযায়ী উল্লেখিত অপরাধের কারণে অপরাধীকে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কিংবা সর্বোচ্চ ২০ বছর বা সর্বনিম্ন ৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হবে। প্রস্তাবিত আইনে উল্লেখিত অপরাধের তদন্ত আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের অধীন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ ট্রাইবুন্যাল ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে। প্রত্যেক জেলা সদরে একটি ট্রাইবুন্যাল স্থাপিত হবে।[৩৩১] মন্ত্রিসভায় জননিরাপত্তা আইন নীতিগত অনুমোদন লাভ করায় রাজনীতিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিরোধী দলকে দমন ও আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এ আইন প্রণীত হয়েছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। জামায়াত, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, সাম্যবাদীদলসহ বিরোধী দলের প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়, আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য সন্ত্রাস দমন নয়। তাদের লক্ষ্য রাজনীতি থেকে বিরোধীদের বিতাড়ন।[৩৩২] জননিরাপত্তা আইন প্রণয়নের প্রতিবাদে জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এক যুক্ত বিবৃতিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দেশের উচ্চতর আদালতগুলোকে অভিযুক্ত করে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তব্যে "তাঁরা জামিন দিয়ে অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের রক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন" মর্মে উচ্চতর আদালতের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপমূলক যে বক্তব্য রেখেছেন এবং ৬ সেপ্টেম্বর '৯৯ মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপিত জননিরাপত্তা আইন নামক জঘন্য কালা কানুনের খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা বলেন দেশবাসী অবগত আছেন যে, কিছুদিন পূর্বে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দেশের উচ্চতর আদালত সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য করে উচ্চতর আদালতের রায়ের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছেন। তার রেশ যেতে না যেতেই আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উচ্চতর আদালত সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়ে জাতির সামনে প্রমাণ করেছেন যে, আওয়ামী লীগ উচ্চতর আদালতের স্বাধীনতা হরণ করে দেশকে বাকশালী বর্বরতার অন্ধকারে ফিরে নিতে চাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে সন্ত্রাস দমনের জন্য দেশে প্রচলিত আইনই যথেষ্ট, এ জন্য নতুন কোন কালাকানুনের আদৌ প্রয়োজন নেই। আইনের অভাবে দেশে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে না, সন্ত্রাস দমনে সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার অভাব এবং সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় ও লালনের কারণেই দেশে সন্ত্রাস বাড়ছে।[৩৩৩]

আওয়ামী সরকারের পদত্যাগ, সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে, গ্যাস রপ্তানি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র এবং ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডর প্রদানের প্রতিবাদে জামায়াতের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন থানায় জনসভার আয়োজন করা হয়। মোহাম্মদপুর থানার জনসভায় জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নিজামী বলেন, ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু করে আওয়ামী লীগ যেমন নিজেদের

শেষ রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি ১৯৯৯ সালেও সন্ত্রাস দমনের নামে কালো আইন চালু করে নিজেদের পতনকে ঠেকাতে পারবেনা।[৩৩৪] জামায়াতসহ বিরোধী জোট তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১২ সেপ্টেম্বর '৯৯ সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্মসূচি পালনকালে জামায়াত পল্টন চত্বরে বিজয়নগর সড়কে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। 'ঘেরাও' সমাবেশে জামায়াতের আমীর গোলাম আযম পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপের নিন্দা জানান। সমাবেশে তিনি ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর তিনদিনের লাগাতার হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচি চলাকালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতাসহ অনেকে আহত হন।[৩৩৫] বিরোধী জোটের লাগাতার ৬০ ঘন্টার হরতাল শুরুর প্রাককালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ঘোষণা করেন, হরতাল হবেনা, সবাই গাড়ি ঘোড়া চালাবেন, পুলিশ এবং দলীয় কর্মীরা প্রটেকশন দেবে।[৩৩৬] ১ম দিন হরতালের পর চারদলের এক প্রেস ব্রিফিং এ নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজপথে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীও সন্ত্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।[৩৩৭] টানা ৬০ ঘন্টা হরতাল পালন শেষে বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বিরোধী দলের আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে জামায়াত ২২ সেপ্টেম্বর '৯৯ রাজধানীতে সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। জামায়াত ও অন্যান্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন কার্যালয় ঘেরাও ও ৩ অক্টোবর সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৩৩৮] ৩ অক্টোবরে হরতাল সফল করার লক্ষ্যে ২রা অক্টোবর '৯৯ জামায়াত, জাতীয় পার্টি, ডেমোক্রেটিক লীগ, ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স (এনডিএ), জাগপা, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল (পিএনপি) ঢাকায় মিছিল বের করে। হরতাল প্রতিরোধে আওয়ামী লীগ রাজধানীতে মিছিল বের করে। পুলিশ বিএনপির মিছিল কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে গতিরোধ করে। পুলিশের ব্যারিকেড এবং আওয়ামী লীগের হরতাল প্রতিরোধ কর্মসূচির মধ্যে বিরোধী জোটের আহুত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতাল কর্মসূচি চলাকালে ১ জন নিহত হয়।[৩৩৯]

বিরোধী চার প্রধান দলের শীর্ষ বৈঠকঃ আন্দোলনের মাইলফলক

বিরোধী দলের ঐক্যকে শক্তিশালী করে সরকারের পতন ও সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে চলমান এক দফার আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পাটি এবং ইসলামী ঐক্যজোট এর মহাসচিবগণ ৮ অক্টোবর '৯৯ সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রধান শক্তি বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে এক বৈঠক মিলিত হন।[৩৪০] আন্দোলনরত বিরোধী চার প্রধান দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে মহাসচিব ও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যদের বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ২০ অক্টোবর জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে দলের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ ও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন ছাড়া

অন্য কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না বলে বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সরকার পতন আন্দোলনে বিরোধী জোট অধিকতর কার্যকর কর্মসূচি গ্রহন করবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চলমান সরকার পতন আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহন না করে উপজেলা, সিটি কর্পোরেশনসহ এক দলীয়ভাবে যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের অপচেষ্টা প্রতিহত করার অঙ্গীকার পূণর্ব্যক্ত করা হয়। বৈঠকে জামায়াতের আমীর আরো কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণের জন্য লিয়াজোঁ কমিটির প্রতি আহবান জানান। অধ্যাপক গোলাম আযম মহাসচিবদের সংগে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের এই বৈঠককে সময়োপযোগী হিসেবে বর্ণনা করে যথাশীঘ্র চারদলের শীর্ষ নেতার বৈঠক অনুষ্ঠান এবং সেই বৈঠক থেকে একটি ঘোষণার মাধ্যমে সরকার পতন আন্দোলনকে চূড়ান্ত পশুিরুতির দিকে নিয়ে যাবার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[৩৪১] বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্য জোটের মহাসচিবসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এই প্রথমবারের মত অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূইয়া, জাতীয় পার্টির মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জু, জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ছাড়াও চারদলের লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিএনপির এম শামসুল ইসলাম, আনোয়ার জাহিদ, জাতীয় পার্টির এ.বি.এম. গোলাম মোস্তফা, কাজী ফিরোজ রশিদ, জামায়াতের আবদুল কাদের মোল্লা, অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী, এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম, ইসলামী ঐক্যজোটের এ.আর. এম. আবদুল মতিন, অধ্যক্ষ মসউদ খান, পীরজাদা মুসলেহউদ্দিন আবু বকর মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২১ অক্টোবর '৯৯ দেশব্যাপী হরতাল পালনশেষে ২৩-২৬ অক্টোবর গণযোগাযোগ, ৩১ অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর রোড মার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৩৪২] নির্বাচন কমিশন ৬ ডিসেম্বর '৯৯ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করলে বিরোধী দল তা প্রত্যাখ্যান করে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রতিহত করাসহ বিরোধী দলের অন্যান্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ৭ ও ৮ নভেম্বর, ১৯৯৯ টানা ৪২ ঘন্টার হরতাল এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় বিরোধী দলের এক মঞ্চে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৪৩] চারদলের লিয়াজোঁ কমিটি ইতোপূর্বে ঘোষিত ৩০ অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর রোডমার্চ কর্মসূচি বাতিল করে ১লা নভেম্বর হরতাল পালন করে। সিটি নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনায় বিরোধী দলের যৌথ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভাগুলোতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের জনসভায় মাওলানা ফজলুল হক আমিনী, খুলনায় মতিউর রহমান নিজামী এবং রাজশাহীতে আবদুল মান্নান ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।[৩৪৪] হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচন কমিশন ৩টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত

ঘোষণা করে। ৭ ও ৮ নভেম্বর হরতাল পালনকালে তিনজন নিহত ও দুই শতাধিক আহত হয়।[৩৪৫] আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনায় হরতাল পালন ১ দিন বৃদ্ধি করা হয়। হরতাল উত্তর লিয়াজোঁ কমিটির সভায় ১৪ নভেম্বর '৯৯ বিরোধী চারদলের গণমিছিল-এর কর্মসূচি ঘোষিত হয়।[৩৪৬] বিরোধী দলের গণমিছিলের নেতৃত্ব দেন শীর্ষনেতৃবৃন্দ। জামায়াতের উদ্যোগে গণমিছিল পূর্ব এক সমাবেশ বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জামায়াত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘন, সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ তোলেন। তিনি ১৬ নভেম্বর হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[৩৪৭] হরতাল পালনশেষে চারদলের যৌথ সংবাদিক সম্মেলনে সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচিসমূহ ছিলঃ ২০ নভেম্বর থানাসমুহে জনসভা, ২২ নভেম্বর ঢাকায় সংসদ সদস্যদের মিছিল, ২৫শে নভেম্বর হরতাল পালন।[৩৪৮] আন্দোলনের এই পর্যায়ে ১৮ নভেম্বর '৯৯ তারিখ বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে চারদলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক এবং আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচানা হয়। চার শীর্ঘ নেতার বৈঠক যাতে দ্রুত করা যায় সে বিষয়ে মাওলানা নিজামী বেগম জিয়াকে পরামর্শ দিয়েছেন। বেগম জিয়া সহসা উক্ত বৈঠকের উদ্যোগ নেবেন বলে জামায়াত নেতাদের জানিয়েছেন।

আন্দোলনরত বিরোধী চার দলের শীর্ষ বৈঠক নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে আলাপ আলোচনা চলে আসছিল। অবশেষে ৩০ নভেম্বর, ১৯৯৯ চার দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শীর্ষ বৈঠকের ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ২৮ নভেম্বর, '৯৯ লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে ৪ দলের পেশকৃত পৃথক পৃথক খসড়া ঘোষণাপত্র আলোচনা করে চূড়ান্ত ঘোষণাপত্র তৈরী করা হয়। উক্ত বৈঠকেই ৩০ নভেম্বর শীর্ঘ বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হয়।[৩৪৯] বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবন ২৯ মিন্টো রোডে ৪ দলের শীর্ষ বৈঠকে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ.এম এরশাদ, জামায়াতে ইসলামী বংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও ইসলামী ঐক্য জোটের প্রধান শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চার মাহসচিব এবং লিয়াজোঁ কমিটির অন্য সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন। এক ঘন্টা ৫ মিনিট স্থায়ী শীর্ঘ বৈঠকে চার নেতা যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।

যৌথ ঘোষণায় ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হবে সে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার, সংবিধানের এ মূলনীতি সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন, বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল, রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। ঘোষণায় সরকারের নানা ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা হয় এবং বলা হয় সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়ে শেখ হাসিনার

নেতৃত্বে গঠিত ক্ষমতাসীন সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সকল বৈধতা হারিয়েছে।[৩৫০]

> যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, "বর্তমান সময়ের একমাত্র দাবি হল বর্তমান সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে সাংবিধানিক নিয়ম মোতাবেক তত্ত্বধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ও সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতি, আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রক্ষার এটাই আজ একমাত্র শান্তিপূর্ণ সংবিধানিক পথ। আমাদের চার দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই যে, যথাসত্বর ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে একটি দেশপ্রেমিক ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শক্তিশালী সরকার গঠন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান এক দফা আন্দোলন তীব্র হতে তীব্রতর হবে। চক্রান্ত যত কুটিলই হোক, নির্যাতন যত বর্বরই হোক, জনজোয়ার কখনও স্তব্ধ হয়না।"

ঘোষণায় সকল জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রকামী, ইসলামী দল, গ্রুপ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র সকল পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী সংগঠন ও ব্যক্তিকে চলমান গণআন্দোলনে শামিল হবার আহবান জানান হয়।

চার দলের শীর্ষ বৈঠক এবং যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে বিরোধী দলের আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। যৌথ ঘোষণা পরবর্তী মাসে (ডিসেম্বর '৯৯) বিক্ষোভ, গণসংযোগ এবং একাধিকবার হরতাল কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলনকে বেগবান করে তোলা হয়। এছাড়া ডিসেম্বর মাসে রমজান উপলক্ষে চারদলের ভিন্ন ভিন্ন ইফতার পার্টিতে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে বিরোধী দলের ঐক্যকে আরো সংহত করেন। শীর্ষ বৈঠক পরবর্তী ১ মাসে জামায়াতসহ বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপঃ

- ২রা ডিসেম্বর '৯৯ দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবস পালন উপলক্ষে জামায়াত বায়তুল মোকারম উত্তর গেটে সমাবেশ ও মিছিল বের করে।[৩৫১]
- ৫ ও ৬ ডিসেম্বর সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক দফা দাবিতে বিএনপি, জামায়াতসহ ৪ দলের হরতাল পালন। এ উপলক্ষে জামায়াত ৪ ডিসেম্বর ঢাকায় সমাবেশ ও মিছিল করে।[৩১৫২]
- ৮-২০ ডিসেম্বর বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করে।[৩৫৩]
- ১৩ ডিসেম্বর ঃ সারাদেশে ৬-৪টা হরতাল পালন। চারদলের মহাসচিবদের এক বৈঠকে (৯ ডিসেম্বর) এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দানের দিনও হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত হয়।[৩৫৪]

- ২৩ ডিসেম্বর ঃ জামায়াতে ইসলামীর ইফতার পার্টিতে বেগম খালেদা জিয়া, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান ও মাওলানা ফজলুল হক আমিনী যোগদান করেন। ইফতার মাহফিল শেষে শীর্ষ নেতাদের এক বৈঠকে এক দফার আন্দোলনকে জোরদার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।[৩৫৫]

- ২২ ডিসেম্বর ঃ চারদলের শীর্ষ নেতাদের ও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যদের এক সভায় বিরোধী দল সংসদ অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৫৬]

- ২০০০ সাল শুরু হয় বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন বয়কট, হরতাল আর বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বিরুদ্ধে ৩ জানুয়ারী, ২০০০ চার দলের ৬ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়। হরতালের সমর্থনে জামায়াত ঢাকায় মিছিল বের করে।[৩৫৭] ১৩ জানুয়ারী, ২০০০ অনুষ্ঠিত চার দলের লিয়াজোঁ কমিটির এক সভায় ১৬ জানুয়ারী দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবস এবং ২৩ জানুয়ারী ঢাকায় জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৫৮] আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌছানোর জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন সংক্রান্ত চারদলের যৌথ সার্কুলারে সাক্ষর প্রদান করেন চার দলের মহাসচিবগণ। ২১ জানুয়ারী, ২০০০ অনুষ্ঠিত চারদলের মহাসবিচবগণ এক সভায় মিলিত হয়ে এই যৌথস্বাক্ষর প্রদান করেন।[৩৫৯] একজন আহবায়কসহ সর্বোচ্চ ১০১ সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সার্কুলারে আহবান জানানো হয়।

বিরোধী দলের কর্মসূচি পালন উপলক্ষে জামায়াত ২৩ জানুয়ারী ঢাকায় এক জনসভার আয়োজন করে। জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সরকারের অপশাসন এবং জননিরাপত্তা আইনের সমালোচনা করে বলেন, আমরা বর্তমান সরকারকে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগেই বাধ্য করাবো না বরং একটি দেশপ্রেমিক সরকার ও গঠন করবো।[৩৬০]

সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াত অনেক সময় নিয়ামকের ভূমিকাও পালন করে। এক দফা আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা এবং আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য সম্ভাব্য কর্মসূচি নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ২৫ জানুয়ারী, ২০০০ বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে ২৯ মিন্টোরোডস্থ বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকৌশল ও কর্মসূচি আলোচনা হয়। বৈঠকে অধ্যাপক গোলাম আযম সংসদ থেকে বিরোধী দলের সদস্যদের পদত্যাগের বিষয়টিও উত্থাপন করেন। বৈঠকে তাঁর সাথে ছিলেন জামায়াত নেতা মোঃ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা ও মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী।[৩৬১]

জননিরাপত্তা আইন (বিশেষ বিধান) ২০০০ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ও বিরোধী দলের প্রতিক্রিয়া

১৯৯৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর জননিরাপত্তা আইন নিয়ে বিরোধী জোট ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে। বিরোধী দলের প্রতিক্রিয়ার মুখে আওয়ামী লীগ সরকার জননিরাপত্তা আইনকে (পিএস এ) চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ২৭ জানুয়ারী, ২০০০ সংসদে উত্থাপন করে। সংসদে পিএসএ (PSA) উত্থাপিত হওয়ার দিনই জামায়াত ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করে।[৩৬২] জননিরাপত্তা আইন ৩০ জানুয়ারী ২০০০ সংসদে পাস করা হয়। এ আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ৯ ধরনের অপরাধের শাস্তি ও বিচারের ব্যবস্থা। যেমন ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সরকারি-বেসরকারি গাড়ি ভাংচুর, টেন্ডার জমাদানে বাধা দান, অপহরণ, যানবাহন চলাচলে বাধা প্রদান, সন্ত্রাস সৃষ্টি, মিথ্যা মামলা রুজু এবং অপরাধ সংগঠনে সাহায্য করা। নব্বই দিনের মধ্যে বিচারের ব্যবস্থা এবং অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে ২ থেকে ১৪ বছরের কারাদন্ড এবং জরিমানার বিধান করা হয়েছে জননিরাপত্তা আইনে। এই আইনের অধীনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জামিন দেয়া যাবে না এবং শাস্তিপ্রাপ্ত কেউ অন্য কোন আদালতে এর বৈধতার প্রশ্ন তুলতে পারবেনা। তবে এ আইনের অধীন দন্ডিত ব্যক্তি ৩০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল করতে পারবে।[৩৬৩] জননিরাপত্তা আইন সংসদে পাস হওয়ার প্রতিবাদে চারদলীয় জোট ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সারাদেশে ৩৬ ঘন্টার হরতাল পালন করে। চারদলের পক্ষ থেকে বলা হয়, এ আইন বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের নির্যাতনের জন্য ব্যবহৃত হবে। বিরোধী জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বিরোধী দলের নেতা নেত্রীকে জেলে নিক্ষেপ করে একতরফাভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার জননিরাপত্তা আইন তৈরী এবং পাস করেছে। তিনি বলেন, এই আইনের লক্ষ্য হচ্ছে বিরোধী দলকে দমন এবং একদলীয় বাকশাল শাসন পুনঃপ্রবর্তন করা।[৩৬৪] বেগম খালেদা জিয়া ৩১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বিচাপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে স্বাক্ষাৎ করে জননিরাপত্তা আইন সংক্রান্ত বিলে স্বাক্ষর না দেয়ার অনুরোধ করেন।[৩৬৫] জননিরাপত্তা আইনের বিলে স্বাক্ষর না দেয়ার অনুরোধ করতে রাষ্ট্রপতির সাথে স্বাক্ষাতের এর অনুমতি পাননি জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম।[৩৬৬] জননিরাপত্তা আইন পাসের প্রতিবাদে ৮ ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের এমপিগণ অনশন ধর্মঘট পালন করে এবং এ সংক্রান্ত বিলে স্বাক্ষর না দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আহবান জানায়।[৩৬৭]

জননিরাপত্তা আইন বাতিল ও অবিলম্বে আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পল্টন ময়দানে আন্দোলনরত প্রধান চার দল বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের উদ্যোগে ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরুর পর এই প্রথম চারদলের শীর্ষ নেতৃত্ব যথাক্রমে বিএনপি চেয়ারপর্সন বেগম খালেদা জিয়া, জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম,

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ.এম. এরশাদ ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এক মঞ্চে বসে সরকার বিরোধী আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একমঞ্চ থেকে বিরোধী নেতৃবৃন্দের চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দেয়া হয়। ১৫-১৭ ফেব্রুয়ারী একটানা ৩ দিন সারাদেশে সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের এ ঐক্য ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম।[৩৬৮] ১৩ ফেব্রুয়ারী পল্টনের জনসভায় অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার দেশের স্বাধীনতা, ইসলামী মূল্যবোধ, মুসলিম জাতি সত্তার চেতনা ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ধবংস করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা বিজাতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ জাতির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তাই সরকারের পতন ঘটাতে ও দেশ গড়ার লক্ষ্যে ৪ দলীয় জোটের শীষ বৈঠকের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র-শিক্ষক, ওলামা-মাশায়েখ, কৃষক শ্রমিক ও পেশাজীবীদের ঐকবদ্ধ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য তিনি উদাত্ত আহবান জানান। জনসমাবেশ শেষে জামায়াতের আমীর গণমিছিলের নেতৃত্ব দেন। মিছিলে হামলা সংঘটিত হয়। গোটা এলাকা পুলিশের টিয়ারগ্যাস ও মিছিলকারিদের ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের কারণে শুরুাঙ্গনে পণ্ডিরুত হয়।[৩৬৯]

১৫-১৭ ফেব্রুয়ারী একটানা ৩৬ ঘন্টা হরতাল পালনের পর ২৭ ফেব্রুয়ারী আরো একদিন হরতাল পালিত হয়।[৩৭০] ফেব্রুয়ারীতে বিরোধীদলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের এক মঞ্চে বক্তৃতা ও চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক নেতা কর্মীদের উৎসাহিত করলেও মার্চের শেষ ভাগে আন্দোলন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। নেতা কর্মীদের মধ্যে কিছুটা হতাশার ভাব দেখা যায়। এ হতাশা কেটে যায় চট্টগ্রামে বিরোধী দলের মহাসমাবেশে চার শীর্ষ নেতার উপস্থিতি ও ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে। ৪ এপ্রিল, ২০০০ চট্টগ্রাম চার শীর্ষ নেতার মহাসমাবেশ দেশবাসীর মধ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। সমাবেশে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, সরকারের পতন ঘটিয়ে আগামী দিনের সরকার গঠন না করা পর্যন্ত আমাদের ঐক্য বহাল থাকবে।[৩৭১] সরকার পতন আন্দোলনের পাশাপাশি চার দল আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, সরকারের দুর্নীতি ও বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিবাদে ২০ এপ্রিল, ২০০০ সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এ উপলক্ষে জামায়াত ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে।[৩৭২] বিভাগীয় শহরগুলোতে ৪ দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি ও মহাসমাবেশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ২৫ এপ্রিল রাজশাহীতে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২০০০ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে বিরোধীদলের কয়েকটি কর্মসূচিতে সরকার বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২৬ এপ্রিল, ২০০০ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন, ৩০ এপ্রিল সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহাসিক জনসভা এবং ৯ মে পল্টনে ছাত্র সমাবেশের আয়োজন। সরকার পতনের অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন করা হয়। ২০০০ সালের ২৬ এপ্রিল, এ সংক্রান্ত ইশতেহারে বলা হয়, ছাত্র জনতার ঐকবদ্ধ আন্দোলন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও

দেশে জাতীয়তাবাদী ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সরকার গঠনে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করবে। দেশের মোট ৮ টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন করা হয়। ছাত্র সংগঠনগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির, জাতীয় ছাত্রসমাজ, ইসলামী ছাত্র মজলিস, জাগপা ছাত্রলীগ, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্র সমাজ। লিখিত ইশতেহারে ঐক্যের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ১৬ দফা কর্মসূচি উল্লেখ করে ৯ মে পল্টন ময়দানে ছাত্র মহাসমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৩৭৩]

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় এ রকম ছাত্র ঐক্য গঠিত হয়েছিল। ছাত্রঐক্যের উল্লেখ্যযোগ্য দাবি ছিলঃ (১) আওয়ামী সরকারের আমলে গঠিত শিক্ষা কমিশন ও কমিশনের রির্পোট বাস্তবায়নের সকল কর্মকান্ড বাতিল এবং মানুষের আদর্শিক মূল্যবোধের আলোকে একটি উৎপাদন ও কল্যাণমূখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন (২) আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর নির্যাতনকারী প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কালো তালিকা প্রণয়ন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ (৩) ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহার (৪) বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তাবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী প্রণীত সকল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি বাতিল। ইশতেহারে ১৬ দফা দাবি পেশ করে বলা হয়, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, নিষ্কন্টক শিক্ষাজীবন, জাতীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণ, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বর্তমান সরকারের পতন ঘটিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে দাবী সমূহ আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যহত রাখবে।

৩০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় (পল্টন ময়দানে) চারশীর্ষ নেতা বক্তব্য রাখেন। ৪ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আওয়ামী লীগ লাঠি মিছিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের ভয় দেখাতে চায়। তিনি বিচারপতিদের প্রতি লাঠি নিয়ে মিছিল করে হুমকি দেয়ার অভিযুক্ত মন্ত্রী ও সরকারি দলের নেতাদের জননিরাপত্তা আইনে অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন। জনসভায় জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, আওয়ামী সরকার ধ্বংসের সরকার। দেশ গড়ার কোন পরিকল্পনা, যোগ্যতা বা ক্ষমতা ওদের নেই। এদের যোগ্যতা শুধু ভাঙ্গার। দেশের প্রশাসনকে এরা ধ্বংস করেছে। তারা এখন বিচার বিভাগের ওপর হাত দিয়েছে। এর আগে বিচার বিভাগ নিয়ে কটূক্তি করায় প্রধানমন্ত্রীকে সুপ্রীমকোর্ট মৃদু ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে।[৩৭৪]

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিরোধী দলের আলোচনার প্রস্তাব ৯ মে অনুষ্ঠিত চার দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বৈঠকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সিইসি (CEC) নিয়োগের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। ৯ মে, ২০০০ পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মহাসমাবেশে ছাত্রনেতৃবৃন্দ বলেন, প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দেব তবু সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবো না।[৩৭৫] আওয়ামী সরকারের পদত্যাগ, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ, গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীদের মুক্তি ও মিথ্যে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য দেশব্যাপী ১৮মে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি পালন করে। ঢাকায় পৃথক পৃথকভাবে ছাত্র সংগঠনগুলো বিক্ষোভ মিছিল করে।[৩৭৬]

সরকার বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি জামায়াত দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ২০০০ সালে মে মাসের শেষ সপ্তাহ দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করে।[৩৭৭] জুন-জুলাই বিরোধী দলের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ায় নেতা কর্মীদের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। জোটবদ্ধ নির্বাচন নিয়ে সংশয়ের কথা পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়। জেলাগুলোতে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হলেও তেমন কোন কর্মসূচি ছিলনা।[৩৭৮] এমনি প্রেক্ষাপটে লিয়াজোঁ কমিটির সাথে বেগম খালেদা জিয়ার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৬ জুলাই, ২০০০। বৈঠকে খালেদা জিয়া বলেন সংশয়ের কোন অবকাশ নেই ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন নির্বাচন ও সরকার গঠন করা হবে।[৩৭৯] বেগম খালেদা জিয়ার পর লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যগন এইচ এম. এরশাদ এবং অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে বৈঠক করেন যথাক্রমে ১৮ ও ২০ জুলাই, ২০০০। ২৫ জুলাই চারদলের গণমিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[৩৮০] বেগাম খালেদা জিয়া, এইচ.এম. এরশাদ, মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী সহ বিরোধী দলের ১৩১ জন এমপি ৭ আগষ্ট, ২০০০ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন, গণমাধ্যমের সাথে সাক্ষাৎকার ও চট্টগ্রামের জনসভায় প্রধান মন্ত্রীর প্রদত্ত বক্তব্যসমূহকে স্বৈরাচার একনায়কের দম্ভ, আইনের শাসনের প্রতি হুমকি এবং নৈরাজ্যের নগ্ন উস্কানি বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রিকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।[৩৮১] ২০০০ সালের ২১ আগষ্ট বিএনপি, জাতীয় পাটি ও জামায়াতের সংসদ সদস্যগন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে।[৩৮২] একই ইস্যুতে প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন এবং সুপ্রীম কোর্টের তিনশতাধিক আইনজীবী পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করে।[৩৮৩]

২০০০ সালের শেষ দিকে বিরোধী দলের আন্দোলনে মাঝে মাঝে হতাশা ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ঐকবদ্ধ নির্বাচন ও সরকার গঠন নিয়ে আন্দোলনরত প্রধান দলগুলোর নেতৃত্বের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই সময় চারদলের অন্যতম শরিক জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ.এম. এরশাদের বিরুদ্ধে জনতা টাওয়ার মামলায় হাইকোর্টের রায় ঘোষণা করা হয়। ২৪ আগষ্ট, ২০০০ তারিখে হাইকোর্টের রায়ে এরশাদকে কারাদন্ড প্রদান করা হলে চারদলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ঐ দিনই এক জরুরি

সভায় মিলিত হয়ে এক সাথে নির্বাচন ও সরকার গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যৌথ ঘোষণা প্রদান করেন। চার শীর্ষ নেতার এই যৌথ ঘোষণার ফলে রাজনৈতিক অঙ্গন নাটকীয়ভাবে সরগরম হয়ে ওঠে। বিরোধী জোট গা ঝাড়া দিয়ে আন্দোলন চাঙ্গা করার তোড়জোর শুরু করে। পারস্পরিক সন্দেহ-সংশয় অবিশ্বাস কাটিয়ে বিরোধী ঐক্য আরো সংহত হয়। বিরোধী জোটের সে যৌথ ঘোষণায় পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী সরকার গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে করার অঙ্গীকার পুণর্ব্যক্ত করে বলা হয়, আঘাত আর যত নিপীড়নই আসুক না কেন বর্তমান আওয়ামী দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে একটি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করা হবে। ঘোষণায় আরো বলা হয় ''আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করব। জনগণের ইচ্ছায় প্রতিফলন ঘটিয়ে ভবিষ্যৎ সরকারও আমরা ঐকবদ্ধভাবে গঠন করবো"।[৩৮৪] চারশীর্ষ নেতার ঐ যৌথ ঘোষণার তাৎপর্য বর্ণনা করে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং পৃথক জাতি সত্তা রক্ষার অঙ্গীকারই চারদলীয় জোটের ঐক্যের ভিত্তি। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জোটের শীর্ষ নেতারা গত ২৪ আগষ্ট ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন ও সরকার গঠনের যে ঘোষণা দিয়েছেন তা দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত করেছে। এতে জোটের ঐক্য আরো মজবুত ও সংহত হয়েছে। আশাকরি এর ফলে সরকার পতনের আন্দোলন বেগবান হবে এবং আন্দোলন এর অভীষ্ট লক্ষ্য পৌছাতে সক্ষম হবে।"[৩৮৫]

২৪ আগস্ট যৌথ ঘোষণার পর চারদলের আহবানে ৩০ আগস্ট হরতাল পালন এবং ৮ সেপ্টেম্বর খুলনায় চার শীর্ষ নেতার উপস্থিতিতে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহাসমাবেশে চার শীর্ষ নেতা পরবর্তী নির্বাচন ও সরকার গঠন পর্যন্ত ঐকবদ্ধ থাকবেন বলে ঘোষণা করেন।[৩৮৬] বিভাগীয় শহরগুলোতে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠানের পর চারদল সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০০০ এ ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরসহ কয়েকটি স্থানে মহাসমাবেশের আয়োজন করে। প্রতিটি মহাসমাবেশ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। মহাসমাবেশ, গণমিছিল, হরতাল, ধর্মঘট, সংসদ অধিবেশন বর্জন ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে চার দল ২০০০ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। বছরের শেষ দিকে রাজনৈতিক অঙ্গন খুব বেশি সরব ছিলনা।

২০০১ সালের শুরু থেকে আন্দোলন বেগবান করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০০০, চার দলের মহাসচিবদের সাথে বেগম খালেদা জিয়ার এক বৈঠকে ১৫ জানুয়ারী থেকে ৩০ জানুয়ারী পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ১৫ জানুয়ারী, ২০০১ কুমিল্লায় মহাসমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কর্মসূচি শুরু হয়।[৩৮৭] ২০০১ সালের ১ম দিন হাইকোর্টের এক মামলার রায়ে 'ফতোয়া' প্রদান অবৈধ ঘোষণা

করা হলে ইসলামী ঐক্যজোটসহ ইসলামী দলগুলো ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। জননিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী জেলা ও মহানগর সদরে গণমিছিলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৮ জানু ২০০১ ঢাকায় পল্টন ময়দানে বিএনপি জামায়াতসহ চার দলের গণমিছিলপূর্ব এক সমাবেশ বিরোধী জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অবিলম্বে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে প্রধানমন্ত্রিকে পদত্যাগের আহ্বান জানান। জননিরাপত্তা আইন বাতিল এবং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ২২শে জানুয়ারী সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। গণমিছিলে বেগম জিয়া ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ, ইসলামী ঐক্যজোটের মাওলানা আজিজুলহকসহ চারদলের মহাসচিবগণ বক্তব্য রাখেন।[৩৮৮] ঢাকায় গণমিছিলের পর সরকার পতন আন্দালনকে আরো বেগবান করার জন্য চার দল যশোর, বান্দরবান, রংপুরে মহাসমাবেশের আয়োজন করে যথাক্রমে ২৫ জানুয়ারী, ৩০ জানুয়ারী ও ৪ ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০০১ তারিখে। বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার, জুলুম নির্যাতন, পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারী, ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ও সরকারের পদত্যাগের দাবীতে ১৩ ফেব্রুয়ারী হরতাল এবং ১৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হয়। ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় চারদলের মহাসমাবেশে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বেগম খালেদা জিয়া উপরোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[৩৮৯]

১৩ ফেব্রুয়ারীর হরতালে ঢাকায় মালিবাগে সরকার দলীয় জনৈক এম.পির নেতৃত্বে বিরোধী দলের মিছিলে হামলা পরিচালনা করলে কয়েকজন নিহত হয়।[৩৯০] বিরোধী দলের মিছিলে হামলা এবং নেতা কর্মী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৪ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারীও হরতাল আহবান করা হয়। সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ-সংঘাতের মধ্যদিয়ে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারী একটানা হরতাল সরকার পতন আন্দোলন 'টার্নিং পয়েন্ট' উপনীত হয়। ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারীর হরতালে ঢাকাসহ সারাদেশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। পরপর ৩ দিন হরতালে সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যবসা বাণিজ্য, দোকানপাট, কলকারখানা বন্ধ থাকে। ১৩ ফেব্রুয়ারী মালিবাগে চার হত্যাকান্ডের পর বিরোধী দলের আন্দোলন গণআন্দোলন পত্তিরুত হয়। মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আসে। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বেকার হরতাল কর্মসূচিতে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি চোখে পড়লেও ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী হরতাল কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সরব উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।[৩৯১]

১৩-১৫ ফেব্রুয়ারী হরতাল কর্মসূচি পালনকালে জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পূর্ণিমায় জামায়াতের তৎপরতার খন্ডচিত্র নিম্মোক্ত ভাবে উল্লেখ করা হয়।

"১৩ ফেব্রুয়ারী সকাল ৭ টায় সময় জামায়াতের একটি মিছিল বের হয়। মিছিলের সামনে ছিলেন মহানগর কমিটির আমীর এটিএম আজাহারুল ইসলাম। জামায়াতের মিছিলটি পল্টন, বিজয়নগর, কাকরাইল ও নয়াপল্টন এলাকা দফায় দফায় প্রদক্ষিন করে অতঃপর পথসভা করে। ১৪ তারিখের হরতালের সমর্থনে জামায়াত সকাল ৮ টায় সময় পল্টন থেকে মিছিল বের করে। এ মিছিলের সম্মুখ ভাগে ছিলেন এটি এম আজহারুল ইসলাম, মাওলানা এটিএম মাসুম, রফিকুল ইসলাম খান, আহমদ উল্লাহ, জসীম উদ্দিন সরকার প্রমূখ। জামায়াত মহানগর কমিটির এই নেতারা সারাদিন দফায় দফায় মিছিল ও পথসভা করেন। জনাব আজহারের নেতৃত্বে কস্তুরী থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিজয়নগর, নয়াপল্টন হয়ে আবার পুরানা পল্টনে চলে যায়। ১৫ ফেব্রুয়ারী হরতালের দিন জামায়াতের পক্ষে ফজরের পর পরই প্রথম মিছিল বের করে ইসলামী ছাত্রশিবির। তারা সরকারের পদত্যাগ ও হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দেয়। সকাল ৯ টার সময় জামায়াতের মহানগর শাখার নেতা রফিকুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে পল্টন থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি দৈনিক বাংলা, পুরানা পল্টন, বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ১১ টার পর জামায়াতের এটিএম আজহারুল ইসলাম ও অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দীন সরকারের নেতৃত্বে আরেকটি বড় মিছিল বের হয়ে কস্তুরী হোটেলের নিচ থেকে। মিছিলটি বিজয় নগর, নয়াপল্টন, ফকিরাপুল ঘুরে পল্টনে এসে শেষ হয়।"

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৯ জুলাই, ২০০১ চারদলের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয পল্টন ময়দানে। শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী আন্দোলনের এটিই ছিল শেষ মহাসমাবেশ। সমাবেশে চারদলের শীর্ষ নেতা বেগম খালেদা জিয়া, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও শায়খূল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক বক্তব্য রাখেন। জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৩ জুলাই সপ্তম সংসদ বিলোপের দিন রাত ১২-০১ মিনিটে ৪ দলের উদ্যোগে গণমিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এছাড়া তিনি তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রতি গ্রেপ্তারকৃত বিরোধী নেতা কর্মীদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি করেন।[৩৯২] অবশেষে বিরোধী দলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মেয়াদপূর্তির পর নিয়মতান্তিকভাবে ১৩ জুলাই ২০০১ সপ্তম জাতীয় সংসদের বিলোপ ঘটে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এই প্রথম একটি সংসদ এর স্বাভাবিক মেয়াদ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। সপ্তম সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১৪ ই জুলাই, মোট ২৩ অধিবেশনে ৩৮২ দিন কর্মদিবসে ১৯০ টি বিল পাস হয় ৭ম সংসদে।[৩৯৩] সংবিধান মোতাবেক প্রাক্তন প্রধান বিচাপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ১৫ জুলাই-২০০১ শপথ গ্রহণ করেন। এরই মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকারের কার্যকাল সমাপ্তি ঘটে।

নির্বাচন ও সংসদীয় গণতন্ত্র: জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং ১১নং ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে "গণতন্ত্রকে" ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ১১নং ধারাটি হচ্ছে:- "প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক

মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।"[৩৯৪] সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় সরকার কায়েম হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর বহুদলীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশ পথচলা শুরু করে। নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন গণতন্ত্রের সোপান। ইসলামী পন্ডিত ও দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীসহ অধিকাংশ ইসলামীদল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক পন্থাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে।

গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের ব্যাপারে জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে দলের "সংগঠন পদ্ধতি" বইতে বলা হয়েছে:

> "জামায়াত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ ও যোগ্য লোককে নেতৃত্বে বসাতে চায়। আর নির্বাচনই হচ্ছে এখানে বড় মাধ্যম। তাই জামায়াত স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতার পরিবর্তন চায়। এ কারণে স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে যখনই কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, জামায়াত তাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। প্রতি নির্বাচনকালে জামায়াত এর নীতি নির্ধাই করে। অধঃস্তন সংগঠনগুলো সেই নীতির ভিত্তিতে নির্বাচনে ভূমিকা পালন করে।"[৩৯৫]

জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাঈয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (রহ:) তাঁর সুবিখ্যাত "ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী" শীর্ষক গ্রন্থে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন "আমরা যে দেশে বসবাস করছি সেখানে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর সে ব্যবস্থার নেতৃত্বের পরিবর্তনের একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন। একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কোন অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন শরীয়তে আপনাদের পক্ষে নাজায়েয।"[৩৯৬] ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী হিন্দের প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের "মৌলিক গণতন্ত্রের" (Basic Democracy) অধীনে ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াত প্রথম বারের মত পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে জামায়াতের চার জন এম.এন.এ (MNA, Member of National Assembly) এবং দু'জন এমপিএ (MPA-Member of Provincial Assembly) নির্বাচিত হন।[৩৯৭]

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের একমাত্র সাধাই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী অংশ গ্রহণ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে বগুড়ায় আবদুর রহমান ফকির একমাত্র সদস্য

নির্বাচিত হন। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন আসন পায়নি জামায়াত। ১৯৭০-এর নির্বাচনে জামায়াতের ফলাফল : জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব থেকে ১টি, সিন্ধু থেকে ২টি এবং সীমান্ত প্রদেশ থেকে ১টিসহ মোট ৪টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ১টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেম থেকে ১টি করে মোট ৩টি আসন লাভ করে।[৩৯৮]

স্বাধীনতা যুদ্ধে ইসলামী দলগুলোর বিরোধী ভূমিকা পালন করার কারণে বাংলাদেশের প্রথম সরকার (মুজিব সরকার) ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং ইসলামী দলসমূহের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন ইসলামী দল অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হলে ইসলামী রাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত ২য় সংসদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ- আইডিএল জোট ২০টি আসন এবং প্রাপ্ত ভোটের শতকরা ১০.০৮ভাগ ভোট পায়। নির্বাচনে আই ডিএল এর ৬জন নির্বাচিত হন যারা মূলত: জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি ছিলেন। আইডিএল এর ৬ জন এম.পি ছিলেন: মাওলানা আবদুর রহীম (বরিশাল), অধ্যাপক সিরাজুল হক (কুড়িগ্রাম), মাওলানা নুরুন্নবী শামদানী (ঝিনাইদহ), মাষ্টার মোঃ শফিকুল্লাহ (লক্ষ্মীপুর), এ.এস.এম. মোজাম্মেল হক (ঝিনাইদহ) ও অধ্যাপক রিজাউল করিম (গাইবান্ধা)। মাওলানা আবদুর রহীম (পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম নির্বাচিত আমীর) ৬ জন এমপির গ্রুপলিডার এবং মাষ্টার শফিকুল্লাহ (স্বাধীনতা পরবর্তী আন্ডারগ্রাউন্ড সময়ে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন) ডেপুটি লিডার ছিলেন। নিম্নের সারণিতে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল উল্লেখ করা হলো।

১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	বিজয়ী আসন	মোট প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোট%
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৯৮	২০৭	৭৯,৩৪,২৩৬	৪১.১৭
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯	৪৭,৩৪২৭৭	২৪.৫৬
মুসলিম লীগ ও আই ডি এল	২৬৬	২০	১৯,৪১৩৯৪	১০.০৭
জাসদ	২৪০	০৮	৯,৩১৮৫১	৪.৮৩
অন্যান্য দল	৫০৪	১০	১৭,৬২২৬৬	৯.৯৮
স্বতন্ত্র	৪২২	১৬	১৯,৬৩,৩৪৫	১০.১৯

উৎস : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট থেকে গবেষক কর্তৃক সারণিকৃত

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, বংলাদেশে প্রথম সরকারের সময় নিষিদ্ধ থাকা মুসলিম লীগ এবং জামায়াতে ইসলামী (আই ডি এল নামে নির্বাচন করে) তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভুত হয়। প্রায় ২০ লাখের মত ভোট পেয়ে ইসলামী দলগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের শক্ত অবস্থানের পরোক্ষ ইঙ্গিত প্রদান করে। রাজনৈতিক দিক থেকে নির্বাচনের ফলাফল বড় ধরণের কোন সাফল্যের পরিচায়ক না হলেও আদর্শিক দৃষ্টিতে এটি ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এটি দেশের ইসলামী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুসলিম জনমনে একটি বলিষ্ঠ আশাবাদ মূর্ত করে তুলেছিল। এর মাধ্যমেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামী শক্তির নবজাগৃতির ইংগিত অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছিল।[৩৯৯]

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সামরিক শাসক লে:জে: হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেই সংসদ ভেঙ্গে দেন। এরশাদের ক্ষমতা দখলের ১ বছর পর থেকেই বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামীসহ সকল বিরোধী দল এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। যুগপৎভাবে পরিচালিত সে আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৮৬ সালের মে মাসে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান দল বিএনপি সে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করলেও আন্দোলনের শরিক জামায়াতে ইসলামী অংশ গ্রহণ করে। জামায়াত সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের অংশ ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচনী দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সময় জামায়াতের মজলিশে শুরার এক অধিবেশনে ৩ বছরের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন পর্যালোচনা করে সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আন্দোলনকে নব পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সমীচীন বিবেচনা করে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪০০] মূলত: বিএনপি তার অভ্যন্তরীণ কারণে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি। তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে ২৮টি রাজনৈতিক দল থেকে ১০৭৮ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ৪৫৩ জন।[৪০১] মারাত্মক সন্ত্রাস এবং সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ব্যালট ডাকাতি, সন্ত্রাস, মিডিয়া ক্যু ছিল এ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য। নির্বাচনের দিন কমপক্ষে ১৫ জন নিহত এবং ৭৫০ জন আহত হয়।[৪০২] নির্বাচনে সরকারের গণভোট ডাকাতির চিত্র উম্মোচিত হয়। নির্বাচনের দিন বিকেলেই জাতীয় প্রেস ক্লাবে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ব্যালট ডাকাতির মাধ্যমে সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জামায়াতে ইসলামী এ প্রথম স্বনামে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। জাতীয় সংসদের ৭৬টি আসনে জামায়াত প্রার্থী দেয়। এর মধ্যে ১০ টি আসনে বিজয়ী হয় এবং ১৫টি আসনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।[৪০৩] জামায়াত সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩ সীট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং আওয়ামী লীগ ৭৬ টি আসন পেয়ে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল নিম্নের সারণি থেকে জানা যায়:

মে '৮৬ জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ফলাফল

দল/স্বতন্ত্র	বিজয়ী আসন	বিজয়ী আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত মোট ভোট	প্রাপ্তভোটের শতকরা হার (প্রদেয় মোট ভোটের ভিত্তিতে)
জাতীয় পার্টি	১৫৩	৫১.০০	১,২০,৭৯,২৫৯	৪২.৩৪
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬	২৫.৩৩	৭৪,৬২,১৫৭	২৬.১৬
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০	৩.৩৩	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মোজাফফর)	০৫	১.৬৬	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	০৫	১.৬৬	২,৫৯,৭২৮	০.৯১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	০৪	১.৩৩	৭,২৫,৩০৩	২.৫৪
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	০৪	১.৩৩	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	০৩	১.০০	২,৪৮,৭০৫	০.৮৭
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	০৩	১.০০	১,৯১,১০৭	০.৬৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	০৩	১.০০	১,৫১,১০৭	০.৫৩
ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি	০২	০.৬৬	২,০৩,৩৬৫	০.৭১
অন্যান্য দল	০০	০০	৪,৯০,৬৮৯	১.৭৩
স্বতন্ত্র	৩২	১০.৬৬	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯

সূত্র: *Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission Report, Jatïya Sangsad Election 1986.*

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জামায়াত সদস্যগণ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রথমবারের মত যোগদান করেন। সংসদে জামায়াত সরকারের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক নীতি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর উত্থাপিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে জামায়াত সংসদীয় দলের নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন,

> "মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চেয়েছেন খুব জোরে সোরে। আমিও জোরে সোরে বলতে চাই, যারা বন্দুক দ্বারা ক্ষমতা দখল করেন, তাদের পক্ষে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া কোন কালেই সম্ভব নয়।... দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য যে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে, সেই দুর্নীতি যদি চলে যায় তাহলে হয়তো ধন্যবাদ এসে যেত এবং সেটা শোভাও পেত। কিন্তু দুর্নীতি মাননীয় স্পীকার, এখন কি আছে, না নেই, এটা জাতির কাছে প্রশ্ন। যদি থাকে তাহলে সে কথা ধোপে টিকে না।[৪০৪]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খান জেলা পরিষদ বিলের মাধ্যমে জেলা পরিষদকে সামরিকীকরণের প্রতিবাদ করেন এবং যে সংসদে গণবিরোধী বিল পাস হতে যাচ্ছে সে সংসদ বয়কট করার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যগণ জেলা পরিষদ বিলের প্রতিবাদে ১২ জুলাই ১৯৮৭ জাতীয় সংসদের অধিবেশন বয়কট করেন।[৪০৫] বিল পাসের দিন জামায়াতসহ অন্যান্য বিরোধী জোট ও দল সকাল সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। জামায়াতে ইসলামী জেলা পরিষদ বিলকে বেসামরিক প্রশাসনকে সামরিকীকরণ হিসেবে আখ্যায়িত এবং এর তীব্র সমালোচনা করেন। এ বিলের প্রতিবাদ এবং সরকারের পদত্যাগের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার ব্যাপারে জামায়াত দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ১০ নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল এবং জামায়াত ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকার এ কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। অবরোধের দিন বিরোধী দলের ওপর চালায় নজিরবিহীন নির্যাতন। শত ষড়যন্ত্র বা নির্যাতনের পরও ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি সফল হয়। সরকার বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনাকে অন্তরীণ করে রাখে। অনেক বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সরকারি নির্যাতন, গ্রেফতার এবং হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ১১ তারিখ থেকে হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। অবরোধের পর ২/১ দিন ব্যতীত প্রায় পুরো নভেম্বরই অতিবাহিত হয় হরতাল অবরোধের মাধ্যমে। আন্দোলনের এ পর্যায়ে সংসদ ছেড়ে আন্দোলনের মাঠে নামার জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে সকল বিরোধী দলীয় সদস্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় রাজধানী ঢাকায় এক সমাবেশে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদ ত্যাগের পক্ষে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, জামায়াত সংসদ সদস্যরা পদত্যাগে প্রস্তুত। আপনারা এগিয়ে আসুন। সংসদ ছেড়ে যৌথভাবে এ সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামুন।[৪০৬] ১৪৪ ধারা জারি, দেখামাত্র গুলির নির্দেশ, ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা জারি, বহু অমূল্য জীবন নাশ, নির্যাতনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইনে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ রাজনৈতিক নেতা, সংসদ সদস্য ও নিরীহ লোককে অন্যায়ভাবে আটক, মৌলিক অধিকার খর্ব, সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে এবং এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে জনগণের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জামায়াত সদস্যগণ জাতীয় সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ৩রা ডিসেম্বর '৮৭ জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির আব্বাস আলী খান জামায়াতের ১০ জন সদস্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[৪০৭] ঘোষণা মোতাবেক জামায়াতের ১০ জন সদস্য ৪ঠা ডিসেম্বর স্পীকারের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করেন কিন্তু স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী তা গ্রহণ করেননি। তিনি জানান, সংসদ চলাকালে স্পীকারের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করা যায়। অন্য সময় সংসদ সচিবের নিকট দিতে হয়। পরবর্তীতে ৫ই ডিসেম্বর জামায়াত দলীয় ১০ জন সংসদ সদস্য সংসদ সচিবের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন।[৪০৮] বাংলাদেশের ইতিহাসে দলীয়ভাবে সংসদ সদস্যদের সম্মিলিত পদত্যাগ এই

প্রথম। সংসদ থেকে জামায়াতের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিনন্দিত হয়েছিল।

জামায়াতে ইসলামীর এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উৎসাহিত এবং তীব্র করেছে। জামায়াতের কট্টর বিরোধী অনেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমেও জামায়াতের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান। এমন কি ভারত থেকে কাদের সিদ্দিকীও পত্র মারফত জামায়াতের এ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান। উল্লেখ্য, জামায়াত এর সদস্যগণকে তৃতীয় জাতীয় সংসদ পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন ঘোষণা দিয়েছিল, সংসদ সদস্যগণ সংসদে গিয়ে অগণতান্ত্রিক সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে থাকবেন এবং প্রয়োজনে জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যগণ সদস্যপদ ত্যাগ করবেন।

জামায়াতসহ বিরোধী জোট ও দলের লাগাতার ৭২ ঘন্টা কর্মসূচি ঘোষণায় এরশাদ সরকার দিশেহারা হয়ে ২৭ নভেম্বর '৮৮ থেকে জরুরি অবস্থা জারি করে। জামায়াতের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সকল সংসদ সদস্যকে ঐকবদ্ধভাবে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। জামায়াতের সংসদ সদস্যগণ ৩রা ডিসেম্বর '৮৮ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সরকার ৫ই ডিসেম্বর রাতে বিভাগীয় শহরগুলোতে কারফিউ জারি করে এবং কয়েকদিন বলবৎ রাখে। ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর রাতে এরশাদ সরকার জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং একইসাথে ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতসহ প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করে। জাসদ নেতা আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দলের ব্যানারে সরকার অনুগত সাইনবোর্ড সর্বস্ব কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় সংসদের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট	প্রদত্ত ভোটের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	২৫১	৮৩.৬৬	১,৭৬,৮০,১৩৩	৬৮.৪৪
সম্মিলিত বিরোধী দল (COP)	১৯	৬.৩৩	৩২,৬৩,৩৪০	১২.৬৩
জাসদ (সিরাজ)	০৩	১.০০	৩,০৯,৬৬৬	১.২০
ফ্রীডম পার্টি	০২	০.৬৬	৮,৫০,২৪৮	৩.২৯
অন্যান্য দল	০০	০০	২,৪২,৫৭১	০.৯৪
স্বতন্ত্র	২৫	৮.৩৩	৩৪,৮৭,৪৫৭	১৩.৫০

সূত্র: *Mohammad Yeahia Akter, Election Corruption in Bangladesh, Ashgat Publication Limited, England 2001, page-135*

১৯৯০ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিরোধী জোট ও দলের সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার প্রচেষ্টা চলে। এরই ফলে অক্টোবর '৯০ থেকে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন পুনরায় তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বিরোধী দলের ঐক্য পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। তীব্রতর গণআন্দোলনের এক পর্যায়ে, ১৯ নভেম্বর ৮, ৭, ৫ দল ও জামায়াতের পক্ষ থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা পেশ করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফর্মূলা এবং যৌথ ঘোষণা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে চূড়ান্ত পণ্ডিরুতির দিকে নিয়ে আসে। অবশেষে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিরোধী দল ও জোটের মনোনয়নকৃত প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে পদত্যাগ করেন। জামায়াতসহ অন্যান্য দল ও জোটের আন্দোলনের কারণে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভের পর উক্ত সরকারের অধীনে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াত প্রথমবারের মত অধিক সংখ্যক প্রার্থী ঘোষণা করে সক্রিয়ভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল প্রধান রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। ৭৫ টির মত রাজনৈতিক দল ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে রেকর্ড সৃষ্টি করে। স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ২৭৮৭ জন প্রার্থী ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[৪০৯] বাংলাদেশে প্রথমবারের মত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য ব্যাপকভাবে বিদেশী পর্যবেক্ষক দল আসে। দেশী-বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী দলসমূহ ১৯৯১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিরপেক্ষ, অবাধ এবং সুষ্ঠু হিসেবে অভিহিত করেছেন। বৃটেন, জাপান, কমনওয়েলথসহ ও সার্ক দেশসমূহের পর্যবেক্ষকগণ নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বলে উল্লেখ করে একে অতুলনীয়, খুব সফল এবং চমৎকার বলে বিবেচনা করে।[৪১০] নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১২.১৩ ভাগ ভোটে পেয়ে ১৮টি আসন লাভ করে জামায়াত।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ:

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর অবস্থান

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	আসন সংখ্যা	বিজয়ী আসন শতকরা হার
বিএনপি	৩০০	১০৫০৭৫৪৯	৩০.৮১	১৪০	৪৬.৬৬
আওয়ামী লীগ	২৬৪	১০২৫৯৮৬৬	৩০.০৮	৮৮	২৯.৩৩
জাতীয় পার্টি	২৭২	৪০৬৩৫৩৭	১১.৯২	৩৫	১১.৬৮

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	আসন সংখ্যা	বিজয়ী আসন শতকরা হার
জামায়াতে ইসলামী	২২২	৪১৩৬৬৬১	১২.১৩	১৮	৬.০০
কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	৪৯	৪০৭৫১৫	১.১৯	০৫	১.৬৭
বাকশাল	৬৮	৬১৬০১৪	১.৮১	০৫	১.৬৭
ন্যাপ মোজাফফর)	৩১	২৫৯৯৭৮	০.৭৬	০১	০.৩৩
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১৫২৫৯২	০.৪৫	০১	০.৩৩
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	৬৩৪৩৪	০.১৯	০১	০.৩৩
জাসদ (সিরাজ)	৩১	৮৪২৭৬	০.২৫	০১	০.৩৩
ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	২৬৯৪৩৪	০.৭৯	০১	০.৩৩
এনডিপি	২০	১২১৯১৮	০.৩৬	০১	০.৩৩
স্বতন্ত্র	৪২৪	৪৯৭৩৬৯	৪.৩৯	০৩	১.০০

সূত্র: *Mohammad Anowar Hossain Mizi, parliamentary Elections under Non-Party Caretaker Governments. Asian Profile, Vol-32, No. 5 ,2004, P.165*

নির্বাচনে কোন দল সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় সরকার গঠন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি বক্তব্য বিবৃতি রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। ২০০৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর পল্টনে মহাসমাবেশে জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, '৯১তে আমির হোসেন আমু সাহেব (আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) মন্ত্রীত্ব এবং অধিকসংখ্যক মহিলা আসন দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে সরকার গঠনে জামায়াতের সমর্থন চাইতে এসেছিলেন। এবং বিএনপির পক্ষ থেকে সরকার গঠনে জামায়াতের সমর্থন চাওয়া হয়।[৪১১] সে সময় তৎকালীন সেনাপ্রধানের মধ্যস্থতায় জামায়াত বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দান করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত তার নির্বাচনী ইতিহাসে সবচেয়ে ভাল ফলাফল করে। ১৮টি আসনে বিজয়ী এবং ৩০টি আসনে জামায়াত নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে জামায়াত বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি মর্যাদাজনক আসনে অধিষ্ঠিত হয়। অনেকে মন্তব্য করেছেন, ১৯৮৬ সালে বিএনপি নির্বাচন না করায় জামায়াত ১০টি আসন লাভ করে। কিন্তু ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত আলাদা আলাদাভাবে নির্বাচন করে। এ নির্বাচনে বিএনপি শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও আসন এবং ভোটের হিসেবে জামায়াত ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি ভাল ফলাফল করে। শতকরা হারে জামায়াত ১৯৮৬

সালের নির্বাচনে ৪.৬১% ভোট লাভ করে অথচ ১৯৯১ সালে প্রায় তিনগুণ অর্থাৎ ১২.১৩% ভোট পায় জামায়াত। ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে দীর্ঘ নয় বছরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতীয় পার্টির চেয়ে জামায়াত ভোট বেশি পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে। ১৯৯১-এর সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতের সাফল্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে দলের বলিষ্ঠ ভূমিকার ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায় আশির দশকে এরশাদ সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আপসহীন ভূমিকা পালন করার জন্য অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় জামায়াতের ব্যাপক গণভিত্তি রচিত হয়েছে।[৪১২]

১৯৭১-২০০০ সময়কালের মধ্যে তিনটি জাতীয় সংসদে (৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ) জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব ছিল। তন্মধ্যে ৫ম জাতীয় সংসদে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জামায়াত সংসদে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সংসদের ভেতর এবং বাইরে জামায়াত তাদের ভূমিকা অব্যাহত রাখে। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে পদত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতের সংসদ সদস্যগণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রায় সকল ইস্যুতে সংসদে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তন্মধ্যে দ্বাদশ সংশোধনী বিল সংক্রান্ত আলোচনা, ফারাক্কা ইস্যু, বাবরী মসজিদ এবং বসনিয়া হার্জিগোভিনা ইস্যু উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট বক্তৃতা উত্থাপন, সম্পুরক প্রশ্ন, মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে জামায়াত সদস্যগণ সংসদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বাদশ সংশোধনী বিলের ওপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন,

> জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি এসেছে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, বিরোধী দলের দাবির মুখে। এ সংসদের চাহিদাকে সামনে রেখে গণ আকাঙ্খার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এ বিলটি জাতীয় সংসদে এসেছে। দীর্ঘ ১৬ বছর পরে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় উত্তরণে আর কোন অন্তরায় নেই। তবে দ্বাদশ সংশোধনী বিলে একইসাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন সংক্রান্ত বিলও যদি শামিল করা হতো, তাহলে খুবই ভালো হতো বলে নিজামী অভিমত ব্যক্ত করেন। রেফারেন্ডাম প্রশ্নে মতিউর রহমান নিজামী বলেন, রেফারেন্ডাম গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয়। জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মেনে নেয়ার পর সংবিধানের মৌলিক কোন পরিবর্তনের জন্য জনগণের কাছে যাওয়া গণতন্ত্রের পরিপন্থী হতে পারেনা। রেফারেন্ডাম যদি গণতন্ত্রের অধিক নিশ্চয়তা বিধানে সহায়ক হয়, তাহলে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা সমীচীন হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। রেফারেন্ডামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি আরো বলেন, আমরা অতীতে দেখেছি সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদে এসে সংবিধানের মৌলিক চরিত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৬ বছর পর আমরা আবার সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে সুইচ ওভার করতে চাচ্ছি। নয় বছরের রক্তঝরা

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমরা যে পরিবর্তন করতে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে যাতে কেউ ব্রুট মেজরিটির বলে তা পাল্টে ফেলতে না পারে, সংবিধানে মৌলিক চরিত্র বদলাতে না পারে, সে জন্য রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা বহাল রাখা প্রয়োজন।[৪১৩]

ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন,

"মাননীয় স্পীকার, এ সম্পর্কে আমার দলের পক্ষ থেকে আমরা বলেছি, বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করতে হবে। ক্ষতিপূরণের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গঙ্গাবাঁধ দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, আমাদের বিগত ১৯ বছরের অভিজ্ঞতা যদি বলে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ আছে তাহলে এই পথ ছেড়ে অন্য পথে যাওয়ার জন্য আমি বলবো না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, আমরা যদি লক্ষ্য করি, ৭৪ সালে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল এবং তখন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের যে প্রভাব খাটাবার সুযোগ ছিল, আমার মনে হয় আর কারো ছিলনা। তারপরও দেখা যায় ৭৪ সালের সমঝোতায় উল্লেখ ছিল উভয় দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিমাণ পানির শেয়ার নির্ধারণের পর গঙ্গা ব্যারেজ চালু করা হবে। এই কথার ওপর ভারত চালাকির আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৭৪ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ফিডার ক্যানেল চালু করার কথা বলা হলেও ৩১শে মের পর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে আলোচনা হয়নি। ফারাক্কা অব্যাহতভাবে চালু রাখা হয়েছে... ১৯৮২-এর পর সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আমরা চলেছি। কিন্তু ৮৮ থেকে আর কোন চুক্তি নেই। এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ৯৭টি বৈঠক হয়েছে, কোন সমাধান আসেনি। অতএব আমরা bilateral আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চাইতে পারি। কিন্তু এর জন্য একটি সময় সীমা নির্ধারণ হওয়া দরকার। সমস্যা চিরকাল ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে পারেনা। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে bilateral আলোচনার সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতএব, আন্তর্জাতিক ফোরামে উপস্থাপনের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি নিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, দ্বিতীয় কথা হলো, এই ফারাক্কার কারণে যে সেচ অসুবিধে হয় তাতে প্রায় ৩ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আদ্রতা হ্রাসের কারণে ৩০ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লবণাক্ততার কারণে ৬৪ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার আমাদের আছে। আমেরিকা মেক্সিকোর তুলনায় অনেক বড় দেশ, একটি মহাদেশ। কিন্তু কলোরাডো নদীর পানির ওপর আমেরিকার যে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের ঐকমত্যে আসা দরকার, সেইসাথে বিকল্প বাঁধের ব্যাপারে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।"[৪১৪]

বসনিয়া হার্জিগোভিনার নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে সংসদ অধিবেশনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সার্বীয়দের গণহত্যার নিন্দা প্রকাশ করেন। তিনি ওআইসিকে (OIC) কার্যকর ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়ে এবং জাতিসংঘকে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব নেয়ার আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আহ্বান ছিল:

> "জনাব স্পীকার, আমরা জানি বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের কাছে এখন এক নাম্বার ইস্যু হচ্ছে বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন। কিন্তু তাদের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম সরকার ও সরকারের উদ্যোগে গঠিত ওআইসি এই পর্যন্ত কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ইউরোপীয় কমিউনিটি যে ভূমিকা ক্রোয়েশিয়ানদের পক্ষে নিয়েছিল, ওআইসি যদি সে রকম ভূমিকা নিতে পারতো, তাহলে বসনিয়ার জনপদের এই দুর্দশা এতদূর গড়াতে পারতো না। তাই আমি এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আপনার মাধ্যমে আমাদের সংসদের পক্ষ থেকে সার্বীয়দের এই বর্বরোচিত হামলার নিন্দা এবং বসনিয়া হার্জিগোভিনার স্বাধীনতাকামীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণার আহ্বান জানাতে চাই। দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে ওআইসিকে কার্যকর ভূমিকায় আনা দরকার।"[৪১৫]

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে ভারতের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ এবং তা পুন:নির্মাণের দাবি জানান। সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের জানমাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য দাবি জানান। মাওলানা নিজামী বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে শুধু একটি মসজিদ ধ্বংস নয় বরং মুসলিম জাতীয়তা বিনাশ করার সুদূরপ্রসারী একটি পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করেন। সংসদে মাওলানা নিজামী বলেন,

> "জনাব স্পীকার, বাবরি মসজিদ নিছক একটি মসজিদ নয়, ইসলামী আদর্শের, ইতিহাসের-ঐতিহ্যের এবং সভ্যতার একটি মূর্তপ্রতীক এটি। তাই বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া সাধাগুরু কোন ব্যাপার নয়, এটাকে বিবেচনা করতে হবে আদর্শের ওপর আঘাত, ইতিহাসের ওপর আঘাত, একটি ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হিসেবে। গোটা বিশ্ব আজ এই কার্যক্রমের নিন্দা করছে। বাংলাদেশে দলমত নির্বিশেষে ১২ কোটি মানুষ এর নিন্দা করছে। সেই ১২ কোটি মানুষের এই সংসদ এ বিষয়ে ঐকবদ্ধভাবে একটা প্রস্তাব নেবে এটাই জাতির প্রত্যাশা। জনাব স্পীকার, এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি হবে, পারস্পরিক আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ হবে, একে অপরকে দোষারোপ করবে, এটা না বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে, না দুনিয়া আশা করে। আমার এই বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় যে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ব্যাপারে আমরা সবাই এর নিন্দা করবো, পুনঃনির্মাণের দাবি করবো এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের জানমাল ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা দাবি করবো। আমরা জাতিসংঘের কাছেও সহযোগিতা কামনা করবো।"[৪১৬]

কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামীসহ সকল বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। বিরোধী দলের দাবি পূগুরু না করে বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলবিহীন একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। কিন্তু বিরোধী জোট ও দলের তীব্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ সংসদ বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের পর সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। বিরোধী দলের আন্দোলনের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অত:পর ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সংবিধান মোতাবেক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত

নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ সকল রাজনৈতিক দল সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। প্রথমবারের মত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ৩০০ সংসদীয় আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

নিম্নে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সারণির মাধ্যমেদেখানো হল:

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্তআসনের শতকরা হার
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	১৫৮৮২৭৯২	৩৭.৪৪	১৪৬	৪৮.৬৭
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১৪২৫৫৯৮৬	৩৩.৬০	১১৬	৩৮.৬৭
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৬৯৫৪৯৮১	১৬.৪০	৩২	১০.৬৭
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩০০	৩৬৫৩০১৩	৮.৬১	০৩	১.০০
ইসলামী ঐক্যজোট	১৬৬	৪৬১০০৩	১.০৯	০১	০.৩১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৬৭	৯৭৯১৬	০.২৩	০১	০.৩৩
স্বতন্ত্র	২৮৪	৪৫০১৩২	১.০৬	০১	০.৩৩

সূত্র: Asisn Profile, Vol-32, No.5, 2004, P.468

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর ফলাফল ছিল হতাশাব্যঞ্জক। নির্বাচনে জামায়াতের বিপর্যয়ের কারণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচনে জামায়াত মাত্র তিনটি আসন লাভ করে। অবশ্য প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় প্রাপ্ত আসন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কম ছিল। ওপরের সারণি থেকে জানা যায়, জামায়াত শতকরা ৮.৬১ ভাগ ভোট পেয়েছে। কিন্তু আসন লাভ করেছে মাত্র শতকরা এক ভাগ। এ অসামঞ্জস্যতা আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থার অন্যতম একটি সীমাবদ্ধতা। সংসদকে সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বশীল করতে হলে বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্প আমাদের খুঁজতে হবে। বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। জার্মানী, তুরস্ক, ইটালী, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ইসরাইলসহ অনকে দেশে এ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে জনগণ ব্যক্তিকে নয় বরং দলের আদর্শ ও কর্মসূচী পর্যালোচনা করে দলকে ভোট দেয়। দল যোগ্য. দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আইনসভায় মনোনীত করে। আইনসভা তথা জাতীয় সংসদকে কার্যকর এবং প্রতিনিধিত্বশীল করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (Proportional system of Representation) পদ্ধতি একটি বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭ম জাতীয় সংসদে জামায়াত মাত্র তিনটি আসন পেলেও মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী (জামায়াত সংসদীয় দলের গ্রুপ নেতা)সহ জামায়াতের অন্য সদস্যরা

সংসদে বক্তব্য বিবৃতি, বিল জমা, প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর বক্তৃতা, বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ, প্রশ্ন উত্থাপনসহ অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ট্রানজিট, উপআঞ্চলিক জোট, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, কুদরাত এ-খুদা শিক্ষানীতি, মাদ্রাসা শিক্ষা, ব্লাসফেমী আইন প্রণয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনে করণীয়, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী, গ্যাস ও কয়লা রপ্তানিসহ বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে জামায়াতের সংসদ সদস্যগণ তাদের বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন। ট্রানজিট ও উপআঞ্চলিক জোট গঠন, পার্বত্য শান্তিচুক্তিসহ বিভিন্ন ইস্যুতে জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে দলের সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন,

> "মাননীয় স্পীকার, জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে ট্রানজিট ও উপআঞ্চলিক জোট সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন, বিলম্ব হলেও এ আলোচনা হচ্ছে এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। জাতির যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংসদে আলোচনা করার পর তা গৃহীত হলে সেটা হয় সকলের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আলোচনা করা এ যেন কাউকে ইচ্ছাকৃত আঘাত দেয়ার পর Sorry বলে পাশ কাটানো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমাদের নদীসমূহে পানি আসুক আর না আসুক গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের জন্য চুক্তি একটা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ পানি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংসদের মাধ্যমে জাতিকে তা জানানো হয়নি। পানি বন্টনের চুক্তিতে সংসদের অনুমোদন তো দূরের কথা, মন্ত্রী পরিষদেরও অনুমোদন নেয়া হয়নি।... সুতরাং আমার দাবি হচ্ছে, ট্রানজিট ও উপআঞ্চলিক জোটের মত এতোবড় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেন সংসদে ও জাতির মতামত অগ্রাহ্য করে পানি চুক্তির মত পর্দার আড়ালে সম্পাদিত না হয়। মাননীয় স্পীকার, আমার দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সুস্পষ্ট মত হচ্ছে: দেশের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত ট্রানজিট ও উপআঞ্চলিক জোট ইস্যুতে সরকার যদি ভারতের আধিপত্যবাদী নীতির কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোন চুক্তিতে উপনীত হয়, তবে তা বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক বীর জনতা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। সম্প্রতি সম্পাদিত অসম ও বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ পানি চুক্তিতে এমনিতেই জনগণ বিক্ষুব্ধ, তারপর ভারতকে সামরিক করিডর প্রদান, উপআঞ্চলিক জোট গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার অপচেষ্টা, চট্টগ্রাম বন্দর এবং কুতুবদিয়া দ্বীপ ভারতকে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান, পার্বত্য এলাকায় ভারতীয় মদদপুষ্ট তথাকথিত শান্তিবাহিনীর দাবির কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোন চুক্তি সম্পাদন করা, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্য তথা জনগণকে ভারতের কৃপায় ছেড়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র হলে, তালপট্টি দ্বীপে ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের মত আধিপত্যবাদী কান্ড ঘটার পরও প্রতিবাদ না জানিয়ে এভাবে নতজানু ভূমিকা পালন করতে থাকলে বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষ চুপ করে বসে থাকবেনা। স্বীয় অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।"[৪১৭]

জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী দেশে একটি সৎ ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে মদ ও জুয়া (নিষিদ্ধকরণ) আইন ১৯৯৬ প্রণয়নকল্পে জাতীয় সংসদে একটি বিলও উত্থাপন করেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দু'টি আদর্শিক ইস্যুতে জামায়াত বিজয়ী হয়েছে বলে দাবি করে। তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সংসদের বৈঠক চলাকালীন আসরের নামাজের বিরতি এবং দ্বিতীয়টি শোক প্রস্তাবে নিরবতা পালনের পরিবর্তে মোনাজাত পদ্ধতি চালু।[৪১৮]

৭ম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে প্রথমবারের মত ৫ বছর মেয়াদ সম্পন্ন করে। বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করেও সরকারকে সরাতে পারেনি। তবে আন্দোলনের কারণে বিরোধী দলের ঐক্য সুদৃঢ় এবং সংহত হয়েছে। ঐকবদ্ধভাবে নির্বাচন ও সরকার গঠনে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সরকারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সংবিধান মোতাবেক প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিয়ম মোতাবেক ৯০ দিনের মধ্যে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৪দলীয় জোট ঐকবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসন লাভ করে। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট ৪ দলীয় জোটের মাধ্যমে এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এরশাদের জাতীয় পার্টির সাথে ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে দলগুলোর অবস্থান ছিল নিম্নরূপ:

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগত ফলাফল:

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	বিজয়ী আসন	বিজয়ীআসনের শতকরা হার
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৫২	২২৮৩৩৯৭৮	৪০.৯৭	১৯৩	৬৪.৩৩
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	২২৩৬৫৫১৬	৪০.১৩	৬২	২০.৬৭
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩১	২৩৮৫৩৬১	৪.২৮	১৭	৫.৬৭
ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	২৮১	৪০৩৮৪৫৩	৭.২৫	১৪	৪.৬৭
জাতীয় পার্টি (না-ফি)	১১	৬২১৭৭২	১.১২	০৪	১.৩৩
ইসলামী ঐক্যজোট	০৭	৩৭৬৩৪৩	০.৬৮	০২	০.৬৭
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৩৯	২৬১৩৪৪	০.৪৭	০১	০.৩৩
জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	১৪০	২৪৩৬১৭	০.৪৪	০১	০.৩৩
স্বতন্ত্র	৪৮৬	২২৬২০৭৩	৪.০৬	০৬	২.০০

মোট ৩০০ ১০০.০০

সূত্র: বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক সারণিকৃত

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫৩টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে একমাত্র আওয়ামী লীগ এককভাবে ৩০০ আসনে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ এবং এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ওপরের সারণিতে সংসদে আসন প্রাপ্ত দলগুলোর নির্বাচনী ফলাফল দেখানো হয়েছে। মোটামুটি তৎপর এমন দলগুলোর নির্বাচনী ফলাফল সারণির মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো:

দলের নাম	নির্বাচনী প্রতীক	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	মশাল	৭৫	১১৯০৭২	০.২১
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে	৬৪	৫৬৯৯১	০.১০
বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি	হাতুড়ি	৩২	৪০৪৮৪	০.০৭
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি	১৬	২৯০০২	০.০৫
বাসদ (খালেকুজ্জামান)	তালা	৩৭	২০৯৪৬	০.০৪
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম	খজুর গাছ	০১	১৯২৫৬	০.০৩
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ	২৯	১৩২৪৭	০.০২
গণফোরাম	উদিয়মান সূর্য	১৭	৮৪৯৪	০.০২
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন	হাতপাখা	০৩	৫৯৪৪	০.০১
গণতন্ত্রী পার্টি	কপোত (ঘুঘু)	১১	৩১৯০	০.০১
জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল	০৪	১১৮১	০০
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ	মোরগ	০৫	৯৯৪	০০
বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	চেয়ার	০৩	৯৭২	০০
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	ছাতা	০১	৩৯১	০০

সূত্র: নির্বাচন কমিশনের সচিবালয় ওয়েবসাইট রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক সারণিকৃত।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'জামায়াতে ইসলামী' সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়ন করার লক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় জামায়াতে ইসলামী নীরবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালায়। প্রকাশ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ভূমিকা পালন করেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জামায়াত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক পরিচালনার জন্য 'আদর্শ প্রস্তাব' গ্রহণ এবং ২২ দফা ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়নে উদ্যাগী ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল আন্দোলন-সংগ্রামে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াত অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা রাখে। তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা প্রকারান্তরে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের বিরুদ্ধে যায়। পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারের প্রকাশ্য প্রতিবাদ

না করায় এবং যুদ্ধকালীন মালেক মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণের কারণে জামায়াত ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাঁচ বছর পর্যন্ত জামায়াত প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা চালাতে পারেনি। ১৯৭৯ সালে আবার আত্মপ্রকাশের পর থেকে জামায়াত সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এরশাদের শাসনকালে স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন, খালেদা জিয়ার সময়কালে সাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) বিরুদ্ধে চার দলীয় ঐক্যজোটের আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। আত্মপ্রকাশের পর প্রায় সকল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণ করেছে। সংসদেও জামায়াত গঠনমূলক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করার চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা সংগঠনটির গণভিত্তি রচনা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশের পর থেকে জামায়াতের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিকভাবে জামায়াতের অবস্থান ধীরে ধীরে সংহত হলেও জনসমর্থন সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। এ জন্য মূলতঃ জামায়াতের নীতি এবং কর্মসূচীকে দায়ী করা হয়। জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো এবং নেতৃত্বের গুণগত পরিবর্তন দরকার বলেও মনে করেন অনেকে। সাংগঠনিক কাঠামোর অনমনীয়তার কারণে সকল শ্রেণীর জনগণের পক্ষে জামায়াতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পাশপাশি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তৎপরতার প্রতি জামায়াত নেতৃবৃন্দকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ তথা কথা ও কাজের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে জামায়াত নেতা-কর্মীদের বিশেষ করে নেতৃবৃন্দকে আরো বলিষ্ঠ হতে হবে। জনগণের নিকট গ্রহণীয় হতে হলে জামায়াতের কর্মসূচি এবং নেতৃত্বের ধরণ পরিবর্তন জরুরি।

তথ্যসংকেত ও টীকা:

১। ১৯০৩ সালে হায়দরাবাদের আওরংগবাদ শহরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করার পর হায়দরাবাদ দারুল উলুমে (ডিগ্রী কলেজ) ভর্তি হন। পিতার অসুস্থতার কারণে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন যথাক্রমে মাওলানা আবদুস সাত্তার নিয়াযী, মওলানা আশফাকুর রহমান এবং মাওলানা শরীফুল্লার নিকট আরবী ভাষা, হাসীস, তাফসীর ও ফেকাহ্ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং এসকল বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য লাভ করেন। বিস্তারিত, আব্বাস আলী খান, *জামায়েতে ইসলামীর ইতিহাস*, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১০-১২।

২। গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ৪-৬।

৩। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ৬।

৪। আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৭১।

৫। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

৬। *পূর্বোক্ত*, পৃ.২১-২২।

৭। আব্বাস আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

৮। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬।

৯। সাইয়দ আবুল আলা মওদূদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

১০। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদক: আকরাম ফারুক, *উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান (১ম খন্ড)* আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ২০।

১১। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ*, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ৩৪, ৩৯।

১২। আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ২০০২, পৃ. ৪২২-৪২৩।

১৩। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *উপমাহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান (১ম খন্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

১৪। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।

১৫। আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭, ৬৮।

১৬। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *উপমাহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৬।

১৭। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫।

১৮। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯।

১৯। আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, পৃ. ১৯৮।

২০। হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব সংগঠন ও আদর্শ*, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৯।

২১। Bhuian Md. Monoar Kabir, *Politics and Development of the Jamaat e- Islami Bangladesh,* A H Development Publishers Houes, Dhaka, 2006, P. 63.

২২। মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, *আদর্শিক চেতনার বিকাশ*, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৬

২৩। আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারন*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ১৯৯৮

২৪। Golam Azam, *A Guide to Islamic Movement,* Azami Publication, Dhaka, 1968, PP, 62-63

২৫। মতিউর রহমান নিজামী, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৯৮,পৃ. ৭

২৬। *গঠনতন্ত্র*, জামায়তে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৩-১৬

২৭। বিস্তারিত, *পরিচিতি*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রকাশকাল মার্চ, ২০০৬

২৮। বিস্তারিত, সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী, *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষৎ কর্মসূচী*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ২০০৪ পৃঃ ২

২৯। *সাক্ষাৎকার*, *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ নভেম্বর, ২০০০

৩০। বদরুদ্দীন উমর, *সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্র ধর্ম*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৮

৩১। বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক*, ব্যবহার, পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৯

৩২। Tajul Islam Hashmi, "Islam in Bangladesh Politics" in Hussain Mutalib, Tajul Islam Hashmi Islam, *Muslim and the Modern State: Case Studies of Muslims in Thirteen Countries,* St. Martins press, NewYork, 1994, P. 1004

৩৩। পুস্তিকা, *দৈনিক ইনকিলাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার*, আল আযামী পাবলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ২৬

৩৪। *পরিচিতি*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৬, পৃ. ৫- ৬

৩৫। *জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ পরিচিতি*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৬, পৃ. ৫

৩৬। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৪ মার্চ, ২০০৮

৩৭। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খন্ড, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৪, পৃ. ৫০২

৪৮। *দৈনিক সংগ্রাম* এবং *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০

৩৯। *দৈনিক পাকিস্তান*, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭০

৪০। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

৪১। *পূর্বোক্ত*, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

৪২। আবুল আসাদ, *কালো পঁচিশের আগে ও পরে*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৭

৪৩। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

৪৪। *পূর্বোক্ত*, ২ রা মার্চ, ১৯৭১

৪৫। *পূর্বোক্ত*, ৪ ঠা মার্চ, ১৯৭১

৪৬। বিস্তারিত, আবুল আসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

৪৭। কামরুদ্দিন আহমদ,*স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২,পৃ. ১০৯

৪৮। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ মার্চ, ১৯৭১

৪৯। *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১

৫০। *দি ড্যন*, ১৬ মার্চ, ১৯৭১

৫১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা.৮৮২

৫২। বিস্তারিত, আবুল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

৫৩। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ মার্চ, ১৯৭১

৫৪। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৭৭৫-৭৭৬

৫৫। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ শে মার্চ, ১৯৭১

৫৬। আবুল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৩

৫৭। *The Daily News*, March 26, 1971. উদ্বৃত্ত, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, পৃ. ১৩০

৫৮। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৭ম খন্ড, ২০০৪, পৃ. ৭৩০

৬৯। বিস্তারিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৭ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩১-৩৩

৬০। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *যুদ্ধাপরাধ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, সূচীপত্র, ২০০৮, পৃ. ২৯

৬১। ডঃ মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ৩৪৮

৬২। বিস্তারিত, এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫

৬৩। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৬০

৬৪। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ এপ্রিল, ১৯৭১, উদ্ধৃতঃ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৬৫। *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ এপ্রিল, ১৯৭১

৬৬। *পূর্বোক্ত*, ৮ এপ্রিল, ১৯৭১

৬৭। *পূর্বোক্ত*

৬৮। *পূর্বোক্ত*

৬৯। *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

৭০। এ.এস.এম.সামছুল আরেফিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৬

৭১। পুস্তিকা, *দৈনিক ইনকিলাবের সাথে অধ্যাপক গোলাম আজমের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৭২। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

৭৩। মাঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৮৬ পৃ. ৭

৭৪। কামরুদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-২৭

৭৫। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

৭৬। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯

৭৭। *মিডিয়ার মুখোমুখি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ২৮

৭৮। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৭

৭৯। দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৪ মার্চ, ২০০৮

৮০। পুস্তিকা, *দৈনিক ইনকিলাবের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার*, পৃ. ৯

৮১। আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, *৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পেক্ষাপট*, পান্ডুলিপি, ১৯৯৬, পৃ. ৫২

৮২। ড. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫

৮৩। মুহাম্মদ কামারুজ্জামন, *বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৫৮

৮৪। সাক্ষাৎকার, *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ নভেম্বর, ২০০০

৮৫। অধ্যাপক গোলাম আযম, *মিডিয়ার মুখোমুখি*, প্রকাশন বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ৬

৮৬। সাক্ষাৎকার, গোলাম আযম, *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ নভেম্বর, ২০০০

৮৭। *দৈনিক মানবজীবন*, ৩ নভেম্বর ২০০০, উদ্ধৃতঃ অধ্যাপক গোলাম আযম, মিডিয়ার মুখোমুখি, পৃ. ২২

৮৮। *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ নভেম্বর, ২০০০

৮৯। ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৯০। *দৈনিক ইনকিলাব সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার*, আল আযামী পাবলিকেশন্স, আগষ্ট ২০০১, পৃঃ ১৮-২০

৯১। সাক্ষাৎকার, গোলাম আযম, *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ নভেম্বর, ২০০০

৯২। *দৈনিক ইনকিলাবের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার* (পুস্তিকা) ,পৃ. ২৭

৯৩। *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ নভেম্বর, ২০০০

৯৪। *মিডিয়ার মুখোমুখি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৮, পৃ. ১৩

৯৫। বদরুদ্দীন উমর, *ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ৩১

৯৬। হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৯৭। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, তৃতীয় খন্ড, কামিয়াব প্রকাশন ২০০৪, পৃ. ২৮৭-২৮৮।

৯৮। Bhuian Md. Monoar Kabir, *op.cit*, P. 68

৯৯। ড: তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের, ভূমিকা ও প্রভাব*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ২০০৭, পৃ. ৮৩

১০০। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, ৪র্থ খন্ড, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৫, পৃ. ১৬৬

১০১। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা*, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৭৭

১০২। নূর হোসেন মজিদী, *মাওলানা আবদুর রহীম, একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা, মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৬৫

১০৩। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের শরীক দলগুলো ছিলঃ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল, ন্যাপ (ভাসানী), মুসলীম লীগ, ইউপিপি, লেবার পার্টি ও তফশিলি ফেডারেশন।

১০৪। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের দলগুলো হচ্ছে আওয়ামী লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ মোজাফফর, সিপিবি, গণআজাদী লীগ, পিপলস্ লীগ, উদ্ধৃত, ড. হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০,* নিউ এজ পাবলিকেসন্স, ঢাকা ২০০১ পৃ. ৩৫৫।

১০৫। নুর হোসেন মজিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭১

১০৬। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, *অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগ্রামী জীবন*, ১৯৮৯, পৃ. ৯৮

১০৭। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, ২০০৫, পৃ. ৭৯

১০৮। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি*, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৮, পৃ. ২০

১০৯। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২-২৪

১১০। ৭ দফা বিস্তারিত, *জীবনে যা দেখলাম*, ৫ম খন্ড, কামিয়াব প্রকাশন, পৃ. ১৯৫-৯৬

১১১। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা*, পৃ. ৩

১১২। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪

১১৩। দেখুন, *১৯৮৬ সালের ২৫-২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত রুকন সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণের পুস্তিকা*, প্রকাশনা বিভাগ. জামায়াতে ইসলামী, পৃ. ৭

১১৪। *Bulletin*, Jammat-e-Islami Bangladesh, vol-1, November 1990, p. 1.

১১৫। গোলাম আযম, *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*, প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯১, পৃ. ১৮

১১৬। মতিউর রহমান নিজামী, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, পৃ. ১৭

১১৭। গোলাম আযম, জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

১১৮। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

১১৯। দেখুন, *দেশব্যাপী দাবি দিবস উপলক্ষে ৭ এপ্রিল '৮৬ প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলের প্রচারপত্র।*

১২০। *গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী*, প্রচার বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। ডিসেম্বর ১৯৮৪, ঢাকা, পৃ. ৯

১২১। দেখুন, *সামরিক সরকার ও রাজনৈতিক সংলাপ, শীর্ষক জামায়াত কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্র, ২৬ শে মার্চ*, ১৯৮৩

১২২। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯শে মার্চ, ১৯৮৩, পৃ. ১

১২৩। দেখুন, *পুস্তিকা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা,* প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী, পৃ. ৬-৭

১২৪। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ অক্টোবর, '৮৩

১২৫। *পূর্বোক্ত*, ২৯শে নভেম্বর, '৮৩

১২৬। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

১২৭। আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ্ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি :প্রকৃতি ও প্রবণতা, ২২ দফা থেকে ৫ দফা*, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩৩

১২৮। দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৮ ডিসেম্বর, '৮৪

১২৯। The *Bangladesh Observer,* 6th April, 1984.

১৩০। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা*, পৃ. ৯

১৩১। মতিউর রহমান নিজামী, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

১৩২। The *Bangladesh Observer,* Dhaka, 18th April, 1984.

১৩৩। সূত্রঃ *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা*।

১৩৪। যে কোন প্রার্থী একাধিক আসনে সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিধান ছিল। আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিলনা। তাই বিরোধী জোট দু'নেত্রীর ১৫০:১৫০ আসনে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এতে নির্বাচনে বিপর্যয়ের চিন্তা করে সরকার আইন সংশোধন করে। এতে একজন প্রার্থী ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

১৩৫। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

১৩৬। আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ্ আহমদ রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৭

১৩৭। Government of the people's Republic of Bangladesh, *Election Commission Report Jatïiœa Sangsad* Election, 1986, (Dhaka-1988), Cited in Muhammad A Hakim, *op.cit,* page, 25-26.

১৩৮। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী*, আল ইসলাহ্ প্রকাশনী, রাজশাহী ১৯৮৯, পৃ. ১৪

১৩৯। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী

১৪০। The *Bangladesh Observer,* 4th October, 1984.

১৪১। The *Bangladesh Observer,* 16th October, 1984

উল্লেখ্য, ১৫ অক্টোবর '৮৪ ঢাকায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। জাতীয় সমাবেশগুলোর সংবাদ পরিবেশনে সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের এবং খবরদারির প্রতিবাদে সাংবাদিকগণ এদিন পত্রিকা প্রকাশ করেন নি। এক দিন পর ১৬ অক্টোবর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং সমাবেশগুলোর সংবাদ পরিবেশন করা হয়।

১৪২। সাপ্তাহিক *রোববার*, ২১ অক্টোবর, ১৯৮৪, পৃ. ১৪

১৪৩। দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৫ অক্টোবর, '৮৭

১৪৪। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা*, পৃ. ১৩

১৪৫। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৭

১৪৬। দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৮৭

১৪৭। *পূর্বোক্ত*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৮৭

১৪৮। *পূর্বোক্ত*, ২০ নভেম্বর, ১৯৮৭

১৪৯। *পূর্বোক্ত*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৮৭

১৫৫। জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি দেখুন, The *Bangladesh Observer*, Dhaka, 15,16,17,23 November, 1987

১৫১। Muhammad A. Hakim, *The Shahabuddin Interregnum*, UPL, Dhaka, 1993, page, 29.

১৫২। *Far Eastern Economic Review*, February 25, 1988, p.20

১৫৩। Muhammad A. Hakim, *op.cit*, p.31

১৫৪। The *Bangladesh Observer*, May 12, 1988.

১৫৫। *Ibid*, May 13, 1988.

১৫৬। *Ibid*, May 13, 1988.

১৫৭। *Far Eastern Economic Review*, June 23, 1988 p-14, Cited, Munir Ahmed Chowdhury, Induction of 'State Religion' in the Constitution of Bangladesh" in *Bangladesh Political Studies*, Vol. ix- xiii, 1986, page-73.

১৫৮। *Ibid*

১৫৯। Munir Ahmed Chowdhury, *op.cit*, p.74

১৬০। *Far Eastern Economic Review*, June 23, 1988, p. 12

১৬১। মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ইসলামপন্থিদের ভূমিকা*, প্রীতি প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ৬৭

১৬২। *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৩ জুন, ১৯৮৮

১৬৩। Abdul Rashid Moten, *Political Dynamics of Islamization in Bangladesh*, p.6.

১৬৪। *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ আগষ্ট, '৮৮

১৬৫। দৈনিক *সংবাদ*, ১৪ জুলাই, '৮৮

১৬৬। *পূর্বোক্ত*, ১৩ জুলাই, '৮৮

১৬৭। মতিউর রহমান নিজামী, জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

১৬৮। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*, পৃ. ১৫

১৬৯। সাপ্তাহিক *রোববার*, ৭ নভেম্বর, '৯০, পৃ. ২৩

১৭০। *পূর্বোক্ত*, ১৪ অক্টোবর, '৯০, পৃ. ১০

১৭১। দেখুন, ১৭ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক *সংগ্রামসহ জাতীয় পত্রিকা সমূহ*

১৭২। সাপ্তাহিক *রোববার*, ১১ নভেম্বর, '৯০, পৃ. ১৯

১৭৩। *পূর্বোক্ত*, ১৮ নভেম্বর, '৯০, পৃ, ১০

১৭৪। দৈনিক *সংগ্রাম*, ১১ নভেম্বর, ১৯৯০

১৭৫। *পূর্বোক্ত*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯০

১৭৬। *পূর্বোক্ত*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯০

১৭৭। *পূর্বোক্ত*, ২২ নভেম্বর, ১৯৯০

১৭৮। দেখুন, পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*, পৃ. ১৫

১৭৯। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী

১৮০। পুস্তিকা,*গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা*, পৃঃ- ১৫

১৮১। দৈনিক *সংগ্রাম*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০

১৮২। *পূর্বোক্ত*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০

১৮৩। *পূর্বোক্ত*, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯০

১৮৪। জামায়াত কেন্দ্রীয় কার্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত *দলিলপত্র* থেকে সংগৃহীত

১৮৫। পুস্তিকা, *গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিক*, পৃ. ১১

১৮৬। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

১৮৭। *Bulletin,* Jammat-E-Islami Bangladesh, vol-1, No-3, January, 1990.

১৮৮। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

১৮৯। *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ১১ই নভেম্বর, ১৯৯০

১৯০। দেখুন, *রক্তাক্ত জনপদ*, ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনা, ১৯৯২, পৃ. ১৭৭-১৮৪

১৯১। দেখুন, *১৯৮৬ সালে ২৫-২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জামায়াতের কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাসআলী খানের উদ্বোধনী ভাষণের পুস্তিকা*, পৃ. ৭

১৯২। Syed Abul A'la Mawdudi, *Islamic Law and its Introduction in Pakistan,* (Lahore, Islamic Publication Limited, 1983) PP.43-44.

১৯৩। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী

১৯৪। ড. হাসান মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩১ এবং *Bulletin,* Jammat-E-Islami Bangladesh, vol-1, No-6, April, 1991.

১৯৫। মতিউর রহমান নিজামী, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

১৯৬। *Bulletin,* Jammat-E- Islami Bangladesh, vol 1 No 4, April 1991.

১৯৭। মতিউর রহমান নিজামী, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

১৯৮। *সাপ্তাহিক রোববার*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৮৪, পৃ. ১৫

১৯৯। সাক্ষাৎকার, মতিউর রহমান নিজামী

২০০। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৭ এপ্রিল, ১৯৮৪, উদ্ধৃত, একাত্তরের ঘাতক জামায়াতে ইসলামীর অতীত, বর্তমান, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৯, পৃ. ১১৭-১৮

২০১। *সাক্ষাৎকার*, মতিউর রহমান নিজামী।

২০২। *সাপ্তাহিক রোববার*, ৩রা মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ১৪

২০৩। *ঢাকা কুরিয়ার*, ৮-১৪ মার্চ, ১৯৯১

২০৪। *সাপ্তাহিক রোববার*, ৩ মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ৩৯

২০৫। *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ৬ মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ২৩-২৪

২০৬। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ মার্চ, ১৯৯১

২০৭। *পূর্বোক্ত*, ৫ মার্চ, ১৯৯১

২০৮। *পূর্বোক্ত*, ৭ মার্চ, ১৯৯১

২০৯। *পূর্বোক্ত*, ৮মার্চ, ১৯৯১

২১০। *দৈনিক ইত্তেফাক* এবং *ইনকিলাব*, ১২ মার্চ, ১৯৯১

২১১। বিস্তারিত, অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, ষষ্ঠ খন্ড, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৬, পৃ-২২৮-২২৯

২১২। বিস্তারিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২২৮-২৩৫

২১৩। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৫ মার্চ, ১৯৯১

২১৪। বিস্তারিত, *ঢাকা কুরিয়ার*, ২২-২৮ মার্চ, ১৯৯১

২১৫। *দৈনিক ইনকিলাব*, ২১ মার্চ, ১৯৯১

২১৬। বিস্তারিত, অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, ষষ্ঠ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৫

২১৭। অধ্যাপক মো. তাসনীম আলম, *ইতিহাস অস্বীকার করা যায়না*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ২০০৬, পৃ. ৭

২১৮। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে হজ্বের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তান থেকে মক্কা শরীফ গমন করেন। এরপর তিনি পাকিস্তান ফিরে যাননি, মক্কা থেকে লন্ডন গমন করেন। ১৯৭৮ সালে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি লন্ডনেই ছিলেন

২১৯। সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযম, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে, ১৯৮৮

২২০। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *কারাগার থেকে আদালতে অধ্যাপক গোলাম আযম*, আল ইসলাহ প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ.২৩

২২১। ৫ম জাতীয় সংসদে মাওলানা নিজামীর ভাষণ থেকে, উদ্ধৃত, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬

২২২। ১ম বার ১৯৮০ সালের ২৭মে, ২য়বার ১৯৮১ সালের ৫মে, ৩য় বার ১৯৮৮ সালের ২৬ মে, ৪র্থ বার ১৯৯২ সালের ১২ জানুয়ারী, ৫ম বার ১৯৯২ সালের ১৬ এপ্রিল

২২৩। মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম, *স্বাধীনতার ২২ বছর পর*, কাকলি প্রকাশনী, পৃ. ৩৩৬

২২৪। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম* (৫ম খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

২২৫। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, *অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগ্রামী জীবন*, ১৯৮৯, পৃ. ৯৮

২২৬। মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬

২২৭। শাহরিয়ার কবির, *গণআদালতের পটভূমি*, দিব্য প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ১৪

২২৮। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২

২২৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

২৩০। দেখুন, *একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রচার সেল কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট*

২৩১। শাহরিয়ার কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

২৩২। দেখুন, এম.এ.এন. সিদ্দিক, সিনিয়র সহকারী মহাসচিব স্বাক্ষরিত সরকারের নোটিশ, উদ্ধৃতঃ অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *কারাগার থেকে আদালতে অধ্যাপক গোলাম আযম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

২৩৩। মেজর রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭

২৩৪। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ মার্চ, ১৯৯২

২৩৫। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩০৩-৩০৪

২৩৬। *পূর্বোক্ত*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.৩০৬-৩০৯

২৩৭। ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৯০-১৯৯৯)*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ. ১১১

২৩৮। *ঢাকা কুরিয়ার*, ২৪ জুন, ১৯৯৪

২৩৯। ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

২৪০। বিস্তারিত, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৭

২৪১। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩১১

২৪২। A. K.M. Shamsul Huda, *The Constitution of Bangladesh*, Vlo-2, Signet Press Limited, 1997, p 597

২৪৩। *Ibid*, P. 597

২৪৪। *Ibid*, P. 604

২৪৫। *Ibid*, P 605

২৪৬। মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার প্রসংগ: একটি পর্যালোচনা, *দি চিটাগাং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সোস্যাল সায়েন্সেস*, ভলিউম-২৪, পার্ট-২, ২০০৬, পৃ. ৩৮

২৪৭। *বুলেটিন*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জানুয়ারী, ১৯৯২

২৪৮। *পূর্বোক্ত*, মে, ১৯৯৪

২৪৯। *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*, ৬ জানুয়ারী, ১৯৯৫

২৫০। *পূর্বোক্ত*, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

২৫১। *পূর্বোক্ত*, ৩১ মার্চ, ১৯৯৫

২৫২। বিস্তারিত, *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*, মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৯৫

২৫৩। *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ অক্টোবর, ১৯৯৫

২৫৪। *পূর্বোক্ত*, ১৬ অক্টোবর, ১৯৯৫

২৫৫। *পূর্বোক্ত*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯৫

২৫৬। *পূর্বোক্ত*, ২২ অক্টোবর, ১৯৯৫

২৫৭। *পূর্বোক্ত*, ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৫

২৫৮। *পূর্বোক্ত*, ৩০, অক্টোবর, ১৯৯৫

২৫৯। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৫

২৬০। *পূর্বোক্ত*, ১১ নভেম্বর, ১৯৯৫

২৬১। *পূর্বোক্ত*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৫

২৬২। *পূর্বোক্ত*, নভেম্বর ২২, ১৯৯৫

২৬৩। *পূর্বোক্ত*, নভেম্বর ২৩, ১৯৯৫

২৬৪। *পূর্বোক্ত*, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৫

২৬৫। *পূর্বোক্ত*, ডিসেম্বর ৪, ১৯৯৫

২৬৬। *পূর্বোক্ত*, ডিসেম্বর ৮, ১৯৯৫

২৬৭। *পূর্বোক্ত*, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৯৫

২৬৮। *পূর্বোক্ত*, ডিসেম্বর ১৯, ১৯৯৫

২৬৯। *পূর্বোক্ত*, জানুয়ারী ১১, ১৯৯৬

২৭০। *পূর্বোক্ত*, ফেব্রুয়ারী ৬, ১৯৯৬

২৭১। *পূর্বোক্ত*, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৯৬

২৭২। *পূর্বোক্ত*, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৯৬

২৭৩। *পূর্বোক্ত*, ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৯৬

২৭৪। *পূর্বোক্ত*, ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯৯৬

২৭৫। *পূর্বোক্ত*, ১ মার্চ, ১৯৯৬

২৭৬। *পূর্বোক্ত*, মার্চ ৪, ১৯৯৬

২৭৭। *পূর্বোক্ত*, মার্চ ৫, ১৯৯৬

২৭৮। *পূর্বোক্ত*, মার্চ ৯, ১৯৯৬

২৭৯। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যগণ হচ্ছেন: সর্ব জনাব মাওলানা আবদুস সোবহান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মো. কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা, মাষ্টার শফিকুল্লাহ, এডভোকেট শেখ আনসার আলী, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, এডভোকেট নজরুল ইসলাম ও এ টি এম. আজহারুল ইসলাম

২৮০। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ মার্চ, ১৯৯৬

২৮১। *পূর্বোক্ত*, ১২ মার্চ, ১৯৯৬

২৮২। *দৈনিক সংবাদ*, ২১ মার্চ, ১৯৯৬

২৮৩। *পূর্বোক্ত*, ২২ মার্চ, ১৯৯৬

২৮৪। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ অক্টোবর, ২০০৭

২৮৫। *পূর্বোক্ত*, ১৯ অক্টোবর, ২০০৭

২৮৬। *দি ইন্ডিপেনডেন্ট*, জুন, ২৪, ১৯৯৬

২৮৭। Bhuian Md. Monoar Kabir, *Poitics and Development of the Jamaat-e- Islami Bangladesh,* AH Development Publishing House, 2006, p156

২৮৮। বিস্তারিত, *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*, নভেম্বর (সংখ্যাসমূহ), ১৯৯৬

২৮৯। *The Dhaka Courier*, September 27. 1996, *সাপ্তাহিক সোনারবাংলা*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

২৯০। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

২৯১। *বুলেটিন*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জানুয়ারী-১৯৯৭

২৯২। *পূর্বোক্ত*, জানু-ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

২৯৩। *পূর্বোক্ত*, জানুয়ারী, ১৯৯৭

২৯৪। *পূর্বোক্ত*, মার্চ, ১৯৯৭

২৯৫। *পূর্বোক্ত*, মে, ১৯৯৭

২৯৬। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৭ মার্চ, ১৯৯৭

২৯৭। *পূর্বোক্ত*, ২০ মার্চ, ১৯৭১

২৯৮। *পূর্বোক্ত*, ১৯ মার্চ, ১৯৯৭

২৯৯। *পূর্বোক্ত*, ৪ এপ্রিল, ১৯৯৭

৩০০। খালেদা জিয়া ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব এ.আর.এম, আবদুল মতিন, মুসলিম লীগের এ্যাডভোকেট আয়েনউদ্দিন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, মুসলিমলীগের জমির আলী, কৃষক শ্রমিক পাটির এ.এস.এম সোলায়মান, জাগপার শফিউল আলম প্রধান

৩০১। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ এপ্রিল, ১৯৯৭

৩০২। *বুলেটিন*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, নভেম্বর '৯৭

৩০৩। ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩২

৩০৪। শান্তি চুক্তি সংক্ষিপ্ত বিবরণ *পরিশিষ্টে* প্রদান করা হয়েছে

৩০৫। *মাসিক শিক্ষাঙ্গন*, জুলাই- আগষ্ট সংখ্যা, ১৯৯৮

৩০৬। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

৩০৭। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

৩০৮। *পূর্বোক্ত*, ৬ জানুয়ারী, ১৯৯৯

৩০৯। *পূর্বোক্ত*, ৭ জানুয়ারী, ১৯৯৯

৩১০। *পূর্বোক্ত*, ৮ জানুয়ারী ১৯৯৯

৩১১। *পূর্বোক্ত*, ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯৯

৩১২। *পূর্বোক্ত*, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

৩১৩। *পূর্বোক্ত*, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

৩১৪। *পূর্বোক্ত*, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

৩১৫। *পূর্বোক্ত*, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

৩১৬। *পূর্বোক্ত*, ৭ এপ্রিল, ১৯৯৯

৩১৭। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মে, ১৯৯৯

৩১৮। *পূর্বোক্ত*, ২০ মে, ১৯৯৯

৩১৯। *পূর্বোক্ত*, ২৫ মে, ১৯৯৯

৩২০। *পূর্বোক্ত*, ৮ জুলাই '৯৯

৩২১। *পূর্বোক্ত*, ১৭ জুলাই ১৯৯৯

৩২২। *পূর্বোক্ত*, ২৬ জুলাই ১৯৯৯

৩২৩। *পূর্বোক্ত*, ২৮ জুলাই, ১৯৯৯

৩২৪। *পূর্বোক্ত*, আগষ্ট বিভিন্ন সংখ্যা, ১৯৯৯

৩২৫। *পূর্বোক্ত*, ১৯ আগষ্ট,১৯৯৯

৩২৬। *পূর্বোক্ত*, ২৪ আগষ্ট, ১৯৯৯

৩২৭। *পূর্বোক্ত*, ৩১ আগষ্ট, ১৯৯৯

৩২৮। *পূর্বোক্ত*, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৩২৯। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ জুলাই, ১৯৯৯

৩৩০। বিস্তারিত, ডক্টর হাসান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার আলোকে করিডোর ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট*, ইউনিভার্সিটি পাবলিশার্স, ২০০০, পৃ. ৩২-৪২

৩৩১। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

৩৩২। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

৩৩৩। *পূর্বোক্ত*, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৩৩৪। *পূর্বোক্ত*, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৩৩৫। *পূর্বোক্ত*, ১৩ সেপ্টেম্বর,'৯৯

৩৩৬। *পূর্বোক্ত*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৩৩৭। *পূর্বোক্ত*, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৩৩৮। *পূর্বোক্ত*, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

৩৩৯। *পূর্বোক্ত*, ৪ অক্টোবর, ১৯৯৯

৩৪০। *পূর্বোক্ত*, ৯ অক্টোবর, ১৯৯৯
৩৪১। *পূর্বোক্ত*, ২১ অক্টোবর, ১৯৯৯
৩৪২। *পূর্বোক্ত*, ২২ অক্টোবর,'৯৯
৩৪৩। *পূর্বোক্ত*, ৩০ অক্টোবর, ১৯৯৯
৩৪৪। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর, ১৯৯৯
৩৪৫। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৯
৩৪৬। *পূর্বোক্ত*, ১২ নভেম্বর ১৯৯৯
৩৪৭। *পূর্বোক্ত*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৯
৩৪৮। *পূর্বোক্ত*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯
৩৪৯। *পূর্বোক্ত*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৯
৩৫০। *পূর্বোক্ত*, ১লা ডিসেম্বর,'৯৯
৩৫১। *পূর্বোক্ত*, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
৩৫২। *পূর্বোক্ত*, ৫ ডিসেম্বর,'৯৯
৩৫৩। *পূর্বোক্ত*, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
৩৫৪। *পূর্বোক্ত*, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
৩৫৫। *পূর্বোক্ত*, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
৩৫৬। *পূর্বোক্ত*, ২৩ ডিসেম্বর, '৯৯
৩৫৭। *The Bangladedh Observer*, December 3, 2000
৩৫৮। *Ibid*, 14 January, 2000
৩৫৯। *Ibid,* 22 January, 2000
৩৬০। *Ibid,* 24 January, 2000
৩৬১। *Ibid*, 26 January, 2000
৩৬২। *Ibid,* 28 January, 2000
৩৬৩। *Ibid*, 3 January, 2000
৩৬৪। *The Dhaka Courier*, 4 February, 2000
৩৬৫। *The Bangladesh Observer*, 1 February, 2000
৩৬৬। *Ibid*, 4 February, 2000
৩৬৭। *Ibid,* 9 February, 2000
৩৬৮। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০
৩৬৯। *পূর্বোক্ত*
৩৭০। *পূর্বোক্ত*, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০০
৩৭১। *পূর্বোক্ত*, ৫ এপ্রিল ২০০০

৩৭২। *পূর্বোক্ত*, ২১ এপ্রিল, ২০০০

৩৭৩। *পূর্বোক্ত*, ২৭ এপ্রিল, ২০০০

৩৭৪। *পূর্বোক্ত*, ১লা মে, ২০০০

৩৭৫। *পূর্বোক্ত*, ১০ মে, ২০০০

৩৭৬। *পূর্বোক্ত*, ১৯ মে, ২০০০

৩৭৭। পূর্বোক্ত, ২৭ মে, ২০০০

৩৭৮। *পূর্বোক্ত*, ১৪ জুলাই, ২০০০

৩৭৯। *পূর্বোক্ত*, ১৭ জুলাই ২০০০

৩৮০। *পূর্বোক্ত*, ২৬ জুলাই ২০০০

৩৮১। *পূর্বোক্ত*, ৮ আগষ্ট, ২০০০

৩৮২। *পূর্বোক্ত*, ২২ আগষ্ট, ২০০০

৩৮৩। *পূর্বোক্ত*, ১৭ ও ২৩ আগষ্ট, ২০০০

৩৮৪। *পূর্বোক্ত*, ২৫ আগষ্ট, ২০০০

৩৮৫। *পূর্বোক্ত*, ২৮ আগষ্ট ২০০০

৩৮৬। *পূর্বোক্ত*, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০০

৩৮৭। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জানুয়ারী, ২০০১

৩৮৮। *পূর্বোক্ত*, ১৯ জানুয়ারী ২০০১

৩৮৯। *পূর্বোক্ত*, ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

৩৯০। *পূর্বোক্ত*, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

৩৯১। *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

৩৯২। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জুলাই, ২০০১

৩৯৩। *পূর্বোক্ত*, ১৪ জুলাই, ২০০১

৩৯৪। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ১৯৯৪, পৃ. ৯

৩৯৫। *সংগঠন পদ্ধতি*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৫৯

৩৯৬। উদ্ধৃত, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ২০০১, পৃ. ১৭

৩৯৭। এম.এন.এগণ হচ্ছেন- জনাব আব্বাস আলী খান (বগুড়া), জনাব শামসুর রহমান (খুলনা), মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ (বাগেরহাট) এবং ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন (ঝালকাঠি)। এমপিএ দু'জন হচ্ছেন মাওলানা আবদুস সোবহান (পাবনা) ও মাওলানা আবদুল আলী (ফরিদপুর)।

৩৯৮। Carig Baxter (1971), 'Pakistan Votes-1970', *Asian Survey*, vol- 11, No- 3, 1971, P. 22

৩৯৯। হাফেজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ)*, মাওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭৩

৪০০। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩

৪০১। Muhammad A. Hakim, *op. cit*, p.24

৪০২। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, মে ১৬, ১৯৮৬, পৃ.২০

৪০৩। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী*, পৃ. ১৪১-৪৪

৪০৪। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬

৪০৫। *The New Nation*, 13 July, 1987

৪০৬। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৮৭

৪০৭। *The Bangladesh Observer*, December 4, 1987

৪০৮। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

৪০৯। Muhammad A. Hakim, *Ibid* , P. 46

৪১০। Mustafizur Rahman Siddiqui, *Movement for Democratization in Bangladesh During Ershad and Khaleda Government*, Ph.D Thesis, C.u. 2002, P.313

৪১১। ২০০৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর পল্টনে মহাসমাবেশে জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, ১৯৯১ তে আমির হোসেন আমু সাহেব (আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) মন্ত্রীত্ব এবং অধিক সংখ্যাক মহিলা আসন দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে সরকার গঠনে জামায়াতের সমর্থন চাইতে এসেছিলেন।

৪১২। মতিউর রহমান নিজামী, *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি*, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪

৪১৩। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭

৪১৪। *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৪১-৪২

৪১৫। *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৪৫

৪১৬। *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৪৭

৪১৭। *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৫৮

৪১৮। বিস্তারিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৮।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনঃ ইসলামী রাজনীতির নব অধ্যায়

খেলাফত আন্দোলন প্রধানত আলিমগণের সংগঠন বিধায় এ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। মুসলিম সমাজকে ধর্মীয় কুসংস্কার, রাজনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক দুরবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১৭০৩-১৭৬০ খ্রিঃ), তাঁর সুযোগ্য সন্তান শাহ আবদুল আযীয (১৭৪৬-১৮ খ্রিঃ), বালাকোট আন্দোলনের নেতা সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রিঃ), হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (১২৮০-১৩৬২ হি.), শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদল হাসান (১২৬৮-১৩৩৮হি.) (রাহিমাহুমুল্লাহু) প্রমুখ প্রখ্যাত আলেমগণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পূর্ব বাংলার হাজী শরিয়তুল্লাহর (১৭৮০-১৮৪০) ফারায়েজী আন্দোলন এবং পশ্চিম বাংলার শহীদ মীর নিসার আলী তিতুমিরের (১৭৮১-১৮৩১) বৃটিশবিরোধী প্রজা আন্দোলনও ছিল একাধারে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন। উপর্যুক্ত উভয় আন্দোলন ছিল ভারতের সাইয়েদ আহমদ শহীদ এবং আরবের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহবের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা। বৃটিশ ভারতে আজাদী আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন উলামায়ে কেরাম। ১৮৫৭ সালের বৃটিশ ভারতের 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের' পরিণতিতে আলিম সমাজের অনেকে নির্যাতন এবং নির্বাসনের শিকার হন। পাকিস্তান আন্দোলনেও আলিম সমাজের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করায় কংগ্রেসী জমিয়তের সাথে আলিমগণের অনেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব বঙ্গের আইন সভায় ১৪ জন আলেম নির্বাচিত হন।[১] এছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন যে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল তাতেও সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং ফুরফরার মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (১৯০৩-১৯৭৭ খ্রি), মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (১৮৯৭ ১৯৬৪ খ্রি.) শর্ষিণার পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ (১৮৭২-১৯৫২ খ্রি.), মাওলানা আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রি.) প্রমুখ দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম।[২] সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারেও আলিমগণের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবি নিয়ে নেতৃস্থানীয় আলিমগণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফর করে। এর ফলে ১৯৫১ সালের

২১-২৪ জানুয়ারী করাচিতে সর্বদলীয় উলামা সম্মেলনে ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি রচিত হয়।[৩] ইসলামী শাসনতন্ত্রের উক্ত ২২ দফা মূলনীতি ছিল নিম্নরূপ:

১. দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।

২. দেশের আইন আল কুরআন ও আল সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হবে।

৩. রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার ওপর সংস্থাপিত হবে।

৪. রাষ্ট্র মা'রূফ প্রতিষ্ঠা করবে ও মুনকার উচ্ছেদ করবে।

৫. রাষ্ট্র মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব-ঐক্য সম্পর্ক মজবুত করবে।

৬. রাষ্ট্রকে দেশের সকল নাগরিককে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি দিতে হবে।

৭. শরীঅর নিরিখে নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৮. আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

৯. স্বীকৃত মুসলিম মাযহাবগুলো আইনের আওতায় পরিপূর্ণ দ্বীনি স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১০. অমুসলিম নাগরিকরা আইনের আওতায় পার্সন্যাল 'ল'ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১১. রাষ্ট্র শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত অমুসলিম অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে।

১২. রাষ্টপ্রধান হবেন একজন মুসলিম পুরুষ।

১৩. রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবে।

১৪. রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি মজলিসে শূরা থাকবে।

১৫. রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শাসনতন্ত্র স্থগিত করতে পারবেন না।

১৬. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপ্রধানকে পদচ্যুত করা যাবে।

১৭. রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবেন এবং তিনি আইনের উর্ধ্বে হবেন না।

১৮. বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হবে।

১৯. সকল নাগরিক একই আইনের অধীন হবে।

২০. ইসলামবিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।

২১. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট বলে গণ্য হবে।

২২. আল কুরআন ও আস সুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যে কোন ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৪]

আলিমগণের চাপের মুখে গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ঘোষণা করতে হয়, যদিও পাকিস্তানের সংবিধান পুরাপুরি শরীয়াহভিত্তিক হবে না, তবু তা শরীয়ত-পরিপন্থীও হবে না।[৫] ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ইসলামী রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা

প্রত্যাহার হলে সর্বপ্রথম খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ এবং মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ (আইডিএল) গঠিত হয়। তবে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর অনুসারীরা দীর্ঘ দিন যাবত রাজনীতিতে বিমুখ ছিল। তাঁরা রাজনীতির ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করায় আলেম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রাখেননি। বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) আশির দশক পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে পদার্পণ করেন এবং আলোচিত হয়ে ওঠেন। প্রায় পুরো জীবন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণের পর বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ হাফেজ্জী হুজুরের রাজনীতিতে আগমন বিশেষত বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণের পূর্বে এদেশের আলেম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুরের 'তওবার রাজনীতি' আলেম সমাজের উক্ত অংশের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দেয়। ইসলামে রাজনীতি নেই বা ইসলাম রাজনীতি থেকে মুক্ত, এ ধরনের মন্তব্য এখন বাংলাদেশের কোন সচেতন আলেমের মুখে শোনা যায় না। কর্মকৌশল এবং পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও বাংলাদেশের আলেম সমাজ আজ একমত যে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী রাজনীতির বিকল্প নেই।

মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ রাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে তিনি দেশের শাসকবর্গকে জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। ১৯৭৯ সালের ২৯শে মে তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এক খোলাচিঠি প্রদান করেন। চিঠিতে তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় পরিস্থিতি বর্ণনাপূর্বক পবিত্র কুরআন সুন্নাহর আলোকে তা সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, প্রয়োজন ছিল যে, আপনি একজন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে পবিত্র কুরআন সুন্নাহর আলোকে দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নীতিমালা জারি করবেন এবং আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি ও আল্লাহর ছায়া হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইহ-পরকালে সফলকাল হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যা আশা করেছিলাম তা পাইনি।[৬]

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন: প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য ও কর্মনীতি

মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দলীয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনে খুব কম ভোট পেলেও প্রখ্যাত কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দলের চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করায় সে সময়

রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি খুবই আলোচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত পাঁচ জন প্রার্থীর অবস্থান নিম্নে প্রদান করা হল :[৭]

নং	প্রতিযোগীর নাম	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	শত করা হার
১.	বিচারপতি আবদুস সাত্তার-বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৪২০৩৯৫৮	৬৫.৫২
২.	ড. কামাল হোসেন-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫৬,৩৬১১৩	২৫.৯৯
৩.	মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর-নির্দলীয়	৩,৮৮,৭৪১	১.৭৩
৪.	জেনারেল এম. এ.জি.ওসমানী-নাগরিক কমিটি	২,৯৩,৬৩৭	১.৩৫
৫.	মেজর (অবঃ) এম. এ. জলিল-ত্রিদলীয় ঐক্যজোট (জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল)	২,৪৮,৭৬৯	১.১৪

এছাড়া নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ ও ইসলামিক ডেমোক্র্যোটিক লীগ (আইডিএল)-এর মাওলানা আবদুর রহীম (রহঃ)। নির্বাচনের পর পরই ২৯ নভেম্বর হাফেজ্জী হুজুর বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন নামে নতুন দল গঠন করেন। সে উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, আমাদের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ হল আত্মশুদ্ধির পথ। তিনি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ, রাসুল্লাহর (সঃ) জীবনাদর্শ অনুসরণ এবং অহমিকাবর্জিত নিষ্ঠার ওপর জোর দেন।[৮] হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে গঠিত খেলাফত আন্দোলন তাদের ঘোষণা অনুযায়ী মহানবীর (সাঃ) তরীকা মতেই এগিয়ে চলতে চায়। খেলাফত আন্দোলন তিনটি ধাপে এর কার্যক্রম অগ্রসর করতে চায়।[৯] প্রথম ধাপে মানুষকে শরীয়তের তালিম দিয়ে শরিয়ত বিবর্জিত ধ্যান ধারণা থেকে মস্তিষ্ক পবিত্র করা । দ্বিতীয় ধাপে মানুষের ভেতরে শরীয়ত প্রীতি সৃষ্টি করে তা হুবহু অনুসরণের জন্য তাদের মনকে পবিত্র করা এবং তৃতীয় ধাপে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জেহাদে অবতীর্ণ হওয়া। জেহাদের তিনটি কাজ।[১০] প্রথম কাজ হচ্ছে, মানবীয় সংবিধান ও সরকারের উচ্ছেদ ঘটিয়ে খোদায়ী সংবিধান ও সরকারের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, বৈষম্য ও কারসাজির বিলুপ্তি ঘটিয়ে ইনসাফের অর্থনীতি কায়েম এবং তৃতীয় কাজ হচ্ছে, খোদায়ী বিচারবিধি চালু করে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো নিরাপদ ও নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে :

ক. সমগ্র বিশ্বব্যাপী খেলাফত আন্দোলনের তৎপরতা সম্প্রসারিত করা ।

খ. আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করা।[১১]

খেলাফত আন্দোলনের গঠনতন্ত্রে দলের ৫ দফা উদ্দেশ্য এবং ১৫ দফা কর্মনীতির উল্লেখ রয়েছে। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

ক. রাসুলে পাকের (সাঃ) আদর্শে ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পন্থায় মানবমন্ডলীকে ইবলিসী বিভেদমূলক আইনের অনুশাসন ও উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর

যমীনে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণের দিগন্ত উন্মোচন করা।

খ. প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে স্ব স্ব ধর্ম পালনের সুযোগ প্রদান করে নৈতিকতা বিরোধী সকল অশুভ তৎপরতা বন্ধের মাধ্যমে চরিত্রবান নাগরিকে পরিণত করা।

গ. সুদ তথা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূলোৎপাটন ঘটিয়ে সম্পদ বন্টনের ইসলামী অর্থনীতি চালু করা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য শর্তাধীন মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে শর্ত ভংগের দায়ে অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার বিধান চালু করা।

ঘ. পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রবঞ্চনা ও সমাজবাদী সাম্য নামের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর দেয়া মানবিক অধিকারগুলো ফিরিয়ে দিয়ে শাসক ও শাসিতের ভেতর সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ. আর্ন্তজাতিক বিশ্বে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের লক্ষ্যে মজলুম মানবতার মুক্তি সংগ্রামে সাধ্যানুরূপ সহায়তা প্রদান ও মুসলিম জাহানে খেলাফত আন্দোলনের তৎপরতাকে সম্প্রসারিত ও সাফল্যমন্ডিত করার জোর প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

খেলাফত আন্দোলনের পনের দফা কর্মনীতি নিম্নরূপ:

১। খেলাফতে রাশেদার আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য ও আদর্শবান নাগরিক ও প্রতিনিধি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাপক তা'লীমি ও তরবিয়তী কার্যসূচি গ্রহণ এবং সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির আমূল সংস্কারের প্রয়াস চালানো।

২। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় সুদক্ষ চরিত্রবান নাগরিক গড়ে তোলা এবং বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা।

৩। পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে পেশাজীবী মেহনতী মানুষের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শোষণহীন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা। সুদ, ঘুষ, অপব্যয়, দুর্নীতি, কালোবাজারী, জুয়া, হাউজী, ভেজাল, জালিয়াতী ও ভোগ-বিলাসের অন্যান্য সকল পথ বন্ধ করে প্রতারণামূলক সুবিধা ভোগের সকল সুযোগ রহিত করা এবং বায়তুলমাল কায়েম করে নিঃস্ব, পঙ্গু, এতীম, বেকার ও বিধবাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৪। প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস ও মাথাভারী প্রশাসনের বিলুপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মচারীদের জরুরি প্রয়োজনের ভিত্তিতে বেতনের যথাযোগ্য হার নির্ধারণ করা।

৫। রাসূলে পাক (সঃ)-এর ঘোষণার ভিত্তিতে প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও নিরাপত্তার নুন্যতম প্রয়োজন মেটাবার নিশ্চয়তা বিধান কল্পে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া।

৬। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে ইনসাফভিত্তিক সহজ ও দ্রুত বিচার ব্যবস্থা চালু করা এবং বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগের ওপরে মর্যাদা দান করা।

৭। রাষ্ট্রের সকর ধর্মাবলম্বীর জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা, সার্বিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

৮। বিদেশী পণ্যের আমদানি সংকুচিত করে দেশজ শিল্পোৎপাদন উৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার দিকে পরিচালিত করা।

৯। অস্ত্র উৎপাদনসহ কতগুলো মৌলিক শিল্প রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে শিল্প ও বাণিজ্যের সকল শাখায় শর্তাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগের পথ উম্মুক্ত করা।

১০। দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষকে সংগঠিত করে সকল পেশায় আন্দোলনের আদর্শের প্রতিফলন ঘটাবার ব্যবস্থা করা।

১১। দেশের পনের হতে চল্লিশ বছর বয়সের সকল সক্ষম মুসলিম নাগরিককে ইসলামের আলোকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করে জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় ভূমিকার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১২। ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক সংস্কার সাধন করা এবং স্বল্পমূল্যে অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ, বিনা সুদে ঋণদান ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা।

১৩। আয়কর ও শুল্ক নীতির আমূল সংস্কার সাধন করে কুরআন–সুন্নাহর আলোকে সকল কর ব্যবস্থার পুণর্বিন্যাস করা।

১৪। মাতৃজাতির পরিপূর্ণ মর্যাদা এবং শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত তাদের সর্বপ্রকার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

১৫। জাতীয় স্বাধীনতা ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে সমমর্যাদার ভিত্তিতে বিশ্বের সকল শান্তিকামী দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা এবং স্বাধীনতা ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি অমর্যাদাকর যে কোন অসম মৈত্রীচুক্তি বাতিল করা। বিশেষত মুসলিম জাহানের সাথে সম্পর্ক সুনিবীড় করে সকলের সম্পদ ও জনশক্তির যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নতির ক্ষেত্রে সহযোগির ভূমিকা পালন করা।

খেলাফত আন্দোলনের প্রধানকে বলা হয় আমীরে শরিয়ত। খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠনে তিনটি পরিষদ থাকার কথা গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে। ওগুলো হচ্ছেঃ মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ, মজলিসে আমেলা বা কর্মপরিষদ এবং মজলিসে উমুমী বা সাধারণ পরিষদ। মজলিসে শূরা খেলাফত আন্দোলনের সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে

বিবেচিত হয়। খেলাফত আন্দোলনের দৃষ্টিতে গোটা মুসলিম মিল্লাত একই পার্টির অন্তর্ভূক্ত এবং সকলের জন্মগত দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তান জন্ম নিয়েছিল এ দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। অথচ এ দায়িত্ব অবহেলা করে আমরা সবাই আল্লাহ ও জনগণের সাথে ওয়াদা খেলাপের পাপ করছি। ফলে বহু রক্তপাতের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। শুধু তাই নয়, এখনও আমরা অন্তহীন দু:খ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। তাই এ পাপ থেকে আমাদের একযোগে সবাইকে তওবা করতে হবে। গত নির্বাচনে হযরত হাফেজ্জী হুজুর এ তওবারই ডাক দিয়েছিলেন। মূলতঃ প্রতারণার রাজনীতি থেকে আল্লাহর প্রবর্তিত সততার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের নামই তওবার রাজনীতি।[১২] বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এরশাদ সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খেলাফত আন্দোলন অংশ গ্রহণ করে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে খেলাফত আন্দোলন মিছিল, সমাবেশ, বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খেলাফতের ভূমিকা

১৫ দল, ৭ দল, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দলের পাশাপাশি বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ১৯৮২ সালে সেনাবাহিনীর প্রধান লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করলেও দেশ দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজিত হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক জুলুম, কালোবাজারি, জালিয়াতি, ঘুষ ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ জাতিতে রূপান্তরের উপায় উদ্ভাবন করার লক্ষ্যে মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮৩ সালের ২৩ জুলাই ঢাকার কামরাঙ্গী চরে মাদ্রাসায়ে নুরিয়ায় জাতীয় নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠক আহবান করেন। হাফেজ্জী হুজুরের আহবানে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে ১৫ দলের পক্ষে পীর হাবীবুর রহমান, নুরে আলম সিদ্দিকী, মনজুরুল আহসান খান, দিলীপ বড়ুয়া, আইডিএল এর মাওলানা আবদুর রহীম, ইউপিপি'র আবদুর রহীম আজাদ, ডেমক্রেটিক লীগের (মুয়াজ্জেম) শহিদুল আলম সাঈদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগের আবদুল মতিন, রিপাবলিকান পার্টির ওয়ালিউল ইসলাম (সককু মিয়া), ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টির অ্যাডভোকেট হাবীবুল্লাহ চৌধুরী, লেবার পার্টির আবদুল খালেক, ইসলামী ছাত্রশক্তির শওকত হোসেন প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন। বৈঠকের পূর্বাহ্নে আখতারুজ্জামান, খ. ম. জাহাঙ্গীর, খন্দকার ফারুকসহ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল হাফেজ্জী হুজুরের সাথে সাক্ষাত করে।[১৩] বৈঠকে হাফেজ্জী হুজুর তাঁর ভাষণে বলেন,

> "আমি ইতোপূর্বে ঘোষণা করেছিলাম যে, বর্তমান সরকার না ইসলামী সরকার, না জাতীয় সরকার, তাহাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ আমারদরকে নিরাশ করিয়াছে। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, চারি প্রকারের জুলুম যথা জীবনের উপর জুলুম, সম্পদের উপর জুলুম, ইজ্জতের উপর

> জুলম ও ঈমানের উর জুলম আজ চরম আকার ধারণ করিয়াছে। দেশবাসীর ধর্ম, প্রাণ, সম্মান, মান কোন কিছুই আজ নিরাপদ নহে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও পত্র-পত্রিকায় অহরহ জুলুমের খবর ছাপা হইতেছে। শাসকরা আজ শোষকের ভূমিকায় নামিয়াছে। রক্ষকরা আজ ভক্ষক সাজিয়াছে। ইনসাফের আদালত জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হইয়াছে। দুর্নীতি আজ প্রশাসন যন্ত্রের ভূষণ হয়ে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং জুলুমে বিরুদ্ধে জেহাদ করা আজ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে"।[১৪]

এ প্রেক্ষাপটে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, আমি আমার জেহাদের দ্বিতীয় ধাপে উত্তরণের সিদ্ধান্তে নিয়েছি। এ ধাপের কার্যক্রম নির্ণয়ের জন্য আমি জাতীয় নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ জরুরি ভেবে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছি। হাফেজ্জী তাঁর বক্তৃতায় নিজ দলের পক্ষে তিনটি দাবি জাতীয় নেতৃবৃন্দের সামনে পেশ করেন।[১৫] ও গুলো হলো:

১. অনতিবিলম্বে দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র অব বাংলাদেশ নামে ঘোষণা করা ।

২. দেশের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করে ৬ মাসের মধ্যে খসড়া গঠনতন্ত্র পেশ এবং এক মাস পরে এর ওপর রেফারেন্ডাম এর ব্যবস্থা করা ।

৩. দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করে তার মাধ্যমে ঐ শাসনতন্ত্র মতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

মাওলান মোহাম্মাদুল্লাহ উপরোক্ত তিনটি দাবি বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারকে আহবান জানিয়ে বলেন, নির্ধারিত সময়ের ভেতর এগুলো বাস্তবায়ন না হলে তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে সকলকে সাথে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদের কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। গোলটেবিল বৈঠকে ১৫ দলের পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, জনগণের মৌলিক অধিকার, সভা, মিছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দান, ১৯৮৪ সালের শীত মওসুমে ইউনিয়ন, থানা পরিষদের নির্বাচনের পূর্বেই সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান-এ তিন দফা লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।[১৬]

মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) ১৯৮৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে একটি খোলা চিঠি প্রদান করেন। চিঠিতে তিনি দেশবাসীর জান, মাল, ইজ্জত ও ধর্মের ওপর জুলুম থেকে পরিত্রাণে জন্য ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জেহাদে সিপাহসালারের ভূমিকা পালনের জন্য জেনারেল এরশাদের প্রতি আহবান জানান। এক্ষেত্রে তিনি তার সকল সহচর ও দোস্ত আহবাবসহ এরশাদের কমান্ডে দ্বীন পুনরুজ্জীবনের জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং জানমাল উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।[১৭] অন্যথায় হাফেজ্জী হুজুর সাধ্যানুসারে তাঁর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহারির, তাবলীগ, তালিম ও তাজকিয়ার মাধ্যমে জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। ১৯৮৪ সালে এরশাদ সরকার উপজেলা

নির্বাচনের উদ্যোগ নিলে খেলাফত আন্দোলন অন্যান্য দল ও জোটের মত সে নির্বাচন বয়কটের আহবান জানায়।[১৮] খেলাফত প্রধান মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ বলেন, উপজেলা নির্বাচনের প্রচেষ্টা প্রহসনপূর্ণ ও অর্থহীন এবং এ নির্বাচন করার অধিকার সামরিক সরকারের নেই।[১৯] খেলাফত আন্দোলন নেতৃবৃন্দ বলেন, সামরিক সরকার অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় এ সরকারের ছত্রছায়ায় সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন আশা করা যায়না। উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মুখোমুখি অবস্থা দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে খেলাফত আন্দোলন প্রধান আশংকা প্রকাশ করে সামরিক সরকাকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, অনতিবিলম্বে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।[২০]

১৯৮৪ সালের এপ্রিলে বিরোধী দল ও জোটসমূহ এরশাদ সরকারের সাথে সংলাপে অংশ গ্রহণ করলেও খেলাফত আন্দোলন তা করেনি। খেলাফত প্রধান এরশাদ সরকারকে অবৈধ ও অনৈসলামিক সরকার বলে অভিহিত করেন এবং এ জন্যই সরকারের সাথে সংলাপে যোগ দেননি বলে মন্তব্য করেন।[২১] তাঁর মতে, সংলাপে বসার অর্থ হচ্ছে অবৈধ ঘোষিত সরকারের বৈধতা মেনে নিয়ে এর হাত শক্তিশালী এবং আয়ু বাড়ানো। মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, সামরিক বাহিনীর পবিত্র দায়িত্ব হলো দেশ রক্ষা করা। সুতরাং সেনা বাহিনীর উচিত দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যথাযোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের হাতে অর্পণ করে স্বীয় কর্তব্য পালনে মনোনিবেশ করা।[২২]

১৯৮৪ সালে অক্টোবরে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হলে ১১ অক্টোবর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে এক জনসভায় এরশাদ আন্দোলনরত জোট ও দলের বিরুদ্ধে ইসলামী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে ইসলামপন্থী এবং ইসলাম বিরোধী হিসেবে বিভক্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করেন। খেলাফত প্রধান মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ সরকারের এ হীন ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকার ২২ দল এবং ২২ দল বহির্ভূক্তদের ইসলাম বিরোধী ও ইসলাম পন্থী বলে বিভক্ত করে হানাহানি সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের জুলুম নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।[২৩]

১৯৮৩ সালের ২৩ জুলাই হাফেজ্জী হুজুর জাতীয় নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠকে তিন দফা ঘোষণা করে সরকারকে ৬ মাস সময় দিয়ে বলেছেন, যদি উক্ত সময়সীমার মধ্যে তিন দফা বাস্তবায়ন না হয় তাহলে দেশবাসীকে নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে জিহাদে অবতীর্ণ হবেন। ১৯৮৩ সালের ১৪-১৬ ডিসেম্বর মাদ্রাসা নুরিয়ায় তিন দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের সমাপনী দিবসে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, প্রকাশ্যে জিহাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনটি ধাপে আন্দোলন অব্যহত থাকবে। প্রথম ধাপে ইসলাম বিরোধী সরকার

পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার জন্য সার্বিক প্রচারাভিযান চালানো হবে এবং মসজিদ ও মাদ্রাসায় এবং জনগণের মধ্যে খতম ও দু'আর ব্যবস্থা চালু করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর মন্ত্রিসভার সাথে শরীআ'ত নির্দেশিত পথে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। অর্থাৎ দেশবাসী তাদের কোন আচার অনুষ্ঠানে এমন কি তাদের কাহারো জানাযায় শরীক হবে না। অধিকন্ত স্বেচ্ছায় যদি কেউ তাতে যোগদান করে তাহলে দেশবাসী তাদেরও বয়কট করবে। তৃতীয় ধাপে জনগণ এরশাদের অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে আমীরুল মোমেনিন নির্বাচনপূর্বক অর্থনৈতিক অসহযোগ সৃষ্টির চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হবে।[২৪]

এরশাদ সরকার ঘোষিত নীতি এবং কর্মসূচির ব্যাপারে জনগণের মতামত নেয়ার উদ্দেশ্যে গণভোট গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে খেলাফত আন্দোলন-এর বিরোধিতা করে। গণভোট অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ পূর্বে ১৫ মার্চ, ১৯৮৫ বায়তুল মোকাররমে আহূত খেলাফত আন্দোলনের সমাবেশ সরকারের বাধার মুখে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সরকার খেলাফত আন্দোলন এবং সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে এবং নেতা কর্মীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহকে সরকার গৃহবন্দী করে রাখে। এ প্রেক্ষিতে হাফেজ্জি হুজুরের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়, সরকার দেশের সকল রাজনীতিক, সাংবাদিক ও সকল মানুষের বাক স্বাধীনতা হস্তরু করে সামরিক আইন জারি রেখে কয়েক প্রকারের লক্ষ লক্ষ পোস্টার ও নির্বাচনী অন্যান্য খাতে কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ অপব্যয় করে প্রহসনমূলক গণভোট দিয়ে স্বৈরশাসন চালাবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রহসনমূলক গণভোটকে বয়কট করার আহবান জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, "আপনারা এরশাদী গণভোট কেন্দ্রে গিয়ে ফেরাউনী শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেবেন না। জাতির দ্বীন ও ঈমান নষ্ট করার সুযোগ করে দেবেন না।"[২৫]

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে বিরোধী দলের দাবির মুখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় সরকার। ৭ মে, ১৯৮৬ অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তা ছিল অত্যন্ত জালিয়াতির নির্বাচন। সহিংস ও আরাজকতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সে নির্বাচনে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ৩৯ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু খেলাফত আন্দোলনের কেউ নির্বাচিত হয়নি।[২৬]

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত 'রাষ্ট্রধর্ম' বিলকে খেলাফত আন্দোলন সমর্থন দান করে।[২৭] কিন্তু পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের ধোঁকাবাজি বুঝতে পেরে খেলাফত আন্দোলন সরকারের উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত অষ্টম সংশোধনীর বিরোধিতা করে। খেলাফত প্রধান মাওলানা আহমদুল্লাহ আশরাফ (হাফেজ্জী হুজুরের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে আহমদুল্লাহ আশরাফ আমীর হন)-এ প্রসঙ্গে বলেন, দেশের জনগণের ইসলামী হুকুমতের প্রতি আকাংখা দেখে স্বার্থ হাসেলের জন্য সরকার অতীতের

শাসকগোষ্ঠির মত ইসলামের নামে জনগণকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। সরকার রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা দিয়ে মূলতঃ ইসলাম বিরোধিদের বিরোধিতা করার নতুন করে সুযোগ দিয়েছে।[২৮]

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ও খেলাফত আন্দোলন

১৯৮৪ সালের ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহর নেতৃত্বে ১০টি রাজনৈতিক সংগঠনের সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' নামে রাজনৈতিক জোট গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ জোটের নামকরণ করা হয় খেলাফত সংগ্রাম পরিষদ।[২৯] সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ[৩০] গঠন উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, সংগ্রাম পরিষদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ ও রসুলের কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এবং আশু লক্ষ্য হচ্ছে অনতিবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো, হক্কানী ওলাময়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের একটি বিপ্লবী সরকার গঠন,বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা। হাফেজ্জী এরশাদ সরকারের অবৈধ অনৈসলামিক শাসন উৎখাত করার জেহাদে অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, এই জেহাদের মধ্যে দিয়ে খোদায়ী লা'নত ও মানবীয় জিল্লতি থেকে মুক্তি আসবে। ১৯৮৪ সালের ১১ই অক্টোবর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জনদলের জনসভায় ইসলামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এরশাদের আহবানের পর সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জরণ ওঠে; এরশাদের আহবানে বিরোধীদলের আন্দোলনকে বিভক্ত করার জন্য এই পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে পরিষদের অন্যতম নেতা মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, এরশাদের আহবানের কারণে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়নি।[৩১]

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহাসিক ঘোষণার সংক্ষিপ্ত বর্ণণা নিম্নরূপঃ

> "এই উপমহাদেশে প্রায় হাজার বছর শাসন চালানোর পর মুসলমানরা প্রায় দু'শ' বছর বৃটিশের গোলামীর অমর্যাদাকর অভিশাপের শিকার হয়। এ অভিশাপের আঘাতে সচকিত মুসলমানরা গোলামীর শুরু থেকেই খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ আজাদী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত সে আজাদী জেহাদে টিপু সুলতান, সৈয়দ আহমদ শহীদ ও হাজী নেসার আলী ওরফে তিতুমীরসহ তাঁদের উত্তরাধিকারী হাজার হাজার আলেম ও অনুসারী শাহাদাত বরণ করেন। সে সংগ্রামের শেষভাগে এসে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী এর নেতৃত্বে পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ বিতাড়নের অভিযান চলে। সে অভিযানের ধারা বেয়েই পরবর্তীকালে ওলামায়ে কেরাম, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশপ্রেমিক জনতার অশেষ ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে বৃটিশ বিতাড়ন পর্ব সমাপ্ত হয়।" ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়,

"ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ওয়াদা রক্ষায় পাকিস্তানী শাসকচক্রের ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতাজনিত জুলুম ও বৈষম্যের জন্যই অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র নায়করাও ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা না করে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ও গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন। জাতীর হতাশা তখন চরমে পৌছায়।" ঘোষণায় আরো বলা হয়

"এক দুর্যোগময় মুহূর্তে দ্বীন ও মিল্লাতের হেফাজতের তাগাদায় আমি তওবার ডাক দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। অত:পর নির্দলীয় হিসেবে দলমত নির্বিশেষ গোটা জাতিকে খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্য বদ্ধ হওয়ার আহবান জানালাম। জাতীয় নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক ডেকে ইসলামী হুকুমতের তিন দফা কর্মসূচি পেশ করলাম। সামরিক সরকার প্রধানের কাছে খোলা চিঠি দিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আহবান জানালাম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি আমার আহবানে সাড়া না দেয়ায় জিহাদের তৃতীয় ধাপ ঘোষণা করলাম। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আহবান জানালাম খেলাফত প্রতিষ্ঠার এ জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমার সে আহবানের ফল আজ আপনারা সব ক্ষেত্রে কমবেশি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সামরিক সরকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এর স্বৈরাচারী তান্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্ট যে, বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা দলের মাধ্যমে সংকট উত্তরণ সুকঠিন। তাই আজ ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ অধমের নেতৃত্বে দশটি দ্বিনী রাজনৈতিক ও যুব সংগঠনের সমন্বয়ে ইসলামী হুকুমতের তিন দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মোশতারাকা মজলিসে আমল বা সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে।"

ঘোষণায় পরিষদের চূড়ান্ত এবং আশু লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ ও রাসুলের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এবং আশু লক্ষ্য হচ্ছে:

১. অনতিবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন।

২. বাংলাদেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ' ঘোষণা করা।

৩. হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে খসড়া ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে শাসনতন্তের ওপর জনমত গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান।[৩২]

পরিষদ গঠনের পর ২৬ অক্টোবর বায়তুল মোকাররম চত্বরে আয়োজিত দোয়া সমাবেশে সামরিক আইন প্রত্যাহার, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্বলিত তিন দফা দাবি জানানো হয়।[৩৩] ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চের প্রহসনমূলক গণভোটের বিরুদ্ধে আহুত খেলাফত সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ পুলিশের হস্তক্ষেপে বানচাল হয়ে যায়। পুলিশ হাফেজ্জী হুজুরকে সমাবেশে যেতে বাধা দেয় এবং পরবর্তীতে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে। পুলিশ পরিষদ নেতা মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা হামিদুল্লাহসহ অন্যান্য নেতা কর্মীকে দৈহিকভাবে নির্যাতন চালায় এবং গ্রেফতার করে। পরিষদ নেতা মেজর (অব:) আব্দুল জলিলকেও পুলিশ গৃহবন্দী করে রাখে।[৩৪] ১৯৮৫ সালের ২১ জানুয়ারি ঢাকায় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয়

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের জাতীয় সমাবেশ । সমাবেশের ঘোষণাপত্রে সংগ্রাম পরিষদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। তিন দফার অন্যতম দাবি হচ্ছে সামরিক শাসনের অবসান ঘটনো। সমাবেশে হাফেজ্জীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইসলামী হুকুমত কায়েমের মাধ্যমে দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার আহবান জানানো হয়। জাতীয় সমাবেশে হযরত হাফেজ্জী হুজুর বলেন, তাঁর নেতৃত্বে খেলাফত কায়েম হলে আর কোন দিন সামরিক শাসন আসবে না।[৩৫] সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করার কথা ঘোষণা করে। পরিষদের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ জেলা ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকদের পদ বিলুপ্তির ঘোষণাকে সামরিক শাসনের অবসান মনে করেনা। সংগ্রাম পরিষদ হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে দেশবাসীকে সামরিক শাসন অবসানের আন্দোলনকে তীব্রতর করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জেহাদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোর জন্য আহবান জানান।[৩৬]

নির্বাচনী রাজনীতিতে খেলাফত আন্দোলন

খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সকল জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে খেলাফত আন্দোলনের নীতি ও কর্মসূচি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়, দেশের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, জনগণ শুধু তার নির্দেশিত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে। ইটাই হবে রাষ্ট্রনীতি। প্রচলিত রাজনীতি মানুষের সার্বিক মুক্তি দিতে পারে না। আল্লাহর দ্বীন ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাই একমাত্র কবচ বলে ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়।[৩৭] মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রাজনীতিতে পদার্পণের পর সব সময়ই ভোটকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, অনেকে মনে করেন গদী দখল করার জন্য আমি নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। নাউজুবিল্লাহ আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তওবা করা। আর তওবার নিয়ম হলো যেমন অপরাধ তেমন তওবা। গোপন গোনাহের তওবা গোপনে, প্রকাশ্য গোনাহের তওবা প্রকাশ্যে। হাদীস শরীফে রয়েছে, অন্যায় অপকর্ম দেখলে হাত দ্বারা বাধা দাও, সম্ভব না হলে মৌখিক বাধা প্রদান কর, তাও সম্ভব না হলে অন্তরে অপকর্মকে ঘৃণা কর ও তা নির্মূল হওয়ার জন্য দোয়া করতে থাক। আমরা তৃতীয়টি সর্বদাই করে আসছি। দ্বিতীয়টি বারবার করেছি। আজ আমরা হাত দ্বারা অর্থাৎ ভোট ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে চাই। আমরা ভোট দিয়ে গোনাহ করেছি, ভোট দিয়েই প্রতিরোধ করতে চাই, আমরা ভোট দিয়ে তওবা করতে চাই।[৩৮]

খেলাফত আন্দোলন নামে দল প্রতিষ্ঠার পূর্বে মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর নির্দলীয়ভাবে ভাবে ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করে দেশবাসীর কাছে এক বক্তব্যে হাফেজ্জী বলেন,

আপনারা হয়তো অবাক হয়েছেন যে, আমার মত নগণ্য বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, যে তার জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিচয় ও খ্যাতি হতে দূরে নির্জনে কাটিয়ে দিয়েছে, সে রাজনীতির বিস্তীর্ণ দুর্গম প্রান্তরে কেন নেমে আসলো?... মুসলিম জনতার খেদমতে আমার কৈফিয়ত, ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে বর্তমানের এই মুহূর্ত পর্যন্ত ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন, একটু গভীর দৃষ্টি দিন, তাহলে এ কথা অতি সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, মহানবী (সাঃ) ইসলামের যে মহীবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন এবং তিনি নিজেই যার বিকাশ ও স্থায়িত্বের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এমনকি পবিত্র রক্ত পর্যন্ত দান করেছিলেন, তাঁর ওফাতের পরও সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত গতিতে চলেই আসছে। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাদের পরবর্তী যুগে তাঁদের অনুসারী, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী ওলামায়ে কেরাম নিজ নিজ যুগের বাতিলের মোকাবিলায় জিহাদ করে করে মহীবৃক্ষকে সেচন করে এসেছেন।... আজ সারাদেশে অশান্তির আগুন জ্বলছে। কৃষক, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, পেশাজীবী কারো সুখ নেই। জুলুম, অত্যাচার, অবিচারে সমাজ দেহ জর্জরিত, চারদিকে হাহাকার। অথচ ইসলামী হুকুমতের অবস্থা শুনুন, অর্ধেক পৃথিবীর খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) একদিন মসজিদে নববীতে সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যদি অন্যায় পথে চলি তবে তোমরা কী করবে? একজন সাধারণ মুসলমান খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে বললো এই তলোয়ার দ্বারা তোমাকে সোজা করে দেব। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে এমন নির্ভীক ব্যক্তির উপস্থিতি দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ)'র ঘোষণা ছিল, সুদূর ফোরাতের তীরেও যদি কোন কুকুর না খেয়ে মারা যায়, তবে তার জবাব আল্লাহর দরবারে আমাকেই দিতে হবে। আর একটি ঘটনা। দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহান ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে শুকরিয়া আদায় করলেন। উযীর সাইদুল্লাহ খান খোলা তরবারি দেখিয়ে বললেন,"আজ যদি আপনি ফেরআউনের মত কোন শয়তানী ঘোষণা দিতেন, তা হলে এ তরবারি দ্বারা আপনাকে শহীদ করে আজীবন আপনার নেমক খাওয়ার হক আদায় করতাম"। বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরস্কৃত করলেন। আর বর্তমান যুগের সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলে দেখুন। জেল, ফাঁসি ছাড়া কিছুই আপনার ভাগ্যে জুটবেনা। তবুও আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি। আন্দোলন করেই যাব, সত্য কথা বলেই যাব। অন্যথায় আল্লাহর দরবারে কী জবাব দেব? তবুও আন্দোলনের পদক্ষেপ হিসেবে আমরা বর্তমান পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছি। বন্ধু-বান্ধবদের সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে বলছি, গদী আমার কাম্য নয়, তবে যদি আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করেন তা হলে এমন লোকদের শাসন পরিচালনায় বসাতে চেষ্টা করবো যারা দেশে ইসলামী বিধান জারি করবে, দেশের মানুষের সুখ সুবিধা, শান্তি নিরাপত্তাকে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য দেবে। হযরত ওমর (রাঃ)'র ন্যায় ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। যাবতীয় অপকর্ম দূরীভূত করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র ইসলামী বিধানই দিতে পারে দেশ ও জাতিকে সুখ, শান্তি ও সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। আমি একথা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, দৃঢ় মনোভাবের সাথে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি। ইনশাআল্লাহ আমি পেছপা হবো না। আমরা সাধনা করেই যাব। পরিপূর্ণতা আল্লাহর হাতে।... আমার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার হলো, আমরা বিগত বছরগুলোতে অপরাধ করে আসছি। আমরা নেয়ামতের নাশোকরী করেছি। এখন আমরা তওবা করতে চাই; আর সে তওবার প্রথম পদক্ষেপ হলো নির্বাচনে অংশ গ্রহণ। আমার এ পয়গাম হলো তওবানামা।[৩৯]

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী সকল বিরোধীদল ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বয়কট করে। কিন্তু খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করেন। এরশাদকে মোকাবেলার জন্যই তিনি প্রার্থী হয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ বলেন, "প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমি এক নীতির ওপর অটল আছি। এ সরকারের কোন পদক্ষেপই চ্যালেঞ্জহীন হতে দেইনি। তাই নির্বাচনে তাঁকে (এরশাদকে) মোকাবেলার জন্যেই প্রার্থী হয়েছি।"[৪০] নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে তিনি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বাদ দিয়ে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানান। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ বলেন, "সকল রাজনৈতিক দল যখন নিশ্চুপ তখন এই সরকারকে আমিই সর্ব প্রথম অবৈধ ও অনৈসলামী ঘোষণা করি। কিন্তু কেউ এর গুরুত্ব অনুধাবন করেনি।[৪১] ভোটদান প্রসঙ্গে মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ বলেন, "ভোট একটি জাতীয় আমানত এবং পবিত্র দ্বীনি কর্তব্য। দ্বীনদার, ধর্মপ্রাণ ও বিশ্বস্ত লোককে নির্বাচিত করাই ভোটারদের দায়িত্ব। অযোগ্য পাত্রে ভোট দান আমানতের খোয়ানত, বিশ্বাস ঘাতকতা এবং মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানের শামিল।"[৪২] রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ঢাকায় খেলাফত আন্দোলনের নির্বাচনী জনসভায় হাফেজ্জী হুজুর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ক্ষমতাসীনদের পাপাচারে অংশীদার হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য সর্বজনীন তওবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে ও এ বছর নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি যোগ্য নেতৃত্ব বাছাইয়ের নির্ভরযোগ্য পন্থা না হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সার্বিক সংকটময় পরিস্থিতি থেকে শান্তিতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে বিকল্প হিসেবে তিনি এ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। হাফেজ্জী হুজুর আরও বলেন, সমস্যার একমাত্র সমাধান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। তিনি খেলাফতে রাশেদার অনুসৃত 'শূরা' পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনার অঙ্গীকার করেন।[৪৩] প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে হাফেজ্জী হুজুর বলেন, সামরিক শাসনের অবসানে অবৈধ সরকারের উচ্ছেদ এবং আন্দোলনে সংগঠিত হবার জন্যেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছি।[৪৪] নির্বাচনে হাফেজ্জী হুজুর প্রদত্ত ভোটের ৫.৬৯% ভাগ পেয়ে দ্বিতীয় হন। লে: জে: এরশাদের পক্ষে ৮৩.৫৭% ভাগ দেখিয়ে তাঁকে বিপুল ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।[৪৫] ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হযরত হাফেজ্জী হুজুর খুব কম ভোট পেলেও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী, ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী জাসদ সভাপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর (অব:) এম. এ জলিলকে পেছনে রেখে তৃতীয় স্থান অধিকার সে সময় রাজনীতিতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নির্বাচনের পর পরই তিনি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি

খেলাফত আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অবশ্য সে নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলো বয়কট করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের প্রাপ্ত ভোট ও অবস্থান নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

নির্বাচনের তারিখ	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার	অবস্থান
১৫ নভেম্বর, ১৯৮১	৩,৮৮,৭৪১	১.৭৩	তৃতীয়
১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬	১৫,১০,৪৫৬	৫.৬৯	দ্বিতীয়

উৎস: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক সারণিকৃত।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রত্যেকটি সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন অংশ গ্রহণ করে। তবে কোন নির্বাচনে তারা সংসদে আসন লাভ করতে সমর্থ হয়নি। নিম্নে জাতীয় নির্বাচনে খেলাফত আন্দোলনের অংশ গ্রহণ এবং দলীয় অবস্থা সারণির মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো:

সংসদ নির্বাচনে খেলাফত আন্দোলনের অবস্থান

সংসদ নির্বাচন ও তারিখ	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট	শত করা হার
তৃতীয়, ৭ মে, ১৯৮৬	৩৯	১,২৩,৩০৬	০.৪৩
চতুর্থ, ৩রা মার্চ, ১৯৮৮	১৩	১,০৫,৯১০	০.৪১
পঞ্চম, ২৭ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১	৪৩	৯৩,০৪৯	০.২৭
ষষ্ঠ, ১২ জুন, ১৯৯৬	৪৬	১৮,৩৯৭	০.০৪৩৪
সপ্তম ১ অক্টোবর, ২০০১	৩০	৯৫৩৪*	০০

*উৎস: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখক কর্তৃক সারণিকৃত।*১৬ টি আসনের ফলাফল ।*

ওপরের সারণি থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, ক্রমান্বয়ে খেলাফত আন্দোলনের জনসমর্থন কমে আসছে। মূলত খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের কারণে দলটি বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি হাফেজ্জী হুজুরের নিকট আত্মীয়রা (ছেলে-জামাই) তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৮৭ সালের শেষের দিকে সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং অধ্যাপক আখতার ফারুক, মাওলানা হামীদুল্লাহ, মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ও অ্যাডভোকেট সিরাজুদ্দৌলার বিরোধিতা নিয়ে খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়। অধ্যপক আখতার ফারুখসহ নেতৃত্বের একটি অংশের বিরুদ্ধে ইরানী লবির অভিযোগ তোলা হয় এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের দলের দায়িত্ব থেকে বাদ দেয়ার দাবি জাননো হয়। এ প্রসঙ্গে খেলাফত আন্দোলনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিব উল্লাহ মেছবাহ ১৬ জানুয়ারী ১৯৮৫ সালে আমীরে শরিয়ত হযরত হাফেজ্জী হুজুরকে সম্বোধন করে এক চিঠি প্রদান করেন।

চিঠিতে উল্লেখ করেন, খেলাফতের নীতি ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসে মওদূদীপন্থী অধ্যাপক আখতার ফারুকের চক্রান্তে খেলাফত আন্দোলন থেকে ওলামায়ে হাক্কানীদের সরানোর নীল নকশা কার্যকরী করা শুরু হয়। যে মওদূদীয়াতের বিরুদ্ধে হযরত হাফেজ্জী হুজুর আজীবন জেহাদ করলেন এবং হুজুরের নেতৃত্বে ৪৫৩ জন ওলামায়ে কেরামের দস্তখত সম্বলিত ফতোয়াও করলেন, সেই মওদূদীয়াতের এদেশীয় প্রধান প্রবক্তা মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেবের রচিত আইডিএল এর দলীয় কর্মসূচি ও দফাকে খেলাফতের কর্মসূচির মধ্যে সুচতুরভাবে ঢোকানো হল। এর প্রমাণ হচ্ছে আইডিএল এর দলীয় মুখপাত্র জাহানে নও পত্রিকার ২৪.০৭.১৯৮৩ তারিখের বক্তব্য যথা:"এ বৈঠকে (গোলটেবিল) বর্ষীয়ান নেতা হাফেজ্জী হুজুর জাতির বর্তমান সংকটাবস্থার নিরসন কল্পে তিনটি বৈপ্লবিক দাবি উত্থাপন করেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, দেশের গণভিত্তিক ইসলামী সংগঠন ইসলামী ডেমোক্র্যোটিক লীগ ইতোপূর্বে এই তিনটি দাবিই জনগণের সামনে উত্থাপন করে।"[৪৬]

চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়, সম্পূর্ণ অগঠনতান্ত্রিকভাবে খেলাফত আন্দোলনকে একটি পার্টি হিসেবে ১০ দলীয় সংগ্রাম পরিষদে ঢুকানো হয়েছে। যদিও এর নামের মধ্যে ইসলামের নাম পর্যন্ত নাই এবং জেহাদ শব্দটি ছেড়ে দিয়ে সংগ্রাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠিতে হাফেজ্জী হুজুরের ছেলে মাওলানা হামীদুল্লাহর ইরানী লবির সাথে সম্পৃক্ততা এবং ইরান থেকে টাকা এনে তা সংগঠনকে না জানানোর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।[৪৭] ১০ দলীয় সংগ্রাম পরিষদের সকল সমাবেশ বর্জন এবং অবিলম্বে মজলিসে শূরার অধিবেশন ডেকে দুর্নীতিপরায়ণ চার কুচক্রীকে খেলাফত আন্দোলনের পদ হতে বহিষ্কারের জন্য হযরত হাফেজ্জী হুজুরের প্রতি খেলাফত কর্মীদের আহবান সম্বলিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়" আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়াছে যে, খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চার কুচক্রী যথা-মাওলানা হামিদুল্লাহ, অধ্যপক আখতার ফারুক, মাও ফজলুল হক আমিনী ও অ্যাডভোকেট সিরাজুদ্দৌলা অপূর্ব কৌশলে কুক্ষীগত করিয়াছেন, তাহাদের চক্রন্তের ফলে খেলাফত কর্মী ও এই জাতির আশা ভরসার স্থল হযরত হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্ব গভীর সংকটে পরিণত হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠক থেকে শুরু করিয়া এই পর্যন্তকাল হযরত হাফেজ্জী হুজুরের নাম ভাংগাইয়া এই কুচক্রীরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও গ্রহণ করিয়াছে তাহা এতই স্ববিরোধী ও হীন উদ্দেশ্যপ্রনোদিত যে যে কোন সাধারণ মানুষেরও ইহাতে মাথা হেঁট হইয়া আসে। কুচক্রীদের চক্রান্তের সর্বশেষ ফসল হইতেছে খেলাফত আন্দোলনকে ১০ দলীয় সংগ্রাম পরিষদে রূপান্তর। এই সম্মিলিত পরিষদ জাতির অবিসম্বাদিত নেতা হাফেজ্জী হুজুরকে জাতির নেতৃত্বে হইতে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে হুজুরের নিকট তাঁহার মুহেব্বীন কর্মীগণের একান্ত নিবেদন, তিনি যেন অবিলম্বে চক্রান্তকারীদের সৃষ্ট এই ঐক্যজোট আহুত সকল সমাবেশ বর্জন করেন এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মজলিসে শূরার সাবেক ও বর্তমান সদস্যদেরকে পত্রিকার মাধ্যমে জরুরি অধিবেশন আহবান করিয়া এই

কুচক্রীদের খেলাফত হইতে বহিষ্কার করেন এবং তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাদির আশু সমাধান করিয়া খেলাফত আন্দোলনের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করেন।[৪৮]

খেলাফত আন্দোলনের কর্মতৎপরতা হ্রাসের কারণ উল্লেখ করে একজন গবেষক মন্তব্য করেন, "বিশেষ করে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাঁর (হাফেজ্জী হুজুর) গঠিত বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কর্মতৎপরতা হ্রাস পেতে থাকে যা ক্রমান্বয়ে নিস্প্রভ পর্যায়ে গড়াতে থাকে। যদিও অভীষ্ট লক্ষ্যেরদিকে এগিয়ে যেতে হুজুরের ব্যক্তিগত চিন্তা চেতনা সমুন্নত ছিল। দলীয় কতিপয় নীতি নির্ধারক নেতৃবৃন্দের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাদের একগুঁয়েমি মনোভাব এবং ব্যক্তিগত মতামত দলীয় ব্যানারে প্রদর্শন মূলত এর জন্য দায়ী।"[৪৯]

খেলাফত আন্দোলন থেকে বের হয়ে আল্লামা আজিজুল হক, মাওলানা ফজলুল করিম, (পীর সহেব চরমোনাই), মুফতি ফজলুল হক আমিনী, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তুলনমূলকভাবে ৪টি বড় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মূল খেলাফত আন্দোলন সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিকভাবে নিস্প্রভ হয়ে পড়লেও খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ইসলামী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করেন। খেলাফত আন্দেলনের প্রতিষ্ঠার কারণে সার্বিকভাবে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের শক্তি ও সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যু ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে খেলাফত আন্দোলনের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে কাশ্মীর, আজারবাইজান, আফগানিস্তানের মজলুম মুসলমানদের পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করে এ সকল দেশে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি ছাড়াও খেলাফতে আন্দোলন প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির বিরোধিতা করে।[৫০]

আন্তর্জাতিক ফোরামে মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী

১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ এবং তৎপরবর্তী খেলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পর হযরত হাফেজ্জী হুজুর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোচিত হন এবং কুটনৈতিক মহলসহ বিদেশেও তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নির্বাচনের পর ইরান ও ইরাকের উচ্চ পর্যায়ের দুজন কর্মকর্তা পৃথক পৃথকভাবে কামরাঙ্গীর চরে মাদ্রাসায়ে নুরীয়ায় উপস্থিত হয়ে হাফেজ্জী হুজুরকে ইরান ও ইরাক সফরের আমন্ত্রণ জানান। ভ্রাতৃপ্রতিম দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে তখন যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধে দেশ দু'টির শহর-বন্দর ও জনপদ ধ্বংস হওয়া ছাড়াও উভয় দেশের হাজার হাজার নর-নারী মৃত্যর কোলে ঢলে পড়ে। উক্ত প্রেক্ষাপটে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ দু'টির যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালের শেষ দিকে হযরত হাফেজ্জী হুজুর ইরান-ইরাক শান্তি মিশন শুরু করেন। প্রথমেই তিনি ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইরান সফর করেন। পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ছিল তাঁর সফরসঙ্গী।[৫১] ইরান পৌছালে

হযরত হাফেজ্জী হুজুরসহ প্রতিনিধিদলকে তেহরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে আট দিন ইরানে অবস্থানের সময় তাঁরা ইরানের অবিসংবাদিত ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনী (রহ:), প্রেসিডেন্ট আলী খামেনীসহ উচচ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। ইরান সফরের পর হজ্জ পালন শেষ করে অক্টোবরের পাঁচ তারিখ হাফেজ্জী হুজুর তাঁর শান্তিমিশনের সদস্যগণসহ ইরাকে পৌছান। ইরাকে হাফেজ্জী হুজুরের প্রতিনিধিদলে আরো তিনজন নতুন সদস্য যুক্ত হন।[৫২] শান্তি মিশনের লক্ষ্য নিয়ে হাফেজ্জী হুজুর ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনসহ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন।[৫৩] উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়ের সময় তাঁরা ইরান-ইরাকের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধ এবং কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে শান্তি স্থাপনের আহবান জানান। ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয় ইরাক যদি ইসলামী হুকুমত কায়েমের কথা ঘোষণা করে এবং ইরাকী আলেমবৃন্দ ও হাফেজ্জী হুজুরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রণীত ইসলামী হুকুমতের রূপরেখা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় তাহলে যে কোন রাজনৈতিক শর্ত ছাড়াই তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত আছে। উক্ত প্রস্তাব ইরাকের প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব মেনে নিলেও কুরআন সুন্নাহর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে তাঁর দেশের বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেন।[৫৪] হযরত হাফেজ্জী হুজুরের শান্তিমিশন সফল না হওয়ার কারণ হিসেবে শান্তি মিশনের ব্যাপারে উভয় দেশের সরকার প্রধান ও নীতি নির্ধারকদের ভুল বোঝাবুঝির শিকার হওয়া ছাড়াও দেশ দু'টির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর বৈরী সম্পর্ক এবং 'শিয়া-সুন্নী' আকিদাগত পার্থক্যও বিরাট ভূমিকা রেখেছে।[৫৫]

১৯৮৫ সালের জুলাই-আগস্ট এ অনুষ্ঠিত লন্ডন মুসলিম ইনস্টিটিউট আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে হযরত হাফেজ্জী হুজুর প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। প্রায় একশটিরও অধিক দেশের বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও উলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হযরত হাফেজ্জী হুজুর বলেন:

> এক নেতা ও একনীতিই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। একক চিন্তাধারা বা মতাদর্শ মানুষ পেতে পারে অবতীর্ণ গ্রন্থ থেকে এবং একক নেতৃত্ব পেতে পারে অবতীর্ণ গ্রন্থের বাহক নবী অথবা নায়েবে নবী থেকে। এই নীতি ও নেতা থেকে বিচ্যুতি মানুষের সকল অনৈক্য ও বিপর্যয়ের মূল। আল্লাহর খলিফার মূল কর্তব্য আল্লাহর জমিনে ইনসাফের বিধান কায়েম করা যেমন আল্লাহ বলেন: "নি:সন্দেহ আমি আমার রাসুলদের সুস্পষ্ট দলিল প্রমানসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে গ্রন্থ ও ইনসাফ দণ্ড পাঠিয়েছি যাতে তারা মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করে। আর সেই সাথে লোহা পাঠিয়েছি যাতে কঠিন ভয়ের কারণ বিদ্যামান এবং মানুষের প্রভূত কল্যাণও রয়েছে। এ থেকে আল্লাহ জানতে পারেন যে আল্লাহ ও রাসুলকে না দেখেও কারা সাহায্য করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর ও অজেয়।"[৫৬] আল কুরআন এ আয়াত থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি:

[এক] এক বা দু'লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়ায় ইনসাফ ও সমতা কায়েমের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন।

[দুই] ইনসাফ ও সমতা কায়েমের একমাত্র ভিত্তি হল ঐশীগ্রন্থ ।

[তিন] যারা তা অমান্য করে যুলুম কায়েম করতে চায় তাদের শায়েস্তা করার জন্য লৌহের ব্যবস্থা অপরিহার্য।

[চার] যুলুম উৎখাত মানব কল্যাণের বড় দিক।

[পাঁচ] আসল শক্তি ও চূড়ান্ত বিজয় আল্লাহর হাতে বিধায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারিদের সম্পর্ক কেবল তাঁরই সাথে থাকবে।

এ বিচ্যুতি যে সব কারণে আসে তার ভেতর আসবিয়াত, জাহেলিয়াত বা জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতা সবচাইতে মারাত্মক। আল্লাহ পাক বলেন, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ যেন তোমাদের ন্যায় থেকে বিচ্যুত না করে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর, সেটাই খোদাভীতির সব চাইতে কাছাকাছি (আল কুরআন) । মূলতঃ গোত্রীয়, আঞ্চলিক, ভাষাভাষী কিংবা বর্ণগত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ইসলামের প্রাণশক্তি ন্যায় ও ইনসাফকে ধুলিসাৎ করে দেয় এবং মানুষে মানুষে সর্বভেদ ও হানাহানি চরমে পৌঁছায়। বস্তত অতীতের আইয়ামে জাহিলিয়াতের মতই আজকের মাগরেবী জাহিলিয়াত একইভাবে কওমী আসবিয়াত ও কওম পরিস্থিতিকে তাদের রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিমূল হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটিয়ে চলছে। মানব জাতিকে পরস্পর বিরোধী হাজারো অংশে বিভক্ত করে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত রাখার চাইতে জাহেলিয়াত বা জাতীয়তাবাদের মারাত্মক ইবলিসি ফর্মূলা আর কিছুই হতে পারে না। অসংখ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াও দু'দুটো মহাযুদ্ধ ও আণবিক বোমার ধবংসলীলার পেছনে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদই সক্রিয়। এমনকি পাশ্চাত্য প্রভাবিত মুসলিম উম্মাহও এ জাতীয়তাবাদী শয়তনের খপ্পরে পড়ে প্রায় অর্ধমৃতভাবে বিভক্ত হয়ে কোথায়ও প্রত্যক্ষ এবং কোথায়ও পরোক্ষ যুদ্ধ ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মিত্র শক্তি পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের বিষবৃক্ষ বপন করে খিলাফত ধবংস করে। আল্লামা ইকবাল বলেন-" হ্যাঁ, জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন মিত্রের প্রভাব আজ দ্বীনকে দাফন করছে বৈকি"। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ভূত যাদের গাড়ে চাপে তারা তাকে খোদার স্থলে আবাল্য দেবতা হিসেবে পূজা করে। তাই এটা শিরক। যেহেতু খোদার ইনসাফ বিধান খিলাফতের বিপরীত বৃত্তে এর অবস্থান এটা সরাসরি কুফর। এক খোদা, এক রাসুল (সাঃ) ও এক ইসলামের ভিত্তিতে গোটা মানবজাতি ঐকবদ্ধ হয়ে একই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবে এটাই ইনসাফের বিধানের দাবি। তাই ইসলামের সর্বশেষ পয়গম্বর শতধা বিভক্ত বিশ্ব মানবকে উদাত্ত আহবান জানালেন, "হে ঐশী গ্রন্থধারী সম্প্রদায়, এসো আমরা এমন এক ন্যূনতম ভিত্তিতে এক হয়ে যাই যা তোমাদের ও আমাদের ভেতর সমভাবে গ্রহণযোগ্য। আর তা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কারো আরাধনা করব না এবং এক আল্লাহর জায়গায় আমাদের কোন মানুষকে প্রভুর আসন দেবনা"। এটাই কালেমায়ে তাইয়্যেবার সর্বজনীন আবেদন।[৫৭]

সম্মেলনে তিনি মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি ও আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর জন্য পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সে প্রস্তাবের সারমর্ম নিম্নরূপ-

১. কালিমা পাঠকারী বিশ্ব মুসলিম ঐকবদ্ধরূপে আল্লাহর রজ্জু ধারণ করে সংঘবদ্ধ হয়ে বিশ্বের সমস্ত কুফরী শক্তিকে অভিন্ন সাব্যস্ত করে সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে । সে জন্য সর্বাগ্রে মুসলিম বিশ্বের হককানী উলামা ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর সমাধান দাতা ও নীতি নির্ধারক পরামর্শ মজলিস) একজন খলিফাতুল মুসলিমীন বা আমীরুল মুমিনীন নির্বাচন করবে। যিনি মজলিসে শূরার পরামর্শ অনুসারে বিশ্ব মুসলিম মিল্লাতকে পরিচালনা করবেন।

২. ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করাসহ মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের জন্য একটি শক্তিশালী বিশেষ উলামা বোর্ড গঠন করতে হবে। সে বোর্ড কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত দেবেন এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বের সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করবে।

৩. সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহের মধ্যে সমন্বয় বিধান ও তাদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি এবং ইয়াহুদীর কবল হতে ফিলিস্তীন মুক্তির জন্য একটি বাইতুল মাল গঠন করতে হবে।

৪. আন্ত:ইসলামী বিশ্বের সংযোগের ভাষা ও খিলাফতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে আরবী। বিশ্ব খেলাফত রাষ্ট্রের জন্য নিজস্ব প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বেতারকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৫. খিলাফতের রাজধানী হবে মক্কা অথবা মদীনায়। তবে সাময়িক প্রয়োজনে শূরার পরামর্শক্রমে অন্যত্র হতে পারবে।[৫৮]

সম্মেলনে প্রদত্ত হাফেজ্জী হুজুরের প্রস্তাবগুলো ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংগঠন জোরালো কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় প্রস্তাবগুলো কার্যকর কোন ফলাফল দিতে সমর্থ হয়নি। তারপরও হাফেজ্জীর ভাষণ ও প্রস্তাব পেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মনে নতুন চিন্তা ভাবনা উদ্রেক করে। অন্তত মানসিকভাবে তারা উজ্জীবিত হয়। এটিও একটি সম্মেলনের সফলতা হিসেবে ধরা হয়।

খেলাফত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, বর্ষীয়ান আলেম হযরত হাফেজ্জী হুজুর সমাজ থেকে জুলম, নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা এবং দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার বন্ধসহ যাবতীয় অশ্লীলতাকে উৎখাতের আহবান জানাতেন। তিনি এ জন্য দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য বলে মনে করেই দল গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নামেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত (মৃত্যু- ৭ মে, ১৯৮৭) এই লক্ষ্যে তাঁর সাধ্যমত কাজ করে গেছেন। নানা কারণে ইচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক উদ্যোগসমূহে কাংখিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে

তিনি চেষ্টা করেছেন এটাই তাঁর সাফল্য। পরিণত বয়সে ইনতেকালের শেষের কয়টি বছর ছাড়া (রাজনৈতিক জীবন ১৯৮১-১৯৮৭) তাঁর গোটা জীবনই কাটিয়েছেন মাদ্রাসায় অধ্যাপনা ও মাদ্রাসা-মসজিদ, এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[৫৭] রাজনৈতিক ময়দানে তাৎক্ষণিক কোন সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও আধ্যাত্মিক সাধনায়, জ্ঞান চর্চায় ও শিক্ষাবিস্তারে তিনি সফলতা অর্জন করেছেন বলে মনে হয়।

খেলাফত আন্দোলন যে প্রত্যাশা এবং মিশন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সময়ের ব্যবধানে তা ম্লান হয়ে পড়ে। হাফেজ্জী হুজুরের জীবদ্দশায়ই নেতৃত্বের কোন্দল এবং ব্যর্থতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এ ব্যর্থতা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। খেলাফত অন্দোলন থেকে বের হয়ে শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করিম এবং হাফেজ্জী হুজুরের জামাতা মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করেন। বের হয়ে যাওয়া নেতৃবৃন্দের প্রতিষ্ঠিত দলগুলো খেলাফত আন্দোলন থেকেও বেশী সংগঠিত এবং শক্তিশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। খেলাফত আন্দোলন পরবর্তিতে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্য কোন ভূমিকা রাখতে না পারলেও বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতিতে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশেষ করে বাংলাদেশে কওমী ধারার আলেমদেরকে অধিকহারে ইসলামী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে খেলাফত আন্দোলনের কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। বাংলাদেশের কয়েক হাজার কওমী মাদ্রাসার লক্ষ লক্ষ ছাত্র-শিক্ষক আজ ইসলামী রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষকরে ইসলামী রাজনীতিতে কওমী ধারার অলেম-উলামাদের ভূমিকা অনেক সময় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

তথ্যসংকেত ও টীকা

১। মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, *মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ:) তাঁর রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার*, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢা. বি. ২০০২ , পৃ. ৬৬

২। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

৩। মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, *আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরীর (রহ:) জীবনী*, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩

৪। *মাসিক পৃথিবী*, বর্ষ- ২০, সংখ্যা ৭, এপ্রিল, ২০০১, পৃ. ৪৩-৪৪

৫। Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan,* University of California Press, 1963, p.100.

৬। মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামপন্থীদের ভুমিকা*, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৯০

৭। মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

৮। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ নভেম্বর, ১৯৮১

৯। *গঠনতন্ত্র*, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, কেন্দ্রীয় দফতর কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৬

১০। *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭

১১। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮

১২। আখতার ফারুক, *বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন*, কেন্দ্রীয় দফতর কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১১

১৩। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ জুলাই,'৮৪

১৪। অধ্যাপক আখতার ফারুক, *খেলাফত আন্দোলন কি ও কেন*, আল আশরাফ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৮

১৫। *দৈনা বাংলার বাণী*, ২৪ জুলাই, ১৯৮৩

১৬। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ জুলাই, ১৯৮৩

১৭। দেখুন, *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সমীপে মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহর খোলা চিঠি*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

১৮। *দৈনিক দেশ*, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

১৯। *পূর্বোক্ত*, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

২০। *পূর্বোক্ত*, ১৫ মার্চ, ১৯৮৪

২১। *দৈনিক সংবাদ*, ১০ জুলাই, ১৯৮৪

২২। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ জুলাই, ১৯৮৪

২৩। *দৈনিক সংবাদ*, ২৫ অক্টোবর, ৮৪

২৪। বিস্তারিত, *সমাপনী ভাষণ*, জাতীয় সম্মেলন ১৯৮৩, উদ্ধৃত, মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-৫৪

২৫। দেখুন, গৃহবন্দীর পর খেলাফত আন্দোলন *প্রধান মোহাম্মদুল্লাহ কর্তৃক প্রচারিত লীফলিট্*

২৬। দেখুন, *রিপোর্ট*, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা, পৃ. ৬৩

২৭। Munir Ahmed Chowdhury, "Induction of state Religon in the Constitution of Bangladesh" in *Bangladesh Political Studies,* Vol.9-13, 1986-89, P.74

২৮। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২ জুলাই, ১৯৮৮

২৯। *পূর্বোক্ত*, ২০ মে, ১৯৯০

৩০। ১৯৮৪ সালের ২১ অক্টোবর মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজী হুজুরের নেতৃত্বে ১০টি রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ নামক রাজনৈতিক জোট গঠিত হয়। জোটে অন্তভুক্ত দলগুলো ছিল: হাফেজ্জীর নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলন, মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আবদুল জলিলের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বাধীন আইডিএল, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, খেলাফত রব্বানী পার্টি, ইসলামী যুব আন্দোলন, খাদেমুল ইসলাম জামায়াত, মজলিসে তাহাফ্‌ফুজ খতমে নবুওয়াত, মজালীস দওয়াতুল হক ও ইসলামী যুব শিবির।

৩১। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ অক্টোবর, ১৯৮৪

৩২। দেখুন, সাংবাদিক সম্মেলন ভাষণ, উদ্ধৃত, *হাফেজ্জী হুজুর (রহ:) স্মারকগ্রন্থ*, হাফেজ্জী হুজুর (রহ:) পরিষদ, ২০০৫ পৃ. ২২৪-২৮

৩৩। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৭ অক্টোবর, ১৯৮৪

৩৪। মো: এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

৩৫। দৈনিক সংগ্রাম, ২২ জানুয়ারী, ১৯৮৫

৩৬। *দৈনিক বাংলার বাণী*, ১লা মার্চ, ১৯৮৫

৩৭। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

৩৮। *গঠনতন্ত্র*, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, (পরিশিষ্ট) পৃ. ৪১

৩৯। দেখুন, *পুস্তিকা*, জাতির ক্রান্তি লগ্ন রাজনীতিতে পদার্পণ ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্পর্ক দেশবাসীর কাছে হাফেজ্জী হুজুরে বক্তব্য, হযরত হাফেজ্জী হুজুরে নির্বাচনী প্রচার কমিটি ৩১৪/২ জগন্নাথ সাহা রোড, কিল্লার মোড, লালবাগ, ঢাকা

৪০। *দৈনিক বাংলার বাণী*, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

৪১। দৈনিক খবর, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

৪২। দৈনিক বাংলার বাণী, ১১ অক্টোবর, ১৯৮৬

৪৩। *দৈনিক খবর*, ১১ অক্টোবর, ১৯৮৬

৪৪। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ অক্টোবর, ১৯৮৬

৪৫। Muhamad A. Hakim, *Shahabuddin Interregnum*, UPL, 1993, P. 28

৪৬। জাহানে নও, ২৪ জুলাই, ১৯৮৩

৪৭। বিস্তারিত, হাবিব উল্লাহ মেছবাহ, (সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন) এর ১৬ *জানুয়ারী, ১৯৮৫ সালের চিঠি*

৪৮। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি*, খেলাফত আন্দোলন ঢাকা মহানগরীর ১০ কর্মী-স্বাক্ষরিত, ২৫ অক্টোবর, ১৯৮৪ইং

৪৯। উদ্ধৃত, মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

৫০। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জানুয়ারী, ১৯৯০, ১২ অক্টোবর, ২০০১

৫১। মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা হামীদুল্লাহ, মাওলানা ফারুকও ত্বহা বিন হাবীব।

৫২। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা হাবীবুল্লাহ এবং হাজী সিরাজউদ্দৌলা।

৫৩। মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৫৪। বিস্তারিত, দেশ দু'টি সফরশেষে ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনের প্রতিবেদন, এবং অধ্যাপক আখতার ফারুক, *মধ্য প্রাচ্যে হাফেজ্জী হুজুর*, হিজবুল্লাহ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৫৮

৫৫। মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১৫

৫৬। *আল কুরআন*, সূরা আল হাদীদ, আয়াত নং-২৫

৫৭। মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (সম্পাদিত), *হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা*, হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৭৬-৭৭

৫৮। *হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ*, হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) পরিষদ, ২০০৫, পৃ. ২৩৪

৫৯। *দৈনিক সংগ্রাম, ১০ মে, ১৯৮৭*

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ঐক্যজোট ও অন্যান্য ইসলামী দল

জামায়াতে ইসলামী এবং খেলাফত আন্দোলন ছাড়াও বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরো কিছু ইসলামী দল ও জোট ভুমিকা রাখে। তন্মধ্যে ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত মজলিস উল্লেখযোগ্য। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, ফরায়েজী জামায়াত, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যুতে জোটবদ্ধ এবং এককভাবে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এসকল জোট ও দলের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো।

ইসলামী ঐক্যজোট

খেলাফতে রাশেদার আদর্শে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐকবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশে ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার পতনের পর ৭টি ইসলামী দলের সমন্বয়ে ইসলামী ঐক্যজোট গঠিত হয়। দলগুলো হচ্ছে, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ফরায়েজী জামায়াত, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস ও ইসলামী আন্দোলন। মূলত এটি ছিলো ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মোটামোটি বৃহত্তর পরিবেশে একটি ইসলামী নির্বাচনী জোট। এই জোটের অধীনে উপর্যুক্ত দলগুলো ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ২২ ডিসেম্বর '৯০ দেশের বিশিষ্ট ওলামা মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবী এবং উক্ত ৭টি দলের প্রতিনিধিদের সভায় ঐক্যজোটের আত্মপ্রকাশের সময় প্রত্যয় ঘোষণা করে বলা হয়, দেশের সকল মুসলিম শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে '৯১-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী শক্তিকে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে জাতিকে ঐকবদ্ধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হবে।[১]

ইসলামী ঐক্যজোটের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি মজলিসে শূরা, ছয়টি বিভাগ,[২] একটি উপদেষ্টা পরিষদ ও একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি থাকার কথা গঠনতন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।[৩] প্রতিটি শরিকদলের প্রধান ও জেনারেল সেক্রেটারীসহ মোট ৫ জন করে সদস্য নিয়ে মজলিসে শূরা গঠিত হবে। শরিক দলসমুহের প্রধানদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান হবেন এবং অপর প্রধানগণ ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে অভিহিত হবেন। মজলিসে শূরা দলসমুহের প্রধান, সহ-সভাপতি অথবা মহাসচিবগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে জোটের মহাসচিব নির্বাচিত করতে পারবে। শরিক দলের অপর

মহাসচিবগণ জোটের যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে গণ্য হবেন। ইসলামী ঐকজোট ১৯৯১ সাল থেকে সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আসছে। ইসলামী ঐক্যজোট বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) এবং আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সময় ইসলামী ঐক্যজোট প্রেসিডেন্টের নিকট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা উপস্থাপন করে।

ইসলামী ঐক্যজোটের রূপরেখায় বলা হয় নতুন সংসদ নির্বাচন এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রেসিডেন্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতি কোন কারণে অপারগ হলে সীনিয়রিটির ভিত্তিতে সে কোর্টের অপর কোন বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেনা। প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ মন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন। তাঁরা শুধু দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।[৪]

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের ঐতিহাসিক 'বাবরী মসজিদ' ধ্বংসের প্রতিবাদে ইসলামী ঐক্যজোটের শরিক খেলাফত মজলিসের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ 'লং মার্চ' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৩ সালের ২রা জানুয়ারী ঢাকা থেকে শুরু হয়ে বিশাল লংমার্চ ৪ ঠা জানুয়ারী যশোরে গিয়ে শেষ হয়। বিতর্কিত নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি প্রদান, ব্লাস্‌ফীম্‌ আইন প্রণয়ন, এনজিওদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতা বন্ধ, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা এবং জনকণ্ঠ, আজকের কাগজসহ ইসলাম বিদ্বেষী পত্রিকাসমূহ নিষিদ্ধ করার দাবিতে ইসলামী ঐক্যজোটভূক্ত দলসমূহ এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সমর্থনে ১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐতিহাসিক হরতাল পালিত হয়। ৩০শে জুন ইসলামপন্থিদের প্রথম হরতাল ছিল সফল এবং সর্বাত্মক।[৫] সে হরতাল সম্পর্কে একজন ভাষ্যকারের মূল্যায়ন ছিল :

> "বহু মাস আসবে, বহু ৩০ জুন এসেছে ও আসবে, কিন্তু ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ ইতিহাসে এই দিবসটিই পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রসুল (দঃ)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারণার প্রতিবাদে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সম্ভবতঃ প্রথম পূর্ণ দিবস স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন ইতিহাসের কাছে চিরদিন এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ৩০ জুন আরো অনেকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বকীয়তা দাবি করবে। এ দিনের সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি এ দেশের ইতিহাসে প্রথম অরাজনৈতিক আলেম উলামা ও ইসলামী ব্যক্তিবর্গের ডাকে একটি প্রতিবাদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হলো। এই তাৎপর্যের গভীরতা রাজনীতির পর্যবেক্ষণ মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশে হরতাল, ধর্মঘট কোনো নতুন কিছু নয়। কিন্তু ইসলামের অবমাননার প্রতিবাদে জনগণের মধ্য থেকে ওঠে আসা নেতৃত্বের ডাকে সারাদেশে সর্বাত্মক হরতালের ঘটনা এই প্রথম।... এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ইসলামী আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক পর্যায়ে

> জাতিকে পথনির্দেশ দিতে এগিয়ে এসেছেন এমন সব ব্যক্তিত্ব যারা এই সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত জ্ঞান-গবেষণা, সাধনা ও ঐকান্তিক সঙ্গোপনে নির্লিপ্ত, নৈব্যক্তিক জীবন-যাপনকেই শ্রেয় মনে করতেন। পন্ডিতবর্গের এই উত্তরণ ইসলামী আন্দোলনে সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ, কোয়লিটেটিভ্ এবং কোয়ন্টিটেটিভ্ অর্থাৎ উদ্দেশ্যগত এবং বৈষয়িক, মানগত এবং মাত্রাগত সর্ববিধ ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।"[৬]

৩০ জুনের হরতাল এবং ইসলাম ও রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অন্য দল, সংগঠন, গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মুফতী ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে 'ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা, (১৬ জুন ১৯৯৪ এ গঠিত), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এনডিএ, মুসলিম লীগ, জমিয়তুল মুদাররেসীন, ইসলামী ঐক্য পরিষদ (সিলেট), সর্বদলীয় ইসলামী জোট চট্টগ্রাম, ফুলতলীর (সিলেট) পীর, ছারছীনার পীর (বরিশাল), বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক, হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মুফতি আহমদ শফী, জাতীয় সংসদ সদস্য মাওলানা উবায়দুল হক (খেলাফত মজলিস), ও মাওলানা আতাউর রহমান খান (বিএনপি) ।[৭]

ইসলামের দুশমন ইহুদী গোষ্ঠী কর্তৃক মহানবী (সঃ) ও পবিত্র কুরআনের অবমাননার প্রতিবাদে এবং ইহুদী চক্রের এদেশীয় দোসরসহ সকল নাস্তিক মুরতাদের শাস্তির দাবিতে ইসলামী ঐক্যজোট ১৫ জুলাই দেশব্যাপী হরতাল পালন করে । গুলি, কাঁদানে গ্যাস, পুলিসের বেধড়ক পিটুনির মধ্যে সারা দেশে সর্বত্মক হরতাল পালিত হয়। প্রায় ৫শ' আহত এবং কয়েকশ' নেতা-কর্মী আটক হয়। জামায়াত, বিএনপি, জাতীয় পার্টি (জা-আ), জাগপাও হরতাল পালন করে।[৮]

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন, ভাস্কর্যের নামে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মূর্তি তৈরির প্রতিবাদে এবং বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ইসলামী ঐক্যজোট ২২ আগস্ট '৯৭ ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে মহাসমাবেশের আয়োজন করে। লাখো জনতার মহাসমাবেশে ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ বলেন, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তারা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন হতে দেবেনা। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, অগ্নিপূজা এ দেশের জনগণ মেনে নেবে না এবং ঢাকাকে মূর্তির শহরে পরিণত করতে দেবে না। মহাসমাবেশ থেকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি, গ্রেফতার, নির্যাতন, হামলা, মহাসমাবেশে আসতে বাধা দান এবং সমাবেশ শেষে যাওয়ার পথে ঐক্যজোটের শত শত কর্মীর ওপর মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের সমাবেশ থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের প্রতিবাদে ২৯ আগস্ট দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৯]

আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) বিরুদ্ধে বিরোধী দলের যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয় ১৯৯৯ সাল থেকে। যুগপৎ আন্দোলনে ইসলামী ঐক্যজোট সক্রিয় ভূমিকা

পালন করে। সরকার বিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও রূপরেখা ঘোষণা উপলক্ষ্যে ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সুস্পষ্টভাবে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করছে। তাদের অবস্থান ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এই সরকার দেশ এবং জাতি একই সাথে ইসলাম ও মুসলমান বিদ্বেষীও। তিনি বিরোধী দলের সমন্বিত যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগসহ নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের দাবি জানান। সম্মেলনে মুরতাদদের শাস্তির লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন, এনজিওদের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড বন্ধ করা, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ ও মূর্তি নির্মাণের সকল উদ্যোগ বন্ধ করাসহ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা আজিজুল হক পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত রাষ্ট্র ও জাতি বিরোধী শান্তি চুক্তি বাতিল করার আহবান জানান।[১০] ১৮ জানুয়ারী '৯৯ রাতে প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমানের বাসায় হামলার ঘটনায় মাদ্রাসা শিক্ষক ও সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার এবং মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার প্রতিবাদে ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ তালেবান ও ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী হওয়ার কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করে কিছুসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষক এবং দ্বীন প্রচারে নিয়োজিত কিছুসংখ্যক দেশী বিদেশী ধর্মপ্রাণ মানুষকে গ্রেফতার, রিমান্ডে এনে পরিকল্পিত 'তথ্য' আদায় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাসের তান্ডব সৃষ্টির বানোয়াট ও দুরভিসন্ধিমূলক হীন চেষ্টার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সে উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারী '৯৯ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ কবি শামসুর রাহমানের বাসায় কথিত হামলাকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দাবি উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর এক হীন চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা উক্ত হামলা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তও দাবি করেন।[১১]

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত ও আলেম সমাজকে হয়রানি বন্ধের দাবিতে ইসলামী ঐক্যজোটের উদ্যোগে জাতীয় মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুল হক, মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও খেলাফত আন্দোলনের প্রধান মাওলানা আহম্মদুল্লাহ আশরাফও বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ বলেন, সরকার শত ষড়যন্ত্র করেও এদেশে ইসলামী আন্দোলন এবং কোরআনী শিক্ষা বন্ধ করতে পারবেনা। তাঁরা আরো বলেন, আলেম ওলামারা স্বাধীনতার বিরোধী নন বরং তাঁরাই প্রথম স্বাধীনতার সবকদারী।[১২] যুগপৎ আন্দোলনে শরিক হওয়ার পর ইসলামী ঐক্যজোট মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র এবং বিরোধী দলের প্রস্তাবিত ৪ দফা দাবি না মানার প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারী, '৯৯ প্রথম সমাবেশের আয়োজন করে। সভায় জোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুল হক বলেন, ভারতীয় তাঁবেদার সরকার দেশের, জাতির ও

ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এই সরকারকে উৎখাত করা দেশবাসীর জন্য ফরজ হয়ে গেছে। তিনি সরকার বিতাড়নের লক্ষ্যে ঐকবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানান। সমাবেশে ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী আহুত হরতাল কর্মসূচি পালনের আহবান জানানো হয়।[১৩] সরকারি দলের কর্মীদের হরতাল আহবানকারীদের ওপর হামলা এবং পুলিশের টীয়ার্ গ্যাস নিক্ষেপ ও সমাবেশ পন্ড করে দেয়ার প্রতিবাদে বিরোধী দলের হরতাল আরো ১ দিন বৃদ্ধি করা হয়। তিন দিনের লাগাতার হরতাল পালন শেষে পুরনো পল্টনে আয়োজিত এক সমাবেশে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান বলেন, জাতীয় ৪ দফা দাবি, পৌরসভা নির্বাচন বাতিল ও ঐক্যজোটের ১০ দফা দাবি সরকারকে মানতে হবে। অন্যথায় এক দফার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া বিকল্প থাকবেনা।[১৪]

পৌর নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা এবং জাতীয় ও ঐক্যজোটের দাবিসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইসলামী ঐক্যজোট ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারী '৯৯ দেশব্যাপী ৭২ ঘন্টার হরতাল আহবান করে। কর্মসূচি ঘোষণা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত আড়াই বছরে মাদ্রাসা শিক্ষাসহ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ধ্বংসে হেন কাজ নেই যা করেনি।[১৫] সারাদেশে তিন দিনের হরতাল সফল করতে ঢাকায় ঐক্যজোটের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শিখা চিরন্তন, মঙ্গল প্রদীপ, বিসমিল্লাহ্ ও জিন্দাবাদ ধ্বনি বর্জন, উলু ধ্বনি প্রদান, 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাস্কর্য নির্মাণকে জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ বিরোধী অপতৎপরতা হিসেবে বর্ণনা করে ইসলামী ঐক্যজোট এ সকল কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আল্লামা আজিজুল হক বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ইতিহাস ঐতিহ্য, তাহযীব তমদ্দুন ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিরোধী অপতৎপরতা চালিয়ে আসছে। ক্যাম্পাসে শেখ মুজিবের মূর্তি স্থাপন সরকারের ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমের সর্বশেষ নজির। তিনি আরো বলেন, হাতে তাসবীহ ও মাথায় হিযাব পরে ক্ষমতায় আসার পর বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার ইসলাম ও মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে দেয়ার জন্য সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসংগে আল্লামা আজিজুল হক বলেন, শিখা চিরন্তন স্থাপন, পবিত্র বিসমিল্লাহ ও জিন্দাবাদ বর্জন, উদ্দাম যুগল নৃত্যের আয়োজন, সরকারি প্রচার মাধ্যমে ইসলামী পরিভাষা পরিত্যাগ, মঙ্গল প্রদীপ, রাখী বন্ধন ও উলুধ্বনি প্রভৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতি আমদানি ও তা অবাধে অনুশীলন তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১৬]

মহাসমাবেশ, হরতাল, রোড মার্চ, লং মার্চ, গণমিছিল, গণ অবস্থান, দোয়ার মাহফিল ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে ইসলামী ঐক্যজোট আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে

আন্দোলন অব্যহত রাখে। ১৪ মে, '৯৯ অনুষ্ঠিত ইসলামী ঐক্যজোটের মজলিসে শূরার এক সভায় ১৬-১৮ মে সিলেট অভিমুখে জোটের রোড মার্চ কর্মসূচি সফল করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানানো হয়। পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত সমাবেশের পর সিলেটের উদ্দ্যেশে ১৬ মে রোড মার্চ শুরু হয়। ১৮ মে সিলেটে রোড মার্চ সমাপ্ত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে জোটের চেয়ারম্যান আল্লামা আজিজুল হক সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও দুঃশাসনের কবল হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের জেহাদে শরিক হয়ে সওয়াব হাসিলের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ইসলামকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, ভাস্কর্যের নামে দেশে একের পর এক মূর্তি তৈরী করছে, শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণ জ্বেলে মুসলমানদের ওপর কুফরী মতবাদ চালিয়ে দিচ্ছে। তিনি বর্তমান সরকারকে দেশ, জাতি ও ইসলামের শত্রুু ঘোষণা করে এটাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সকলের ওপর ফরজ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[১৭]

ইসলামী ঐক্যজোট আওয়ামী লীগ সরকারের 'পার্বত্য শান্তি চুক্তির' বিরোধিতা করে ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ লং মার্চ কর্মসূচি পালন করে। চুক্তি মোতাবেক জনসংহতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমার হাতে দায়িত্ব দেয়ার প্রতিবাদে ইসলামী ঐক্যজোট ২৭ মে, '৯৯ কালো দিবস কর্মসূচি পালন করে। এ ব্যাপারে ঐক্যজোটের মজলিসে শূরার এক সভায় জনমত উপেক্ষা করে সন্তু লারমার হাতে ৩ টি পার্বত্য জেলার দায়িত্ব তুলে দেয়ার প্রতিবাদে ২৭ মে দেশব্যাপী কালো দিবস ঘোষণা করে। এ উপলক্ষে ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[১৮] সরকারের পদত্যাগ সহ চার দফা দাবিতে ৪ দলীয় জোটের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী দ্বিতীয় দফা রোড মার্চ কর্মসূচি উপলক্ষে ইসলামী ঐক্যজোট ২৫ জুলাই মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ শেষে চট্টগ্রামের অভিমুখে রোড মার্চ শুরু করে। রোড মার্চ যাত্রাপূর্ব সমাবেশে জোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুল হক বলেন, শেখ হাসিনার সরকার ইসলাম ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর সরকারের সময় পবিত্র কুরআন অবমাননা, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র, ভারতে গ্যাস রফতানি ও করিডর প্রদানের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। রোড মার্চ দাউদকান্দি, কুমিল্লা, নোয়াখালী হয়ে চট্টগ্রামে গিয়ে শেষ হয়।[১৯] চার দফা দাবি আদায়ে বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে ২রা আগস্ট হতে একটানা ৩০ ঘন্টার হরতাল আহবান করে। হরতালের সমর্থনে ইসলামী ঐক্যজোট ঢাকায় এক মিছিল বের করে। মিছিল পূর্ব সমাবেশে জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়, ট্রানজিটের নামে করিডর প্রদান প্রতিহত করা হবে।[২০]

ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর প্রদানের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ও ইসলামী ঐক্যজোট আন্দোলনের অংশ হিসাবে দেশব্যাপী জেলা প্রশাসক (ডিসি) অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। বোমাবাজি ও টীয়ারগ্যাস নিক্ষেপের মধ্যে ১৮ আগস্ট '৯৯ ইসলামী ঐক্যজোট ভারতকে

ট্রানজিটের নামে করিডর প্রদানের সিদ্ধান্ত ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র এবং আওয়ামী দুঃশাসনের অবসানের লক্ষ্যে ঢাকা জেলা প্রশাসকের অফিস ঘেরাও করে। জোটের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে এক মিছিল পুরানা পল্টন থেকে শুরু হয়ে জিরো পয়েন্ট, গোলাপশাহ মাজার, ফুলবাড়িয়া হয়ে বংশাল রোডে পৌছালে পুলিশের ব্যারিকেডের সম্মুখীন হয়। পরে জোটের নেতা মাওলানা আবদুল লতিফের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ডিসি অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে বলা হয়, ট্রানজিটের ফলে পরিবহন খাতের ওপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। সীল করা কন্টেনারে মালামাল পরিবহনের নামে উত্তর পূর্বঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে এ অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হবে। এ ছাড়া যে সকল মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও বন্ধের আদেশ প্রদান করা হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানানো হয় স্মারকলিপিতে।[২১] এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আওয়ামী সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রনণালয় ১৯৯৯ সালের মে-জুন মাসে ২১৫টি মাদ্রাসার মঞ্জুরি ও সরকারি বেতন ভাতা কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই প্রত্যাহার করে নেয়। আদালতের নির্দেশে কিছু মাদ্রাসা পরে প্রত্যাহারকৃত মঞ্জুরি ও বেতন ভাতা লাভ করে।[২২]

চার দলের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বে বরিশালে জোটের গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গণমিছিল অনুষ্ঠানের পূর্ব দিন দেশব্যাপী হরতাল পালন শেষে এক সমাবেশে মাওলানা আজিজুল হক বলেন, চলতি আন্দোলন সরকার হটানোর গতানুগতিক আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন দেশ গড়ার আন্দোলন।[২৩] সরকার বিরোধী জোটের কর্মসূচি পালন উপলক্ষে ঢাকায় ৩০ আগস্ট ইসলামী ঐক্যজোটের উদ্যোগে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গণমিছিল পূর্ব সমাবেশে ১২ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে 'অবস্থান কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়।[২৪] ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডর প্রদানের সিদ্ধান্ত, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত এবং আওয়ামী দুঃশাসনের প্রতিবাদে ইসলামী ঐক্যজোট পুলিশের দাপট ও তান্ডবের মধ্যে সচিবালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। সচিবালয় কর্মসূচির কারণে পুরো ঢাকা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশের হামলা থেকে নামাজরত মুসুল্লীরাও রেহাই পায়নি। বায়তুল মোকাররম মসজিদও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে সরকার ও বিরোধী দলের দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। ৪ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ দিন সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের ঘোষণা দেন। ঘেরাও কর্মসূচি শেষে ইসলামী ঐক্যজোট তিন দিনের লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করে।[২৫] তিন দিনের লাগাতার হরতাল (১৩-১৫ সেপ্টেম্বর) শেষে ইসলামী ঐক্যজোটের আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালনের মাধ্যমে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অনাস্থা প্রকাশ করে।[২৬]

সরকার পতনের এক দফার আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতিতে নেয়ার লক্ষ্যে চার দলের মহাসচিবগণ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের

সাথে ২২শে '৯৯ অক্টোবর বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে নেতৃবৃন্দ এই মর্মে একমত পোষণ করেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারের পতন ঘটানো না গেলে দেশ, জাতি, মুসলমান ও ইসলাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক প্রশ্নের জবাবে জোটের মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেন, সরকারের সাথে কোন আলোচনার প্রশ্নই ওঠেনা। আলোচনা হতে পারে কেবল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে।[২৭] বহুল প্রত্যাশিত ৪ দলের শীর্ষ বৈঠকের ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ৪ দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে ইসলামী ঐক্যজোটসহ শরিকদলগুলো ঘোষণাপত্রের পৃথক পৃথক খসড়া পেশ করে। ২৯, নভেম্বর '৯৯ লিয়াজোঁ কমিটির এক বৈঠকে শীর্ষ বৈঠকের তারিখ এবং ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা হয়।[২৮]

শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের পরিচালিত আন্দোলন সর্বাত্মক রূপ নেয় ৪ দলের শীর্ষ বৈঠকের পর। সে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৩০, নভেম্বর ১৯৯৯। বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবন ২৯ মিন্টো রোডে অনুষ্ঠিত ৪ দলের শীর্ষ বৈঠকে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুল হকসহ জোটের শরিকদলগুলোর প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে চার দলের প্রধানগণ যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। যৌথ ঘোষণায় সরকারের পদত্যাগ দাবি করে অবিলম্বে সাংবিধানিক নিয়ম মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানানো হয়। যৌথ ঘোষণাপত্রের বিস্তারিত পরিশিষ্টে প্রদান করা হল। চার দলের শীর্ষ বৈঠকের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সাথে সংলাপের প্রস্তাব দেয়া হয়। ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে এ ধরনের যে কোন সংলাপের বিরোধিতা করা হয়।[২৯]

২০০০ সালের শুরু থেকেই সরকার বিরোধী আন্দোলন ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালিত হতে শুরু করে। ১৩ ফেব্রুয়ারী সরকার বিরোধী আন্দোলনের একটি মাইল ফলক। সে দিন বিরোধী দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এক মঞ্চে একত্রিত হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর আহবান জানান। শীর্ষ নেতৃত্বের এক মঞ্চের জনসভায় মাওলানা আজিজুল হক বলেন, সরকার ভারতের স্বার্থে পানিবিহীন পানি চুক্তি করার ষড়যন্ত্র করেছে। স্বাধীনতা, স্বকীয়তা বিকিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি জননিরাপত্তা আইনের মতো কালো আইনের অনুমোদন না দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুরোধ জানান। জনসভা শেষে আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোটের এক গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[৩০] ঢাকায় এক মঞ্চে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের জনসভার পর চট্টগ্রামসহ বিভাগীয় শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ জেলা সদরে ৪ দলের যৌথ জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল জনসমাবেশে ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এক তরফাভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রতিবাদে চার দলের নির্বাচন কমিশন অফিস ঘেরাও উপলক্ষে ঢাকায় ঐক্যজাটের সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।[৩১]

২০০১ সালের ১লা জানুয়ারী হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ সব ধরনের 'ফতওয়া' নিষিদ্ধ করে একটি রায় প্রদান করেন। সে রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের উলামা সমাজ এবং ঐক্যজোটসহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো ঐকবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে। ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদে ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০১ ঢাকার পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক উলামা-মাশায়েখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ও ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনীর সভাপতিত্বে মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আল্লামা আজিজুল হক। সমাবেশে কর্মসূচি ঘোষণা করেন সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাস। মহাসম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন মাসিক মদিনার সম্পাদক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়,

> "হাইকোর্ট কর্তৃক যে কোন 'ফতোয়া' অবৈধ ও দন্ডনীয় অপরাধ ঘোষণায় দেশবাসী উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত। এই রায়ে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ রায়ের বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের উলামা মাশায়েখ এক মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন। সব ধরনের ফতোয়া অবৈধ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বাতিল এবং রায় প্রদানকারী বিতর্কিত দুই বিচারপতি গোলাম রব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানাকে অপসারণ করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এই রায় প্রদান করে যেহেতু, শরীয়তের ফয়সালা অনুযায়ী এই দুই বিচারপতি মুরতাদ ও কাফের হইয়া গিয়েছে, আর ইসলামে মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। তাই অনতিবিলম্বে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ডের আইন পাশ করিয়া প্রকাশ্যে তওবা না করিলে তাদের মৃত্যুদন্ড প্রদান করতে হবে। ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়ত বিরোধী কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ইসলাম, দেশ ও মানবতাবিরোধী এনজিওদের সকল অপতৎপরতা বন্ধ ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে। এ ছাড়া এনজিওদের সকলপ্রকার ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে"।

মহাসম্মেলন থেকে নিম্নোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

৩ ফেব্রুয়ারী ঃ ঢাকায় হরতাল পালন।

৭ ফেব্রুয়ারী ঃ জেলা সদরে ডিসি ও উপজেলা সদরে ইউএনওর নিকট স্মারকলিপি প্রদান।

১০ ফেব্রুয়ারী ঃ খুলনায় লং মার্চ।

১১ ফেব্রুয়ারী ঃ বরিশাল অভিমুখে লং মার্চ।

১২ ফেব্রুয়ারী ঃ ফরিদপুর অভিমুখে লং মার্চ।

এ ছাড়া ১৪-১৯ ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া ও রাজশাহীতে সমাবেশ এবং পয়লা এপ্রিল জাতীয় মহাসমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৩২]

সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ২৪ আগস্ট, (২০০০) চার শীর্ষ নেতার যৌথ ঘোষণায় এক সাথে নির্বাচন ও সরকার গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা

হয়। বিএনপি, জামায়ত, জাতীয় পার্টি (এ) এবং ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান এই যৌথ ঘোষণা প্রদান করেন।[৩৩]

সংসদ নির্বাচন ও ইসলামী ঐক্যজোট

মূলত ইসলামী ঐক্যজোট ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী জোট। এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠিত ৫ম সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নারী নেতৃত্বের প্রশ্নে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট ছেড়ে যায়। নিম্নে ইসলামী ঐক্যজোটের নির্বাচনী ফলাফল সারণিতে উল্লেখ করা হর।[৩৪]

সংসদ নির্বাচন ও তারিখ	প্রার্থী সংখ্যা	বিজয়ী আসন	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
৫ম জাতীয় সংসদ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, '৯১	৫৯	০১	২,৬৯,৪৩৪	০.৭৯
৭ম জাতীয় সংসদ, ১২ জুন, '৯৬	১৬৬	০১	৪,৬১,০০৩	১.০৯
৮ম জাতীয় সংসদ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১	০৭	০২*	৩,৭৫,৯৮০	০.৬৮

** শেখ হাসিনার ছেড়ে দেয়া নড়াইল আসনে উপনির্বাচনে ঐক্যজোটের আরো একজন প্রার্থী মুফতি শহীদুল ইসলাম জয়ী হন।*

নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট ভাল ফলাফল না করলেও ইসলামী দলগুলোর ঐক্যজোট বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সময়ে দেশ, জাতি এবং ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমের বিরোধিতা করে সরকার বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খেলাফত মজলিস

বাংলার জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবতর সমন্বয়ধর্মী ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য চেতনাসমৃদ্ধ আপসহীন নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর খেলাফত আন্দোলন (একাংশ) ও ইসলামী যুবশিবির একীভূত হয়ে 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস' নামে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৫] আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া এবং আখেরাতের মুক্তি ও প্রকৃত কল্যাণ লাভের উপায় হিসেবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রচলিত অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে কুরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে এবং খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রথমে বাংলাদেশে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে চায়।[৩৬] গঠনতন্ত্র অনুসারে খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সংগঠন অভিভাবক পরিষদ, আমীরে খেলাফত মজলিস, কেন্দ্রীয় সাধারণ

পরিষদ, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা খেলাফত আন্দোলনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থার দায়িত্ব পালন করে। সকল বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ এবং খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্ত অনুসরণের মৌলনীতির ওপর খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠিত। মজলিসের মৌল কর্মসূচি ৯টি। ওগুলো হচ্ছে :

১। বাংলাদেশে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনগণকে 'জেহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর' জন্য সচেতন ও সংঘবদ্ধ করা।

২। দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং সর্বস্তরের জনগণকে দ্বীন পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। খেলাফত মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের আদর্শিক সচেতনতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কর্মীরূপে গড়ে তোলা।

৪। বাংলাদেশের জন্য একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনগণের সকল প্রকার মৌলিক, মানবিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

৫। শোষিত, বঞ্চিত, মজলুম নারী, পুরুষ ও শিশুদের সকল প্রকার ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা এবং আর্ত-মানবতার সেবায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে সচেষ্ট থাকা।

৬। দেশের প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের লক্ষ্যে আদর্শহীন, সুবিধেবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ, ফাসেক ও স্বৈরাচারী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে জনগণের আস্থাভাজন হক্কানী ওলামা, দ্বীনদার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীসহ দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

৭। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের মৌলিক মানবিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো।

৮। মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রকার বিরোধ-বিভেদ অবসান এবং ইসলামের জন্য কর্মরত বিভিন্ন দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো।

৯। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরোধিতা, মজলুম জাতিসমূহের পক্ষাবলম্বন এবং সমমর্যাদার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন।[৩৭]

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মসূচি হচ্ছে :

১। অনৈসলামী সরকারের অবসান ঘটিয়ে হক্কানী উলামা, দ্বীনদার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদগণের নেতৃত্বে দেশে একটি প্রকৃত গণপ্রতিনিধিত্বশীল ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।

২। সুদ ও শোষণভিত্তিক বৈষম্যমূলক স্থবির ও পশ্চাদমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎখাত করে ইনসাফ ও সুষম বন্টনীতি ভিত্তিক, উৎপাদানমুখী, গতিশীল ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৩। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তাসহ দেশের প্রতিটি নাগরিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান কল্পে যাকাত ও করজে হাসানাসহ যাবতীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৪। কৃষি জমিতে প্রকৃত কৃষক ও ভূমিহীন চাষীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা।

৫। শিল্প-কারখানার মালিকানায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব, ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা এবং বাসস্থান স্বাস্থ্য ও সন্তানাদির শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬। বন্যা, খরা, নদী শিকস্তি, মহামারী, ঝড়, টর্নেডো প্রভৃতি বালা মসিবতে আক্রান্ত আর্তমানবতার পুনর্বাসনসহ যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন।

৭। ইসলামী নীতিমালার আলোকে নারীদের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতনসহ নারীসমাজের সকল প্রকার অবমাননার অবসান ঘটানো।

৮। বিচার ব্যবস্থার পূর্ণস্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

৯। আইনের সীমার মধ্যে থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ, জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান, মত প্রকাশ, সংঘবদ্ধ হওয়া ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা।

১০। ইসলামী নীতিমালা ও মূল্যবোধের আলোকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার এবং নারী শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার অভিশাপ দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১। ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ এবং নৈতিক ও মানব কল্যাণের পরিপন্থী যাবতীয় অপসংস্কৃতির অবসান ঘটানো।

১২। সরকারে সংখ্যালঘুদের ইনসাফভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধান।

১৩। বেকারত্ব রোধ ও বেকারদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান।

১৪। মজুতদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, একচেটিয়া কারবার, ভেজাল ও সকল প্রকার প্রতারণার অবসান ঘটানো।

১৫। মসজিদকে মুসলিম জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

১৬। সর্বপ্রকার আগ্রাসন ও আধিপত্যের মোকাবেলায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও নিশ্চিতকরণ।[৩৮]

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। মজলিসের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে এরশাদ সরকারকে ছদ্মবেশী সামরিক সরকার আখ্যায়িত করে এর ছত্রছায়ায় কোন নির্বাচনী ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য সকল বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানানো হয়।[৩৯] খেলাফত মজলিসের অন্যতম মৌল কর্মসূচি হচ্ছে দেশে প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের লক্ষ্যে আদর্শহীন, সুবিধাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ, ফাসেক ও স্বৈরাচারী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে জনগণের আস্থাভাজন হক্কানী ওলামা, দ্বীনদার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীসহ দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা। স্বৈরাচারের বিরোধিতা করা ইসলামের শিক্ষা। খেলাফত মজলিস ইসলামের ভিত্তিতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। এ জন্য খেলাফত মজলিস এরশাদের স্বৈরশাসনসহ সকল স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আন্দোলন চালিয়েছে।[৪০] এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে গিয়ে ঢাকায় খেলাফত মজলিসের প্রাক্তন মহাসচিব এ আর এম আবদুল মতিনসহ ৪০ জন নেতা-কর্মী ৩ মাস জেলে আটক ছিলেন। শত শত মজলিস কর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে খেলাফত মজলিসের অনেক কর্মী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় কারাবরণ করেন।[৪১] এরশাদের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত ৫ম সংসদ নির্বাচনে খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে নির্বাচন করে সিলেট-৫ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধ বিশ্বাসী রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ১৯৯৭ সালের ৫-৭ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি সম্মেলনে খেলাফত মজলিসের তৎকালীন মহাসচিব মাওলানা এ আর এম আবদুল মতিন অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শক্তির সমন্বয়ে 'ন্যাশন্যাল্ সলিডারিটি কাউন্সিল' গঠনের প্রস্তাব দেন।[৪২] স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'শিখা চিরন্তন' স্থাপনের প্রতিবাদ করে খেলাফত মজলিস। এর প্রতিবাদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মজলিসের বিক্ষোভ সমাবেশে আমীরে মজলিস মাওলানা আজিজুল হক বলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে শিখা চিরন্তন স্থাপন করা হয়েছে তা প্রকাশ্য অগ্নিপূজা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শিরক। এদেশের তৌহিদী জনতা কিছুতেই এ ধরনের অনৈসলামী কর্মকান্ড মেনে নেবেনা। তিনি শিখা চিরন্তন স্থাপনের বিরুদ্ধে কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১০ এপ্রিল : ঢাকায় উলামা-মাশায়েখ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবী সমাবেশ।

১৮ জুলাই : ঢাকা অভিমুখে মার্চ।

কিছু এনজিওর ইসলাম বিরোধী তৎপরতা এবং নাস্তিক মুরতাদের বিচারের জন্য খেলাফত মজলিস ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। খেলাফত মজলিসের প্রত্যক্ষ তৎপরতার ফলে গড়ে ওঠা আন্দোলনে নাস্তিক মুরতাদরা চুপসে যায় এবং তসলীমা নাসরীন দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। নাস্তিক মুরতাদদের বিচারের দাবিতে ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন ঘোষিত পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। সে কর্মসূচি পালনকালে ইসলামী ছাত্র মজলিসের (খেলাফত মজলিসের ছাত্রফ্রন্ট) কিশোর কর্মী আরমান পুলিশের গুলিতে কিশোরগঞ্জে শাহাদাত বগুরু করে।[৪৩]

খেলাফত মজলিস সব সময় ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী থেকেছে। শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, ভাস্কর্য নির্মাণের নামে পৌত্তলিকতা প্রসার ইত্যাদির প্রতিবাদে ১৯৯৭ সালের ২২ আগস্ট খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের আহবানে ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে ১৯৯৩ সালের ২ জানুয়ারী ভারত অভিমুখে লং মার্চের ডাক দেয়া হয়। লং মার্চ প্রস্তুতি কমিটির ব্যানারে এ লং মার্চের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করে খেলাফত মজলিস। প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ এ লংমার্চে শরিক হয়। লংমার্চ বেনাপোল সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে গেলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে খেলাফত মজলিসের নেতা-কর্মীসহ ৫ জন লোক নিহত হয়। বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে আয়োজিত লং মার্চকে উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪৪]

খালেদা জিয়ার শাসনামলে (১৯৯১–১৯৯৬) বাবরী মসজিদ লং মার্চ এবং তসলিমা বিরোধী আন্দোলনে খেলাফত মজলিস নেতৃত্ব প্রদান করে। ১৯৯৩'র এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এর অংশগ্রহণের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে খেলাফত আন্দোলনের প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকসহ খেলাফত মজলিস ও ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ও কারাদ— প্রদান করা হয়।[৪৫]

পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাতিলের দাবিতে ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইসলামী ঐক্যজোট লং মার্চের ডাক দেয়। এ লং মার্চ সফল করার জন্য খেলাফত মজলিস ২৭ ডিসেম্বর ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পুলিশের বেধড়ক লাঠি চার্জ, টীয়ার গ্যাস ও গ্রেফতার উপেক্ষা করে লং মার্চ শুরু হয়। পুলিশ খেলাফত মজলিস, ছাত্র মজলিস ও শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ১৩ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত হয়।[৪৬] সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যথারীতি লং মার্চ খাগড়াছড়ির রামগড়ে

পৌঁছে। লং মার্চ শেষে আয়োজিত মহাসমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে পার্বত্য কালো চুক্তি বাতিল না করলে আরো লং মার্চ ডাকা হবে। সমাবেশে খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা আজিজুল হক পরবর্তী শুক্রবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবস এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ পার্বত্য জেলায় তিনটি মহাসমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[৪৭] রামগড়ের সমাবেশে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, নেজামে ইসলামসহ অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন।

১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন শুরু হলে খেলাফত মজলিসের আমীর এবং ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুল হক সরকার পতনের লক্ষ্যে আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জাতীয় কর্মী সম্মেলনে আমীরে খেলাফত মজলিস মাওলানা আজিজুল হক বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, মৌলিক ও মানবিক অধিকার হরণ করেছে। এ সরকারের নিকট দেশ, ইসলাম ও জনস্বার্থ একেবারেই নিরাপদ নয়। এ অবস্থায় সরকার পতনের এক দফার আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানো এবং গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই বলে আমীর, খেলাফত মজলিস সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। সম্মেলনে শায়খুল হাদীস আরো বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও ধর্ষকদের দৌরাত্ম্যে সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মূর্তি ও অগ্নিপূজার সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রসারিত হচ্ছে। শিল্প, বাণিজ্য ও সম্পদ বিদেশের হাতে তুলে দিয়ে সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিচ্ছে।[৪৮] খেলাফত মজলিসের জাতীয় সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, সহকারী মহাসচিব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, এটিএম আজহারুল ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক এ টি এম হেমায়েত উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

এনজিওদের অপতৎপরতা ও ইসলামী শিক্ষা বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ইসলামী খেলাফত মজলিস এককভাবে এবং জোটগতভাবে আন্দোলন সংগ্রাম অব্যহত রাখে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারাদেশে শক্তিশালী সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জোর প্রচেষ্টা চালায়। সংগঠন সম্প্রসারণ, গণসম্পৃক্ততা অর্জন ও গণআন্দোলনের জন্য জনমত গঠনের প্রতি খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠার পর থেকে সজাগ ও সচেতন থাকে। তাই প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যে খেলাফত মজলিস দেশের প্রায় ৬৪টি জেলায় সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[৪৯]

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

চরমোনাইর পীর এবং খেলাফত আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম (রহ:)-এর নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের

মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শুরুতে এটি কোন সংগঠন হিসেবে ছিল না। এটি ছিল ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যপ্রয়াসী একটি ইস্যূ ভিত্তিক আন্দোলন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ছিলেন শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তিনি এ আন্দোলনের সাথে চূড়ান্তভাবে যুক্ত হতে পারেননি। মূলতঃ বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের যৌথ প্রয়াসের ফলে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সূচনাতে যে সব সংগঠনের সমন্বয়ে শাসনতন্ত্র আন্দোলন যাত্রা শুরু করেছিল, সেগুলো হলোঃ (মরহুম) মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হকের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলনের এক অংশ, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে ইসলামী যুব শিবির, (মরহুম) মাওলানা আবদুল জাব্বারের নেতৃত্বে আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, হযরত মাওলানা ফজলুল করিম (রহ:)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ কমিটি। এছাড়া আওলাদে রাসুল মাওলানা আবদুল আহাদ মাদানী (রহ:) তাঁর অসংখ্য অনুসারী নিয়ে শাসনতন্ত্র আন্দোলনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইত্তেহাদুল উম্মাহর নেতা হিসেবে। নোয়াপাড়ায় পীর সাহেব খাজা সাঈদ শাহ সাহেব ও তাঁর হাজারো ভক্ত মুরিদ নিয়ে শুরু থেকেই শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাথে ছিলেন।[৫০] শাসনতন্ত্র আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চরমোনাইর পীর বলেন, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং অগ্রগতির গ্যারান্টি ইসলামী শাসনতন্ত্র। ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে যৌথ নেতৃত্বে ভিত্তিক ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন গঠন করা হয়েছে।[৫১] দেশের প্রচলিত অনৈসলামিক নীতি এবং জাহেলী সমাজের সার্বিক পরিবর্তন সাধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।[৫২] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন সকল প্রকার স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে একটি ইসলামী সরকার গঠনের লক্ষ্যে আন্দোলন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় কোন অবস্থাতেই সামরিক আইন জারি বা সংবিধান মূলতবি করার অবকাশ নেই।[৫৩] ইসলামী শাসনতন্ত্রের নীতিমালা অনুসারে এর লক্ষ্য হচ্ছে, প্রচলিত জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নের মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদার আদর্শে বাংলাদেশকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। যে মৌলনীতির ওপর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হচ্ছেঃ (ক) ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সকল কর্মকান্ড শরীয়তসম্মত শূরায়ী নিযামের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। (খ) আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আক্বীদাই-এ সংগঠনের আক্বীদা অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের রব, হযরত মুহাম্মদ (সা:) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী। ক্বিয়ামত ধ্রুব সত্য। কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ। সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি। সকল

প্রকার সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনার পাত্রে পরিণত করা স্পষ্ট গোমরাহীর লক্ষণ।[৫৪] ইসলামী শাসনতন্ত্রের নীতিমালায় দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, সমাজ সংস্কার, গণআন্দোলনসহ ১০টি কর্মসূচির উল্লেখ রয়েছে। কর্মসূচিগুলো হচ্ছে:

১। **দাওয়াত :** উল্লেখিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণকে সচেতন করা এবং সর্বস্তরে আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার (ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ) এবং জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্র জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।

২। **সংগঠন :** আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আগ্রহী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, দল ও ব্যক্তিদের ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কাফেলায় সংঘবদ্ধ করা।

৩। **প্রশিক্ষণ :** সংঘবদ্ধ লোকদের আদর্শিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে ইসলামী সমাজ গঠনের যোগ্য সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৪। **ঐক্য :** দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বত সৃষ্টির চেষ্টা চালানো এবং মুসলিম উম্মাহর সকল প্রকার বিরোধ ও বিভেদ মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫। **শিক্ষা সংস্কার :** জাতীয়ভাবে সর্বজনীন কল্যাণকে সামনে রেখে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন এবং স্কুল, কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধাশুরু শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চালানো।

৬। **খেদমতে খালক :** খেদমতে খালক বা সমাজের অবহেলিত, দুর্গত, বঞ্চিত মানুষের সেবা, জালিমের প্রতিরোধ এবং খেটে খাওয়া মজলুম মানুষের অধিকার আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

৭। **অপশক্তি-অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ :** জাহিলী অপশক্তি ও অপসংস্কৃতির জোয়ার রোধ করে সুষ্ঠু ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর জন্য সক্রিয় প্রয়াস চালানো।

৮। **সমাজ সংস্কার :** সর্বস্তরের সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি উচ্ছেদ করে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ ও স্বনির্ভর করার জন্য দেশের অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও সর্বসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা।

৯। **অমুসলিম বা সংখ্যালঘুদের অধিকার :** অমুসলিম বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা ও ধর্মীয় অধিকারসহ সকল প্রকার নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

১০। **গণ-আন্দোলন :** সমাজ ও রাষ্ট্রের খোদাদ্রোহী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে খোদাভীরু লোকের নেতৃত্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো একজন আমীর, মজলিসে সাদারাত (প্রেসিডিয়াম), মজলিসে শূরা (পরামর্শ পরিষদ) ও মজলিসে আমেলা (নির্বাহী পরিষদ) নিয়ে গঠিত।[৫৫] আত্মপ্রকাশের পর পরই ১৩ মার্চ ঢাকার শাপলা চত্বরে আহুত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সমাবেশ পুলিশ বাহিনীর বেপরোয়া হামলার কারণে পন্ড হয়ে যায়। পুলিশের নারকীয় হামলায় বহুলোক আহত হয়। খেলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা আজিজুল হকসহ ৪০ জনের বেশি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[৫৬]

১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (ই শা আ) ইস্যু ভিত্তিক মিছিল-মিটিং সমাবেশের আয়োজন করে। এ সময়কালে '৮৮র মার্চে দেশব্যাপী শাসনতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ঢাকায় বিশাল সমাবেশ মিছিল, যাত্রীবাহী ইরানী বিমানে মার্কিনী ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ২৯০ জনকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ, সৌদি হজ্ব নীতি ও কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ, '৮৮-র বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, মার্কিন হামলায় দু'টি লিবিয়ান বিমান ধ্বংসের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, স্যাটানিক ভার্সেস রচয়িতা সালমান রুশদীর ফাঁসির দাবিতে প্রচন্ড বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। রুশদী বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশী হামলায় ঢাকায় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অর্ধশতাধিক কর্মী আহত হয়।[৫৭] ১৯৯০ সালে কাশ্মীরে নির্যাতন এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ই শা আ ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনেও ই শা আ মিছিল সভা সমাবেশের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে।[৫৮] এরশাদ সরকারের পতনের পর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করিম এক বিবৃতিতে মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে অনৈসলামিক জালেম ও মুনাফিক সরকারের পতনে সন্তোষ প্রকাশ করে।[৫৯]

মূলত ১৯৯১ সাল থেকে ই শা আ একটি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন 'ইসলামী ঐক্য জোটের' ব্যানারে অংশ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এরশাদ সরকারের পতনের পর ২২শে ডিসেম্বর '৯০ দেশের বিশিষ্ট ওলামা মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবী এবং ৭টি ইসলামী দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় ইসলামী ঐক্য জোট নামে বৃহৎ পরিসরে একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয় ।[৬০] বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠাতা অর্জন করতে পারেনি। সরকার গঠনে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিলে ই শা আ সরকার গঠনে কালক্ষেপণের বিরোধিতা করে একে ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ই শা আ এর উদ্যোগে ১৫ মার্চ ঢাকায় বায়তুল মোকারম মসজিদের উত্তর গেটে এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতাকালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র,

চরমোনাইর পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন, ইসলামী নীতি ছাড়া অন্য কোন নীতিতে শান্তি আসবেনা। সংবিধানে শুধু বিসমিল্লাহ সংযোজন করলেই অনৈসলামিক কর্মকান্ড বৈধ হয়না। সমাবেশে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে ই শা আ মুখপাত্র বলেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে পাস করেছেন, সংসদে বসে মুনাফেক সাজবেন না। নির্বাচনে জনগণ ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে ইসলামের পক্ষে রায় দিয়েছে। ইসলামের কথা বললেই সাম্প্রদায়িকতা হয় না। সমাবেশে ই শা আ নেতৃবৃন্দ বলেন, আল্লাহ পাক ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের মুখ দিয়েই সংবিধানে বিসমিল্লাহ রাখার কথা এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করিয়েছেন। অবাধ নির্বাচনের সুযোগ পেয়ে জনগণ জয়বাংলার পরিবর্তে আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিয়েছে। বক্তাগণ নতুন সরকার গঠনে কালক্ষেপণকে ষড়যন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেন।[৬১]

কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ই শা আ

কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ই শা আ যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করে। বিএনপি সরকারের সীমাহীন ক্ষমতালিপ্সা ও একগুঁয়েমিপনার কারণে সৃষ্ট সংকট নিরসনকল্পে ই শা আ-এর মুখপাত্র, চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করিমের আহবানে ৩১ অক্টোবর, '৯৫ সকাল ১১টা হতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণঅবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। কর্মসূচির উদ্বোধনী ভাষণে ইশাআ মুখপাত্র দেশ ও জাতিকে রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও বিপর্যয় হতে রক্ষার জন্য ১১ নভেম্বরের পূর্বে সরকারের পদত্যাগ দাবি করে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের আহবান জানান। মাওলানা ফজলুল করিম বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার দরুন দেশবাসীর জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। কলকারখানায় উৎপাদন বন্ধ, মূলত: দেশের অস্তিত্বই আজ হুমকির সম্মুখীন। পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক সংঘর্ষে মানুষের নিরাপত্তা বিপন্ন। তিনি বলেন সংকট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ হতে ফিরে যাবোনা। গণঅবস্থানের ১ম দিনে বিভিন্ন দলের জাতীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।[৬২]

ই শা আ এর গণঅবস্থান কর্মসূচির দ্বিতীয় দিবস শেষে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনুরোধে প্রত্যাহার করা হয়। গণ অবস্থান শেষে প্রধানমন্ত্রির সচিবালয় অভিমুখে এক বিশাল শান্তিপূর্ণ মিছিল যাত্রা করে। মিছিল শেষে ৮ নভেম্বর মানব বন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচির সমাপনী ভাষণে ই শা আ মুখপাত্র মাওলানা ফজলুল করিম গৃহযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য অবিলম্বে-কেয়ারটেকার সরকারের দাবি মেনে নেয়ার জন্য পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান।[৬৩] পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনকল্পে ইশাআ ৮ নভেম্বর দুপুর ১১টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত ইত্তেফাকের মোড় হতে ফার্মগেট পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচি শেষে জাতীয় প্রেস ক্লাব সম্মুখে আয়োজিত সমাবেশে

মাওলানা ফজলুল করিম দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক সংকট নিরসনকল্পে অনতিবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশে তিনি ১৮ নভেম্বর বাদ ফজর দেশ ব্যাপী দোয়া দিবস এবং ২৩ নভেম্বর শান্তি মিছিলের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[৬৪] নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ই শা আ সহ আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল ঐকবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। পরিষদের সমন্বয়কারী, ই শা আ এর মুখপাত্র মাওলানা ফজলুল করিমের সভাপতিত্বে ১৯ নভেম্বর '৯৫ বায়তুল মোকারম উত্তর গেটে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় দ্বীনদার নির্দলীয় সরকার গঠন করে নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। জনসভায় আরো বক্তব্য রাখেন পরিষদের সদস্য সচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী, ফ্রীডম পার্টির কর্ণেল (অব:) আবদুর রশীদ, এনডিএর মহাসচিব আনোয়ার জাহিদ, মুসলিম লীগের মহাসচিব অ্যাডভোকেট আয়েন উদ্দিন, জাগপার শফিউল আলম প্রধান, যুবকমান্ডের রহমতুল্লাহ, ই শা আ এর হেমায়েত উদ্দিন, নেজাম ইসলাম পার্টির এম. এ. লতিফ প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ ২২ নভেম্বরের মধ্যে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনের পদ্ধতি সাব্যস্ত করার ওপর জোর দেন।[৬৫]

শেখ হাসিনার সরকার: ই শা আ এর ভূমিকা

দীর্ঘ ২১ বছর পর পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকার ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের উদ্যোগ নেয়, পানি চুক্তি, পাবর্ত্য শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করে। ই শা আ বিভিন্ন ইস্যুতে শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রদান করে। ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার নামে করিডর প্রদান, পানি ও বিদ্যুৎ সংকট, আইন শৃংঙ্খলার চরম অবনতি ও সন্ত্রাস দমনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ইশাআ ২১মার্চ, '৯৭ ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে।[৬৬]

ভারতকে ট্রানজিট দেয়া হলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে মর্মে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ই শা আ আমীর মাওলানা ফজলুল করিম। ষড়যন্ত্রমূলক পানি চুক্তি, ভারতকে ট্রানজিট প্রদান, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পাঁয়তারা, বিদ্যুতের নজির বিহীন লোড শেডিং ও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ঈমান আক্বিদা বিরোধী 'শিখা চিরন্তন' নামক অগ্নি শিখা স্থাপনের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত ইশাআ-এর সমাবেশে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন পীর সাহেব চরমনাই ও ই শা আ আমীর মাওলানা ফজলুল করিম। তিনি আরো বলেন, এ দেশের বুকের ওপর দিযে ভারতীয় যানবাহন চলতে দেয়া হবে না। ভারতকে ট্রানজিট দিয়ে আমরা ভারতের বিদ্রোহীদের (উলফা) শত্রুষ্ট হতে চাই না। সমাবেশে ই শাআ মূখপাত্র নিম্মোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[৬৭]

২৮ মার্চ- ২৫ মে : বিভিন্ন পর্যায়ে জনসভা;

২৫ এপ্রিল : থানায় বিক্ষোভ মিছিল;

২ মে : জেলা শহরসমূহে জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল;

২৫ মে : ঢাকায় জনসভা।

শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ঢাকায় আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী (৫-৭ এপ্রিল '৯৭) জাতীয় সংহতি সম্মেলনে ই শা আ অংশ গ্রহণ করে। ই শা আ-এর প্রতিনিধি অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন সংহতি সম্মেলনে বলেন, যারাই জাতিকে ধোঁকা দেয় তাদেরই পতন অনিবার্য। ইসলামের বিরুদ্ধে আজকের সরকার যে সব পদক্ষেপ নিচ্ছে, তার জন্য তাদের ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে।[৬৮] স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তন স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। ই শা আ এর বিরোধিতা করে । শিখা চিরন্তন নামিয়ে তদস্থলে মসজিদ নির্মানের জন্য ই শা আ বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং বিরাট লাঠি মিছিলের আয়োজন করে।[৬৯]

শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের আন্দোলনের নতুন মাত্রা যোগ হয় ১৯৯৯ সালে বিরোধী দলের যুগপৎ আন্দোলন শুরুর মাধ্যমে। ইসলামী ঐক্যজোট যুগপৎ আন্দোলনে শরিক হলেও ই শা আ তাতে শরিক হয়নি। ই শা আ স্বতন্ত্রভাবে শেখ হাসিনার সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করে। যুগপৎ আন্দোলন এবং আওয়ামী সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যাপারে ই শা আ এর দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ই শা আ এর আমীর মাওলানা ফজলুল করিম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সম্প্রতি যুগপৎ আন্দোলনের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে তা ঐক্যজোটের নীতিমালার বহির্ভূত। মাওলানা ফজলুল করিম ক্ষমতাসীন জালিম সরকারের পতনের লক্ষ্যে তীব্র গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের দু:শাসনে জনগণ আজ অতিষ্ঠ, দেশে আইনের শাসন বলতে কিছু নেই। দেশ পরিচালনায় সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থ সরকারের শাসন ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। নজিরবিহীন নির্লজ্জ দলীয়করণের মাধ্যমে সরকার গোটা প্রশাসনকে জিম্মি করে রেখেছে।[৭০]

১৯৯৯ সালের শুরুতে সরকার পৌর নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে অন্যান্য বিরোধী দলের ন্যায় ই শা আ পৌর নির্বাচনের বিরোধিতা করে তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করে। পৌর নির্বাচন প্রতিহত করা ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ই শা আ ঢাকায় একাধিক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ গুলোতে ই শা আ নেতৃবৃন্দ যে কোন মূল্য প্রহসনের নির্বাচন প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন করতে দেয়া হবে না। পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশে অনাকাংখিত পরিস্থিতির উদ্ভব

হবে মর্মে ই শা আ সরকারকে হুঁশিয়ার উচ্চাশুরু করে পৌর নির্বাচন স্থগিত করে নৈরাজ্যের পথ পরিহারের আহবান জানায়।[৭১]

কবি শামসুর রহমানের বাসায় হামলার অভিযোগ তুলে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে ঢাকায় আয়োজিত এক সমাবেশে ই শা আ আমীর মাওলানা ফজলুল করিম বলেন, বর্তমান সরকার সুপরিকল্পিতভাবে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের জন্য ওঠে পড়ে লেগেছে। তিনি আওয়ামী লীগকে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুউ হিসেবে ঘোষণা করে বলেন, কবি শামসুর রহমানের ওপর সত্যিকারের হামলা হলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে বিচার করা হোক। আওয়ামী লীগ সরকারকে জনগণ ক্ষমতায় দেখতে চায় না বলে মন্তব্য করে ই শা আ-এর আমীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার তিন বছরের শাসনামলে বাংলার জনগণের কল্যাণ করতে না পারলেও ভারতের স্বার্থে সব কিছুই করেছে। ৬ ফেব্রুয়ারী, '৯৯ ঢাকায় এক জনসভায় ই শা আ আমীর আরো বলেন, শিখা চিরন্তন, মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন, নগ্ন ছবি প্রদর্শন ও অপপ্রচারের মাধ্যমে হিন্দু সংস্কৃতি চালু, পানি চুক্তির নামে প্রহসন, শান্তি চুক্তি করে দেশের এক-তৃতীয়াংশ ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।[৭২] আওয়ামী লীগ সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি ইসলাম, দেশ, জাতি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং বিরোধী দলের হরতাল-সমাবেশে পুলিশ ও আওয়ামী কাডারদের বাধা প্রদান দেশকে এক সংঘাতময় পরিস্থিতি দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মাওলানা ফজলুল করিম সরকারকে সতর্ক করে দেন।[৭৩]

আওয়ামী সরকারের জননিরাপত্তা আইনের বিরোধিতা করে ই শা আ জননিরাপত্তা আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল, আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ ও ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে ৩১ মার্চ, '৯৯ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশের সভাপতি মাওলানা ফজলুল করিম আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবি করে বলেন, বর্তমান সরকার দেশের অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিপর্যস্ত করে তুলেছে।[৭৪] শেখ হাসিনার সরকারের পদত্যাগসহ বিভিন্ন দাবিতে আহুত বিরোধী দলের ৭ ও ৮ নভেম্বর, '৯৯ হরতালের সমর্থনে ই শা আ ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।[৭৫] মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত, আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবাদে ঢাকায় আয়োজিত সমাবেশ শেষে ই শা আ বঙ্গভবন অভিমুখে গণমিছিলের ঘোষণা দেয়। মিছিলটি পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বঙ্গভবনের দিকে অগ্রসর হলে ই শা আ এর নেতা-কর্মীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে ২৫ জন নেতা-কমী আহত হয়।[৭৬]

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। বিশেষ করে ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যুগপৎ আন্দোলন, জামায়াতে ইসলামীকে 'ইসলামী দল না' বলে ঘোষণা, এরশাদের

সাথে জোটবদ্ধ নির্বাচন, পারিবারিক দ্বন্দ্বসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ই শা আ-এর ভূমিকা ব্যাপকভাবে আলোচিত সমালোচিত হয় ।[৭৭]

নির্বাচনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি[৭৮] কর্মসূচির পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়। প্রতিষ্ঠার পর ই শা আ ১৯৯১ সালে ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে জোটবদ্ধ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ২০০১ সালে ই শা আ জাতীয় পার্টির সাথে ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে অষ্টম জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয় । এ নির্বাচনে ই শা আ ২৩টি আসনে নির্বাচন করার সুযোগ পায়।[৭৯] ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ এবং ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে ই শা আ এককভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ই শা আ ২০টি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট ১১, ১৫৯টি ভোট পায়। শতকরা হিসেবে তা প্রদত্ত ভোটের ০.২৬৩%। নির্বাচনে এ দলটি কোন আসনে বিজয়ী হতে পারেনি।[৮০] তবে ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ই শা আ পূর্বের তুলনায় ভাল ফলাফল করে। শতাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এ নির্বাচনে তারা ৭, ৩৩, ৯৬৯টি ভোট পায় যা মোট প্রদত্ত ভোটের ১.০৫% ।[৮১] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এ পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনে কোন আসনে বিজয়ী হতে না পারলেও ধীরে ধীরে সংগঠনটি বিস্তার লাভ করছে। এক্ষেত্রে চরমোনাইর মুরিদগণ ই শা আ এর জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাড়াও ই শা আ স্কুল, মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা ও ক্যাডেট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ফজলুল করিম (রহ:) বলেন, "দেশের ৬৪টি জেলায় এমনকি প্রতিটি থানাতেই আমাদের সাংগঠনিক কমিটি রয়েছে। আমরা আগামী প্রজন্মের মাঝে ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। সারাদেশে আমাদের প্রায় ১৬ হাজার ভ্রাম্যমান স্কুল রয়েছে। সেগুলোতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়। এ ছাড়া চরমোনাই, খুলনা ও ঢাকায় আমাদের মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা ও ক্যাডেট মাদ্রাসা রয়েছে। এ সব মাদ্রাসায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিনা বেতনের শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মোট তিনটি অঙ্গ সংগঠন রয়েছে। ওগুলো হচ্ছে মুজাহিদ কমিটি, ছাত্র আন্দোলন ও যুব আন্দোলন। এ তিনটিই বর্তমানে দেশের প্রায় প্রতিটি থানায় সক্রিয় রয়েছে।"[৮২]

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতেও ভূমিকা পালন করে। কাশ্মীরে মুসলমানদের ওপর ভারতের বিমানহামলা ও নির্বিচারে তাদের হত্যার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ই শা আ হত্যার প্রতিবাদ না করায় আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।[৮৩]

অন্যান্য ইসলামী দল

জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত মজলিস ছাড়াও বেশ কয়েকটি ইসলামী সংগঠন বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংগঠনগুলোর দেশব্যাপী সাংগঠনিক বিস্তৃতি না থাকলেও জাতীয় ও বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার পাশাপাশি সংগঠনসমূহ সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ, ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি, ফারায়েজী জামায়াত, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ মোটামুটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন। নিম্নে দলগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং রাজনৈতিক ভূমিকা তুলে ধরা হলো:

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি

উপমহাদেশ ভিত্তিক ওলেমাদের প্রথম সংগঠন হিসেবে নিখিল ভারত জমিয়তে উলামা ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের কারণে শুরুতে মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা সৈয়দ হোসাইন মাদানীসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতা গ্রেফতার ও নির্বাসিত হন। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে এক কনভেনশনের মাধ্যমে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রকাশ্যে মূল ধারার রাজনীতি শুরু করে। তখন 'অখন্ড ভারত' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পর পাকিস্তান আন্দোলনে আলেমদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কলকাতায় শীর্ষস্থানীয় আলেমদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী, ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী, ছারছিনার পীর মাওলানা নেছার উদ্দিনসহ শীর্ষস্থানীয় আলেমদের উপস্থিতিতে পাকিস্তান দাবি আদায়ের লক্ষ্যে "জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়।[৮৪] মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর নেতৃত্বে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন জানায় এবং মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।[৮৫] পাকিস্তান সৃষ্টির পর মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর নেতৃত্বে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান গণপরিষদে "আদর্শ প্রস্তাব" পাস করানোর জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৯ সালের মার্চে আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর অন্যান্য মূল বিষয় ছিল আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী আদর্শের স্বীকৃতি। অবশ্য এ আদর্শ প্রস্তাবের কোন কার্যকারিতা পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫০ সালে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাছিহাতায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে শর্ষীণার পীর মাওলানা নেছার উদ্দিনকে সভাপতি নির্বাচিত করে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে মাওলানা আতহার আলী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালের ১৮-২০

মার্চ দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরামদের উপস্থিতিতে কিশোরগঞ্জের এক সম্মেলনে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। এ লক্ষ্যে নেজামে ইসলাম পার্টি নামে জমিয়তের একটি রাজনৈতিক সেল গঠিত হয়। মাওলানা আতহার আলী এবং মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন নেজামে ইসলাম পার্টির যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচেন যুক্তফ্রন্টের শরিকদল হিসেবে নেজামে ইসলামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়ী হয়ে শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করে যাতে নেজামে ইসলাম পার্টির সদস্যও ছিল।[৮৬] কপ (COP), পডিএম (PDM), ডাকসহ (DAC) পাকিস্তানের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেজামে ইসলাম ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

১৯৮১ সালে খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদকে সভাপতি এবং এডভোকেট মঞ্জুরুল আহসানকে সেক্রেটারী করে নেজামে ইসলামী পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো নতুনভাবে ঘোষিত হয়।[৮৭] অপরদিকে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পৃথকভাবে সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বাধীন খেলাফত সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ভূমিকা রাখে। এরশদের পতনের পর অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে গঠিত রাজনৈতিক জোট "ইসলামী ঐক্যজোট" এ জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম সক্রিয় ভূমিকা রাখে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০০) বিরুদ্ধে বিরোধীদলের আন্দোলনের প্রধান জোট চারদলীয় জোটের শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের তৎপরতায়ও উক্ত দল দু'টো ভূমিকা রাখে। অষ্টম সংসদ নির্বাচনে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস যশোর থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

ফারায়েজী জামায়াত

আল্লাহ্‌র জমীনে দ্বীন ইসলাম কায়েম এবং বাংলাদেশে খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৩৮০ বঙ্গাব্দে ফারায়েজী জামায়াত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফারায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ বিশ্বাস করে একমাত্র ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে আজকের সমস্যা জর্জরিত এবং নিপীড়িত বিশ্বে মানুষের সত্যিকার মুক্তি সম্ভব। ফারায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ মানবতা বিরোধী সংস্কৃতি এবং শিরক বিদায়া'তসহ অনৈসলামী কার্যকলাপ, কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করার জন্য ব্যাপক ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে সুস্থ, সুন্দর ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে।[৮৮] বর্তমানে ১৩টি জেলায় ফারায়েজী জামায়াতের সক্রিয় সংগঠন রয়েছে বলে সভাপতি জানান। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও সরকার বিরোধী আন্দোলনে ফারায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ যথাসম্ভব ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে।

ফারায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ তৎকালীন সভাপতি পীর মোহসীন উদ্দিন (দুদুমিয়া) ৮ নভেম্বর, ১৯৯০ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সম্মেলনে পীর মোহসিন উদ্দিন বলেন, ১৯৮২ সালে একটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃংখলা, নজিরবিহীন দুর্নীতি, আইন শৃংখলার অবনতি, অর্থনীতি ধ্বংস এবং সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন। রাষ্ট্রীয়ধর্ম ইসলামের নামে অধর্ম চালু করে সরকার শিরক বিদআতকে উৎসাহিত করেছে। দেশের এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে তিনি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। পীর দুদুমিয়া দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল বিরোধীদলকে ঐক্যবদ্ধভাবে একমঞ্চে সমবেত হয়ে অভিন্ন শ্লোগান নিয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।[৮৯] এরশাদের পতনের পর গঠিত ইসলামী দলগুলোর বৃহৎ জোট ইসলামী ঐক্যজোটে 'ফারায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ' শরিক দল হিসেবে যোগদান করে। কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলন এবং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী আন্দোলনেও ফারায়েজী জামায়াত সাধ্যানুসারে ভূমিকা রাখে। ইসলামী ঐক্যজোটের বর্তমান শরিকদের মধ্যে ফারায়েজী জামায়াত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির অন্যতম পুরোধা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা আবদুর রহীম (রহ:)-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ (আইডিএল) কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে কিছু পরিবর্তন এনে ১৯৮৪ সালের ৩০ নভেম্বর ইসলামী ঐক্য আন্দোলন নামে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আইডিএল এর ব্যানারে গণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক ভূমিকা রাখা এবং ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে জেহাদী ভুল হিসেবে উল্লেখ করেন মাওলানা আবদুর রহীম।[৯০] প্রচলিত গণতান্ত্রিক বা সংসদীয় রাজনীতির পরিবর্তে ইসলামের জেহাদী বা বিপ্লবী রাজনীতিতে উত্তরণের ব্যাপারে আইডিএল জাতীয় কমিটিতে পূর্ণাঙ্গ মতৈক্য স্থাপিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৮৩ সালের ২৪ অক্টোবর আইডিএল-এর জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় অধিবেশনে "গণতন্ত্র থেকে বিপ্লবে উত্তরণ"-এর স্বপক্ষে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে।[৯১] নতুন নাম গ্রহণের পর আইডিএল এর গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র থেকে গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতি পরিহার করে তাতে ইসলামের জিহাদী বা বৈপ্লবিক কর্মধারা সন্নিবিষ্ট করা হয়। গণতন্ত্রকে ভ্রান্ত মতবাদ হিসেবে উল্লেখ করে "গণতন্ত্র নয়, পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব," "প্রচলিত রাজনীতি নয়, জিহাদই কাম্য" এ দু'টি শ্লোগান ধারণ করে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে চায়।[৯২] ইসলামী ঐক্য

আন্দোলন ইসলাম এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, ইসলামে আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস, অপরপক্ষে গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, ইসলামের লক্ষ্য আত্মিক ও পার্থিব উন্নতি, গণতন্ত্রের লক্ষ্য শুধু ক্ষমতার রাজনীতি, ইসলামের নেতৃত্বের ভিত্তি জ্ঞান ও খোদাভীতি, গণতন্ত্রের ভিত্তি সস্তা জনসমর্থন, ইসলামের লক্ষ্য জুলুম-শোষণের অবসান, গণতন্ত্রের লক্ষ্য পুঁজিবাদী শোষণ প্রতিপালন, ইসলামের শিক্ষা নি:স্বার্থ আত্মত্যাগ অপরপক্ষে গণতন্ত্রের শিক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ-ভোগবাদ ইত্যাদি। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক পন্থার পরিবর্তে গণঅভ্যুত্থান বা গণবিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চায়।[৯৩] ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে আল্লাহ্‌র দ্বীন পূর্ণাঙ্গ কায়েমের মাধ্যমে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও রাসূল (সা:)-এর আনুগত্য, সমাজ হতে জুলুম-শোষণ উৎখাত করে আদর্শ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ, সর্বোপরি রাসূল (সা:)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন হচ্ছে ঐক্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের কর্মসূচি হলো: ১. দাওয়াত ও তাবলীগ ২. সংগঠন ৩. তালিম, তারবিয়াত ও তাজকিয়াহ ৪. আম্‌র বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার ৫. বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি ৬. সমাজ সেবা (খেদমতে খালক) ও ৭. অর্থনৈতিক স্বাধিকার ও ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা। গণচেতনা সৃষ্টি, গণসংগঠন, গণপ্রতিরোধ, গণঅভ্যুত্থান এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক কর্মতৎপরতার ধারা অনুসরণ করে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন।[৯৪] ইসলামী ঐক্য আন্দোলন ইসলামী বিপ্লবের ৮দফা ইশতেহার ঘোষণা করে। আদর্শগত, সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করে ৮ দফা ইশতেহার রচনা করা হয়।[৯৫] পানিচুক্তি এবং ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের কথিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন, মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন অপশক্তির চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অশ্লীলতা বন্ধসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন বক্তৃতা-বিবৃতি, সমাবেশ অনুষ্ঠান ও মিছিলের মাধ্যমে ভূমিকা রাখে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

১৯৮৪ সালে মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর (অব:) আবদুল জলিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে পদত্যাগ করে একই সালের অক্টোবর মাসে "জাতীয় মুক্তি আন্দোলন" গঠন করে। মেজর জলিলের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ২১ দফা মেনিফেস্টোর মধ্যে ৭ দফাই ছিল ইসলামী আদর্শ মোতাবেক সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে নিবেদিত। তিনি দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে বৃহত্তর একক ইসলামী আন্দোলনে জোটবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এরশাদ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।[৯৬] হাফেজ্জী হুজুরের

নেতৃত্বে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে মেজর জলিল ইসলামী রাজনীতি ও সরকার বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শরিক হওয়ায় ১৯৮৫ সালে তিনি একমাস গৃহবন্দী ছিলেন। তারপর বিশেষ নিরাপত্তা আইনে ১৯৮৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর হতে ১৯৮৮ সালের মার্চ পর্যন্ত কারাগারে আটক ছিলেন। মেজর জলিলের মৃত্যুর পর এ সংগঠনের কার্যক্রম বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। তবে তাঁর এবং মাওলানা ভাসানীর আদর্শের অনুসারীরা জাতীয় গণমুক্তি আন্দোলন নামে সংগঠিত রয়েছে।[৯৭]

ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ

এনজিও, খ্রিষ্টান মিশনারী, কাদিয়ানী ও নাস্তিক মুরতাদদের ইসলাম ও দেশ বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধ এবং দ্বীন,ঈমান, জাতীয় মূল্যবোধ, দেশের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্বকে রক্ষা করার লক্ষ্যে দেশের সচেতন ওলামা-মাশায়েখ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করে মুসলিম জনতাকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে ৩০ মে ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৪ সালের ২০ মে রাজধানীতে "কুরআন মিছিল" কুরআনের ইজ্জত রক্ষার বজ্র শপথের মধ্যদিয়ে এ আন্দোলনের ভিত রচিত হয়। অত:পর ৩০ মে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ (ঢাকা) মাদ্রাসায় দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সভায় ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা গঠনের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক-গবেষক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে আহবায়ক এবং মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির উদ্যোগে ৯ জুন ঢাকায় যুব সমাবেশ থেকে ৩০ জুন '৯৪ কোরআনের ইজ্জত রক্ষার দাবিতে দেশব্যাপী হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। আন্দোলনকে সংগঠিত এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় স্থায়ীরূপ দেয়ার লক্ষ্যে ১৬ জুন, '৯৪ সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে সভাপতি এবং মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে মহাসচিব করে "ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা" গঠিত হয়। পরবর্তীতে নাম সংক্ষিপ্ত করে "ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ" নামকরণ করা হয়।[৯৮]

ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ ৪টি পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ক. মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ;

খ. মজলিসে আমেলা বা কার্যনির্বাহী পরিষদ;

গ. মজলিসে আম্মাহ বা সাধারণ পরিষদ;

ঘ. মজলিসে খাস বা উপদেষ্টা পরিষদ।

"ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ" ৭দফা দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করছে। ওগুলো হচ্ছে: রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলাম বিরোধী সকল অপতৎপরতা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা, নাস্তিকমুরতাদ, ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের গ্রেফতার করে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা, কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা, এনজিওদের দেশ, ইসলাম ও মানবতা বিরোধী সকল তৎপরতা বন্ধ করা, ইসলাম বিদ্বেষী সকল পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং রেডিও টেলিভিশনসহ যাবতীয় প্রচার মাধ্যমে ইসলামী আকিদা, বিশ্বাসবিরোধী-প্রচারণা থেকে বিরত রাখার কঠোর ব্যবস্থা রাখা। ইসলামী মোর্চার নেতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব হিসেবে শেখ হাসিনার সময়কালে (১৯৯৬-২০০০) বিরোধীদলের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উল্লেখিত ইসলামী দল ও জোটসমূহ এককভাবে গণতান্ত্রিক ও সরকার বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে না পারলেও ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে দলগুলোর বলিষ্ঠতা এবং সংঘবদ্ধতা প্রদর্শিত হয়েছে। সাংগঠনিক শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামী দলগুলোকে একটি সিদ্ধান্তকারী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। এজন্য ইসলামী দলগুলোকে ন্যূনতম ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। নেতৃবৃন্দের মতানৈক্য যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনার বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসংকেত ও টীকা

১। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯০

২। সংগঠন বিভাগ, অর্থবিভাগ, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, দপ্তর বিভাগ, রাজনৈতিক বিভাগ, সমাজকল্যান বিভাগ

৩। দেখুন, *নীতিমালা*, ইসলামী ঐক্যজোট

৪। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মার্চ, ১৯৯৬

৫। *The Dhaka Courier*, 24 June, 1994

৬। *ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিরোধ আন্দোলন*, চলতি প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৮৩-৮৪

৭। ড.তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ১৩৪

৮। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৬ জুলাই, ১৯৯৭

৯। *পূর্বোক্ত*, ২৩ আগষ্ট, ১৯৯৭

১০। *পূর্বোক্ত*, ৭ জানুয়ারী, '৯৯

১১। *পূর্বোক্ত*, ১ ফেব্রুয়ারী, '৯৯

১২। *পূর্বোক্ত*, ৯ মার্চ, '৯৯

১৩। *পূর্বোক্ত*, ৫ ফেব্রুয়ারী, '৯৯

১৪। *পূর্বোক্ত*, ১২ ফেব্রুয়ারী, '৯৯

১৫। *পূর্বোক্ত*, ১৯ ফেব্রুয়ারী '৯৯

১৬। *পূর্বোক্ত*, ৭ মার্চ, '৯৯

১৭। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে, ১৯৯৯

১৮। *পূর্বোক্ত*, ২৫ মে, '৯৯

১৯। *পূর্বোক্ত*, ২৬ জুলাই, '৯৯

২০। *পূর্বোক্ত*, ৩ আগষ্ট, '৯৯

২১। *পূর্বোক্ত*, ১৯ আগষ্ট, '৯৯

২২। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৪ এপ্রিল, ২০০০

২৩। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ আগষ্ট, '৯৯

২৪। *পূর্বোক্ত*, ৩১ আগষ্ট, '৯৯

২৫। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

২৬। *পূর্বোক্ত*, ১৬ সেপ্টেম্বর, '৯৯

২৭। *পূর্বোক্ত*, ২৩ অক্টোবর, '৯৯

২৮। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ নভেম্বর, '৯৯

২৯। *The Bangladesh Observer*, January 24, 2000

৩০। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

৩১। *পূর্বোক্ত*, ৫ জুন ২০০০

৩২। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

৩৩। *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৫ আগষ্ট, ২০০০

৩৪। মাহমুদ শফিক, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়*, বইপত্র, ২০০২, পৃ.১৬৫-১৭৫

৩৫। দেখুন, *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

৩৬। *গঠনতন্ত্র*, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, পৃ. ৬

৩৭। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬-৭

৩৮। *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, কর্তৃক কার্যালয় ৪৪/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা

৩৯। *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৯

৪০। *সাক্ষাৎকার*, এ আর এম আবদুল মতিন, মহাসচিব বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

৪১। *পূর্বোক্ত*

৪২। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ এপ্রিল, ১৯৯৭

৪৩। *জাতীয় সম্মেলন ১৯৯৯ স্মারক*, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ১৯৯৯, প. ৫১

৪৪। *স্মারক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৪৫। ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, প. ১৩৪

৪৬। *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৪৭। *পূর্বোক্ত*, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৪৮। *পূর্বোক্ত*, ৯ অক্টোবর, ১৯৯৯

৪৯। *স্মারক*, প্রাগুক্ত, প. ৫৬

৫০। বিস্তারিত, *আলের বাতিঘর পীর সাহেব চরমোনাই (রহঃ)*, সম্পাদনা পরিষদ, আল ফাতাহ প্রকাশনী ২০০৭, পৃ. ৪৭-৪৮

৫১। সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা ফজলুল করিমের বক্তব্য থেকে, *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ মার্চ, ১৯৮৭

৫২। দেখুন, *পরিচিতি* , ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

৫৩। *নীতিমালা*, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৫, পৃ. ৬-৭

৫৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৫৬। *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৪ মার্চ, ১৯৮৭

৫৭। *আলোর বাতিঘর পীর সাহেব চরমোনাই (রহঃ)*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৮

৫৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

৫৯। *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০

৬০। ঐক্যজোটভুক্ত ৭টি দল হচ্ছে: জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ফরায়েজী জামায়াত, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস ও ইসলামী আন্দোলন

৬১। *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৬ মার্চ, ১৯৯১

৬২। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১লা নভেম্বর, ১৯৯৫

৬৩। *পূর্বোক্ত*, ২ নভেম্বর, ১৯৯৫

৬৪। *পূর্বোক্ত*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৫

৬৫। *পূর্বোক্ত*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯৫

৬৬। *দৈনিক ইনকিলাব*, ২২ মার্চ, ১৯৯৭

৬৭। *পূর্বোক্ত*, ২৮ মাচ, '৯৭

৬৮। *পূর্বোক্ত*, ৬ এপ্রিল, ১৯৯৭

৬৯। *পূর্বোক্ত*, ১১ এপ্রিল, '৯৭

৭০। *পূর্বোক্ত*, ৯ জানুয়ারী, ১৯৯৯

৭১। *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৬ জানু, ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

৭২। *পূর্বোক্ত*, ৭ ফেব্রুয়ারী, '৯৯

৭৩। *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৮ ফেব্রুয়ারী, '৯৯

৭৪। *পূর্বোক্ত*, ১লা এপ্রিল, ২০০০

৭৫। *পূর্বোক্ত*, ৭ ফেব্রুয়ারী, '৯৯

৭৬। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ নভেম্বর, ১৯৯৯

৭৭। উদ্ধৃত, আবদুল্লাহ (সংকলিত), *চরমোনাই পীরের গোপন রহস্য*, আবদুল্লাহ প্রকাশনী, বরগুনা, ২০০৬, পৃ. ৩০

৭৮। কর্মী মুবাল্লিগদের দৈনন্দিন কর্মসূচি, *নীতিমালা*, পরিশিষ্ট- ৩, পৃ. ৩২

৭৯। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১

৮০। নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট, মাহমুদ শফিক, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়*, বইপত্র, ২০০২, পৃ. ১৭৫

৮১। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২ জানুয়ারী, ২০০৯

৮২। সাক্ষাৎকার, *সাপ্তাহিক ২০০০*, উদ্ধৃত, চরমোনাই পীরের গোপন রহস্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৮৩। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন, ১৯৯৯

৮৪। *সাক্ষাৎকার*, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ২৯ জুন, ২০০৫, পৃ. ১৪-১৫

৮৫। Ishtiaq Hossain Qureshi, *Ulema in Politics* (reprint), Renaissance Publishing House, Delhi 1985) p. 358, 114

৮৬। Salahuddin Ahmed, *Bangladesh Past and Present,* A.P.H. Publishing Corporation, 2004, p-141

৮৭। বিস্তারিত, আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান* (২য় সংস্করণ) ঢাকা, কওমী পাবলিকেশন ২০০০, পৃ. ২০৮-২১৬

৮৮। *সাক্ষাৎকার*, আলহাজ্ব মুইনউদ্দিন আহমদ, সভাপতি ফারায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ, উদ্ধৃত, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ২৯ জুন ২০০৫, পৃ. ২০

৮৯। *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯০

৯০। বিস্তারিত, হাফেজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *মাওলানা আবদুর রহীম (রহঃ)*, মাওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন, ২০০৭, পৃ. ১৯৭-৯৮

৯১। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৭

৯২। *পরিচিতি*, ইসলামী ঐক্য অন্দোলন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ- ৮৫/১-৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

৯৩। হাফেজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, কি চায় কেন চায় কিভাবে চায়*, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন প্রকাশনী, ২০০৩ (৩য় সংস্করণ) পৃ. ৩৭-৪২

৯৪। *স্মারক*, মহাসম্মেলন ২০০৩, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, পৃ. ১৪

৯৫। বিস্তারিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১-১২

৯৬। *সাপ্তাহিক রোববার*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৮৪

৯৭। *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ২৯ জুন, ২০০৫

৯৮। *গঠনতন্ত্র*, ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ, ১৯৯৯, পৃ. ৩-৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

জঙ্গিবাদ ও বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি

বর্তমান বিশ্বে জঙ্গিবাদ একটি ব্যাপক আলোচিত বিষয়। ছোট-বড় প্রায় সকল রাষ্ট্র আজ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে জঙ্গি তৎপরতার কারণে নিরাপত্তা সংকটে নিপতিত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংস, ২০০১ সালের ২৫ জুলাই মাদ্রিদের বোমা বিস্ফোরণ, ২০০৫ সালে ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা হামলাসহ অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যক্রম জঙ্গিবাদের বিস্তৃতি এবং সুসংগঠিত কার্যক্রমের বহি:প্রকাশ। বাংলাদেশেও সাম্প্রতিককালে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সরকার এবং জনগনের প্রচেষ্টার কারণে জঙ্গি তৎপরতা ব্যাপকতা লাভ করতে না পারলেও তা অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। যদিও জঙ্গিরা তাদের নিজস্ব লক্ষ্য ও কর্মসূচি নিয়ে তৎপরতা চালাচ্ছে তথাপি অধিকাংশ সময় জঙ্গি তৎপরতাকে ইসলামী জঙ্গিবাদ হিসেবে প্রচার করা হয়। বিশ্বব্যাপী জঙ্গি তৎপরতায় শুধু মুসলিম নয় খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং হিন্দু ধর্মসহ অন্যান্য ধর্ম ও আদর্শের সমর্থকরাও জড়িত রয়েছে।

জঙ্গির ইংরেজী শব্দ Militant. Oxford Advanced Learners Dictionary-তে Militant-এর অর্থ করা হয়েছে: 'using or willing to use force or strong pressure to achieve aims, especially to achiev social or political' অর্থ্যাৎ জঙ্গি হচ্ছে শক্তি বা বল প্রয়োগ করে কোন উদ্দেশ্য সাধন করা। জঙ্গি হচ্ছে সে ব্যক্তি যে পরিবর্তনের জন্য চরমপন্থা গ্রহণ করে। সাধারণত মারমুখো বা রণোন্মুখ বোঝাতে জঙ্গি পদবাচ্যটি ব্যহৃত হয়ে থাকে। অতএব জঙ্গি বলতে আমরা সংগঠিত কোন জনগোষ্ঠিকে বুঝাবো যারা তাদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য চরমপন্থা গ্রহণ করে। তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সশস্ত্র সংগ্রামে তারা আত্ম নিয়োগ করে এবং জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সাম্প্রতিক কালে জঙ্গি তৎপরতা বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আশির দশকের মাঝামাঝিতে 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলাম' সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামের নামে এ ধরনের তৎপরতা শুরু হয়। মূলতঃ আফগান যুদ্ধফেরত যোদ্ধারা এ সকল কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে। দু'হাজার সাল থেকে তথাকথিত 'ইসলামী জঙ্গি' তৎপরতা প্রকাশ্যে শুরু হয়। এ সকল জঙ্গি প্রকাশ্যে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের কথা বলায় প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ ধরনের কর্মকান্ডকে 'ইসলামী জঙ্গি' তৎপরতা হিসেবে

অভিহিত করে আসছে। যদিও ইসলাম-এ ধরনের জঙ্গি তৎপরতাকে আদৌ সমর্থন করেনা।

অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমান বিশ্ব অনেক বেশী সন্ত্রাস কবলিত এবং জঙ্গি তৎপরতার শিকার। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রায় সকল রাষ্ট্রই সন্ত্রাসকে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর জনগণের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। আমাদের এই উপমহাদেশে জঙ্গি তৎপরতার ইতিহাস একটু পুরনো। বৃটিশ যুগেই চরমপন্থীর উদ্ভব ঘটে এ ভূখন্ডে। বলা যায় গোপন আন্দোলন ও শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্ম হয়েছে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে। ফকির আন্দোলন, সন্ন্যাসী আন্দোলন, জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজা আন্দোলন-প্রতিবাদ শুধু বিদ্রোহ ছিল না, সুসংঘবদ্ধ প্রজা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের পরিকল্পিত প্রজা আন্দোলন জিহাদী আন্দোলনে রূপ নিয়েছিলো। আঞ্চলিক বিদ্রোহগুলোর সামগ্রিক রূপ পেয়েছিলো ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিপ্লবে'- যা বৃটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে খ্যাত।[১]

বৃটিশ আমলে স্বদেশী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয়া চরমপন্থীদের নেতৃত্ব চলে যায় কমিউনিস্টদের হাতে। সেটাই চারু মজুমদারের নকশালবাড়ি আন্দোলন, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির আন্দোলন ইত্যাদিতে রূপ নেয়। অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন সমিতির নামে বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কার্যক্রম ১৯০২ সালে শুরু হলেও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার পর চরমপন্থী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ এবং ১৯১৫ সালে অহিংসবাদী এম.কে গান্ধীর উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সাময়িকভাবে দুর্বল করে। পরবর্তীকালে গান্ধী কর্তৃক হঠাৎ করে তুঙ্গে উপনীত হওয়া অসহযোগ আন্দোলনের অবসান ঘোষণা নতুন করে চরমপন্থী আন্দোলন বিস্তারে সহায়ক হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকারের ব্যাপক দমননীতি, রাজনৈতিক দল ও জনগণের সমর্থনের অভাবে প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, তারকেশ্বর দস্তিদার, প্রীতিলতা, ওয়াদ্দেদারসহ অনেকের আত্মদান সত্বেও বেশিদিন সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম পরিচালনা গুপ্ত সংগঠনগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৩৪ সালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।[২] বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম সরকারের (মুজিব আমল) সময়কালে নৈরাজ্যজনক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সিরাজ সিকদারের গোপন ও সশস্ত্র আন্দোলন ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। হক– তোহার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও তখন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের প্রায় সকল সরকারকে উত্তর–দক্ষিণ বঙ্গের, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এবং সর্বহারা পার্টির চরমপন্থীদের জঙ্গি তৎপরতার মোকাবেলা করতে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে চরমপন্থী সর্বহারাদের দমনে চিরুনি অভিযান চালানো হয়েছে।

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা মারাত্মক আকার ধারণ করে ১৯৯৯ সাল থেকে। এ সালের ৬ মার্চ যশোরের উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় নিহত হয় ১০ জন। পল্টন ময়দানে সিপিবি'র জনসভায় বোমা হামলা হয় ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারী; নিহত হয় ৭ জন। রমনার বটমূলে ছায়ানটের পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা চালানো হয় ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল। এতে ১০ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়। নারায়নগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোশুরু ঘটে ২০০১ সালের ১৫ জুন; নিহত হয় ২২ জন।[৩]

আওয়ামী সরকারের আমলে সংঘটিত উপরোক্ত জঙ্গি হামলার ধারাবহিকতায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোটের শাসনামলে (২০০১-২০০৬) তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশের ৬৩ টি জেলায় (একমাত্র মুন্সিগঞ্জ জেলা ছাড়া) একযোগে বোমা হামলা সবাইকে হতবাক করে দেয়। এক দিনে একই সময়ে পাঁচ শতাধিক স্থানে এ ধরনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলার সাথে যে উগ্রবাদী জঙ্গি সংগঠনের লীফ্লেট পাওয়া গেছে তার নাম জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)। প্রতিটি বোমা বিস্ফোরণের স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বাংলা ও আরবীতে লেখা একাধিক লীফলেট। যাতে বলা হয়েছে, কোন মুসলিম ভূখন্ডে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যকোন বিধান চলতে পারে না। শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম বাস করা সত্ত্বেও আমাদের দেশে আল্লাহর বিধান নেই। লীফলেটে যতদিন পর্যন্ত দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন না হয় ততদিন 'তাগুতের' বিচারালয় বন্ধ রাখার আহবান জানানো হয়।

১৯৯৪ সাল থেকে দেশে জেএমবির সাংগঠনিক তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া গেলেও ২০০৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী দিনাজপুরে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রথম আলোচনায় আসে সংগঠনটি। একই বছরের ১৪ আগস্ট জয়পুরে পুলিশের সাথে মুখোমুখি এক বন্ধুক যুদ্ধে লিপ্ত হয় জেএমবির ক্যাডাররা।[৪] বহুল প্রচারিত একটি সাপ্তাহিকের বর্ণনায় জেএমবির ক্রমবিকাশ নিম্নরূপ ঃ

> "সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে নিয়ে জামালপুরের শাইখ আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৯৮ সালে গঠিত হয় জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ নামক জঙ্গি সংগঠনটি। প্রথম উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় মাদ্রাসা ও মসজিদকে কেন্দ্র করে এ সংগঠনের গোপন কর্মকান্ড শুরু হয়। তবে সে সময় সংগঠনের নাম এটা ছিলনা। জানা যায় ১৯৯৮ সালের শুরুর দিকে 'ক্বিতাল' পার্টি নাম দিয়ে সদস্য সংগ্রহ ও অন্যান্য কর্মকান্ড শুরু হয়। এখনো জামালপুর, ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল ও হরিপুর উপজেলা এবং বগুড়ার কাহালু উপজেলার সাধারণ মানুষ জামায়াতুল মুজাহিদিনকে 'ক্বিতাল' নামে ডাকে। এরপর নামকরন করা হয়েছিল আল্ জামায়াতুল জিহাদ। ২০০০ সাল পর্যন্ত এ নাম চালু ছিল। ওই বছর জয়পুর হাটের কালাই উপজেলার দু'টি মসজিদে জঙ্গি প্রশিক্ষণের খবর ছাপা হওয়ার

পর আল জামায়াতুল জিহাদ নামের প্যাডে কালাই প্রেস ক্লাবে চিঠি দিয়ে হুমকি দেয়া হয়েছিল। ২০০১ সালের জয়পুর হাটের ক্ষেতলাল, কালাই, দিনাজপুর সদর, পার্বতীপুর, চিরির বন্দর, বগুড়ার সারিয়াকান্দি, নন্দিগ্রাম, গাইবান্ধার সাগাটা, নাটোরের গুরুদাসপুর, ঠাকুরগাঁও, জামালপুরের বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতুল মুজাহিদিনের নাম ও কার্যক্রম সাধারণ মানুষের নজরে আসে। এরপর থেকে এ নামেই গোপন জঙ্গি তৎপরতা অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। জয়পুর হাটের ক্ষেতলাল উপজেলার উত্তর মহেশপুরে ২০০৩ সালে ৪২ জন জঙ্গি সদস্য ধরা পড়ার পর আবদুর রহমান গা ঢাকা দেন। এরপর হতে তিনি আত্মগোপনে থেকে দল পরিচালনা করেছেন। স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, তিনি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে সশস্ত্র যুদ্ধের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতারকৃত জঙ্গিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী থেকে জানা যায়, ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিবও এ সংগঠনের একজন বড় নেতা। পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রগুলো মনে করেছে গালিব এ দলের আধ্যাত্মিক নেতা। দলের উত্তরাঞ্চলের কমান্ডার হচ্ছেন বগুড়ার সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই। বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে রাজশাহীর বাগমারা এবং নওগাঁর রানীনগর ও আত্রাইয়ে ২০০৪ সালের এপ্রিলে যে সশস্ত্র তৎপরতা চালানো হয়েছিল জামা'আতুল মুজাহিদিন নামে, এক সপ্তাহ পরে নাম পাল্টে রাখা হয় জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)। মুলত দু'টিই এক সংগঠন বলে জানা গেছে। জামায়াতুল মুজাহিদিন ও জেএমজেবিকে ২৩ ফেব্রুয়ারী (২০০৫) সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং বাংলা ভাই ও আবদুর রহমানকে গ্রেফতারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন।"[৫]

২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত জঙ্গি হামলার প্রধান প্রধান কয়েকটি ঘটনা নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।[৬]

সাল ও তারিখ	স্থান	বিবরণ/ঘটনা	হতাহতের সংখ্যা
২০ জানুয়ারী, ২০০১	পল্টন ময়দান	সিপিবির মহাসমাবেশ	নিহত ৭ ,আহত ৬০
১৪ এপ্রিল, ২০০১	রমনা বটমূল	নববর্ষ বগুরু অনুষ্ঠান	নিহত ১০, আহত শতাধিক
৩ জুন, ২০০১	বানিয়ার চং, গোপালগঞ্জ	গীর্জায় বোমা হামলা	নিহত ১০, আহত ১০
১৫ জুন, ২০০১ সাল	নারায়নগঞ্জ	আওয়ামী লীগ কার্যালয়	নিহত ২২ , আহত ৩০
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১	মোল্লার হাট, বাগেরহাট	আওয়ামী লীগ সমাবেশ	নিহত ৪
৬ ডিসেম্বর, ২০০২	ময়মনসিংহ	৪টি সিনেমা হলে হামলা	নিহত ২৮ ,আহত শতাধিক
১৭ জানুয়ারী, ২০০৩	টাঙ্গাইল	মেলায় বোমা হামলা	নিহত ৭ , আহত ২০
২১ মে, ২০০৪	সিলেট শাহ জালাল (রহঃ) মাজার	বিট্রিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলা	নিহত ৩
২১ আগষ্ট, ২০০৪	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ , ঢাকা	আওয়ামী লীগ সমাবেশে গ্রেনেড হামলা	নিহত ২২ , আহত কয়েকশ'
২৭ জানুয়ারী ,২০০৫	হবিগঞ্জ	সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ.এম.এস কিবরিয়ার	নিহত ৩ , আহত ১০

সাল ও তারিখ	স্থান	বিবরণ/ঘটনা	হতাহতের সংখ্যা
		সমাবেশ	
১২ আগষ্ট, ২০০৫	আখাউড়া মাজার , ব্রাক্ষমবাড়িয়া	মাজার এবং মেলায়	নিহত ২ ,আহত শতাধিক
১৭ আগষ্ট, ২০০৫	একযোগে ৬৩ টি জেলায়	জেএমবির দেশব্যাপী সন্ত্রাস পরিচালনা	নিহত ২ ,আহত তিন শতাধিক
৩ অক্টোবর, ২০০৫	চট্টগ্রাম,লক্ষীপুর,চাঁদপুর	জজ আদালতসমূহে বোমা নিক্ষেপ	কয়েকজন আহত হয়
১৪ নভেম্বর, ২০০৫	ঝালকাঠি	বিচারকদের গাড়িতে বোমা হামলা	দুই সাব জজ নিহত
২৯ নভেম্বর, ২০০৫	গাজীপুর ও চট্টগ্রাম	আদালত মজলিস ও ভবন	কমপক্ষে ১০ জন নিহত

বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনসমূহ

১৯৯২ সালে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশ নেয়া হরকাতুল জিহাদের সদস্যরা দেশে ফিরে এসে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় হরকাতুল জিহাদের তত্ত্বাবধানে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তান গিয়েছিল। ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী হরকাতুল জিহাদের ৪১ জন জঙ্গি অস্ত্রশস্ত্র, গ্রেনেডসহ ধরা পড়ে।[৭] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯৮ সাল থেকে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় তারা 'ক্বিতাল' বাহিনী এবং পরবর্তীতে 'জামায়াতুল মুজাহিদিন' নামে জঙ্গি বাহিনী গড়ে তোলে। প্রথম আলোর অক্টোবর ২৮, ২০০৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৯টি কিংবা তারও বেশি জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে। সাপ্তাহিক মৃদু ভাষণের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংখ্যা তিন গুণ বেশি। পত্রিকাগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য জঙ্গি সংগঠন হলো ঃ

১। জামায়াতুল মুজাহিদিন ২। জাগ্রত মুসলিম জনতা ৩। শাহদাত- ই- আল হিকমা ৪। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী ৫। শহীদ নসুরুল্লাহ আল আরাফাত বিগ্রেড ৬। হিজবুত তাওহিদ ৭। জামাত–ই–ইয়াহিয়া ৮। আল তুরাত ৯। আল হারাত আল ইসলামিয়া ১০। জামায়াতুল ফালাইয়া ১১। বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট ১২। জুম্মাতুল আল সাদাত ১৩। শাহদাত -ই- নবুয়ত ১৪। আল্লাহর দল ১৫। জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ ১৬। আল জিহাদ বাংলাদেশ ১৭। ওয়ারত ইসলামিক ফ্রন্ট ১৮। জামায়াত আস সাদাত ১৯। আল খিদমত ২০। হরকতে ইসলাম আল জিহাদ ২১। হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ ২২। মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল ২৩। ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ ২৪। জইশে মুহাম্মদ ২৫। তা'আমীর উদদ্বীন বাংলাদেশ ২৬। হিজবুল মাহাদী ২৭। আল ইসলাম মার্টায়ারস বিগ্রেড ও তানজীম। জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকার চারটি জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। ও গুলো হলো

শাহাদাত-ই-আল হিকমা (২০০৪), জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি ২০০৫), হরকাতুল জিহাদ (২০০৫) এবং জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি, ২০০৫)। ২০০৯ সালের মার্চে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয় বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত ১২টি ধর্মীয় সংগঠনের একটি তালিকা মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে। এর মধ্যে রয়েছে: ১। জেএমবি ২। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলাম ৩। হিজবুত তাহরীর ৪। ওলামা আল বাইয়্যেনাত ৫। ইসলামী ডেমোক্র্যোটিক পার্টি ৬। ইসলামী সমাজ ৭। তৌহিদ ট্রাস্ট ৮। জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ ৯। শাহাদাত-ই আল হিকমা পার্টি ১০। তামির আদদীন বাংলাদেশ ১১। হিজবুত তাওহীদ ১২। আল্লাহর দল।[৮]

জঙ্গি কার্যক্রমের কারণসমূহ

বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ অনেকটা দ্বিধাবিভক্ত। সুশীল সমাজের একটি অংশ জঙ্গিবাদের উত্থানের পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণকে প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপর অংশ জঙ্গি তৎপরতার রাজনৈতিক কারণকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্যও দুই ধারায় বিভক্ত। একটি অংশ বিশেষতঃ ইসলাম ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমর্থক দলগুলোর মতে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের পেছনে আন্তর্জাতিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত রয়েছে। তারা চার দলীয় জোট সরকারকে (২০০১-২০০৬) অকার্যকর করার জন্য দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। অপরদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলো জঙ্গিবাদের উত্থানকে বিগত চার দলীয় সরকারের একটি অংশের যোগসাজস হিসাবে উল্লেখ করে বলেছে দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র বানানোর জন্য সরকারের একটি অংশ জঙ্গিবাদকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। এ ধারার দলগুলো বিগত চার দলীয় জোট সরকারকে অকার্যকর ও ব্যর্থ হিসেবে অভিহিত করেছে।

জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ডঃ মাহাবুব উল্লাহ বলেন সমাজে ধনী দরিদ্র বৈষম্য জঙ্গিবাদের জন্ম দেয়। বৈষম্য প্রকট হয়ে গেলে তা সমস্যা হয়ে যায়। বৈদেশিক কোন শক্তি সামাজিক বৈষম্য ব্যবহার করে ফায়দা নিতে পারে। সেন্টার ফর ডেমোক্র্যোসি আয়োজিত একই গোলটেবিল বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুরে এলাহী বলেন, দেশে ধনী দরিদ্র বৈষম্য বেড়ে গেছে। ন্যায় বিচার নেই। যে দলই ক্ষমতায় আসুক, সুশাসন না থাকলে এ ধরনের জঙ্গি আসতে থাকবে। বৈষম্যের কারণে গণতান্ত্রিক দেশ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস দুই সপ্তাহ জ্বলেছে। বাংলাদেশের জঙ্গিরা দেখছে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। কিন্তু তাদের কিছুই হচ্ছে না। ধনী দরিদ্র বৈষম্য দূর না হলে জঙ্গি দমন সম্ভব হবে না। নিরাপত্তা বিশ্লেষক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) সাখাওয়াত হোসাইনের মতে, বোমা হামলাকারিরা কোন না কোনভাবে বঞ্চিত বা নির্যাতিত হয়েছে।[৯] বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জিল্লুর

রহমান সিদ্দিকী জঙ্গিদের উত্থানের জন্য রাজনৈতিক ও আদর্শিক দিককে অন্যতম মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ইরানে শাহের পতনের পর ওদেশে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী শাসন প্রবর্তন এবং আফগানিস্তান থেকে রুশ উপস্থিতির উৎপাটন মৌলবাদীদের উৎসাহিত করে। আফগানিস্তানের মিশন সফলের পর যুদ্ধ ফেরত বাংলাদেশী মুজাহিদরা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এইচ.এম.এরশাদের শাসনামলে সহায়ক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেমে পড়ে। নির্দিষ্ট কিছু মাদ্রাসাকে তারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে।[১০] কারো কারো মতে, জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জঙ্গিরা উৎসাহ পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা জঙ্গি তৎপরতার জন্য জামায়াতকে প্রত্যক্ষ দায়ী করেননি। অনেকের মতে জেএমবি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদকে আর্থিক বা অন্য কোন প্রত্যক্ষ সাহায্য হয়তো দেয়নি জামায়াত। সরকারে থেকে এটি করাও হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামের নামে পরিকল্পিত জঙ্গিবাদকে পশ্রয় দেয়া বা তাদের দমনে অনান্তরিক থাকা জামায়াতের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।[১১] জঙ্গি উত্থানের পিছনে রাজনৈতিক কারণকে দায়ী করেন সুশীল সমাজের একটি অংশ। রাজনীতিকগণ তাদের নেতিবাচক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এ ধারণাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ অংশের মতে, শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সময় থেকে জঙ্গি তৎপরতা শুরু হয়। বিদেশের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টা আরম্ভ হয় এ সময় থেকেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন যখন আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশ সফর করেন তখন তাকে সরকারের পক্ষ থেকে একটি বই প্রদান করা হয়। যার নাম ছিল ডেমোক্র্যাসি ভার্সেস 'ফান্ডামেন্টালিজম'। তাতে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের (!) তথ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে তুলে ধরা হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে বুকলেট ইংরেজীতে 'টেররিজম ইন দ্যা নেইম অভ ইসলাম' নামে এবং আরবীতে 'আল এরহাব বে ইসমিল ইসলাম' সারা দুনিয়ায় প্রচার করা হয়।[১২]

মূলত বিএনপি, জামায়াতসহ ৪ দল জোটবদ্ধ নির্বাচন করায় ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে বেশি ভোট পেয়েও আসন কম পাওয়ায় সরকার গঠন করতে পারেনি। তদুপরি সংসদে তাদের সংখ্যাও পূর্বের নির্বাচন থেকে ভীষণভাবে হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবে আওয়ামী লীগ জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোর ওপর খুব ক্ষুব্ধ হয়। তাই সরকার গঠনের পর পরই আওয়ামী লীগ দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র এবং সরকারকে 'তালেবান সরকার' হিসেবে উল্লেখ করে দেশ বিদেশে অপপ্রচার শুরু করে। বিএনপি দলীয় এমপিদের দল ত্যাগ করিয়ে সরকার পতনের বহুল আলোচিত ৩০ এপ্রিলের (২০০৪) ট্রামকার্ডও ব্যর্থ হয়। এটি ব্যর্থ হওয়ার পর আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবীগণ দেশকে 'অকার্যকর রাষ্ট্র' প্রমাণ করার জন্য পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক লেখা লেখি করেন। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির অজুহাতে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীগণ সরকারকে অকার্যকর এবং ব্যর্থ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা

চালায়। প্রিন্টিং মিডিয়াগুলোর অধিকাংশই ৪ দলীয় সরকারের বিরোধী পক্ষে অবস্থান করায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় এলীট ফোর্স র‍্যাব (RAB–Rapid Action Battalion) গঠন করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে চেষ্টা করে। সরকারের কঠোর মনোভাবের কারণে সন্ত্রাসীরা আত্মগোপন করে, অনেকে বিদেশে পালিয়ে যায়। র‍্যাবের কার্যকর পদক্ষেপের দরুন যখন আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটে, মানুষের মধ্যে স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়, জনগণ র‍্যাবের কার্যক্রমের প্রশংসা করতে শুরু করে, সরকারের প্রতি জনগনের আস্থা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হতে থাকে তখন নতুন তত্ত্ব নিয়ে মাঠে নামলেন এন.জি.ও, বুদ্ধিজীবীর একটি অংশ এবং আওয়ামী বলয়ের রাজনৈতিক দলগুলো। তারা 'মানবাধিকার' 'আইনের শাসনের' কথা বলে চিহ্নিত ও মোষ্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারে পড়ে মৃত্যুকে চরম মানবাধিকার বিরোধী বলে দেশে-বিদেশে প্রচারণা চালাতে লাগলেন। র‍্যাবের কার্যক্রমের ফলে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক উন্নয়নে তারা খুশি হতে পারেননি। তাই তারা 'সন্ত্রাসীদের' মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলেন। বিদেশে গিয়েও রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা-নেত্রী সরকারের সন্ত্রাস দমনের পদক্ষেপকে 'মানবাধিকার হরণ' বলে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনে র‍্যাবের পদক্ষেপ সমূহ সে সময় জনগণের সমর্থন লাভ করে। র‍্যাবের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়। জনগনের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আজো 'র‍্যাব' বাংলাদেশের জনগনের আশা ভরসার অন্যতম আশ্রয়স্থল।[১৩] ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলা এবং তৎপরবর্তী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাস দমনের উপায় বের করার লক্ষ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৪ ডিসেম্বর (২০০৫) থেকে 'প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ' শুরু করেন। বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিসহ প্রধান বিরোধী দলগুলোকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আওয়ামী লীগ আমন্ত্রণপত্র গ্রহন করা থেকে বিরত থাকে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর এ সংলাপে ব্যবসায়ী, ডাক্তার, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ব্যতীত এরশাদের জাতীয় পার্টি, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাজনৈতিক দল সংলাপে যোগ দেয়। সবচেয়ে সাফল্যের দিক হলো সংলাপে ওলামা মাশায়েখদের প্রতিনিধি এক বাক্যে জঙ্গি তৎপরতার নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করে সন্ত্রাস দমনে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তারা ইসলামের নামে এ ধরনের ঘৃণ্য কাজকে ইসলাম, মানবতা, দেশ ও গণতন্ত্রের চরম বিরোধী বলে উল্লেখ করেন।[১৪] অন্যদিকে জঙ্গি তৎপরতার অন্যতম অগ্রনায়ক হরকাতুল জিহাদ এর প্রধান মুফতি হান্নান বলেন, ইসলাম বিরোধী কাজ বন্ধে বোমা হামলা চালায় হরকাতের জঙ্গিরা। আদালতে দেয়া মুফতি হান্নানের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে রমনার বটমূলে বাংলা নববর্ষ-শুরু অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, কোটালী পাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা পরিকল্পনা এবং যশোরে উদীচী অনুষ্ঠানের বোমা হামলার পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে অনৈসলামী কাজ

বন্ধ এবং আওয়ামী সরকারের সময় ফতোয়া নিষিদ্ধ করার কারণ উল্লেখ করেন।[১৫] যাত্রা অনুষ্ঠানসমূহে বোমা হামলার সিদ্ধান্তের কথা বলতে গিয়ে জেএমবি নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম (বাংলা ভাই) তার জবানবন্দিতে বলেন, "২০০৩ সালের শুরুতে চাপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত শুরার বৈঠকে সমাজে অশালীনতা ও অনৈসলামিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে করনীয় সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন যাত্রা প্যান্ডেলে ক্ষতি না হয় এরূপ ছোট বোমা বিস্ফোরনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে যাত্রা দেখতে অনুৎসাহিত করতে সিদ্ধান্ত গৃহীত"।[১৬] ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারাদেশে সিরিজ বোমা হামলার ব্যাপারে জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান গ্রেফতারের পর জবানবন্দিতে বলেন, "২০০৫ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত শুরার এক বৈঠকে ইতোপূর্বে দুইবার লীফলেট প্রচারণায় তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি বলে বিস্ফোরণের মাধ্যমে দেশব্যাপি লীফলেট বিতরণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক আকারে জেএমবির প্রচার প্রচারণা চালাতে উক্ত বৈঠকে ১৭ আগস্ট বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করা হয়"।[১৭] সর্বহারা নিধনের জন্যও জঙ্গি তৎপরতা প্রদর্শিত হতে দেখা যায়। এ প্রসংগে এক সাক্ষাৎকারে 'বাংলা ভাই' বলেনঃ

> "২০০৪ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে আমরা রাজশাহীর বাঘমারায় সর্বহারা নিধন অভিযান শুরু করি। তবে অনেক আগে থেকেই তথা ২০০১ সাল থেকে বাঘমারা এলাকায় দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় দাওয়াত প্রাপ্তদের কাছ থেকে সর্বহারাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের করুণ কাহিনী সম্পর্কে অবগত হই। দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সর্বদাই আমাদের কাছে এই বলে আর্জি করত, আগে ওই এলাকাকে সর্বহারা মুক্ত করুন। তারপর আপনাদের সব দাওয়াত মেনে নেব। আমি তখন থেকেই ওই এলাকায় সর্বহারা বিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মোটিভেশন শুরু করি। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চে সর্বহারারা আমদের কর্মী বেলালকে প্রচন্ড প্রহার করে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। এ ছাড়া অপর এক কর্মী ইব্রাহীমের বিবাহিতা বোনের সম্ভ্রমহানির উদ্দেশে তার বাড়িতে দল বেধে পরপর দুই রাত আক্রমণ চালায়। কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা ঘরের দরজা না খুলে ভেতর থেকে দা-ছুরি ইত্যাদি নিয়ে চিৎকার করলে তারা পিছু হটে। এ ছাড়া আম্মরসহ আমাদের বহু কর্মী সর্বহারাদের অত্যাচারে এবং হুমকির ভয়ে রাতে বাসায় অবস্থান করত না। এ সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কর্মীদের অনুরোধে আমরা বাঘমারায় সর্বহারা নিধন অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিই। এ ব্যাপারে ফেব্রুয়ারী বা মার্চে বাড্ডায় একটি শূরা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল"।[১৮]

ইসলামের নামধারী বাংলাদেশের জঙ্গিরা ইরান ও আফগানিস্তানের বিপ্লব এবং আল-কায়েদার আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যবিরোধী শক্ত অবস্থান ও কার্যক্রম থেকে উৎসাহ পেয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আহলে হাদীস ও কওমী মাদ্রাসার কিছু বিভ্রান্ত ছাত্র জঙ্গি কার্যক্রমে শরিক হয়। জামায়াত-শিবিরের প্রাক্তন গুটিকতেক কর্মী ও সমর্থক এ তৎপরতায় জড়িত বলে ধারণা করা হয়। তবে সামগ্রিকভাবে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত নয়। সাংগঠনিকভাবে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবির এবং আহলে হাদীসের জঙ্গি তৎপরতায় সংশ্লিষ্টতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জঙ্গিদের

ঘৃণ্য ও নৃশংস কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে জামায়াতের অবস্থান এ অধ্যায়ের পরের অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজশাহীর বাঘমারায় সর্বহারা নিধন অভিযানে পুলিশ কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল বলে বাংলা ভাইয়ের জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন। অভিযানের সময় বিএনপি'র কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনুর সাথে বাংলা ভাইয়ের ফোনালাপ হয়েছিল বলে জবানবন্দির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। সর্বহারা নিধন অভিযানের সময় জেএমবি'র কিছু অমানবিক কর্মকান্ডের কথা পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন বের হলে দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দাতাসংস্থা সহ রাজনৈতিক চাপে বিএনপি সরকার জঙ্গিদের ব্যাপারে কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সূত্র জানায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি'র সীনিয়র পাঁচ জন নেতা ও জামায়াতের একজন নেতার সঙ্গে বৈঠকের পর জঙ্গি দমনে সিদ্ধান্ত নেন।[১৯] সরকারের জঙ্গি বিরোধী অভিযান শুরুর পর জামায়াত এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মধ্যে টানাপড়েন পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গি দমন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, জেএমবি বা জেএমজেবি নিষিদ্ধের ক্ষেত্রে জামায়াতের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দের মনোভাব ছিল এ ব্যাপারে নেতিবাচক। তারা তথাকথিত ইসলামী জঙ্গি দমন প্রক্রিয়ার জন্য পরোক্ষভাবে জামায়াতকে দায়ী করেছেন। ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছেন– কওমী মাদ্রাসাগুলোর সাথে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। যখনই দেশে কোন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে, তখনই গোয়েন্দারা অস্ত্র অথবা প্রশিক্ষণ শিবিরের খোঁজ করে কওমী– মাদ্রাসাগুলোতে । কিন্তু আমরা যে কোন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী। এ পর্যন্ত সারা দেশে দেড়শ' কওমী মাদ্রাসায় পুলিশের গোয়েন্দারা তল্লাশী করে কিছুই পায়নি। সন্ত্রাসের কথা ওঠলেই গোয়েন্দারা কওমী মাদ্রাসা তল্লাশী করে কেন? কওমী মাদ্রাসায় না গিয়ে তাদের বরং জামায়াত শিবিরের অফিসে তল্লাশী চালানো উচিত।[২০]

ওপরের আলোচনায় এটি সুস্পষ্ট জঙ্গি তৎপরতার কারণ একমাত্রিক নয় বহুমাত্রিক। সামাজিক বৈষম্য, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, অজ্ঞতার সাথে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিও সমভাবে দায়ী। বাংলাদেশে জঙ্গি উত্থানের সাথে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলোর প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত না হলেও পরোক্ষভাবে যে এই জঙ্গি তৎপরতার পেছনে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠির সমর্থন এবং সহযোগিতা ছিল না, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কেননা তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সম্ভবনার দ্বারগুলোকে বন্ধ করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলো সদা তৎপর। আর তাদের কুটিল পরিকল্পলার ফাঁদে পা দিয়ে নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি ইসলামের নামে জঙ্গি তৎপরতা শুরু করে ইসলামের সুমহান আদর্শের ওপর কালিমা লেপনের আন্তর্জাতিক

চক্রান্তের শিকার হয়েছে। তবে জঙ্গি তৎপরতায় অংশগ্রহণকারী হরকাতুল জিহাদ, জেএমবি বা জেএমজেবি সংগঠন যতই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বা অনৈসলামিক কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য বোমাবাজি, আত্মহত্যার যে সকল ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছে, তা কোনভাবে ইসলাম অনুমোদন করেনা। ইসলামী আদর্শের সাথে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই। এদের ইসলামী জঙ্গি বা ইসলামী সন্ত্রাসী বলার পেছনে কোন যুক্তি থাকতে পারেনা। কেননা সন্ত্রাসীর পরিচয়- 'সে সন্ত্রাসী ' তার একটিই পরিচয় হওয়া উচিত। এটি সত্য যে, প্রায় সব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের নায়কদের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান কোন না কোন পরিচয় আছে। ধর্মনির্বিশেষে কিছু সন্ত্রাসীর দাবির সঙ্গে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা ও স্পিরিটের কোন মিল নেই। সুতরাং কোন সন্ত্রাসীর ধর্মবিশ্বাস যাই হোক তার ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য তাকে 'ইসলামী সন্ত্রাসী', 'ইহুদী সন্ত্রাসী', কিংবা 'খৃস্টান সন্ত্রাসী' বলা সমীচীন নয়।[২১]

ইসলাম ও জঙ্গিবাদ

ইসলাম হচ্ছে শান্তি, সম্প্রীতি ও প্রগতির ধর্ম, কিন্তু সাম্প্রতিককালে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের সংশ্লিষ্টতার কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আল কায়েদা[২২] সংগঠন মুসলিম জনগণের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলোর চরম সমালোচনায় লিপ্ত এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক জায়গায় আল কায়েদা সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। ৯/১১-এ টুইন টাওয়ার[২৩] ধবংস, লন্ডনের বোমা হামলার (৭ জুলাই, ২০০৫) সাথে আল কায়েদাকে যুক্ত করে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (War on Terror) পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও নিকট অতীতে জঙ্গি তৎপরতা পরিচালনাকারী আত্মস্বীকৃত সংগঠন জেএমবি তাদের লীফলেটের মাধ্যমে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেছে। আল্লাহর আইন মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনা করছেনা বলে বিচারক এবং আদালতে বোমা হামলা চালিয়েছে। আত্মঘাতি বোমাবাজদের সরল বিশ্বাস তাদের এ সকল কর্মকান্ড জিহাদের সমতুল্য এবং তারা মৃত্যুবরণ করলে শহীদ হবে। এ মৃত্যু তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।[২৪] কিন্তু ইসলামের সঠিক রূপ এবং শিক্ষা তাদের কাছে না থাকায় বিভ্রান্ত হয়ে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত এ সকল তরুণগণ ষড়যন্ত্রকারীদের অন্ধমায়াজালে আবদ্ধ হয়ে দেশ, জাতি এবং ইসলামের চরম ক্ষতি করছে। ইসলামের সুমহান আদর্শ এবং সুদীর্ঘ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, ইসলাম কখনো জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কোন নবী বা রাসুলই সমাজ পরিবর্তনের জন্য শক্তি প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করেননি। ইসলাম পরিবার, সমাজ, রাজনীতি এবং অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করে আসছে। ইসলামে কোন উগ্রবাদ বা চরমপন্থার সুযোগ নেই। এমনকি ইসলাম ধর্ম এর অনুসারীদের অন্য ধর্মের দেব-দেবীদের অসম্মান করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে তাদের তোমরা

কখনো গালি-গালাজ করোনা। নইলে বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে না জেনে আল্লাহ তায়ালাকেও তারা গালি দেবে। আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজ কার্যকলাপকে সুশোভন করেছি। অত:পর সবাইকে তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে। অত:পর তিনি তাদের বলে দেবেন তারা দুনিয়ার জীবনে কি করে এসেছে।[২৫]

ইসলাম সামগ্রিকভাবে একটি জীবনাদর্শ, পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার নাম। এই দ্বীন কোন সুনির্দিষ্ট যুগ বা সময়ের জন্য, কোন বিশেষ জাতি বা পরিবেশের জন্য পরিচিহ্নিত নয়। ইসলামের সর্বজনীনতা, সাম্য, সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা এবং সহনশীলতার কথা উল্লেখ করে জনৈক ইসলামী গবেষক অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিজের ভাষায় ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরে বলেন,

> এই দ্বীন (ইসলাম) সকল যুগের জন্য, সকল জাতির জন্য, অনন্তকালের জন্য। এই দ্বীন হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণের ধর্ম। দ্বীন, শান্তি ও মিলনের বাণীকে উজ্জ্বল করে তোলে, এ দ্বীন সহাবস্থান ও পারস্পরিক সংলাপ রচনার অবকাশ প্রদান করে। এ দ্বীন বিকিরণ করে স্বাধীনতার সুবিমল জ্যোতি, প্রতিষ্ঠিত করে সাম্য, সম্প্রচার করে ভ্রাতৃত্ববোধ। এ ধর্ম বিশ্বাস শিশুর অধিকার ও মর্যাদাকে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করে। এ দ্বীন সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করে শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের, প্রতিষ্ঠিত করে জীবনের প্রতিটি স্তরে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা। এই দ্বীন অজ্ঞানতার তমসা দূরীভূত করে সুশিক্ষার নির্মল আলোকেই প্রাধান্য প্রদান করে। এই ধর্ম বিশ্বাস জুলুম ও সন্ত্রাস, কলহ ও বিদ্বেষকে ঘৃণা করে। এ বিশ্বাস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, ধর্মে কোন বাধ্য বাধকতা নেই।[২৬]

ইসলাম সম্পর্কে অনেক অপপ্রচারএবং ভ্রান্তি রয়েছে যেমন– ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম অন্য ধর্মকে সহ্য করতে চায়না, ইসলাম মানুষকে অসহিষ্ণু করে তোলে ইত্যাদি। কিন্তু পবিত্র কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে– "লা ইকরাহা ফিদ্ দ্বীন" অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।[২৭]

ইসলাম যেমনিভাবে-এর বিশ্বাস এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আপস বা সমঝোতার কোন অনুমতি দেয়নি, তেমনি অন্য ধর্মের লোকদের জোরপূর্বক ইসরাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করার কোন হুকুম দেয়নি। পবিত্র কুরআনের ভাষায়: "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন" অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন তোমাদের কাছে, আমার দ্বীন আমার।[২৮] ইসলামের এ সকল আদর্শের কথা স্বাক্ষী দিয়ে গেছেন যুগে–যুগে মনীষীগণ। নিম্নে কয়েক জন বিখ্যাত মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরা হলো :[২৯]

শুয়োন ফিতজফ (Schuon Frithjof) তাঁর Understanding গ্রন্থে বলেন, যেটি এড়িয়ে যাওয়া হয় তা হল, "ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা উদ্বুদ্ধকরণই অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে"। এ.এস.ট্রিটন তাঁর 'ইসলাম' শিরোনামীয় গ্রন্থে অধিকতর বলিষ্ঠতার সঙ্গে স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, "এক হাতে তরবারি অন্য হাতে কুরআন নিয়ে অগ্রসরমান মুসলিম যোদ্ধার চিত্রটি সম্পূর্ণ রূপে

কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন," স্যামুয়েল সি.চ্যু তাঁর Crescent and the Rose গ্রন্থে দ্বিধাহীন চিত্তে উল্লেখ করেছেন, "আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইসলামের মানবতা মুখী মনন ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের সর্বোত্তম রূপই প্রেরণা যুগিয়েছে 'আহলুল কিতাবদের' অধিকতর সহনশীলতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে বিচার করার, যার কাছাকাছি কোন সহনশীলতা খ্রীষ্টান ইউরোপে ইহুদীর প্রতি, প্রোটেষ্টান্টদের জগতে ক্যাথলিকদের প্রতি কিংবা ক্যাথলিকদের জগতে প্রোটেষ্টান্টদের প্রতি ব্যবহারে আদৌ পরিলক্ষিত হয়নি। Message of Quran গ্রন্থে John Davenport-এর উক্তি সংক্ষিপ্ত হলেও অধিকতর অর্থবহ: ইসলাম কোনদিনও কোন ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেনি, কোনদিনও শুদ্ধাভিযান বা বিচারসভা (Inquisition) প্রতিষ্ঠা করেনি। সে তার ধর্ম উপস্থাপন করেছে, কোনদিনও জোর করে চাপিয়ে দেয়নি। এইচ.এ.আর গীব ও জে.এইচ. ক্রেমারস সম্পাদিত The Shorter Encyclopaedia of Islam-এ বলা হয়, ক্রুসেডের সময় পর্যন্তও অবিশ্বাসীদের প্রতি, বিশেষ করে আহলুল কিতাবদের প্রতি ইসলামের যে সহনশীলতা ছিল, তা সমসাময়িক খ্রীষ্টান জগতে কল্পনাও করা যায়না। সম্প্রীতি, সহ-অবস্থান, পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতায় গৌরবময় ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আজও দ্বীপ্যমান মহানবী (স:)-এর ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ'।

ইসলাম অন্যায়ভাবে নিরীহ কোন মানুষকে হত্যার অনুমোদন দেয়নি, ইসলামী শরীয়তে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ হচ্ছে, অন্যায় রক্তপাত ও নরহত্যা। শুধু তাই নয়, অন্যায়ভাবে মাত্র একজন মানুষকে হত্যা করাকে গোটা মানবজাতিকে হত্যার সমতূল্য ঘোষণা করেছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, কোন মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধবংসাত্মক কাজ করার শাস্তির বিধান ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো। আবার এমনিভাবে যদি একজনের প্রাণ রক্ষা করে সে যেন গোটা মানবজাতিকে বাঁচিয়ে দিল। এদের কাছে আমার রাসুলরা সুস্পষ্ট আইন নিয়ে এসেছিলেন, তারপরও তাদের অনেকেই এ জমিনের বুকে সীমা লংঘনকারী হিসেবে থেকে গেল।[৩০] এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, ইসলাম মানুষের জীবনকে কি পরিমাণ মূল্য দিয়েছে। নিকট অতীতে আল্লাহর এ সুস্পষ্ট বিধানকে লংঘন করে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিরা বেহেস্তে যেতে চেয়েছে। এর চেয়ে চরম বোকামী আর কি হতে পারে?

জঙ্গি তৎপরতা ও মূলধারার ইসলামী দলসমূহ

১৯৮৪-১৯৮৫ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী দেশে প্রথম জঙ্গি গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। হরকাতুল জিহাদের জঙ্গিরাই ২০০০ সালের ২১ জুলাই

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য জনসভায় যাওয়ার পথে দুটি ৭৬ কেজি বোমা পুঁতেছিল।[৩১] জঙ্গিদের তৎপরতা অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে ২০০৫ সালে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। ১৭ আগস্টের (২০০৫) সিরিজ বোমা হামলার পর দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে জঙ্গি তৎপরতার প্রসংগ আলোচিত হতে থাকে। ইতোপূর্বে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য চার দলীয় জোট সরকার ২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী জেএমবি এবং জেএমজেবি নামক দু'টি জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৩২] নিকট অতীতে সংঘটিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং জঙ্গিতৎপরতার সাথে বাংলাদেশের মূলধারার ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ জড়িত ছিল বলে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হয়েছে। বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের দরুন আত্মস্বীকৃত জঙ্গিঁ সংগঠন জেএমবি'র শীর্ষ ৬ নেতার গ্রেপ্তার, জবানবন্দি গ্রহণ, বিচার এবং ফাঁসির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে জঙ্গি তৎপরতার সাথে জেএমবি, জেএমজেবি, হরকাতুল জিহাদসহ গুটিকতেক ছোটদল ও গোষ্ঠী দায়ী ছিল যারা প্রকাশ্যে কখনও মূলধারার ইসলামী দল হিসেবে স্বীকৃত ছিলনা। অথচ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংলাপে অংশগ্রহণ না করার অন্যতম কারণ হিসেবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তখন বলা হয়েছে জামায়াত সরকারের সাথে থাকলে তারা সংলাপে যাবে না, বৈঠকে বসবেনা।

আওয়ামী লীগের এ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে তৎকালীন সরকারের সমাজকল্যাণমন্ত্রী ও জামায়াতের মহাসচিব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন, ১৯৯১ সালে নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর পক্ষে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমু সরকার গঠনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়ার জন্য মগবাজারস্থ আল ফালাহ ভবনে সুনির্দিষ্ট ৩ টি প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রস্তাবগুলো ছিল : আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিলে জামায়াতকে হিসেব মত মহিলা আসন দেয়া, মন্ত্রিত্ব–প্রতিমন্ত্রিত্ব দেয়া এবং জামায়াত চাইলে আওয়ামী লীগের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির মধ্যেও পরিবর্তন আনা যেতে পারে।[৩৩] জঙ্গি দমনে বিগত চারদলীয় জোট সরকার জঙ্গি গ্রেপ্তার, বিপুল পরিমাণ বোমা, গ্রেনেডসহ বোমা তৈরীর সরঞ্জমাদি উদ্ধার এবং জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক তছনছ করে দেয়। সরকার জঙ্গি দমনে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সুশীল সমাজের দাবির প্রেক্ষিতে সংলাপের ডাক দেয়। ২০০৫ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ শুরু হয়। ব্যবসায়ী, ডাক্তার, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ (১৪ দলীয় জোট ব্যতীত) প্রধানমন্ত্রীর সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। সবচেয়ে সাফল্যের দিক ছিল সংলাপে অংশগ্রহণ করে ওলামা-মাশায়েখ নেতৃবৃন্দ এক বাক্যে জঙ্গি তৎপরতার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে এ ধরনের ঘৃণ্য কাজকে ইসলাম মানবতা, দেশ ও গণতন্ত্রের চরম বিরোধী বলে উল্লেখ করেন। জঙ্গিদমনে তারা সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আলেম সমাজের নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। ইসলাম কখনো নিরীহ মানুষকে হত্যার অনুমোদন দেয়নি। সশস্ত্র বিপ্লবের

মাধ্যমে নয় বরং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র বৈধ পথ হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের সমর্থনের মাধ্যমে।

বোমা হামলা ও জঙ্গি তৎপরতার দমনের লক্ষ্যে সরকারি পদক্ষেপের প্রথম দিকে চারদলীয় জোটের দুই শরিক জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ঐক্যজোট তাদের কিছু মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক গ্রেপ্তার হওয়ায় জামায়াতকে সন্দেহ করেছিল। জোটের মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী মাদ্রাসায় তল্লাসী এবং ছাত্র–শিক্ষকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে জামায়াত শিবিরের অফিস তল্লাসীর ও দাবি করেছিলেন। কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক হচ্ছে ঐক্যজোটের মূল শক্তি। তাই তাদের গ্রেপ্তারকে ঐক্যজোট গুরুত্বের সাথে নেয়। কিন্তু গ্রেপ্তার ও তল্লাসী উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত না হয়ে পুলিশের 'রুটিন ওয়ার্ক' প্রমাণিত হওয়ায় এবং জামায়াতের দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে দু'দলের শীতল সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী ঐক্যজোটের সীনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খানকে সাংবাদিকগণ প্রশ্ন করেছিলেন, অনেকে মনে করে জামায়াত এ বোমা হামলা বা জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত, আপনি কি মনে করেন? জবাবে তিনি বলেন, যারা বলেছে তারা কিসের ভিত্তিতে বলেছে জানি না। এ ধরনের কোন প্রমাণ আছে বলে আমরা মনে করিনা।[৩৪]

সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে বাংলাদেশের পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাজনৈতিক দল সকলেই এক বাক্যে জঙ্গি তৎপরতাকে কুরআন-সুন্নাহ, মানবতা ও দেশের শত্রুট হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের দমনে সকলকে ঐকবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর আহবান জানান। উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম) মাদ্রাসার মহাপরিচালক ও বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহের অন্যতম পুরোধা আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, ইসলামের শত্রুটরাই পবিত্র ইসলামের নামে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পেছনে কলকাঠি নাড়ছে। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, সন্ত্রাসবাদকে ইসলাম কোন মতেই সমর্থন করেনা। নিরপরাধ যে কাউকে হত্যা ও আত্মঘাতি হামলা ইসলাম ধর্মে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতেও হিংসার পথ বেছে নেয়া ইসলাম সমর্থন করেনা।[৩৫] লক্ষনীয় ব্যাপার হচ্ছে, বিভ্রান্ত হয়ে এবং অন্ধ মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে কিছু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত তরুণ জেএমবির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তথাকথিত 'জিহাদে' অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে যেমন কওমী বা সরকারি মাদ্রাসার কিছু ছাত্র-শিক্ষক ছিল, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও ছিল। রিক্সাচালক, শ্রমিক, বাদাম বিক্রেতা সহ সমাজের নিঃস্ব ও অসহায় মানুষের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে জেএমবি তাদের মিশন চালিয়েছে। 'সুইসাইড স্কোয়াডের' বোমারুদের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী এবং জামায়াতের আমীর মাওলানা নিজামী দেশ, জনগণ, গণতন্ত্র ও ইসলামের শত্রুট হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, গত সরকারের আমল থেকে শুরু হওয়া 'বোমা সংস্কৃতির' সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। তিনি বলেন, বহি:শত্রুর আগ্রাসনের পথকে উন্মুক্ত ও সহজ করার লক্ষ্যে জেএমবির আত্মঘাতি সদস্যরা বোমা হামলা চালাচ্ছে।[৩৬] বাংলাদেশের ওলামা মাশায়েখদের মতে ইসলামের নাম ব্যবহার করে ষড়যন্ত্রকারীরা ইসলামের ধ্বংসের জন্য, ইসলামের সুমহান আদর্শের ওপর কালিমা লেপনের জন্য জঙ্গি তৎপরতার মত ঘৃণ্য কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গি দমন প্রক্রিয়ার প্রথম দিকে বিচ্ছিন্নভাবে কওমী মাদ্রাসার কতিপয় ছাত্র-শিক্ষক গ্রেপ্তার হলেও সামগ্রিকভাবে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড ঢাকায় জাতীয় সমাবেশের মাধ্যমে জঙ্গিদের সাথে তাদের কোন ধরনের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছে। তারা এ ধরনের অমানবিক কর্মকান্ডকে ইসলামের সুমহান ভাবমূর্তিকে ধবংস করার ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে।[৩৭] জঙ্গিদের সাথে বিদেশী ২/১টি গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগ এবং সম্পর্ক থাকার কথাও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ধৃত বোমারুদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া সূত্র অনুসরণ করে ইতোমধ্যে ইমাম বা আলেমের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা বিদেশী চরদের অধিকাংশই আটক হয়েছে বলে উল্লেখ করে এক পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে ১৯৮৮ সাল থেকে একটি বিদেশী গুপ্তচর সংস্থায় ১৬ হাজার বেতনভুক্ত কর্মচারী বাংলাদেশে নিযুক্ত রয়েছে।[৩৮] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং ১৪ দলের অন্যান্য শরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জঙ্গি তৎপরতার জন্য বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারকে দায়ী করা হয়েছে। তাদের মতে সরকারের একটি অংশ জেএমবির জঙ্গিদের সাথে সম্পৃক্ত। তারা জামায়াতকে সরকার থেকে বহিষ্কারের দাবিও জানিয়েছিল। জঙ্গি তৎপরতার সাথে জামায়াতের সম্পৃক্ততার কারণ হিসেবে তারা বলেছে, জামায়াত শিবিরের অনেক প্রাক্তন কর্মী জেএমবির সদস্য।

গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গিদের ৪০% জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত মর্মে অভিযোগ সম্বলিত এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আমীর সাংবাদিক সম্মেলনে তা মিথ্যে ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের অভিযোগ যারা উত্থাপন করেছেন, তাদেরই দায়িত্ব হচ্ছে অভিযোগ সত্য প্রমাণ করা। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, জামায়াতের একজন সক্রিয় কর্মীর নামও তারা বলতে পারবেনা।[৩৯] জঙ্গি তৎপরতার সাথে জামায়াতের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে জামায়াতের আমীর বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীর কোন নেতা-কর্মী জেএমবির ঘৃণ্য তৎপরতার সাথে জড়িত নয়। মাওলানা নিজামী বলেন, গ্রেপ্তারকৃত কিছু জঙ্গির সাথে জামায়াতের কর্মীদের দূরতম আত্মীয়তার সম্পর্ক আবিষ্কার করে জামায়াতের জঙ্গি কানেকশন প্রমাণ করার অপচেষ্টায় অনেকে সক্রিয়। অনেকের মতে, যদি তাই হয় তাহলে (২০০৫) সালের পৈশাচিক এবং মানবতাবিরোধী জঙ্গি হামলার মূলনায়ক জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও সংসদ সদস্য মির্জা আযমের আপন ভগ্নিপতি হওয়ায় এটা

বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট যে, জঙ্গিঁদের সাথে আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত এবং পরিকল্পনাকারী।[৪০] বাংলাদেশের মূলধারার ইসলামী দলসমূহ যে জঙ্গি তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত নয় তা গ্রেপ্তারের পর ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জেএমবি প্রধান আবদুর রহমান এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের জবানবন্দিই প্রমাণ বহন করে। তাদের জঙ্গিঁ কর্মকান্ডের সাথে কোন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দলের সম্পৃক্ততার কথা তারা বলেননি, বরং মূলধারার ইসলামী দলসমূহের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে তারা সঠিক মনে করেনি বলে তারা জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছে। বাংলা ভাইয়ের জবানবন্দিতে বলেন, 'ছাত্রজীবনে আমি ইসলামী বক্তা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর একজন বিশেষ ভক্ত ছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেশের জাতীয় রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব মেনে নেয়ার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর সমঝোতা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণে তাদের প্রতি আমি আনুগত্য হারিয়ে ফেলি।[৪১]

> জেএমবির প্রধান আবদুর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন "এছাড়া সৌদি আরবে থাকাকালীন মিশর ভিত্তিক মুসলিম ব্রাদারহুড (ইখওয়ানুল মুসলেমিন) সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। বিশ্বজুড়ে জিহাদী কর্মকান্ড পরিব্যাপ্ত হওয়ার কারণে বাংলাদেশেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে জিহাদকে বেছে নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশে ফিরে এসে জামায়াতে ইসলামীর কার্যপদ্ধতি তথা গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারিনি। তাই আমি নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশে ইসলামী আইন কায়েমের জন্য আলাদা জিহাদী সংগঠন তৈরীর পরিকল্পনা করি।"[৪২]

> বাংলাদেশের প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর আমীর এবং প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতার বিষয়ে দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য জাতির সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, আলেম, উলেমা, ইসলামী দল ও ধর্মভীরু মুসলমানদের সাথে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম পন্থীদের দোষারোপ করার জন্য ইসলামের ভাব মর্যাদা বিনষ্ট করার জন্য, ইসলামের নামধারী সংগঠনের ব্যানারে নাশকতামূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালিত করার কুটকৌশল কেউ গ্রহণ করতে পারেন বলে আমরা দৃঢ়তার সাথে মনে করি।[৪৩]

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় উদার মুসলিম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত। সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশের মুসলিম-হিন্দু, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রয়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে বেড়ে ওঠা জঙ্গি তৎপরতা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে অনেকটা ক্ষুন্ন করেছে। সুশীল সমাজের অনেকের মতে, এ ধরনের জঙ্গি কর্মকান্ডের সাথে আন্তর্জাতিক শক্তির হাত রয়েছে। তাদের ক্রিড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সহজ-সরল ধর্মবিশ্বাসী কিছু বিভ্রান্ত তরুণ। বেহেস্তে যাওয়ার মিথ্যে মায়াজালে আবদ্ধ করে তাদেরকে

আত্মঘাতি বোমারু হিসেবে ব্যবহার করছে। সবচেয়ে দু:খজনক হচ্ছে ইসলামের নামেই এ সকল কর্মকান্ড হচ্ছে। অথচ ইসলাম সুস্পষ্টভাবে সন্ত্রাস, উগ্রবাদ ও চরমপন্থাকে সমর্থন করেনা ইসলাম বরাবরই মধ্যমপন্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এতে ইসলাম সম্পর্কে দেশ বিদেশের সাধারণ মানুষের নিকট ইসলামের ইতিবাচক আদর্শ কলুষিত হচ্ছে। বিভ্রান্ত হচ্ছে মুসলিম জনগণ। এ জঙ্গিবাদের পেছনে যে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিহিত রয়েছে তা কিশোর-তরুণ বোমারুরা বুঝতে পারেনি। সুকৌশলে তাদের এ বিষয়ে বোঝার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। জঙ্গি তৎপরতার সাথে বিদেশী ২/১টি গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে বলেও পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। জঙ্গি তৎপরতার রাজনৈতিক দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অনেকে বিবেচনা করেছেন। বিশেষ করে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং তাদের অনুসারী ছোট বাম দলগুলো জঙ্গি দমনে সরকারের সহযোগিতার আহবানে সাড়া না দেয়ায় এবং জাতীয় সংলাপে অংশ না নেয়ায় অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। সরকারের জঙ্গি গ্রেপ্তার, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বোমা তৈরীর সরঞ্জমাদি উদ্ধারকে সংসদের তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রীর 'নাটক' হিসেবে অভিহিত করায় বিরোধী দলের সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। প্রধান বিরোধী দল জঙ্গি দমনে সরকারকে সহযোগিতা না করে বরং সরকারের পদত্যাগ দাবি করে আসছিল।

জঙ্গি দমনে চার দলীয় জোট সরকারের দৃঢ় অবস্থানের কারণে জাতি এবং দেশ ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। জঙ্গিরা ইসলামী আইন বাস্তবায়নের কথা বলায় প্রথম দিকে ইসলামপন্থী দল, ব্যক্তি, গোষ্ঠী এমনকি সরকারও বিব্রতবোধ করে। কিন্তু দিন যত অতিবাহিত হল ততই জঙ্গিদের স্বরূপ উম্মোচিত হতে লাগল। গ্রেফতারকৃত জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে লাগলো। সরকার এবং জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল এটি দেশের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের কৌশল মাত্র। এটি যে স্বয়ং ইসলামের বিরুদ্ধে ও একটি চক্রান্ত তাতে দেশের ইসলামী দলগুলো এবং ওলামা মাশায়েখ একমত পোষণ করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের আলেম সমাজের এতোটা ঐক্য আর কোন ইস্যুতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটি অবশ্যই সুদূঢ় প্রসারী প্রভাব রাখবে। ইসলামী দল ও নেতৃস্থানীয় আলেমদের ইসলামের নামে জঙ্গিদের মানবতা ও ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের প্রকাশ্য বিরোধিতা করায় মানসিক এবং নৈতিকভাবে জঙ্গিদের দুর্বল করে দেয়। তাৎক্ষণিক যার প্রমাণ পাওয়া যায় মাঠ পর্যায়ের জেএমবির নেতা কর্মীদের পলায়নপর প্রচেষ্টা এবং গ্রেপ্তারকৃত নেতা-কর্মীদের অনুশোচনা থেকে।

জঙ্গি দমনে সরকারের পদক্ষেপগুলো ছিল পরিপক্ক ও সূচিন্তিত। জঙ্গিদের কঠোর হস্তে দমনের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ছিল রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ। জাতীয় সংলাপের আয়োজন করে বিরোধী দলের সহযোগিতা চেয়ে সরকার গণতান্ত্রিক

মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। তাছাড়া জঙ্গি দমন ইস্যুতে সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং ওলামা মাশায়েখদের সম্পৃক্ততা সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে জঙ্গিদের কোণঠাসা করে তোলে। ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব এখনো বাংলাদেশের সমাজে সক্রিয়। বিবিসির সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়– এ দেশের ৮০ ভাগ মানুষ ধর্মীয় নেতা, ৭৮ ভাগ মানুষ ধর্মীয় পন্ডিত এবং ২৮ ভাগ মানুষ রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করে।[৪৪]

প্রধান বিরোধী দলের অসহযোগিতা সত্ত্বেও বিগত চার দলীয় জোট সরকার ওলামা-মাশায়েখ এবং ইসলামী দলগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করে কঠোর ভাবে জঙ্গি দমন করে। সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছার কারণে অল্পসময়ের মধ্যে জঙ্গিদের অস্ত্র ও গোলা বারুদের আস্তানাগুলো ধবংস করে দেয়া হয়, আঞ্চলিক, বিভাগীয় পর্যায়ের কমান্ডারদের গ্রেফতার করে মাঠ পর্যায়ের নেটওয়ার্ক প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়। ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলার কিছুদিনের মধ্যে সামরিক কমান্ডার আতাউর রহমান সানি, (১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫) শুরা সদস্য আবদুল আউয়ালসহ (১৮ নভেম্বর, ২০০৫) কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই ধরা পড়ে। সর্বশেষ ২০০৬ সারের ২ মার্চ এবং ৬ মার্চ গ্রেফতার হন যথাক্রমে জেএমবির প্রধান শায়খ আবদুর রহমান এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড সিদ্দিকুল ইসলাম (বাংলা ভাই)। চারদলীয় জোট সরকার জঙ্গিদের বিচারকার্য শুরু করে। ২০০৬ সালের ২৬ মার্চ জেএমবির ৮ নেতার বিরুদ্ধে ঝালকাঠির দুই বিচারককে হত্যার ঘটনায় চার্জশিট দেয়া হয়। ২৯ মে, ২০০৬ ঝালকাঠির আদালতে ১ পলাতক আসামীসহ ৭ জনের মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে ২৯ মার্চ, ২০০৭ রাত পৌণে বারটায় জেএমবির ৬ শীর্ষ জঙ্গির একযোগে ফাঁসির মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। নিম্নে বহুল আলোচিত ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলার পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গি তৎপরতা ও জঙ্গি দমনের (বিচার প্রক্রিয়া) একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনাক্রম উল্লেখ করা হলো:

১৭ আগস্ট (২০০৫) : দেশ জুড়ে ৬৩ জেলায় ৫ শতাধিক বোমা বিস্ফোশুরু

৩ অক্টোবর : চট্টগ্রাম, লক্ষীপুর ও চাঁদপুরের আদালতে বোমা হামলা

১৮ অক্টোবর : সিলেটে বোমা হামলায় এক বিচারক আহত

১৪ নভেম্বর : ঝালকাঠিতে আত্মঘাতি বোমা হামলায় দুই বিচারক নিহত

১৭ নভেম্বর : ঠাকুরগাঁয়ে আবদুল আউয়াল গ্রেফতার

২৯ নভেম্বর : একই সময়ে গাজীপুর ও চট্টগ্রামে আত্মঘাতি বোমা হামলা

১ ডিসেম্বর : গাজীপুর ডিসি অফিসের গেটে আত্মঘাতি বোমা হামলা

৪ ডিসেম্বর : টাঙ্গাইলে জঙ্গি-পুলিশ বন্দুকযুদ্ধ

৮ ডিসেম্বর : নেত্রকোনায় আত্মঘাতি বোমা হামলা

১৩ ডিসেম্বর : ঢাকায় আতাউর রহমান সানি গ্রেফতার

১৮ ডিসেম্বর : ময়মনসিংহে জঙ্গি - র‍্যাব বন্দুকযুদ্ধ

২ মার্চ (২০০৬) : সিলেটে শায়খ আবদুর রহমান গ্রেফতার

৬ মার্চ : ময়মনসিংহে বাংলা ভাই গ্রেফতার

১৯ মার্চ : রাজধানীর ডেমরায় খালেদ সাইফুল্লাহ গ্রেফতার

২৬ মার্চ : ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল

২৭ এপ্রিল : ঝালকাঠির আদালতে বিচার শুরু

২৯ মে : ঝালকাঠির আদালতে এক পলাতক আসামিসহ ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

৩১ আগস্ট : হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন

২৮ নভেম্বর : সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে মৃত্যুদন্ডের রায় বহাল

৫ মার্চ (২০০৭) : জঙ্গিদের প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নাকচ

২৯ মার্চ : দেশের চার কারাগারে ৬ জঙ্গির ফাঁসি কার্যকর[৪৫]

৬ শীর্ষ জঙ্গি যাদের ফাঁসি কার্যকর হয় তারা হলো :

১. শায়খ আবদুর রহমান– জেএমবি প্রধান
২. সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই– সেকেন্ড ইন কমান্ড
৩. আতাউর রহমান সানি– সামরিক কমান্ডার
৪. খালিদ সাইফুল্লাহ– শূরা সদস্য
৫. আবদুল আউয়াল– শুরা সদস্য ও আবদুর রহমানের জামাতা
৬. ইফতেখার আল মামুন– ঝালকাঠিতে বিচারকদের ওপর হামলাকারী আত্মঘাতি বোমারু[৪৬]

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জঙ্গি তৎপরতা অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সরকার র‍্যাবসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে জঙ্গি দমনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যচ্ছে। তবে বাংলাদেশের জঙ্গিদের আর্ন্তজাতিক কানেকশন এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। জঙ্গি ইস্যুতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো দুই শিবিরে বিভক্ত। উভয়ই জঙ্গি তৎপরতার জন্য একে অপরকে দায়ী করে আসছে। তবে জঙ্গি তৎপরতার সাথে মূলধারার ইসলামী সংগঠনসমূহের সম্পৃক্ততার কোন প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোটসহ কয়েকটি ইসলামী দলকে দায়ী করতে চাইলেও তা প্রমাণিত হয়নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, বাংলাদেশের সকল ইসলামী দল (প্রকাশ্যে তৎপরতা প্রদর্শনকারী) এবং ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে ইসলামের নামে সকল প্রকার জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ প্রতিবাদ ও ঘৃণা প্রকাশ করা

হয়েছে। এ সকল ঘৃণ্য কর্মকান্ডের সাথে ইসলামের এবং সাংগঠনিকভাবে তাদের দূরতম কোন সম্পর্ক না থাকার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে ইসলামী দলসমূহ।

মূলধারার ইসলামী দলগুলোর সাথে জঙ্গি সংগঠনসমূহের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক না থাকলেও অনেকের মতে জঙ্গি সংগঠনগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী দলগুলোর একটি অংশের পরোক্ষ সমর্থন পেয়ে আসছে। তাছাড়া নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি'র শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অনেকে অতীতে মূলধারার ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর কোন কোনটির সাথে সম্পৃক্ত ছিল বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে ইসলামের নামে সংঘটিত জঙ্গি তৎপরতা বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির উপর যে কালিমা লেপন করেছে তা ভবিষ্যতে ইসলামী দলগুলোর স্বাভাবিক কর্মতৎপরাতার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি জঙ্গি কর্মকান্ডের কারণে ইসলামের সুমহান আদর্শ এবং এর শান্তিপূর্ণ আহ্বান সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ বা ভিন্ন ধর্মালম্বীদের নিকট প্রশ্নবোধক হিসেবে দেখা দিবে। ইসলামের নামে এ সকল জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই মারত্মক ক্ষতি করেছে।

তথ্য সংকেত ও টীকা

১। *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

২। বিস্তারিত, ড. হাসান মোহাম্মদ, *বাংলার সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন*, রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৪ ,পৃ.৪৫-৬৯

৩। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৬ আগষ্ট, ২০০৫

৪। *পূর্বোক্ত*

৫। *পূর্বোক্ত*

৬। গবেষক কতৃক বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ও সারণিকৃত

৭। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৯ ডিসেম্বর, ২০০৫

৮। *দৈনিক যুগান্তর*, *প্রথম আলো*, ১৭ মার্চ, ২০০৯

৯। *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৫ আগষ্ট, ২০০৫

১০। *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ লা ডিসেম্বর, ২০০৫

১১। *পূর্বোক্ত*

১২। *সাংবাদিক সম্মেলন*, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, শিল্পমন্ত্রী, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রশ্নোত্তর পর্ব, ২০আগস্ট, ২০০৫

১৩। মো: এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, জঙ্গি তৎপরতা ও বাংলাদেশের রাজনীতির সাম্প্রতিক ধারা, *শিক্ষক সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*, ৩য় সংখ্যা, ২০০৬ , পৃ .৩১-৩২

১৪। *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫-৩৬

১৫। *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

১৬। *দৈনিক প্রথম আলোয়* প্রকাশিত বাংলা ভাইয়ের জবানবন্দির উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে, ১৯-২০ আগষ্ট, ২০০৭

১৭। *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত আবদুর রহমানের জবানবন্দির ভিত্তিতে রচিত প্রতিবেদন, ১৭ও ১৮ আগষ্ট, ২০০৭

১৮। বাংলা ভাইয়ের জবানবন্দি, *পূর্বোক্ত*

১৯। *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ৯ মার্চ, ২০০৫

২০। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪

২১। *দৈনিক আমার দেশ*, ২৯ জানুয়ারী, ২০০৮

২২। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আল কায়েদা এবং এর প্রধান স্থপতি ওসামা বিন লাদেন (লাদেন) সারাবিশ্বে ব্যাপক আলোচিত হয়ে আসছে। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আল কায়েদা এবং লাদেনকে সন্দেহ করা হয়। আমেরিকাসহ পশ্চিমা মিডিয়ার ব্যাপক প্রচাণ্ডরুার ফলে আল কায়েদা আজ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে পরিচিত। কিন্তু আল কায়েদা সংগঠনের পরিচিতি এবং সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। আল কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেন ১৯৫৭ সালে সৌদি আরবের এক বিলিয়নার ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ বিন লাদেনের সাথে রাজপরিবারের যোগাযোগ ছিল। জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাদেন এন্‌জিনীয়ারিং বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৮০ সালে রাশিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লাদেন আফগানিস্থান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সৌদি আরবে মার্কিন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করলে লাদেন এর বিরোধিতা করেন। পরবর্তিতে লাদেন সুদান গমন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ইসলামী গ্রুপকে সংঘটিত করে ট্রেনিং প্রদান শুরু

করেন। ১৯৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কের বিশ্ব ব্যবসায় কেন্দ্রে হামলা, ১৯৯৩ সালে ৩রা অক্টোবর মোগাদিসুতে হামলা চালিয়ে ১৮ মার্কিন মেরিন সেনা হত্যা, ১৯৯৬ সালে সৌদি আরবে মাকিন ঘাঁটি 'কোবরায়' হামলায় ১৯ জন নিহত হওয়াসহ আরো কয়েকটি স্থানে হামলার জন্য আল কায়েদা এবং লাদেনকে দায়ী করা হয়। আন্তর্জাতিক গোষ্ঠির চাপের মুখে লাদেন সুদান ত্যাগ করে ১৯৯৬ সালে আফগানিস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আফগানিস্থানের তালেবান সরকার তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহন করে। কিন্তু ৯/১১ এর দুর্ঘটনার পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জর্জ বুশ আফগানিস্তান আক্রমন করে। ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সূত্রঃ Dr.Nazrul Islam, *Islam, 9/11 and Global Terrorism, A Study of Perceptions and Solution,* Viva Books Private Limited, New Delhi,2005, pp.27-30

২৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ইয়র্ক শহরে টুইন টাওয়ার অবস্থিত ছিল। ১৯৭৩ সালে ১১০ তলাবিশিষ্ট টাওয়ারটি নির্মাণ করা হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পরপর দু'টি বিমান হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে পড়ে। টুইন টাওয়ার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নামে খ্যাত ছিল।

২৪। মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

২৫। *আল কুরআন*, সুরা আন'আম, আয়াতঃ ১০৮

২৬। *স্মরনিকা*, (রিজিয়নাল সেমিনার), সিএনআরএস, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০৫, পৃ. ৩৫

২৭। *আল কুরআন*, সুরা বাকারাহ, আয়াতঃ ২৫৬

২৮। *আল কুরআন*, সুরা কাফিরুন, আয়াতঃ ৬

২৯। দেখুন, *স্মরনিকা*, সিএনআরএস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৩০। *আল কুরআন*, সুরা আল মায়েদা, আয়াত নং-৩২

৩১। *দৈনিক সমকাল*, ৩১ মার্চ, ২০০৭

৩২। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৬ আগষ্ট, ২০০৫

৩৩। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৫

৩৪। *পূর্বোক্ত*, ৪ ডিসেম্বর, ২০০৫

৩৫। *পূর্বোক্ত*, ৮ মার্চ, ২০০৮

৩৬। *The Dhaka Courier*, 2 December, 2005

৩৭। মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৩৮। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২১ ডিসেম্বর, ২০০৫

৩৯। *The Dhaka Courier, op.cit*

৪০। মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

১। দেখুন, বাংলা ভাইয়ের জবানবন্দীর ভিত্তিতে *দৈনিক প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদন, ১৯-২০ আগস্ট, ২০০৭

। *পূর্বোক্ত*

১। মতিউর রহমান নিজামীর *সাংবাদিক সম্মেলনের* (২০ ডিসেম্বর, ২০০৫) *বক্তব্য* থেকে উদ্ধৃত

। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৫

। *দৈনিক সমকাল*, ৩১ মার্চ, ২০০৭

৬। *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৩১ মার্চ, ২০০৭

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি: সমস্যা ও সম্ভাবনা

১৯৭১-২০০০ সময়কালে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত সার্বিক বিচারে ইসলামী রাজনীতির অবস্থান ক্রমাগত সুসংহত হয়েছে। ইসলামী রাজনীতির পুনরুত্থানের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বহি:স্থ দু'ধরনের কারণকে দায়ী করা হয়। ইসলামী রাজনীতির পুনরুত্থানের প্রধান কয়েকটি কারণ ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ইসলামী দলগুলো বর্তমান পর্যায়ে উপনিত হয়েছে। বর্তমানেও তাদেরকে অনেক সমস্যার মধ্যে কর্মতৎপরতা চালাতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী মুজিব সরকার ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন। যদিও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এ ধরণের কোন বক্তব্য ছিলনা।[১] প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান সৃষ্টির নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগের অসন্তুষ্ট গ্রুপের দ্বারা সৃষ্ট আওয়ামী মুসলিম লীগ বামপন্থীদের চাপে ও সংখ্যালঘুদের ভোট আদায়ের জন্য মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে।[২] স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আল্লাহু আকবারের পরিবর্তে 'জয় বাংলা' শ্লোগান ব্যবহার শুরু হয়। হিন্দুদের 'জয় মা কালী', 'দুর্গা মায় কি জয়', জয় হিন্দ প্রভৃতি শব্দের মত শ্রুত 'জয় বাংলা', ব্যবহার জনগণের মধ্যে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হয়। মুজিব সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন ১৯৭২ সালের সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' না রাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'রাব্বি জিদনী ইলমা' বাদ দেয়া, 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল', এবং 'ফজলুল হক মুসলিম হল, এবং 'জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করা, 'কবি নজরুল ইসলাম কলেজকে 'ইসলাম' শব্দ-বাদ দিয়ে কবি নজরুল কলেজ নামকরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি স্থাপন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ধর্মহীনতার আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐতিহাসিক এবং বিভিন্ন কারণে এ দেশের জনগণের মধ্যে ভারত বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্ট। স্বাধীনতার পর এ মনোভাব তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাই জনগণের ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্টের সাথে ধর্মনিরপেক্ষ কার্যক্রম যুক্ত হওয়ায় মুজিব সরকারকে একাধারে ইসলাম বিরোধী এবং ভারতপন্থী সেকিউল্যার সরকার হিসেবে অভিহিত করা শুরু হয়। তাই মুজিব সরকার মুসলিম জনগণের বিক্ষোভকে প্রশমিত

করার লক্ষ্যে 'সকল ধর্মের প্রতি সরকারি সুযোগের সমতার নীতি' অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দান করেন।[৩]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করলেও ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে 'বৈরী সম্পর্ক' সব সময় বিদ্যমান ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ রদ, পাকিস্তান সৃষ্টি, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, অত:পর বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর ফারাক্কা, তালপট্টি, সীমান্ত সংঘর্ষ, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ-ভারতের জনগণ পরস্পরকে 'মিত্র' হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালীন ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকশ' বলেছেন, বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী।[৪] মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়া এবং সহযোগিতার পেছনে ভারতের স্বার্থ ছিল।[৫] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সকল ইসলামী দল যে সকল কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তার মধ্যে ভারতভীতি অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৬] এক দিকে মুজিব সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ কার্যক্রম অপর দিকে 'ভারতপন্থী' সরকার হিসেবে প্রচারণার দরুন জনগণের মধ্যে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ তীব্রতর হতে থাকে। জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করে মুজিব সরকার নিজেদের ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাংলাদেশের জনগণের মুসলিম জাতি সত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভারতের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ বৈঠকে যোগদান করেন। মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মিশর, কুয়েতসহ কয়েকটি মুসলিম দেশ সফর করেন। মাদ্রাসা-শিক্ষার বাজেট বৃদ্ধিসহ ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭৩ সালে মাদ্রাসা বাজেট ২,৫০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭২,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয় যা বিগত বছরের তুলনায় বহুগুণ ছিল।[৭] জনগণের ভারতবিরোধী মনোভাব এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বিরুদ্ধ অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ইসলাম ও চীনপন্থী সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে তার রাজনৈতিক দর্শন পুনর্নির্ধারিত করেন। জনগণের দিল্লী-মস্কো বিরোধী জনমতের বহি:প্রকাশ হয় ইসলামপন্থী প্রবণতার মাধ্যমে। ভারতের সাথে অবনতিশীল সম্পর্কের সমান্তরালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী ভাবধারা বেশ শক্তি সঞ্চয় করে।[৮] স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজের বিরোধী ভূমিকারও অন্যতম কারণ ছিল বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি ভারতের সহযোগিতা ও সমর্থন।[৯]

ইসলামী রাজনীতির পুনরুত্থানের কারণসমূহ

নেতৃত্বের বৈধতার সংকট নিরসনে তৃতীয় বিশ্বের শাসক গোষ্ঠির একটি অংশ প্রায়ই ধর্মকে ব্যবহার করে থাকেন। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতি অস্থিতিশীল ও প্রতিনিধিত্বহীন। নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে এ সকল রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। শাসক শ্রেণী নিজেদের বৈধতার জন্য ধর্মকে রাজনৈতিকস্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের (মুজিব আমল) শেষ পর্যায় থেকে ধর্মকে রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রবণতা শুরু হয়। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে সীমিত পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসন পালন করলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হলে সংসদে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস করা হবে না। '৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমানের আমলে ইসলামী রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাঁর বৈধতার সংকট নিরসনে ইসলামকে 'রাষ্ট্র ধর্ম' হিসেবে ঘোষণা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের সমর্থন পাবার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য তিনি তাতে সফল হতে পারেননি। জিয়ার আমল থেকে ইসলামী রাজনীতির যে পুনরুজ্জীবন ঘটতে শুরু করে, এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সময় তা অনেক বেশি শক্তিশালীও সুসংহত হয় ।

সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের অনেকে বাংলাদেশের মৌলবাদী রাজনীতির উত্থানকে সংকটাপন্ন বুর্জোয়া রাজনীতির ফল হিসেবে অভিহিত করেছেন। বুর্জোয়া রাজনীতির সংকট উত্তরণে সমাজতন্ত্রীদের মতাদর্শিক দুর্বলতারও তারা সমালোচনা করেছেন।[১০] সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত দূর্বলতার উল্লেখ করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ বলেন, মার্কসবাদ-লেলিনবাদ, যা বস্তবাদী দর্শনের একটি রূপ, গ্রহণকারী কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় দানকারী দলও ধর্মকে মুক্তির পথ হিসেবে বর্ণনা করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাম দল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্রের উল্লেখ করে বলেন, সিপিবি ইসলামকে ন্যায় ও সাম্যের ধর্ম হিসেবে বর্ণনা করে ওটার সঠিক ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির উত্থানের পেছনে শেখ মুজিবের ১৯৭৩ সালের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্ত আইনকেও 'General Clemency Act 1973' দায়ী করা হয়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর সদস্যরা এবং ইসলামী দলগুলোর প্রায় সকল নেতা-কর্মী মুক্তি পেয়ে যায়। পরবর্তীতে ইসলামী দলগুলোর মুক্তিপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[১১]

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির পুনরুত্থানকে বহি:স্থ কারণের সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী দলের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ, তেলসমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রের পেট্রোডলার এর ঋণপ্রবাহ,

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি রাষ্ট্রে প্রচুর জনশক্তির বাজার সৃষ্টি, বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিরীহ মুসলিম জনগোষ্ঠির ওপর অমানবিক জুলুম-নিপীড়ন বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে বেগবান করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির পুনরুত্থানকে অনেক গবেষক বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করছেন। ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন ইসলামী ইতিহাসের গতিধারার একটি স্থায়ী প্রপঞ্চ (Phenomenon)। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইসলামের পুনরুজ্জীবন বিশ্বের চিন্তাশীল লোকদের মনে নাড়া দেয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৬০ সালের মধ্যে অনেকগুলো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। 'মুসলিম বিশ্ব' হিসেবে একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আদর্শিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের নিকট আরব রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় মুসলিম বিশ্বকে ভাবিয়ে তোলে। সে পরাজয়ের জন্য তারা ইসরাইলের পক্ষ নেয়ার জন্য পশ্চিমা বিশ্বকে দোষারোপ করলেও নিজেদের দুর্বলতাই প্রধান ছিল। তাদের আত্মোপলব্ধি ঘটে যে, ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক নীতিমালার প্রতি মুসলিম উম্মাহর ঔদাসীন্যই তাদের পরাজয়ের মূল কারণ। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলামী নিয়ম নীতি মেনে চলা উচিত। কারণ ইসলাম শুধুমাত্র কিছু আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়-বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নির্দেশিকা প্রদানকারী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম হচ্ছে ইসলাম।[১২]

আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর মুসলিম রাষ্ট্রের সম্মিলিত ফোরাম 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধে তুলনামূলক ভাল অবস্থান মুসলিম উম্মাহকে নৈতিকভাবে উজ্জীবিত করে। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তেল উৎপাদনকারী সংস্থা 'ওপেক' (OPEC) তেলের মূল্য বৃদ্ধি করার ফলে তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কুয়েত, আরব-আমিরাতসহ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র এ সময় অন্যান্য অনুন্নত মুসলিম দেশের ইসলামী আন্দোলনকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে। তাছাড়া মধ্য প্রাচ্যের দেশ সমূহে শ্রমের বিশাল বাজার সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন মুসলিম দেশের জনশক্তি নিয়োগ লাভ করে। তাদের অনেকে নিজ দেশের ইসলামপন্থীদের অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে।[১৩] পাশ্চাত্য পন্ডিতদের অনেকে স্নায়ুযুদ্ধ উত্তর সময়ে পশ্চিমা উদার গণতান্ত্রিক আদর্শের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইসলামকে আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করেন।[১৪] মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী আন্দোলন ক্রমবর্ধমানভাবে শক্তিশালী হওয়ার পেছনে কেউ কেউ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং নেতৃত্বকে দায়ী করেন। তাদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রায়নের ফলে ইসলামী দলগুলো বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে উৎসাহবোধ করবে। তারা গণতন্ত্রায়ন এবং শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের নীতি গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে উৎসাহ ও চাপ প্রদানের জন্য পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি আহবান জানান।[১৫]

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইসলামী দলগুলো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রের 'রাজনৈতিক শক্তি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব, আফগানিস্তানের ইসলামপন্থীদের কোয়ালিশন সরকার এবং পরবর্তীতে 'তালেবান' সরকার প্রতিষ্ঠা, তুরস্কে ইসলামী দলের ক্ষমতা লাভ, পাকিস্তানের জিয়াউল হক সরকারের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া এবং তাতে ইসলামী দলগুলোর অংশগ্রহণ, সুদানে ইসলামী শরীয়াহ চালু বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনসমূহ বিশেষ করে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে নৈতিকভাবে উজ্জীবিত করে তোলে। তাছাড়া মালয়েশিয়া, জর্দান, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, মিশর, সিরিয়া, কুয়েত, মরোক্কোয় ইসলামী দলগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে। নব্বই এর দশকে আলজেরিয়ায় ইসলামী সালভেশন ফ্রন্ট নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও পশ্চিমা মদদপুষ্ট সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। ইসলামী বিশ্বের দেশসমূহের উপরোক্ত ঘটনাবলী বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোকে আরো সক্রিয় হতে অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া নির্যাতিত মুসলিম জনপদ বিশেষ করে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আরাকান, কসোভো, জি; জিয়াং, চেচনিয়া, এবং বৃহত্তর ককেশাস অঞ্চলের নিরীহ-নিরস্ত্র মুসলমানদের আত্ম সংগ্রামের গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা অধিকতর সংগ্রামে ঝুঁকে পড়ার উদ্দীপনা লাভ করে।[১৬]

বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের মতে বাংলাদেশের ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপের সাথে ইসলামী প্রচার কার্যক্রমে (Islamic missionary activities) পশ্চিম এশীয় তেলসমৃদ্ধ-মুসলিম দেশসমূহের উদার অর্থনৈতিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর মতে, অভ্যন্তরীণভাবে দলসমূহের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞাও ইসলামী তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে শান্তির খোজে ইসলামী আদর্শের দিকে সাধারণ মানুষ ঝুঁকে পড়ে।[১৭] আশির দশকে ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং নব্বইর দশকে আফগানিস্তানে তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের তরুণ এবং আলেম সমাজকে ইসলামী রাজনীতির পথে অগ্রসর হতে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। সৌদি আরব, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ইসলামী দাওয়াত কার্যক্রমে বিপুল পরিমাণ অর্থদান ধর্মীয় রাজনীতির উত্থানের কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন। এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়, ৫ বছরে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ০.৬ ভাগ। জাতীয় ক্ষেত্রে এই হার হচ্ছে শতকরা ০.৪ ভাগ। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ২০.০৩ ভাগ।[১৮] এছাড়া আশির দশকে সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া দূতাবাস বাংলাদেশের আলেম সমাজকে তাদের নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে রাখার জন্য নেতৃস্থানীয় আলেমদের মাসিক ভাতাও প্রদান করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের জনশক্তির বাজার সৃষ্টিও প্রকারান্তরে ইসলামী দলগুলো লাভবান হয়েছে। বিদেশী শ্রমিকদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা জাতীয় আয়ের

উল্লেখযোগ্য অংশ হওয়ায় সরকার অন্তত অর্থনৈতিক স্বার্থে মুসলিম বিশ্বের নিকট বাংলাদেশের ইসলামী ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, যা পরোক্ষভাবে ইসলামী শক্তির সমর্থন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের জনশক্তির অনেকে ব্যক্তিগতভাবেও ইসলামী আন্দোলনকে আর্থিক সহযোগিতা করেছে যাতে প্রত্যক্ষভাবে ইসলামী রাজনীতি উপকৃত হয়েছে। বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশে মৌলবাদী প্রবণতার কারণ বলতে গিয়ে উল্লেখ করে, অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান মৌলবাদের প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে একের পর এক অবৈধ সরকারের ইসলামী শ্লোগানের আবরনে বৈধতাঅন্বেষণ। প্রাধান বহি:স্থ কারণ হিসেবে সক্রিয় পেট্রো-ডলারের প্রভাব।[১৯]

ওপরের অভ্যন্তরীণ এবং বহি:স্থ কারণগুলোর সাথে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধির প্রধান কাণ্ডরু হিসেবে ইসলামের অন্তনিহিত আদর্শিক শক্তিকে উল্লেখ করা যায়। কারণ, যুগে যুগে ইসলামের উত্থানের-পতনের প্রেক্ষাপটে যখনি মুসলমানরা তাদের আদর্শের উৎস কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে এসেছে তখনি তাদের পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। অতএব বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির উত্থানকেও ইসলামের ইতিহাসের গতিময় বৈশিষ্ট্যের আলোকেই বিবেচনা করতে হবে। তবে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং কারণগুলোকেও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ওগুলো ইসলামী রাজনীতির নেতা-কর্মীদের মানসিক এবং নৈতিক সাহস যুগিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ইতিবাচক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ইসলামী আদর্শ দ্রুততার সাথে শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর পুন:জাগরণের প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ এবং বহি:স্থ কারণগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ:

ক. গতানুগতিক সমাজ কাঠামো ও সামাজিক আন্তক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট রাজনৈতিক আধুনিকতার সংকট।

খ. সুপ্ত এবং জাগ্রত সামাজিক চেতনা ও সৃষ্টি (Latent and manifested Social force and Social structure) বিবেচনায় অপরিপক্ক সেকিউল্যার রাজনৈতিক এলীটদের দূরদৃষ্টিহীনতা।

গ. আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও চাপ।

ঘ. শক্তিশালী এবং সুপরিবর্তনীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানহীনতা ও প্রকারান্তরে অনিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের বিশেষত: সামরিক ও বেসামরিক এলীটদের প্রাধান্য ।[২০]

ইসলামী রাজনীতির সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির সমস্যাগুলোকে প্রধানত: রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংগঠনিক এবং আন্তর্জাতিক এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রাজনৈতিকভাবে

ইসলামী দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতন্ত্রী আদর্শের ধারক রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা বৈরিতার শিকার হচেছ। এ ধারার প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং সিপিবিসহ অন্যান্য বাম দল। এদের মতে ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামকে রাজনীতিতে টেনে আনা অযৌক্তিক, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ধর্মকেই কলুষিত করবে ইত্যাদি। তারা রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহারের জন্য ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলকে দায়ী করে থাকে। তদের দৃষ্টিতে ইসলামী দলগুলো ধর্মব্যবসায়ী। কিন্তু ইসলামী দলগুলো এদের বক্তব্যকে ইসলাম সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা করছে। কেননা ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মত শুধু ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানের কিছু নিয়মনীতির নাম নয়। ইসলাম সামগ্রিকভাবে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর স্বাভাবিকভাবে মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রাজনীতি ইসলাম থেকে পৃথক রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই।

১৯৭১ সালে ইসলামী দলগুলোর বিতর্কিত ভূমিকার কারণে এ দলগুলোকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার জন্য প্রতিপক্ষ দলগুলো বারবার '৭১এ দলগুলোর কর্মকান্ড জাতির সামনে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস চালায়। ইসলামী দলগুলোকে স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে অভিহিত করে। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ইসলামী দলগুলো নিজেদের স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে মনে করেন না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "আমরা দেশের স্বাধীনতা সর্বভৌমত্বের বিরোধী নই। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে ভূমিকা রাখলেও বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পর আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিয়েই বাংলাদেশে রাজনীতি করছি।" বিরোধী পক্ষের বক্তব্য মূলত: বৃহত্তম ইসলামী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীকে লক্ষ্য করে বেশি হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালে জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সংগঠনটির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছে স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা।[২১] একাত্তরে দলীয় ভূমিকার কারণ ব্যাখ্যা করে ১৯৭৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'জামায়াতের আবেদন' পুস্তিকায় জামায়াতে ইসলামী বলেছে "পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক এটা অবশ্যই জামায়াত চায়নি। কেননা সে সময় জয় বাংলা ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগানই প্রধান ছিল, 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবর' তখন শোনা যায়নি। আর এ জন্যই তখন ভারতের আধিপত্যের ভয়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আতঙ্কে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে জামায়াত বিশ্বাস করতে পারেনি।[২২] ১৯৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "১৯৭১ এ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখতো। অপরদিকে সেনাবাহিনী এবং বিহারীদের তোপের মুখেও আমরা পড়েছি। এমতাবস্থায় আমরা পাকিস্তানের অখন্ডতার জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। তবে পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারে আমরা শরিক ছিলাম না।[২৩]

জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা প্রসংগে বলেন, "জামায়াত পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা পালন করলেও তারা খারাপ কাজে বাধা দিয়েছে। সেনাবাহিনীর অত্যাচারের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতৃস্থানীয় অনেক লোকও নিহত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, ঢাকা মহানগরী ছাত্র সংঘের সভাপতি সৈয়দ শাহজালাল চৌধুরী, ফরিদপুর জেলা সভাপতি আবদুস সালাম, ঢাকা জেলা সেক্রেটারী আবদুল মতিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রসংঘনেতা আবদুল মতিন প্রমুখ।[২৪] জামায়াতের পুস্তিকায়ও বলা হয়েছে "তাই বলে টিক্কা খানের সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে রক্ষা করার নামে যতো অমানবিক কাজ করেছে, তা কখনই জামায়াত সমর্থন করেনি"।[২৫] জামায়াতের বিরুদ্ধে আরো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হচ্ছে জামায়াত যুদ্ধাপরাধী, জামায়াত নেতৃবৃন্দ আলবদর বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ছিলেন। জামায়াতের আমীর এ গবেষকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, "রাজাকার-আলবদর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৃষ্টি। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুলতানের (পাকিস্তান) অধিবেশনে আমি ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি থেকে অব্যাহতি নেই। এরপর তিনমাস আমি সংঘ করিনি, জামায়াতেও ছিলাম না। আমি কীভাবে সুপ্রিম কমান্ডার হই।"[২৬] যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের বক্তব্য ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক, নয়াদিগন্ত, প্রথম আলো, সংগ্রাম সহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাহী পরিষদের বক্তব্যে বলা হয়,

> "জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের যে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আজ যে সব জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মত গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচেছ তাদের কারও নামে কলাবেরটর আইনেও কোন মামলা করা হয়নি এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ১৯৫ জনের যে তালিকা করা হয়েছিল ও সরকার যাদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছিল সেই তলিকায় জামায়াতের কোন নেতার নাম ছিল না, কারণ যারা যুদ্ধই করেনি, তারা যুদ্ধাপরাধী হয় কি করে?" নির্বাহী পরিষদের বক্তব্যে বলা হয়,
>
> জামায়াত এবং জামায়াত নেতৃত্বের ওপর আঘাত হেনে যারা ইসলামী ধারার রাজনীতিকে নস্যাৎ করতে চায়, তারাই জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটি সামনে নিয়ে এসেছে। কারণ জামায়াতের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গি ইস্যু আনার চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। শুধু রাজনৈতিকভাবে জামায়াত নেতাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই 'যুদ্ধাপরাধ'এর রাষ্ট্রীয়ভাবে মীমাংসিত ইস্যুকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এবং পাকিস্তানের ৯৫ হাজার সেনাসদস্য সেদিন আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর স্বাধীনতা-উত্তর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার তাই যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্য তদন্তের ব্যবস্থা করে। সে তদন্তের আওতায় ছিল পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের সহায়ক বাহিনীগুলো। তদন্তের মাধ্যমেই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয় । ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত

হওয়া ও তাদের বিচারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে। ওদের বিচারের জন্য বাংলাদেশের পালামেন্টে ১৯ জুলাই, ১৯৭৩ একটি আইন পাস হয়। সেই আইনটির নাম ছিল International Crimes (Tribunal) Act, 1973. আইন পাস করার আগে ১৫ জুলাই ১৯৭৩ সংবিধান সংশোধন করা হয়। কারণ এই আইনের অনেক বিধান সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সাথে অঙ্গতিপূর্ণ । পরবর্তী এক বছরে বিভিন্ন সময় পাকিস্তান ও ভারত, বাংলাদেশ ও ভারত এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার ফল হিসেবে উপমহাদেশের শান্তি ও সমঝোতার স্বার্থে এবং পাকিস্তান সরকারের ভুল স্বীকার ও বাংলাদেশের জনগণের কাছে forgive and forget আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনা শেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে চিহ্নিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়। তাতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পররাষ্টমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন ,ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরন সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ। সে চুক্তির ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তানুযায়ী যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তালিকাভূক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিষয়টি মীমাংসা করা হয় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উদ্ভূত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুর ইতি ঘটে।[২৭] নির্বাহী পরিষদের বক্তব্যে বলা হয়:

> স্বাধীনতা যুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের মত যুদ্ধাপরাধের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দ যে সামান্যতমও জড়িত ছিল না, তার প্রমাণ জামায়াতের প্রাক্তন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলা সংক্রান্ত হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়। এ মামলার বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন, কতিপয় সংবাদ ভাষ্য ও একটি ছবিতে দেখা যায় যে, আবেদনকারী অধ্যাপক গোলাম আযম জেনারেল টিক্কা খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। সেটা ব্যতীত পাকিস্তানী বাহিনী বা তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর বা আল শামস কর্তৃক কথিত নৃশংসতার সাথে আবেদনকারী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আবেদনকারী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সামরিক জান্তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, এটা ব্যতীত আমরা এমন কিছু দেখি না যাতে বলা যায় যে, আবেদনকারী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কথিত নৃশংসতার সাথে জড়িত ছিলেন।[২৮]

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ, দলগুলো সন্ত্রাসের সাথে জড়িত, জঙ্গি তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে ৫০০ টিরও বেশি স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ইসলামী দলগুলোকে কোণঠাসা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশের মূলধারার ইসলামী দলগুলো উক্ত ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ করার পাশাপাশি জঙ্গি তৎপরতার সাথে তাদের জড়িত থাকার কথা সুদৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। বোমা বিস্ফোরণ, জঙ্গি হামলা ও তৎপরতার সাথে জেএমবি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলেও ইসলামী রাজনীতির বিরোধী দলগুলো ইসলামী দলসমূহ ও আলেম সমাজকে এ জন্য দোষারোপ করতে থাকে। পরবর্তীতে দেশের সকল ইসলামী দল ও আলেম সমাজের সক্রিয় সহযোগিতায় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিগত চারদলীয় জোট

সরকার জেএমবির জঙ্গি তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং কর্ম তৎপরতা জঙ্গি তৎপরতা ও বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ইসলাম এবং ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে বলা হয়, ইসলাম নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে নারীদের ঘরে আবদ্ধ থাকতে হবে, লেখা-পড়া বন্ধ করে দেবে, ইসলামী রাজনীতি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিবন্ধক ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ড উপরোক্ত অভিযোগ সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয় না। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামে প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও অধিকার বহাল এবং নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। নারীদের প্রতিভা, যোগ্যতা ও প্রয়োজনানুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, যৌতুক প্রথা বন্ধ করা, অসহায়, বিধবাসহ দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, নারীদের মিরাসী অধিকার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থাসহ নারীদের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার করা হয়েছে ইসলামী দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে।[২৯] বাংলাদেশের প্রায় সকল ইসলামী দল ও সংগঠনের মহিলা শাখা রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য হিসেবে পঞ্চম সংসদে ২ জন এবং ৮ম সংসদে ৪ জন মহিলা সদস্য ছিলেন, তারা সংসদে জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসহ নারী অধিকারের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চম সংসদে জামায়াতের অন্যতম মহিলা সদস্য বেগম রাশিদা খাতুন সংসদে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, নারী উন্নয়নের নামে বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) ইসলামী আদর্শ, নৈতিকতার বিরুদ্ধে লাগামহীনভাবে প্রচার করে যাচ্ছে। আমরা খবরের কাগজের চিঠিতে সিলেটের জনৈক নুরজাহানকে পাথর মেরে হত্যার কথা জানতে পারলাম। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী এ সম্পর্কে চিঠিতে আলোচনা করতে যেয়ে মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবর্তন করা উচিত কিনা তাও বলা হলো। কিন্তু যে এলাকায় এই নারকীয় কান্ড সংঘটিত হয়েছে তা সিলেটের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে সেটা এন.জি ও দের প্রভাবাধীন এলাকা এ ধরনের বিচার কীভাবে সম্ভব হলো? সরকারের তরফ থেকে এর একটা তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। এ ধরনের বিচারের মাধ্যমে ইসলামের আইন কানুনকে পরিকল্পিতভাবে বিকৃত করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। তাই এই সমস্ত অপতৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ না করলে দেশ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।[৩০] মহিলাদের রাজনীতি প্রসঙ্গে একমত পোষণ করে খেলাফত মজলিসের মহাসচিব অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের বলেন, খেলাফত মজলিসের মহিলা সংগঠন 'মহিলা মজলিস' নামে কাজ করছে।[৩১] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয়, জেলা, ইউনিয়ন কমিটিতে মহিলা ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদকের পদ রয়েছে। মহিলা ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদকের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি দেশের সর্বস্তরের নারী সমাজের মাঝে অনুপম ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও সে অনুযায়ী জীবন যাপনে

উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাবেন। মহিলাদের ইসলামের বিজয়ে সহায়ক শক্তি হিসেবে নিয়োজিত করার জন্য তাদের সংঘবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[৩২]

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি সামাজিক দিক থেকেও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (এনজিও) কর্তৃক বিভিন্ন কর্মকান্ডের দরুন এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচি নিয়ে এনজিওগুলো তাদের প্রধান কার্যক্রম চালালেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা তাদের আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর কর্মসূচি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশের ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনের সময় ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের ভোটদানে উৎসাহিতকরণ, খেলাপীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেয়া, সংসদে নারী নেতৃত্ব প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে প্রতিষ্ঠাকরণ, ফতোয়া প্রসঙ্গে সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে বিশেষ একটি দলের পক্ষে ব্যবহারকরণ, সরকারকে হঠাতে বা চাপ দিতে বিরোধী দলের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ঢাকা অবরোধ বা 'মহাসমাবেশ' করাসহ বহুবিধ রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে বহু এনজিও সচেষ্ট ছিল। রাজনৈতিক ইস্যুতে ও নির্বাচনের প্রাক্কালে অনেক এনজিও'র মাধ্যমে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে অর্থের ও লোকজনের সমাবেশ ঘটানো, পোষ্টার-প্রচারপত্র প্রকাশ, উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ, নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষাবলম্বনসহ অনেক বিতর্কিত তৎপরতা গৃহীত হয় । তা কেবল রাজনৈতিক বা দলীয় কাজই নয় বরং এনজিও বা উন্নয়ন সংস্থার মৌলিক নীতি, আদর্শ, চরিত্র ও শপথের পরিপূর্ণ খেলাপও বটে।[৩৩] এনজিওগুলো উন্নয়ন কর্মকান্ডের নামে যে সকল সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নারীর ক্ষমতায়নের নামে চিরায়ত পরিবার প্রথা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা, জাতীয় ঐক্যমতের মৌলিক বিষয়বস্তু যেমন ধর্ম, স্বাধীনতার চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করে সমাজে বিভেদ ও অনৈক্য প্রসার করা, সর্বাবস্থায় ধর্ম তথা ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো, ইসলামী বিধান ও জীবনাচারের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ অবস্থান তৈরি করা তথা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস, আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ। আমাদের এ ভূখন্ডে ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রাকৃতিক ও যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের প্রতি মানবিক প্রয়োজনে সাড়া দেয়ার উদ্দেশে এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম শুরু করে।[৩৪] কিন্তু বর্তমানে তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাদের কর্মতৎপরতা প্রসারিত করছে। শিক্ষা, ব্যাংকিং কার্যক্রম, পরিবহন ব্যবসা, রীয়্যাল এস্‌টেট্‌ ব্যবসাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ প্রভাব বিস্তার করে আছে। বর্তমানে এনজিওগুলো তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজস্ব সমিতি 'এডাব' (ADAB-Association of the Development Agencies in Bangladesh) গঠন করে অনেকটা বেপরোয়াভাবে তাদের কার্যক্রম

চালিয়ে যাচ্ছে। এডাবের সদস্য সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোতে কমপক্ষে একজন এনজিও প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব পরিমাপের জন্য যথেষ্ট।

ইসলামী রাজনীতির সাথে এনজিও গুলোর বৈরী সম্পর্ক প্রকট আকার ধারণ করে ১৯৯১ সালের ৫ম সংসদ নির্বাচনের পর। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর ১৮টি আসনে জয়ী এবং প্রদত্ত ভোটের ১২.১৩% লাভ ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশেও ইসলামের উত্থানের সম্ভাবনা দেখতে পায়। পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের অর্থে পরিচালিত এনজিওগুলো দাতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি উত্থানের প্রতিরোধকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ করে। গবেষক হলওয়ের মতে: "বাংলাদেশে ১৯৯১ পূর্ববর্তী এনজিও-সরকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল দ্বন্দ্ব ছিল সরকারি আমলাদের সঙ্গে এনজিওসমূহের লড়াই। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী জাতীয় সংসদে ইসলামী দলের (জামায়াতে ইসলামী) প্রভাব বৃদ্ধি এ দ্বন্দ্বকে নবতর মাত্রায় নিয়ে যায়।" এনজিও কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত মহিলারাই বেশি। তাই কিছু কিছু এনজিও'র মতে জামায়াতসহ ইসলামী রাজনীতির শক্তি বৃদ্ধি পেলে মিশনারী কার্যক্রমসহ নারীদের ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অংশ গ্রহণ কর্মসূচি বাধাগ্রস্থ হতে পারে। তাই এনজিওগুলো জামায়াত এবং ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম হাতে নেয়।[৩৫] ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋনের মাধ্যমে চড়া হারে সুদ গ্রহণ, নারীর ক্ষমাতায়নের নামে পর্দা প্রথা বিনষ্ট ও অশ্লীলতার বিস্তার, নারীর ক্ষমতায়নের নামে সামাজিক ভারসাম্য বিপন্ন করা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বিস্তার, পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোসহ নানা অনৈসলামিক কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং এনজিওর নামে বেনিয়াবৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র জনমত ও আন্দোলন সংঘটিত হয়।[৩৬] ইসলামী দলগুলোর এনজিও বিরোধী কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে এনজিওদের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, সাংস্কৃতিক জোট ও বামপন্থী সংগঠন সহ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। রিচার্ড হলওয়ের মতে, "১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪ এই ছয় বছর এনজিওগুলো তাদের নিরপেক্ষ ও উন্নয়নকামী অবস্থান বদল করে একই সংগে বামপন্থী ও পশ্চিমা উদারপন্থী তথা ইসলামের সামাজিক রাজনৈতিক উত্থান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে কৌশলগত ও আদর্শিক জোট বা মৈত্রী গঠন করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মজবুতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।"[৩৭] ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনজিওদের একটি বিরাট অংশ বামপন্থী-ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে সক্রিয় সমর্থন জানায় এবং তৃণমূল জনতার মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। ৭ম জাতীয় নির্বাচনে এনজিওদের সক্রিয় সমর্থন এবং ভূমিকা ২১ বছর পর আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় নিয়ে আসার অন্যতম কারণ বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের অনেকগুলো এনজিও 'সুশীল সমাজের' নামে

বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করে সরকারি নীতি প্রণয়নে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এসকল এনজিও নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগই বামপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী। তারা বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল বৈঠক এবং গবেষণা কর্মের মাধ্যমে মানবাধিকার, সুশাসনের নামে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী 'পলিসি' গ্রহণে সরকারকে প্রলুব্ধ করে থাকে। এনজিওগুলোর অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী। কিন্তু এর মাধ্যমে আদৌ দারিদ্র্য দূরীকরণ হচ্ছে, নাকি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে নিরীহ জনগণ, এ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য বাংলাদেশের জনগণের জন্য যে অভিশাপ সে ব্যাপারে সবাই একমত।

ইসলামও মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চায়। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য একটি মারাত্মক সমস্যা। এ সমস্যা থেকে ধর্মীয় এবং সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় । এ জন্য মহানবী (সঃ) আল্লাহর কাছে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চেয়েছেনঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দারিদ্র্য, অভাব ও নিচুমনা থেকে পানাহ চাই।[৩৮] ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকের কর্ম-কৌশল রয়েছে। সীমিত পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং আরো কয়েকটি কল্যাণমূখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসা, বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, মিরপুর সিল্ক উইভারস ইনভেষ্টমেন্ট স্কীমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।[৩৯] এছাড়া মুসলিম এইড (ইউকে) বাংলাদেশ, দারুল খিদমাহ ওয়াল ফালাহ বাংলাদেশ, ইসলামিক এইড, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি তৃণমূল পর্যায়ে সীমিত পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে। ইসলামী দলগুলোকে এনজিও মোকাবেলায় ইসলামসম্মত পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে হবে।

ইসলামী দলগুলো নিজেদের সাংগঠনিক এবং আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও সম্পর্কের কারণেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিয়ামক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছেনা। নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে একটি ইসলামী দল ভেঙ্গে একাধিক ইসলামী দল হয়েছে। আবার দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করাও কঠিন কাজ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ বছর ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও গোপনে জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর জামায়াত, নেজামে ইসলাম, পিডিপিসহ অন্যান্য ইসলামী দলের নেতা-কর্মীগণ আইডিএল গঠন করেন। কিন্তু একবছরের ব্যবধানে আইডিএল ভেঙ্গে যায়। খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ এবং তৎকালীন জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুর রহীম দুই অংশের নেতৃত্বে ছিলেন। আরো কিছু দিন পর আইডিএল থেকে জামায়াত-নেতা-কর্মীগণ স্বনামে পুনর্গঠিত জামায়াতে ইসলামীতে শরিক হন। মাওলানা আবদুর রহীম, মাওলানা আবদুস সোবহান, ব্যরিস্টার কোরবান আলীসহ নেতৃস্থানীয় কয়েকজন জামায়াতে না গিয়ে

আইডিএল এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব বর্ষীয়ান আলেমে দ্বীন মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন গঠন করেন। কওমী মাদ্রাসার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেম হাফেজ্জী হুজুরের খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে সম্মিলিত খেলাফত পরিষদ গঠিত হলে আইডিএল, যুবশিবিরও তাতে যোগদান করে। কিন্তু এ পরিষদের কার্যক্রমও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। '৮৬ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ প্রশ্নে ঐক্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। হাফেজ্জী হুজুরের জীবদ্দশায়ই খেলাফত আন্দোলন ভেঙ্গে যায়। মাওলানা আজিজুল হক, চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করিম, মাওলানা আবদুল গাফ্ফারসহ খেলাফত আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় নেতা পৃথক খেলাফত আন্দোলন গঠন করেন। ১৯৮৭ সালে মাওলানা আবদুর রহীম, চরমোনাইর পীর সাহেব এবং খেলাফত আন্দোলন (আজিজ-গাফ্ফার) মিলিত হয়ে গঠন করে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন। আন্দোলনের সূত্রপাত জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী করলেও জামায়াতের চাপে তিনি শুরু হওয়ার আগেই নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। নতুন উৎসাহ উদ্দীপনায় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কার্যধারা শুরু হয়। এরশাদ সরকারের পতনের পর ইসলামপন্থীদের একটি বৃহত্তর নির্বাচনী জোট 'ইসলামী ঐক্যজোট' গঠিত হয়।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন সে জোটে অন্তর্ভুক্ত হলে মাওলানা আবদুর রহীমের (রহ:) ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের একটি অংশ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ছেড়ে যায়। ইসলামী শাসনতন্ত্র-আন্দোলনের দুই প্রধান শরিক খেলাফত আন্দোলন ও যুবশিবির ১৯৮৯ সালে খেলাফত মজলিস গঠন করে। মাওলানা আজিজুল হক মজলিসের আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৯১ এর নির্বাচনের পর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন মূলত: একটি সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। চরমোনাইর পীর ও খেলাফত আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা মাওলানা ফজলুল করিম মুখপাত্র (পরবর্তীতে আমির) নির্বাচিত হন এবং কর্মকান্ড এগিয়ে নেন। ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী চারদলীয় যুগপৎ আন্দোলন শুরু হলে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট ত্যাগ করে। চারদল শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। যদিও চারদলের আন্দোলনের কারণে শেখ হাসিনার সরকার পদত্যাগ করেনি তথাপি আন্দোলনের কারণে গড়ে ওঠা চার দলীয় জোট ২০০১ সালে ৮ম সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে জোট নিরংকুশ আসন লাভ করে। সরকার গঠনের পূর্বেই ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রশ্নে ইসলামী ঐক্যজোট দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাওলানা ফজলুল হক আমিনী নতুন অংশের আমীর নির্বাচিত হন। অপর অংশের আমীর থাকেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক। বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙ্গা-গড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিচালনার পর এ পর্যায়ে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হলেও এদেশে ব্যাপক ভিত্তিক কোন ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য বিরাজমান। অথচ ইসলামী দলগুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম। জামায়াতে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম প্রবাস জীবন শেষে ১৯৭৮ সালে দেশে ফিরে আসার পর ইসলামী দলগুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকাটিতে ইসলামী ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে সকল ধরনের দ্বীনী খেদমতকে স্বীকৃতি দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মক্তব, আলিয়া মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসা, মসজিদে খানকাহ ওয়াজ, ইসলামী বই, তাবলীগ ইত্যাদি দ্বারা দ্বীনের কি কি খেদমত হচ্ছে তার বিবরণ দিয়ে পুস্তিকাটিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এ সবই দ্বীনের মূল্যবান খেদমত। সাধারণত: যারা যে ধরনের খেদমতে মশগুল আছেন, তারা সে কাজের গুরুত্ব যতটা অনুভব করেন ততটা অন্যান্য খেদমতের ব্যাপারে উপলব্ধি করেন না। অথচ সবার খেদমতের মূল্য সবাই উপলব্ধি না করলে দ্বীনের খেদমতের মধ্যেও মহব্বত এবং ঐক্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে না।[৪০] পুস্তিকাটি নেতৃস্থানীয় আলেম, পীর মাশায়েখদের নিকট বিতরণ করা হলে ঐক্যের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে যারা সাড়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চরমোনাইর পীর সাহেব মাওলানা সাইয়্যেদ ফজলুল করিম, বায়তুশ শরফের পীর সাহেব মাওলানা আবদুর জব্বার, ঢাকার প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মাসুম, জনপ্রিয় ওয়ায়েজিন মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী, বিখ্যাত ওয়ায়েজিন মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দীন জাফরী। তাদের প্রচেষ্টায় একটি কমিটি গঠিত এবং বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মাসুমকে আহবায়ক করে উক্ত কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত আড়াই বছর উল্লেখযোগ্য সকল মহলের সাথে যোগাযোগের পর ১০ জুন বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট এন্তেজামিয়া কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির উদ্যোগে ১৯৮১ সালের ৬ আগস্ট ঢাকার টি এন্ড টি কলনি মসজিদে "ঐক্য-সম্মেলনের" প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর ব্যাপক ভিত্তিক ইসলামী ঐক্য সংগঠনের নামকরণ করা হয় "ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ"। পরবর্তীতে ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর টি এন্ড টি কলনি মসজিদে প্রায় ৩০০ জন আলেম, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলনের মাধ্যমে "ইত্তেহাদুল উম্মাহ" আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪১] এ ঐক্যমঞ্চে সকল দ্বীনী মহল প্রথমে শামিল না হলেও এর পূর্বে এতটা ব্যাপক ঐক্য কখনো দেখা যায়নি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে সভাপতি বা সেক্রেটারী পদ না দিয়ে ঐক্যের স্বার্থেই বিভিন্ন মহলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয়

মজলিসে সাদারাত (সভাপতিমন্ডলী বা সভাপতি পরিষদ) গঠন করা হয়। চরমোনাই. শর্ষিনা, বায়তুশ শরফ এর পীর সাহেবগণ এবং খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদসহ উল্লেখযোগ্য উলেমা এবং বিভিন্ন ইসলামী দলের প্রতিনিধিগণ মজলিসে সাদারাতের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহর পাঁচ দফা কর্মসূচি এবং নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যাপক ঐক্য, বিভিন্ন মত, পথ ও দলের মর্যাদা, রাজনৈতিক বিষয়ে পাঁচটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। ইত্তেহাদুল উম্মাহর সাংগঠনিক কাঠামো এমন রাখা হয় যাতে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকে এবং নেতৃত্ব নিয়ে কোন রকম কোন্দল সৃষ্টি না হয়। সংগঠনের কোন একজনকে সভাপতি না করে বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধিত্বকারীগণের সমন্বয়ে যৌথ সভাপতিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রতিষ্ঠা লাভের পর ইত্তেহাদুল উম্মাহ দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। বিভাগীয় ও জেলা শহরে ইত্তেহাদুল উম্মাহর সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মসূচিতে জনগণ বিপুল সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। মাওলানা মাসুম ও চরমোনাই পীর সাহেব, মাওলানা সাঈদীসহ কেন্দ্রীয় সাদারাতের পাঁচ-ছয়জন সদস্য যেখানেই সম্মেলনে হাজির হবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানেই স্থানীয় ইসলামপন্থি সকল মানুষ অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। সম্মেলনের ব্যয়ভার বহনের জন্য তহবিল সংগ্রহে কোন বেগ পেতে হয়নি। অনেকে নিজে এসেই অর্থ সাহায্য দিয়ে গেছেন।[৪২]

প্রতিষ্ঠা লাভের কয়েক বছর পর্যন্ত ইত্তেহাদুল উম্মাহর তৎপরতা মোটামুটি ব্যাপক ছিল। ঐক্যের ব্যাপারে সাধারণ জনগণ আশান্বিত হয়েছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। ইত্তেহাদুল উম্মাহ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে মজলিসে সাদারাতের এক বৈঠকে বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবিতে আন্দোলন করার প্রস্তাব গ্রহীত হয়। মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীকে সামনে রেখে এ আন্দোলন শুরু করা হয় এবং ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করার লক্ষ্যে মহাসমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচির উপযুক্ত সময় আসেনি মনে করে এ আন্দোলনে সমর্থন প্রদান করেনি। জামায়াত মাওলানা সাঈদীকে এ আন্দোলন থেকে চলে আসার জন্য আহ্বান জানায়। চরমোনাই, বায়তুশ শরফের পীরসহ অন্যান্য উদ্যোক্তাও সাঈদী সাহেবের নিষ্ক্রিয়তার কারণে আর অগ্রসর হননি। ফলে ১৩ মার্চের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়নি। "ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন" কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হওয়ায় "ইত্তেহাদুল উম্মাহর" নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার কারণে "ইত্তেহাদুল উম্মাহর" কার্যক্রম ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮৭ সালে "ইত্তেহাদুল উম্মাহর" মঞ্চ ভেঙ্গে যাওয়ার পর নতুন করে ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাওলানা নজরুল

ইসলামকে এ ব্যাপারে যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী ও মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সাথে যোগাযোগ করে এ উদ্যোগ এগিয়ে নেন। শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হককে আহ্বায়ক করে তাঁরা ইসলামী দলগুলোর একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালের ১৪ আগস্ট ৮টি দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে এক সম্মেলনে সমবেত করতে তাঁরা সক্ষম হন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন:

১। খেলাফত মজলিস- শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা আবদুল গাফফার ও অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক।

২। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন- চরমোনাই পীর সাহেব মাওলানা সাইয়্যেদ ফজলুল করিম।

৩। নেজামে ইসলামী পার্টি- মাওলানা আশরাফ আলী ধরমন্ডলী।

৪। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মাওলানা ফজলুর রহমান।

৫। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন- ব্যারিস্টার কুরবান আলী।

৬। তমদ্দুন মজলিশ- অধ্যাপক আবদুল গফুর।

৭। শর্ষিণার পীর সাহেবের প্রতিনিধি- মাওলানা রুহুল আমীন খান।

৮। জামায়াতে ইসলামী- অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও অ্যাডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

> শীর্ষ সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন, বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে জানার ও বোঝার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর রচিত সাহিত্য আমাদের মত আধুনিক শিক্ষিতদের সামনে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত এ সাহিত্যে অণুপ্রাণিত হয়ে শাহাদাতের পবিত্র জযবা নিয়ে দাওয়াতে দ্বীনের কাজে এগিয়ে এসেছে এবং অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে। মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের এ বিরাট অবদান সত্ত্বেও তাঁর রচনায় ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। তিনি রাসূল (সা:)-কে ছাড়া আর কাউকে ভুলের উর্ধে মনে না করার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। তাই কি করে আমরা তাঁকে ভুলের উর্ধে মনে করতে পারি? ১৯৮১ সালে আমার লিখিত "ইকামাতে দ্বীন" বইটিতে ওলামা মাশায়েখের খেদমতে এই মর্মে আবেদন জানাই যে, সংশোধনের নিয়তে কুরআন হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর বইতে যে সব ভুল পাওয়া যায় তারা সেগুলো চিহ্নিত করে দিলে আমরা এ খিদমতের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মধ্যে শামিল আছি বলে দৃঢ়বিশ্বাস করি। এর খেলাফ কোন কথা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি নই।"[৪৩]

ঐক্যের প্রক্রিয়া চালু করার উদ্দেশ্যে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয় কিন্তু সদস্যদের প্রয়োজনীয় তৎপরতার অভাবে সে ঐক্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ইসলামী শক্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতের পক্ষ থেকে ১৯৯৫ সালে দেশের নেতৃস্থানীয় আলেমগণের সাথে যোগাযোগের লক্ষ্যে একটি টীম বিভিন্ন জেলা সফর করেন। এরই

অংশ হিসেবে জামায়াতের দুই কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আবদুস সোবহান ও অ্যাডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম চট্টগ্রামের জামায়াত নেতা মাওলানা শামসুদ্দিন, মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী ও মাওলানা আবু তাহেরকে সাথে নিয়ে হাটহাজারী ও পটিয়ার বিখ্যাত দু'টো মাদ্রাসার মুহতামিমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আন্তরিক পরিবেশে মতবিনিময়ের পর ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি চিঠি তাঁরা হস্তান্তর করেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের চিঠির উত্তরে মুহতামিমরা চারটি বিষয়ে জামায়াতের অবস্থান জানতে চান। বিষয়গুলো হচ্ছে:

১। ইসমাতে আম্বিয়া

২। আদালতে সাহাবা

৩। ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামী রাজনীতি করা এবং পাশ্চাত্য কর্মপন্থা বর্জন করা এবং

৪। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে মাওলানা মওদুদী সাহেবের চিন্তাধারাকে জড়িত করা হবেনা বলে ঘোষণা দেয়া

উক্ত চিঠির জবাবে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, আপনাদের পত্রে প্রকৃত ও সঠিক দ্বীন কায়েমের স্বার্থে যে ৪টি বিষয়ে আমাদের একমত থাকা সম্পর্কে লিখিতভাবে জানানোর কথা বলেছেন, তন্মধ্যে ১ ও ২ নং বিষয়ে আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ অনুরূপ অর্থাৎ আমরা ইসমাতে আম্বিয়া এবং আদালতে সাহাবায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। শেষোক্ত বিষয় দু'টি সম্পর্কেও নীতিগতভাবে আমরা একমত। কিন্তু অধ্যাপক আযমের চিঠির উত্তর মুহতামিমদ্বয়ের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। ইসলামী শক্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াত নেতা গোলাম আযম ১৯৮৪ সালে মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে অধ্যাপক আযম সবার মুরুব্বী হিসেবে সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য হাফেজ্জী হুজুরকে ডাক দেয়ার অনুরোধ জানান। তাঁর ডাকে জামায়াতে ইসলামীও সাড়া দিতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ঘোষণা করেন। অধ্যাপক আযম আরো বলেন,

> "মাওলানা মওদুদীকে আমরা নির্ভুল মনে করিনা। কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে তাঁর লিখিত কিতাবাদিতে কী কী ভুল আছে তা ধরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তা মেনে নেব। আপনি কয়েকজন আলেমকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দিলে জামায়াতের কয়েকজন তাদের সাথে বসে ভুলগুলো জেনে নিতে পারবেন। আর এ জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব"।[৪৪]

চরমোনাই পীর সাহেব সাইয়্যেদ ফজলুল করিম এবং হাফেজ্জী হুজুরের মেঝো ছেলে হাফেজ হামীদুল্লাহ গোলাম আযমের বক্তব্য সমর্থন করলেও হাফেজ্জী হুজুর তাতে সাড়া দেন নি। ১৯৯৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ঝালকাঠিতে শর্ষিণার "কায়েদ সাহেব" নামে খ্যাত মাওলানা আযীযুর রহমানের উদ্যোগে তাঁরই মাদ্রাসায় ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে একটি বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে ফুরফুরা শরীফের তৎকালীন গদীনশীন পীর

মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দীকী সাহেব আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, চরমোনাই পীর সাহেব সাইয়্যেদ ফজলুল করিম, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং ফুরফুরা শরীফের মুফতি মাওলানা সাঈদ আহমদও উপস্থিত ছিলেন। ঝালকাঠির সে বৈঠকের পর ঢাকায় আরও কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঐক্য প্রক্রিয়াকে জোরদার করার জন্য।

১৯৯৭ সালের ১১ জুলাই ঢাকায় ফুরফুরার দরবার শরীফ দারুস সালাম এ ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ঝালকাঠির কায়েদ সাহেব, ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব, বাইতুল মোকররমের খতীব, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ও ড.মুস্তাফিজুর রহমানসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা আবদুস সোবহান ও মাওলানা সাঈদীও উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। জামায়াতের উপস্থিতির কারণে চরমোনাইর পীর সাহেব উক্ত বৈঠকে যান নি। ইতোপূর্বে চরমোনাইর পীর সাহেব প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, "জামায়াত" কোন ইসলামী দল নয়। চরমোনাই পীর সাহেবের সাথে জামায়াতের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য একটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ড. মুস্তাফিজ উদ্যোগ নিলেও পীর সাহেবের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে তা সফল হয় নি।[৪৫]

১৯৯৮ সালের মার্চ মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখে ঝালকাঠিতে সর্বদলীয় দ্বিতীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে "কায়েদ সাহেব" তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে "ইত্তেহাদ মাআল ইখতেলাফ" (মতানৈক্যসহ ঐক্য) এ নীতির আলোকে সকল শ্রেণীর মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীনের খেদমতে আঞ্জাম দেয়ার জন্য আহবান জানান। ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রণীত কতিপয় ইস্যুর ওপর একটি খসড়ায় ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণের দস্তখত সংগ্রহের জন্য মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমদ ও ড. মুস্তাফিজুর রহমানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা উল্লেখযোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেরই মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁরা মোট ৬৩ জনের দস্তখত সংগ্রহ করে ১৯৯৮ সালের ১৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রেসবিজ্ঞপ্তি পাঠান।

৬৩ জন নেতৃস্থানীয় ওলামা, মাশায়েখের যুক্তবিবৃতি ইসলামী ঐক্যের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। পরবর্তীতে ১৫ ডিসেম্বর '৯৮ ফুরফুরা দরবার মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম [দারুস সালাম, মীরপুরে] উক্ত স্বাক্ষরকারী আলেমগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হককে আহবায়ক করে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল গঠিত হয়। আহবায়ক কমিটিতে পীর, মাশায়েখ, ইসলামী

চিন্তাবিদ এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্বকারী আলেমগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুফতি সাঈদ আহমদকে প্রধান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি লিয়াঁজো কমিটিও গঠন করা হয়। জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল ইসলামী ঐক্যের একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগঠনে রূপ লাভ করে। জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হকের (মরহুম) গতিশীল নেতৃত্বে এবং ফুরফুরা শরীফের পীর মরহুম মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহহার সিদ্দীকীর পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিসমূহের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এ পর্যন্ত জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলই সর্বদলীয় একমাত্র ঐক্যমঞ্চ। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার স্বার্থে যুগপৎ আন্দোলন করার বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করে। জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ঐক্যজোটের প্রধান মাওলানা আজিজুল হকের সাথে ১৯৯৮ সালে দু'বার সাক্ষাৎ করে ইসলামী দলগুলোর যুগপৎ আন্দোলনের গুরুত্ব উপস্থাপন করেন। কিন্তু ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি।[৪৬]

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি তথা ইসলামী সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার। ৯/১১-এর পর বিশ্বব্যাপী যেভাবে 'War on Terror' এর নামে 'War on Islam' চলছে তারই ধারাবহিকতায় দেশ-বিদেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের মূল ধারার ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে কোণঠাসা করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ভুল তথ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। বিখ্যাত মার্কিন অধ্যাপক মাইকেল প্যারেন্টি 'Methods of Misrepresentation' শিরোনামে পাশ্চাত্য মিডিয়ার ভ্রান্ত উপস্থাপনার কতগুলো কৌশল উপস্থাপন করেছেন। সেগুলো হলো:

ক. সংবাদ গায়েব/চাপা দেয়া (Omission & Supressions)
খ. নির্জলা মিথ্যা ছড়িয়ে দেয়া (Dissemination of outright lies)
গ. ভারসাম্যহীন ট্রিটমেন্ট প্রদান (Unbalanced Treatment)
ঘ. মনগড়া কাঠামোবদ্ধকরণ (Framing)
ঙ. সত্যকে ধূসর করে দেয়া (The greying of reality)
চ. সহায়ক অলংকরণ (Auxiliary embellishment)[৪৭]

আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচারণার কৌশল হিসেবে যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছে সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায়: (ক) মৌলবাদের জিগির তোলা, (খ) ইসলামী আন্দোলন ও সন্ত্রাসকে একাকার করে দেখানো, (গ) ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কালিমালিপ্ত করার ব্যবস্থা করা (ঘ) যে কোন সন্ত্রাসের দায় ইসলামী আন্দোলন ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের ওপর যে কোনভাবে চাপিয়ে দেয়া।[৪৮] মূলত: ২০০১ সালে জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক

দলসমূহের জোট 'চার দলীয় ঐক্যজোট' ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর দেশীয় মিডিয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রচারণা তুঙ্গে ওঠে। নিম্নে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কয়েকটি শিরোনাম প্রদান করা হল। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি এবং সংগঠন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল কী ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তা অনায়াসে উপলব্দি করা যাবে।

	পত্রিকার নাম	তারিখ/সংখ্যা	শিরোনাম	প্রকাশ স্থান
1.	Far Eastern Economic Review	4 April 2002	Bangladesh: A Cocoon of Terror	Hongkong
2.	The Wall Street Journal	2 April, 2002	In Bangladesh, as in Pakistan, a worrisome rise in Islamic Extremism	USA
3.	Guardian	2 October, 2001	Islamic hardliners head for power in Bangladesh	Britain
4.	Time Asia	21October 2002	Deadly Cargo	USA
5.	New York Post	october, 2002	Militant Islam's new strong holds	New york
6.	New York Time Magazine	23 January, 2005	Bangladesh the next Islamist Revolution	New york
7.	The Economist	June 18, 2005	Bangladesh State of Denial	London

ওপরোক্ত পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে মূলত বাংলাদেশের ইসলামী শক্তির পুনরুত্থানে সহায়ক উপাদান তথা ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, এবং আলেম সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে। ভুল তথ্য এবং তথ্য গোপন করে বিভিন্ন উগ্রবাদী গ্রুপকে মূলধারার ইসলামী দলের সাথে একাকার করে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী দলের নেতা কর্মীদের অত্যাচারে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ, তথাকথিত প্রগতিশীল লেখক-কবিদের ওপর হামলার উদ্ভট তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদনগুলোতে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০১ সালের নির্বাচনের পরপরই উগ্রপন্থী মৌলবাদীদের তৎপরতা-উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। সে তৎপরতাকে যদি বিনা চ্যালেঞ্জে অব্যাহত রাখতে দেয়া হয়, তবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য তা মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেবে। কারণ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত একটি সংঘবদ্ধ চক্রের

সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ মুসলিম এ দেশটি এতদিন মডারেট ইসলামিক কান্ট্রি হিসেবে পরিচিতি থাকলেও এখন সে অবস্থানে নেই। দেশের ৬৪ হাজার মাদ্রাসা থেকেই প্রতিবছর ইসলামী মৌলবাদের বিস্তার ঘটছে।[৪৯]

ভারতের মিডিয়াগুলোও বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর কার্যক্রম নিয়ে প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে। ভারত থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার একটি শিরোনাম ছিল এরকম 'ভারতে হানা দিতে আল কায়েদা জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়েছে বাংলাদেশে'।[৫০] The Statesman পত্রিকায় ২১ নভেম্বর ২০০২ একটি খবর সৃষ্টি করে এ রূপ "There are more than 170 terrorist training camps, including some run by Al-Qaeda, in Bangladesh."[৫১] হিন্দুস্থান টাইমস লিখেছে- 'বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে আরেক আফগানিস্তান।'[৫২] ভারতীয় এবং অন্যান্য মিডিয়ার সাথে তালমিলিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোর একটি অংশও 'ইসলামী মৌলবাদের' বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত হয়ে প্রকারান্তরে দেশ ও জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করে তোলার ভারতীয় ষড়যন্ত্রের সাথে ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপের আর্থিক মদদপুষ্ট বলে কথিত দৈনিক জনকণ্ঠ বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় এগিয়ে। দৈনিক জনকণ্ঠের ২০ জুন, ২০০২ সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুন্দরবনে জঙ্গি মৌলবাদীরা ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। ২০০১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী দৈনিক ভোরের কাগজ 'সারাদেশে দশ হাজার মাদ্রাসায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছে' শিরোনামে এক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে।[৫৩] সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ১২ অক্টোবর ২০০৩ সংখ্যায় 'বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি নেটওয়ার্ক' প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়েছে, মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি হয়ে ওঠছে বাংলাদেশ। নাম জানা না জানা দেশী বিদেশী এসব জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে এদেশের জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের রয়েছে গভীর যোগাযোগ। অর্থ, অস্ত্র, রসদ এবং অন্যান্য সহায়তা দিয়ে তারা প্রস্তুত করছে জঙ্গিদের। উদ্দেশ্যে তথাকথিত তালেবানী শাসন কায়েম অর্থাৎ অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল। 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর ২৮ জানুয়ারী ২০০৫ সংখ্যায় বাংলাদেশ কি জঙ্গি মৌলবাদী রাষ্ট্র?' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে নির্বাহী সম্পাদক লিখেছেন ভোটের রাজনীতিতে বিএনপি আওয়ামী লীগ নিজেদের ব্যর্থতায় জিম্মি হয়ে পড়ছে মৌলবাদের কাছে। এর খেসারত দিতে হচ্ছে জনতাকে।[৫৪] উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিবন্ধকতা সমূহকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

১. ১৯৭১ সালে জায়ামাতসহ ইসলামী দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। তারা অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা রাখে। বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোকে স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের

ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্তির শিকার হয়। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের ভোটাররা ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ভোট প্রদান করে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

২. জেএমবিসহ গুটিকয়েক সন্ত্রাসী গোষ্ঠি ইসলামের নামে সন্ত্রাস, বোমাবাজিসহ জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত। যদিও মূলস্রোতের ইসলামী দলগুলো এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নয় বলে প্রমাণিত। তারপরও দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক একটি মহল এ সকল জঙ্গি তৎপরতার সাথে জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোটসহ অন্যান্য দলের সাথে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করে। এতে সহজ-সরল সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

৩. বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এনজিও কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। কিছু কিছু এনজিওর কর্মকান্ড মুসলিম ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী হওয়ায় ইসলামী দলগুলোর সাথে এনজিওগুলোর একটি মনস্তাত্তিক বিরোধ অব্যাহত রয়েছে। এনজিওরা সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন ইস্যুতে নেতিবাচক ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করে। নির্বাচনের সময় এনজিওগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামী দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৯৬ এবং ২০০৮ সালে নির্বাচনে এর প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪. দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া ব্যাপক প্রচারণা রয়েছে যে বাংলাদেশ মৌলবাদের পুনরুত্থানের সুযোগে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। জেএমবিসহ বিভিন্ন জঙ্গি গ্রুপের সাথে আল কায়েদাসহ আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলোর যোগাযোগ রয়েছে। ইসলামী দল, আলেম সমাজ এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের জঙ্গি তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়।

৫. রাজনৈতিক সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক বাধার চেয়েও ইসলামী দলগুলোর জন্য মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে নিজেদের অনৈক্য। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মপ্রাণ। তারা ইসলামী কল্যাণমূলক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের এক জরিপে অধিকাংশ উত্তরদানকারী বলেছেন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের অধিকাংশ ভোটার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দেবে।[৫৫] মানুষের মধ্যে ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রভাব এখনো সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের আলেম সমাজ এবং ইসলামী দলগুলোর কার্যকর কোন ঐক্য দলগুলোকে রাজনীতিতে নিয়ামক শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম।

৬. অভ্যন্তরীণভাবে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো মজবুত এবং সুসংগঠিত নয়। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব খুব প্রকট। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে একটি দল ৪/৫ ভাগেও বিভক্ত হয়েছে। ইসলামী দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভেদ বিশৃঙ্খলা

সাধারণ মানুষের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। প্রায় লোককে প্রশ্ন করতে দেখি ইসলামী দলগুলো এত ভাগে বিভক্ত কেন? যদিও একটি মাত্র ইসলামী দল থাকবে এ ধরণের কোন বাধ্যবাধকতা বর্তমানে নেই, তথাপি সামান্য অজুহাতে ইসলামী দলের বিভক্তি সাধারণ জনগণ ভালভাবে নেয় না। এ ধরনের মানসিকতা এবং সংগঠন নিয়ে বড় ধরনের কোন পরিবর্তনও সম্ভব নয় ।

৭. বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত এবং মূলধারার ইসলামী দলগুলো ধর্মীয় কুসংস্কার তথা পীরপূজা, মাজার পুজা, ওরশ ইত্যাদির বিরোধী। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ সকল কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত। পীর-মুরিদ, ওরশের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ ত্বরিকত ফেডারেশনের ব্যানারে অনেকটা ঐক্যবদ্ধ। এদের বিরুদ্ধে ইসলামী দলগুলোর কার্যকর কোন বিরোধিতা করা সামাজিক ও রাজনৈতিক পেক্ষাপটে সম্ভব নয়। কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে এদের অধিকাংশই সেকিউল্যার রাজনৈতিক দলের পক্ষে থাকে।

৮. ইসলাম সম্পর্কে এদেশের শিক্ষিত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। তারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত শুধু একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপের সাথে তারা পূর্ব পরিচিতি না থাকায় ইসলামী রাজনীতি নিয়ে তারা বিতর্কে অবতীর্ণ হন। তাছাড়া ১৯৭১ সালের ইসলামী দলগুলোর ভূমিকার সাথে ইসলামী রাজনীতিকে একাকার করে দেখতে চান অনেক বুদ্ধিজীবী। কিন্তু ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে ইসলাম এবং ইসলামী রাজনীতিকে এক করে দেখার যুক্তিসংগত কোন কারণ না থাকলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেকটা তাই হচ্ছে। বুদ্ধিজীবী এবং লেখক সমাজ ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে ইসলামী আদর্শের সমালোচনায় লিপ্ত হয়। এ কারণে শিক্ষিত সমাজ এবং তাদের প্রভাবে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের একটি অংশের মধ্যে ইসলাম ও ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

৯. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাও ইসলামী দলগুলোর জন্য প্রতিবন্ধক। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে তারা প্রায় সকল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সাংগঠনিক এবং জনমতের দিক থেকে বিবেচনা করলে তাদের নির্বাচনী ফলাফল আশানুরূপ নয়। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার যে সকল উপায় কার্যকর বিশেষ করে অর্থ, পেশিশক্তি, প্রশাসনিক সহযোগিতা তা ইসলামী দলগুলোর নেই বললে চলে। এ জন্য কিছু কিছু ইসলামী-গোষ্ঠী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয় বলে মনে করে। তারা গণবিপ্লবে বিশ্বাসী। এ সকল কারণে বর্তমান নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিকভাবে ইসলামী সমাজ

প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বিধায় জেএমবিসহ কয়েকটি গোষ্ঠীও জঙ্গি তৎপরতার মাধ্যমে (তাদের ভাষায় জিহাদ) ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

১০. বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। গণতান্ত্রিক পন্থায় যে কোন পরিবর্তনের জন্য নারী সমাজের সমর্থন পুরুষের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা বেশি বলে আমার বিশ্বাস। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর সমানাধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, তালাক প্রদানসহ বিভিন্ন ইস্যুতে এনজিওরা নারীদের সংগঠিত করছে। অসংখ্য মহিলা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত।[৫৬] নারীদের মধ্যে ইসলামী দলগুলোর তৎপরতা উল্লেখযোগ্য নয়। জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, শাসনতন্ত্র আন্দোলন মহিলাদের মধ্যে কাজ করলেও তা আশানুরূপ নয়। পর্দাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে ইসলামী দলগুলো এনজিও বা অন্যান্য সেকিউল্যার রাজনৈতিক দলের মত মহিলাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারে না, নিয়ন্ত্রিত পন্থায় তাদের কাজ করতে হয় ।

১১. যে কোন পরিবর্তন বা বিপ্লবের জন্য শ্রমিক আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকরা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এখনো বাম সমাজতান্ত্রিক এবং সেকিউল্যার রাজনৈতিক দলের নেতাদের হাতে। ইসলামী দলগুলোর শ্রমিক সংগঠন থাকলেও সেগুলোর কর্মতৎপরতা খুবই সীমিত। তাছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের জন্য যে ধরনের নেতৃত্ব দরকার, ইসলামের বাধ্যবাধকতার কারণে সে ধরনের শ্রমিক নেতা তৈরী হওয়া ইসলামী শ্রমিক সংগঠনে কষ্টকর। সে জন্য ইসলামী শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রায়ই অপেশাদার শ্রমিক নেতাদের হাতে থাকতে দেখা যায়। ইসলামী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব দীর্ঘদিন থেকে পালন করেছেন কিংবা এখনও করছেন মরহুম মাষ্টার শফিকুল্লাহ, অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী, অধ্যাপক মজিবুর রহমান প্রমূখ ব্যক্তিগণ।

১২. ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহে 'সম্মোহনী' (Charismatic) গুণাবলী সম্পন্ন নেতার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি দল বা আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিনির্ভর বেশি বলে প্রমাণিত। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক জিয়াউর রহমান এখনো মানুষের মনে প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। তাদের কারণে তাদের উত্তরধিকারীগণও সাধারণ জনগণের আস্থা লাভে সমর্থ হচ্ছে। কিন্তু ইসলামী দলসমূহে এমন কোন নেতার এখনো আবির্ভাব হয়নি যিনি সাধারণ জনগণকে আস্থায় নিয়ে কোন গণঅভ্যুত্থান বা পরিবর্তন করতে সমর্থ। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমান বা জিয়াউর রহমান তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর সাথে সাথে ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং পরিবেশ পরিস্থিতির সুবিধেও পেয়েছেন। পরিবেশ-

পরিস্থিতির কারণে ভবিষ্যতে ইসলামী রাজনীতিতেও এ ধরনের কোন অবিসংবাদিত নেতার আবির্ভাব হতে পারে।

ইসলামী রাজনীতির সম্ভাবনা

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতিতে এখনো নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হতে না পারলেও ভবিষ্যতে ইসলামী শক্তির সম্ভাবনা অনুজ্জ্বল নয়। ইতোপূর্বে যে সকল প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা আলোচনা হয়েছে সেগুলোর যথাসম্ভব সমাধানের ওপর নির্ভর করছে এ সম্ভাবনা। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। ধর্মীয় আবেগ উচ্ছ্বাস, এবং রীতিনীতি এদেশের মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানের উদাসীনতা বা অনিয়মিত অভ্যাস (Practice) পরিলক্ষিত হলেও ধর্মীয় কোন ইস্যুতে এদেশের জনগণ অন্য যে কোন ইস্যুর চেয়ে অধিকতর সক্রিয় এবং ঐক্যবদ্ধ। রাজনৈতিকভাবে সেকিউল্যার বা বাম আদর্শের ধারক ব্যক্তিদেরও তাদের সন্তানদের ধর্মীয় জ্ঞান বা অনুশীলনের ব্যাপারে যত্নবান হতে দেখা যায়। সুদীর্ঘ হাজার বছরের ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমায় এ ভূখন্ডের জনগণ ইসলামের সাথে নিজেদের একাকার করে ফেলেছে। ইসলামের সরাসরি বিরোধিতা করে বাংলাদেশে রাজনীতি করাও কষ্টসাধ্য। এর প্রমাণ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্রমাগত করুন অবস্থা।

প্রায় সাড়ে ৫শ' বছর এ ভূখন্ড মুসলিম শাসকদের অধীনে ছিল। তৎকালীন শাসক গোষ্ঠির ব্যর্থতার দরুন এটি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কিন্তু মুসলিম জাগরণের ফলে আবার মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান সৃষ্টি হল। অতএব ইসলাম এবং মুসলিম রাজনীতি বাংলাদেশ ভুখন্ডের জনগণের সামগ্রিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ভূখন্ডের জনগণ ইসলামের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করে আসলেও সঠিক মুসলিম নেতৃত্বের অভাব বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে। পাকিস্তান আমলেও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ইসলামের নীতিমালার আলোকে রাজনীতি ও সমাজ পরিচালনা করতে চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের বিকল্প কোন ইসলামী দলের শক্তিশালী অবস্থান ছিল না। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির নিপীড়ন ও বৈষম্যের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক শক্তি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে ইসলামী দলগুলোর অখন্ড পাকিস্তান প্রীতি দলগুলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিপরীতে বিতর্কিত রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ইসলামী রাজনীতির ওপর এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির অবতারণা ঘটে। কিন্তু ইসলামী শক্তিগুলো ধীরে ধীরে আবার শক্তি সঞ্চয় করে। স্বাধীনতার মাত্র ৫ বছর পর ইসলামী দলগুলো আবার রাজনৈতিক তৎপরতা

শুরু করে এবং ৮ বছরের মধ্যে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি ভোট এবং আসন লাভ করে সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। এরপর থেকে ইসলামী দলগুলো অধিক তৎপরতা প্রদর্শন করে। রাজনৈতিক চরম প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই ইসলামী দলগুলো তৎপর ছিল। ইসলামী দলগুলোর অগ্রসরমান অবস্থা সেকিউল্যার ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলো স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের প্ররোচণায় অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগও ইসলামী দলগুলো বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ইসলামী শক্তিকে সামনে এগিয়ে নেয়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর রাজনৈতিক সংস্কার ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক তৎপরতা প্রদর্শনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার পর হাফেজ্জী হুজুরের রাজনীতিতে আগমন এবং এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোর সক্রিয় ভূমিকার কারণে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সুসংহত হয়। এরশাদ পরবর্তী নির্বাচনে 'জামায়াতে ইসলামীর' তুলনামূলক ভাল ফলাফল এবং সরকার গঠনে ভারসাম্য শক্তির ভূমিকা পালন রাজনৈতিকভাবে ইসলামী দলগুলোকে শক্ত ভিত্তি প্রদান করে। পরবর্তীতে খালেদা জিয়ার শাসনামলে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর সক্রিয় তৎপরতায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় নির্বাচনের পর প্রধান ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীর সরকারে যোগদান এ ধারাবাহিক সফলতারই ফলশ্রুতি।

রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো আজ একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী দলগুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় ইসলামী রাজনৈতিক শক্তি কোন নিয়ামকের ভূমিকায় আসতে না পারলেও নির্বাচনে, আন্দোলন-সংগ্রামে ইসলামী দলগুলো একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ কোন না কোন ইসলামী দলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এমনকি পীরদের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সম্পৃক্ততা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চরমোনাইর এবং আটরশির পীর এবং তাঁদের মুরিদগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িত । বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ইসলামী রাজনীতির একটি বিরাট উপাদান। বাংলাদেশে বর্তমানে ১২ হাজার মাঝারি ও বড় আকারের এবং ৮০ হাজার ক্ষুদ্রাকারের কওমী মাদ্রাসা রয়েছে বলে দাবি করা হয়।[৫৭] অতীতে এ কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ রাজনীতির ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করলেও বর্তমানে তারা রাজনীতি সচেতন। ইসলামী ঐক্যজোট কওমী মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। তাছাড়া ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলনে কওমী মাদ্রাসার উল্লেখযোগ্য ছাত্র-শিক্ষক জড়িত।

"তাবলীগ" বিশ্বব্যাপী একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় আন্দোলন। অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় বয়স্ক জনগোষ্ঠির হেদায়েত ও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করার কর্মসূচি নিয়ে তাবলীগ কাজের অনানুষ্ঠানিক শুরু হয় ১৯২৬ সালে।[৫৮] ১৯৪১ সালের দক্ষিণ দিল্লীর মেওয়াতে তাবলীগী জামায়াতের প্রথম ইজতেমাহ ২৫০০ লোকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ইলিয়াছ আখতার (১৮৮৬-১৯৪৪) এ "তাবলীগ" আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। ১৯৮৫ সালে খুলনার মাওলানা আবদুল আজিজের মাধ্যমে ঢাকায় তাবলীগী কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। ১৯৫০ এর দশকের শুরুর দিকে ঢাকার কাকরাইল মসজিদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে তাবলীগ কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে।[৫৯] "তাবলীগ জামায়াত ইসলামী জিন্দেগী চালু করার প্রাণপন মেহনত করিয়া যাইতেছে। ধর্ম পালনে শিথিল মুসলমানদের দ্বীনের প্রতি সতেজ করিয়া তুলিতেছে। গ্রামেগঞ্জে, শহরবন্দরে ও দেশ বিদেশে প্রচার কার্য চালাইয়া যাইতেছে। ঈমানভিত্তিক আমল গড়ে তোলার লক্ষ্যে "ছয় উছুল" কে ঘিরে তাবলীগ জামায়াতের কার্যক্রম পরিচালিত হইতেছে"। তাবলীগ জামায়াতের ছয় উছুল (বৈশিষ্ট্য) হচ্ছে ঈমান, নামায, এলেম ও যিকির, একরামুল মুসলেমিন (মুসলমানদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা করা) ইখলাস-ই-নিয়ত (নিয়তের বিশুদ্ধতা) ও দাওয়াতে তাবলীগ।[৬০] তাবলীগ জামায়াতের কাজের অন্যতম কৌশল হলো বিনয় ও নম্রতার সাথে সব সময় বিতর্ক ও ক্ষমতার রাজনীতি এড়িয়ে চলার নীতি। তাবলীগ জামায়াত এর যাবতীয় কার্যক্রমকে সব সময় সতর্কতার সাথে ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এজন্য তাবলীগ জামায়াতীদের কঠোরভাবে সমালোচনা করে থাকেন। তাবলীগ জামায়াতীগণ নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালনের জন্য রাজনীতিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করেন। বাস্তবে রাজনীতিযুক্ত হয়ে সততার সাথে ধর্মীয় জীবন যাপন করা তাবলীগকারীদের মতে সম্ভব নয়।[৬১] তাবলীগ জামায়াত ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে। জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে ইসলামের আহ্বান তাবলীগ জামায়াতের কাছে কম গুরুত্ব পাচ্ছে। তাবলীগ জামায়াতের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে। অন্যতম ২টি সমালোচনা হচ্ছে (১) তাবলীগী আন্দোলন মুসলমানদের জিহাদী চেতনা ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইহুদীদের একটি গভীর চক্রান্ত এবং (২) তাবলীগকারীগণ মুসলমানদের বড় বড় সংকটে নিশ্চুপ থাকেন। যেমনঃ আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ইরাক প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদের ওপর যে হত্যা নির্যাতন করা হয়েছে বা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য নেই।[৬২] অবশ্য এ সকল সমালোচনার ব্যাপারে তাবলীগ মুসলীদের নিজস্ব মতামত রয়েছে।

ইসলামী রাজনীতি প্রসঙ্গে তাবলীগের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গবেষক ড. হাসান মোহাম্মদ বলেন, সমালোচনা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের সামগ্রিক রাজনৈতিক সংকট, দেশ বিদেশের মুসলমানদের দূরবস্থা, প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর হামলা ইত্যাদি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তাবলীগ জামায়াত বিশ্বের কোন দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ

দেখায়নি। তাবলীগীদের মতে, মুসলিম বিশ্বের এই দূরবস্থার জন্য প্রধানতঃ মুসলমানদের ঈমানী ও আমলী দুর্বলতাই দায়ী। মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে ঈমান ও আমলের পথে আসলে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। সত্যিকার মুমিন মুসলামনদের আল্লাহ খেলাফত বা রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দিয়ে থাকেন।[৬৩]

বাংলাদেশেও "তাবলীগ" একটি শক্তিশালী অরাজনৈতিক ধর্মীয় আন্দোলন ও সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়েছে। "প্রচলিত অর্থে-তাবলীগ কোন রাজনৈতিক দল নয়। ইসলামী ও অন্যান্য দল থেকেও এর ধরন-ধারণে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যক্ষ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কর্মসূচি না থাকার কারণে এখানে সমাবেশ ঘটেছে ধর্মভীরু দলনিরপেক্ষ একটি বিরাট জনগোষ্ঠির। সেই সাথে যোগ হয়েছে প্রচলিত রাজনীতি বিরোধী শান্তিকামী একটি জনগোষ্ঠির। ইসলামী রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট, এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়াসীরা তাবলীগকে গ্রহণ করেছে তাদের সহযোগী ফ্লাটফরম হিসেবে"।[৬৪] বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় আন্দোলন হচ্ছে তাবলীগ জামায়াত। রাজনীতির বিষয়ে তাদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকলেও প্রকাশ্যে ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রকাশ্য অবস্থান পরিলক্ষিত হয়না। তাবলীগের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে কোন বক্তব্য রাখেনা। জামায়াতে ইসলামী তাবলীগ জামায়াতের কার্যক্রমকে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক শক্তি মনে করে। তবে তাবলীগ জামায়াতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থক ইসলামী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয় । একজন তাবলীগ মুরুব্বীর মতে আসলে খাঁটি তাবলীগওয়ালা বা যার মধ্যে দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি এসে গেছে, সে কোনদিন আওয়ামী লীগ বা বিএনপিকে ভোট দিতে পারবেনা। আর এই সমঝ-বুঝ বা উপলব্ধি আসাটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিলম্বিত হয়।[৬৫]

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক বিস্তৃতি প্রায় সকল জেলা-উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া চরমোনাইর মুজাহিদ কমিটিও দেশব্যাপী বিস্তৃত। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কার্যক্রম ৫৯ জেলায় এবং ২০০ উপজেলায় সক্রিয়ভাবে অব্যহত রয়েছে।[৬৬] প্রধান ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক অবস্থা মজবুত এবং সুসংগঠিত। একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী স্বীকৃত। জামায়াত মোট ৭৮টি সাংগঠনিক জেলা এবং প্রায় সাড়ে সাতশ' সাংগঠনিক থানায় তাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ইউনিয়নে জামায়াতের ইউনিট চালু রয়েছে। জামায়াতের জনশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৪৪৮ জন রুকন নিয়ে ১৯৭৯ সালে প্রকাশ্যে কাজ শুরু করে। ২০০৬ সালে জামায়াতের রুকন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২২,০০০ জনে। কর্মী ও সহযোগী সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে দুই লাখ এবং এক কোটির মত।[৬৭]

জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক তৎপরতার অগ্রগতির হার নিম্নের সারণি থেকে উপলব্ধি করা যায়।[৬৮]

জনশক্তি	সাল				
	১৯৬৮-৬৯	১৯৭৯	১৯৯১	২০০০	২০০৬
রুকন	৪২৫	৪৪৮	৫৮০০*	১১,০০০*	২২০০০
কর্মী	-	-	৬০,০০০*	৭৬,০০০*	২,০০,০০০
সহযোগী সদস্য	৪০,০০	-	৩,৪২,০০০*	২২,৪৬,০০০*	১,০০,০০০০০

** এটি প্রকৃত সংখ্যা নয়, সর্বনিম্ন সংখ্যা উল্লেখ করা হল। প্রকৃত সংখ্যা আরো কিছু বেশি ।*

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির নেতৃত্ব এককভাবে শুধু আলেম সমাজ বা ইংরেজি শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ইসলামী দলগুলোর নেতৃত্বে রয়েছেন। তবে প্রায় সকল ইসলামী দলের মূল নেতৃত্ব এখনও মাদ্রাসা শিক্ষিত লোকের হাতে। অবশ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিষদে উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব আছে। রাজনীতিতে আলেম সমাজের দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের উলেমা শ্রেণীও রাজনীতিতে বিশেষ করে ইসলামী রাজনীতিতে এখনও কান্ডারী হিসেবে সক্রিয় রয়েছেন। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ইসলামী রাজনৈতিক দল যেমন জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফত আন্দোলনের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বাকী সংগঠনগুলো উলেমা শ্রেণী প্রাধান্য দল। তুলনামূলকভাবে খেলাফত মজলিসের নেতৃত্বে সাধারণ শিক্ষিত এবং উলেমার একটি সমন্বয় ছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে শূরা এবং নেতৃত্বের ধরন প্রশ্নে খেলাফত মজলিস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।[৬৯] মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বের অংশটি উলেমা প্রাধান্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, অপর পক্ষে মাওলানা ইসহাক ও অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদেরের নেতৃত্বাধীন খেলাফত মজলিসে সাধারণ শিক্ষিত নেতৃত্বের প্রাধান্য ঘটে। নিম্নে ঐক্যবদ্ধ খেলাফত মজলিস এবং বিভক্তির পর একটি অংশের (ইসহাক-কাদের) কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উলামার অবস্থান সারণির মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো।

ঐক্যবদ্ধ খেলাফত মজলিসের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহে উলামার অবস্থান।[৭০]

কর্তৃপক্ষের নাম	মেয়াদ	মোট সদস্য	আলিম সদস্য	মোট সদস্যের%
অভিভবক পরিষদ	১৯৯৬-১৯৯৮	১১	১১	১০০
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ	১৯৯৩-১৯৯৫	২৩	১২	৫২.১৭
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা	২০০১-২০০২	১৮৩	১২৯	৭০.৪৯

খেলাফত মজলিসের (ইসহাক-কাদের) নেতৃত্বের (কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি) ধরণ নিম্নরূপ:[৭১]

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
৬০ বছর	৬	১৫.৩৮
৫৫-৬০ "	১৭	৪৩.৫৮
৫০-৫৫ "	০৮	২০.৫১
৪০-৫০ "	০৪	১০.২৫
৩০-৪০ "	০৪	১০.২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা

মাদ্রাসা শিক্ষিত	১২	৩০.৭৬
সাধারণ শিক্ষিত	২২	৫৬.৪১
উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত	০৫	১২.৮২

উল্লেখ্য খেলাফত মজলিসের একটি অংশ এখনো উলেমা প্রাধান্য নেতৃত্বের অধীন পরিচালিত হলেও অপরটির নেতৃত্বে সাধারণ শিক্ষিত এবং উলেমা সমন্বিত। এ অংশটির নেতৃত্বের মধ্যে প্রবীণ-নবীনের সংমিশ্রণও রয়েছে যা সংগঠনটিকে গতিশীল রাখতে সহায়তা করছে। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ব্যতিক্রমী একটি সংগঠন। এ দলের প্রতিষ্ঠাতাও একজন আলিম ছিলেন। কিন্তু এ দলটিতে মাদ্রাসা এবং সাধারণ ইংরেজি শিক্ষিত উভয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। বর্তমান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে উলেমা শ্রেণীর তুলনায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণকারী নেতৃত্বের প্রাধান্য বিদ্যমান। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধরণ বোঝার জন্য দু'টি সারণি ব্যবহার করা হল

জামায়াতে ইসলামীর নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহে মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষিতদের অবস্থান[৭২]

কর্তৃপক্ষের নাম	মেয়াদ	মোট সদস্য	আলিম সদস্য	আলিম সদস্যের%	সাধারণ শিক্ষিত সদস্য	শতকরা হার
নির্বাহী পরিষদ	২০০১-২০০৩	১৫	৪	২৬.৬৬	১১	৭৩.৩৩
কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ	২০০১-২০০৩	৪৮	১২	২৫.০০	৩৬	৭৫.০০
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা	২০০১-২০০৩	১৬৯	৫৩	৩১.৩৬	১১৬	৬৮.৬৩

নিম্নে বর্তমান (২০০৯) নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের বয়সও শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা হলো: [৭৩]

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
৭০-৮০ বছর	৪	২৬.৬৬
৬০-৭০ "	৩	২০.০০
৫৫-৬০ "	৩	২০.০০
৪৫-৫৫ "	৫	৩৩.৩৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

মাদ্রাসা শিক্ষিত: (কামিল)	৫	৩৩.৩৩
মাষ্টারস/বার এট্ ল্	৯	৬০.০০
বি.এ	১	৬.৬৬

ওপরের দু'টি সারণির তথ্য থেকে দেখা যায়, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব প্রধানত: কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাধারী ব্যক্তিদের হাতে নিহিত। তবে নেতৃত্বের কাঠামোতে মাদ্রাসা শিক্ষিত জনগোষ্ঠিরও একটি সমন্বয় রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাধান্য বেশি হওয়ার প্রধান কারণ ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রাক্তন নেতাদের জামায়াত নেতৃত্বে সমাসীন হওয়া। বর্তমানে কর্মপরিষদের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনই ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাক্তন নেতা। তম্মধ্যে ৭ জনই হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি।

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির সম্ভাবনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ছাত্র রাজনীতিতে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের প্রভাব ও গ্রহণ যোগ্যতা। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে ভূমিকা পালনকারী ইসলাম ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন (ইশা ছাত্র আন্দোলন) ইসলামী ছাত্র মজলিস, খেলাফত ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী ছাত্রমোর্চা। এ ছাড়া ছাত্র জমিয়ত, জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদ ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ছাত্র রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ছাত্র সংগঠন সমূহের কর্মপদ্ধতিগত খুব বেশি পার্থক্য নেই। তবে মূল রাজনৈতিক দলের নীতি-আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাত্র সংগঠনগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। জমিয়তে তালাবয়ে আরাবিয়া, কওমী মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদ শুধু মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে কাজ করে। মূল রাজনৈতিক দলের মতো ইসলামী ছাত্র সংগঠনগুলোও মাদ্রাসা ছাত্র প্রাধান্য নির্ভর সংগঠন। সংগঠন গুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যতিক্রম হচ্ছে ইসলামী ছাত্রশিবির। এ সংগঠনটির মূল নেতৃত্ব সবসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মাদ্রাসা (আলীয়া) ছাত্রদের মধ্যেও এ সংগঠনের কার্যক্রম অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাদ্রাসা এবং কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের সমন্বয় রয়েছে।

'ইসলামী ছাত্র মোর্চা বাংলাদেশ' চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের সহযোগী ছাত্র সংগঠন। ৪৫টি জেলায় সংগঠনটির জেলা কমিটি রয়েছে। এছাড়া সারাদেশে প্রায় ৩৯ হাজার সদস্য রয়েছে তম্মধ্যে সহযোগী সদস্য ৯ হাজার এবং সাধারণ সদস্য ৩০ হাজার। এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো হচ্ছে ৩টি। মজলিসে আমেলা বা কার্যনির্বাহী পরিষদ, মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ, এবং মজলিসে খাস বা উপদেষ্টা পরিষদ। মাদ্রাসা কেন্দ্রিক এ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কিছু স্কুল-কলেজেও এ সংগঠনের সীমিত পর্যায়ে কাজ রয়েছে। এছাড়া জেলা, মহানগর, উপজেলা, পৌরসভা, থানা, ইউনিয়ন ও মাদ্রাসা পর্যায়ে সংগঠনের কমিটি রয়েছে।[৭৪]

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের (ই শা ছা আ) কার্যক্রম মোটামুটি বিস্তৃত। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে এটি স্বীকৃত। ১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট ই শা ছা আ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের তরুণ ছাত্র সমাজকে চারিত্রিক ও নৈতিক অধ:পতন থেকে তুলে এনে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' এর পথে পরিচালিত করে মুসলিম মিল্লতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্যের দিকে ধাবিত করার জন্যই ই শা ছা আ ছাত্র আন্দোলনের অভিযাত্রা। ইলম ও তারবিয়াত (জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ), আমল ও তাযকিয়াহ (আত্মশুদ্ধি), তাবলীগ (দাওয়াত), তানজীম (সংগঠন), ও ইনকিলাব (বিপ্লব) এ ৫ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ৮৭টি সাংগঠনিক জেলা কমিটির মাধ্যমে সমগ্র দেশে ই শা ছাত্র আন্দোলনের কাজ চলছে বলে সংগঠনে সেক্রেটারী জেনারেল জানান।[৭৫] ই শা ছাত্র আন্দোলনের জনশক্তির শ্রেণীবিন্যাস তিনটি। আমলের ভিত্তিতে জনশক্তির এ স্তর নির্ধারণ করা হয়। স্তরগুলো হচ্ছে: সদস্য,কর্মী ও মুবাল্লিগ। সারাদেশে ২০ লাখের ওপরে ইশা ছাত্র আন্দোলনের প্রাথমিক সদস্য রয়েছে বলে দাবি করেন সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল। বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র আন্দোলন মাওলানা মরহুম হাফেজ্জী হুজুরের আদর্শের দল খেলাফত আন্দোলনের সহযোগী ছাত্র সংগঠন। ১৯৯০ সালের ৮ জুন প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি ৬ দফা কর্মনীতির ভিত্তিতে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজে কাজ করে যাচেছ। শিক্ষা, শিষ্টা, নিষ্ঠা ও কুদ্ধি হল এ সংগঠনের মূলনীতি। এক পরিসংখ্যানে এ ছাত্র সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ৫৩,৭৯৩ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৬]

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস (ছাত্র মজলিস) ১৯৯০ সালের ৫ জানুয়ারী কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ব্যক্তি জীবনের পরিশুদ্ধি, সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইহকালিন কল্যাণ লাভ এবং এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও আন্দোলনের কর্মসূচির ভিত্তিতে এ সংগঠন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ছাত্র সংগঠনটির সাংগঠনির স্তর তিনটি। ১. প্রাথমিক সদস্য ২. কর্মী ৩. সহযোগী সদস্য ও সদস্য। নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংগঠনটির মূল সংগঠন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কোন হস্তক্ষেপ নেই বলে জানান ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়

সভাপতি নির্ধারিত হন। সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতি ২৫ জনে একজন করে এবং অবশিষ্ট সংখ্যার জন্য একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সেক্রেটারী জেনারেল এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সম্পাদকের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন করেন। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি, প্রতিনিধি পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত হয় ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো।[৭৭] সাম্প্রতিক সময়ে হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশের ছাত্র ও যুব সংগঠন 'লিবারেটেড ইয়থ' বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসাসমূহে তাদের কার্যপরিধি বিস্তৃত করছে। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে বলে জানা গেছে। এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ব্রাক ইউনিভার্সিটি, সিটি ইউনিভার্সিটি, সাইথ-ঈস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দান ইউনিভার্সিটিতে এ সংগঠনের সক্রিয় শাখা রয়েছে।[৭৮] খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সংগঠন তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।[৭৯]

স্বাধীনতা পরবর্তী ছাত্র রাজনীতিতে ইসলামী ধারার প্রথম সংগঠন হচেছ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। তরুণ ছাত্রসমাজের কাছে ইসলামের আহবান পৌছিয়ে তাদের ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যোগ্যতা সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সমস্যার সমাধান এবং জ্ঞানার্জন, ক্যরিয়ার সৃষ্টি, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব- এ ৫টি কর্মসূচির ভিত্তিতে ছাত্র শিবিরের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি, কার্যকরী পরিষদ ও সেক্রেটারিয়েটের সমন্বয়ে শিবিরের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। এ সংগঠনের সমগ্র জনশক্তি ৪টি স্তরে বিভক্ত। ওগুলো হচ্ছে ১. সমর্থক ২. কর্মী ৩. সাথী ও ৪. সদস্য। জ্ঞানার্জনের জন্য নির্ধারিত সিলেবাস ও প্রত্যাশিত কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে সাথী ও সদস্য করা হয। সাথী ও সদস্যদের আল্লাহর নামে শপথবাণী উচ্চারণ করতে হয়।[৮০] তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে সভাপতির পদে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরই সম্ভবত একমাত্র ছাত্র সংগঠন যার সভাপতি নির্বাচন প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায়, শিবিরের প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত কোন কারণেই (হোক তা সামরিক শাসন, জরুরি আইন বা নির্বাচনী ঢাকঢোল) ছাত্রশিবিরের নেতৃত্ব নির্বাচন বিলম্বিত হয়নি। সংগঠনটির সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে থাকে।[৮১]

প্রতিষ্ঠার চার বছরের মধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংসদ

নির্বাচনের ইসলামী ছাত্রশিবির অংশ গ্রহণ করে। ১৯৮০ সালের ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিনিধি মুহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।[৮২]

১৯৮০ সালে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির তিনটি বড় দলের একটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৮৩] ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয়ের মাধ্যমে ছাত্রশিবির ছাত্র সমাজসহ সুধীমহলের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ অনুষ্ঠিত চাকসু নির্বাচনে ভিপি, জিএস, এ জি.এসসহ ২৬টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে ইসলামী ছাত্র শিবির বিজয়ী হয়।[৮৪] হল সংসদ গুলোতেও ইসলামী ছাত্র শিবির নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদে নিরংকুশ আসন লাভ সে সময় রাজনৈতিক ও ছাত্র অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ থাকে, পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে আবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন শুরু হলে ইসলামী ছাত্রশিবির সে নির্বাচন সমূহেও অংশ গ্রহণ করে। নিম্নে ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত ৪৮টি কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জরিপ প্রদান করা হল যা থেকে শিবিরের প্রতি ছাত্র সমাজের সমর্থনের চিত্র ফুটে ওঠে। এখানে ৮ জেলার ৪৮ টি কলেজের ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে।

মোট ৮০৪টি আসনের মধ্যে ছাত্রলীগ (সু-র) পেয়েছে ২৮২টি, ছাত্রশিবির ১৭২ টি এবং ছাত্র ইউনিয়ন ১২৬টি, ছাত্রলীগ (মু-না) ১৪টি এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ১৮টি আসন। বাকী আসনগুলো পেয়েছে অন্যান্য সংগঠন। ৪৮টি কলেজের ১২টিতে প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে শিবির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। ৬টি কলেজে প্রথম, ২টিতে দ্বিতীয় এবং ৪টি কলেজে তৃতীয় স্থান লাভ করে। উক্ত কলেজগুলো ভিপি পদে ৮টি এবং জি.এস. পদে ৭টিতে ছাত্রশিবির জয়লাভ করে।[৮৫]

১৯৯০ এর গণঅভ্যূত্থানের পর ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পুনরায় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রশিবির তাতে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কিছু ফলাফল উল্লেখ করা হলো। নিম্মোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রশিবির সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে:

১। খুলনা বিএল কলেজ ২। দৌলতপুর কলেজ, ৩। রামপাল কলেজ, ৪। কক্সবাজার কলেজ ৫। সাতক্ষীরা কলেজ, ৬। বগুড়া আজিজুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ৭। সিলেট তিব্বিয়া কলেজ, ৮ দর্শনা কলেজ, এ ছাড়া ঢাকার ঐতিহ্যবাহী তামীরুল মিল্লাত মাদ্রাসা ছাত্র সংসদ সহ অনুষ্ঠিত প্রায় সকল মাদ্রাসা ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শিবির বিজয়ী হয় । ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আংশিক বিজয়ী হয়েছে এমন কলেজ গুলো ছিল ১। বরিশাল বি.এম কলেজ, ২ আলেকজান্ডার কলেজ ৩ । নোয়াপাড়া কলেজ, ৪। ছাগলনাইয়া কলেজ, ৫। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ৬। দেবিদ্বার কলেজ, ৭। চৌদ্দগ্রাম কলেজ, ৮। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৯। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১০। বরিশাল

পলিটেকনিক সহ আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[৮৬] ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত চাকসু নির্বাচনে সম্মিলিত ছাত্র ঐক্যের বিরুদ্ধে ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফন্টসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎপর ১২টি ছাত্র সংগঠন ঐকবদ্ধভাবে শিবিরের বিরুদ্ধে প্যানেল ঘোষণা করে। নির্বাচনে ছাত্রশিবির ১টি হলে বিজয়ী হলেও চাকসু এবং অন্য হলগুলোতে কোন আসন পায়নি। চাকসু নির্বাচনে শিবিরের ভিপি এবং জি.এস. যথাক্রমে ৩৬.৪৭% এবং ৩৪.৫৯% ভোট লাভ করে।[৮৭] মূলত এককভাবে শিবিরের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবেনা নিশ্চিত হয়েই ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের রাজনৈতিক এবং আদর্শিক মতভেদ ভুলে গিয়ে ঐকবদ্ধ প্যানেলে নির্বাচন করে। শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে প্যানেল দেয় শিবির বিরোধী ছাত্র সংগঠনসমূহ। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐকবদ্ধ প্যানেলের বিরুদ্ধেও এককভাবে শিবির বিজয়ী হয়।[৮৮]

ইসলামী ছাত্রশিবির ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী কর্মী সৃষ্টির পাশাপাশি রাষ্ট্র এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্য 'ক্যারিয়ার' গঠনের ওপর জোর দেয়। ছাত্রশিবিরের প্রাক্তন নেতা-কর্মীদের অনেকে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত আসন প্রাপ্তির দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল করে। নির্বাচনে যে দু'জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারাও হচ্ছেন ছাত্র শিবিরের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সহসভাপতি। সঠিক নেতৃত্বের পরিচালনায় স্বাধীনভাবে সংগঠনটি কাজ করতে পারলে ছাত্রশিবির ইসলামী রাজনীতির জন্য ভাল ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে বলে মনে হয়।

একটি দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। দুর্নীতি আজ বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। দুর্নীতি সমাজ এবং রাষ্ট্রকাঠামোকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত নন। বরং রাজনীতিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে বলে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ক্ষোভ বিরাজমান। এরশাদের সামরিক সরকার এবং ওয়ান এলেভেন (২০০৭)-এর সামরিক বাহিনী মদদপুষ্ট ফখরুদ্দিন এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ এবং দুর্নীতি বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে প্রথমদিকে জনগণের ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ নিজেদের দুর্নীতিমুক্ত রাখার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ করলে জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভে সমর্থ হবে। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের বহু কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতা (দলের সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী, স্থায়ী কমিটি, প্রেসিডিয়াম সদস্যসহ) গ্রেফতার হন। এ ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী ব্যতিক্রম ছিল। সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে বড় দু'টি দলের কেন্দ্রীয় নেতারা যখন একে একে আটক হচ্ছিল তখন প্রিন্ট মিডিয়ায় বার বার সরকারের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা

হয়েছে। সরকার জামায়াত নেতৃবৃন্দকে আটক করছেনা-অভিযোগ প্রবল হয়ে উঠে। এমনি এক পরিস্থিতিতে সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্ক ফোর্স প্রধান মেজর জেনারেল (অব:) আবদুল মতিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "সরকার জামায়াতকে ছাড় দিচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। তবে আমার জানামতে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ পাইনি।[৮৯] চার দলীয় জোট সরকারের (২০০১-২০০৬) শরিক হিসেবে জামায়াতের দু'জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। পত্রিকায় এ সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচার-প্রপাগ্যান্ডা হলেও তা সত্য হিসেবে প্রমানিত হয়নি। দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপারে জামায়াত মন্ত্রীদের কোন সংশ্লিষ্টতার না থাকায় জামায়াতের তথা ইসলামী রাজনীতির একটি ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। জামায়াত মন্ত্রীদের এই 'ক্লিন ইমেজ' ইসলামী রাজনীতির একটি অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা ভবিষ্যতে ইসলামী রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে।

রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংগঠনিক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসমর্থনও বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। জামায়াতের ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনের বিষয়টি নিম্নের সারনিতে উল্লেখ করা হলো:

বিভিন্ন জাতীয়-সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রাপ্ত ভোট[৯০]

বছর/নির্বাচন	প্রার্থীর সংখ্যা	বিজয়ী আসন	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের%
১৯৭০ সাল	১৭০	০	৯,৯১,৯০৮	৬.০০
১৯৭৩, ১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	জামায়াত নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি	০	০	০
১৯৭৯ সাল ২য় জাতীয় সংসদ	২৬৬ আইডি এল ও মুসলিমলীগ জোট	২০	১৯,৪১,৩৯৪	১০.০৮
১৯৮৬ সাল, ৩য় জাতীয় সংসদ	৭৬	১০	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১
১৯৮৮ সাল, ৪র্থ জাতীয় সংসদ	বয়কট	০	০	০
১৯৯১ সাল, ৫ম জাতীয় সংসদ	২২২	১৮	৪১,৩৬,৬৬১	১২.১৩
১৯৯৬ সাল, ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ	বয়কট	০	০	০
১৯৯৬ সাল, ৭ম জাতীয় সংসদ	৩০০	৩	৩৬,৫৩,০১৩	৮.৬১
২০০১ সাল, ৮ম জাতীয় সংসদ	৩১ (৪ দলীয় জোট)	১৭	২৩,৮৫,৯০৭	৪.২৯
২০০৮ সাল, ৯ম জাতীয় সংসদ	৩৮, ৪ দলীয় জোট	০২	৩২,৮৮,৭৮২	৪.৮১

সূত্র: নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট এবং জামায়াত কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক কর্তৃক সংকলিত।

ওপরের সারণি থেকে বোঝা যায়, জামায়াতের ভোট প্রাপ্তি ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বশেষ ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত মাত্র ২টি আসন লাভ করলেও, সে নির্বাচনে

জামায়াতের ভোট বেড়েছে ৯ লাখের ওপরে। তাছাড়া এ নির্বাচনে জামায়াতের কোন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়নি। নির্বাচনে লক্ষাধিক হারে ভোট পেয়েছে জামায়াতের ১৩ জন প্রার্থী। ২২ জানুয়ারী, ২০০৯ অনুষ্ঠিত ৩য় উপজেলা নির্বাচনে জামায়াত সমর্থিত ২৪জন উপজেলা চেয়ারম্যান, ২৬জন ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) এবং ১৩ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, চাষী কল্যাণ সমিতি, ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম, আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে জামায়াত পরোক্ষভাবে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করছে। বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রাথীগণ অংশ গ্রহণ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচিত হন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতি, ডিন, সিনেট, ও সিন্ডিকেট নির্বাচনে জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকগণ নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। ডাক্তারদের পেশাজীবী সংগঠন বিএমএ নির্বাচনেও জামায়াত সমর্থিত ডাক্তারগণ নির্বাচিত হচ্ছেন। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য পদেও নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াত সমর্থিত আইনজীবীগণ। জামায়াতের সার্বিক অগ্রগতি এবং অন্যান্য ইসলামী দলের সাংগঠনিক শক্তির কারণে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর শক্তি ও প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও ইসলামী ধারার রাজনীতি নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম ধর্মালম্বী হলেও কেন ইসলামী দলগুলো সেভাবে সমর্থন লাভ করে এগিয়ে যেতে পারছেনা? এ ব্যাপারে ইসলামী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁরা ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির চক্রান্ত অপতৎপরতা এবং সুমলমানদের ইসলামরে মূল শিক্ষার ব্যাপারে অজ্ঞতাকে দায়ী করেন। কিন্তু এ বক্তব্যই শেষ কথা নয়। বরং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী দলুগলোকে তাদের কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। ইসলামী দলসমূহের নেতৃবৃন্দকে আরো গণমুখী চরিত্র অর্জন করতে হবে। মানুষের সুখে-দুঃখে নিজেদেরকে আরো সম্পৃক্ত করতে হবে। কথায় এবং কাজে মিল রেখে নিজেদের জীবন ও চরিত্রকে গঠন করে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, সেবা এবং দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির সম্ভাবনা অধিক বৃদ্ধি পাবে।

তথ্য সংকেত ও টীকা

১। দেখুন, *স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭২

২। *The Morning News*, 23 October, 1955

৩। Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, University Press Limited, Dacca, 1980, p.113

৪। *The Statesman*, 29 April, 1988

৫। বক্তব্য, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, মহাসচিব বিএনপি, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৬। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯

৭। For details, see, Aftabuddin Ahmad, *The Mujib Regime in Bangladesh: Its problem & performances*, Ph.D Dissertation, University of London, 1983, PP.254-90

৮। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,*সমাজ নিরীক্ষণ*, ২৬ সংখ্যা, নভেম্বর '৮৭, পৃ. ৪

৯। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮১, পৃ. ২২

১০। বিস্তারিত, আনু মুহাম্মদ, "বাংলাদেশের মৌলবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ২৬, পৃ, ২০-২৪

১১। Bhuian Md. Monoar Kabir, *Politics and Development of the Jammat-e-Islami Bangladesh*. AH Development Publishing House, Dhaka, 2006 P. 27

১২। See, Al' Alwani, "Missing Dimension in Contemporary Islamic Movements" *The America Journal of Islamic Social Sciences*, 12.2, Summer, 1995 PP.240-254, John L. Esposito, `Introduction" in John L. Esposito, ed, *Political Islam: Revolution, Radicalisen or Reform*, PP. 1-14

১৩। Bhuian M. Monoar Kabir, "Islamic Politics in Bangladesh: Internal and External contexts" in Mahfuzul H. Chowdhury, ed, *Thirty years of Bangladesh Politics*, The University Press Ltd. 2002, P.150

১৪। See, Samuel P, Huntington, " *The Clash of Civilization*", Bernard Lewis, The Political Language of Islam, Chicago, 1991

১৫। Veinin and Joe Stork, eds, *Political Islam: Essays from Middle East Report*, Berkeley; University of California Press 1999. Cited in Bhuian M. Monoar Kabir, *op.cit*, P.150

১৬। Bhuian M. Monoar Kabir, *op.cit*, P.151

১৭। Emajuddin Ahmad, "Current Trends of Islam in Bangladesh" in *Society and Politics in Bangladesh*, Academic Publishers, Dhaka 1989, P.135

১৮। দেখুন, *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ*, ১৯৮৬

১৯। *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা -২৬, পৃ. ৯

২০। মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, "ধর্ম ও রাজনীতিঃ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ," *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা -৬, ১৯৮২, সেপ্টেম্বর, পৃ. ৩৫-৩৬

২১। বিস্তারিত, মাওলানা আবদুল আউয়াল, *জামাতের আসল চেহারা*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৮২-৮৬

২২। মাওলানা আবদুল আউয়াল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭

২৩। *ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার*, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

২৪। *ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার*, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, ১৭ মার্চ, ২০০৮

২৫। জামায়াতের আবেদন, পৃ.১১ উদ্ধৃতঃ মাওলানা আবদুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৮

২৬। *সাক্ষাৎকার*, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আমীর জামায়াতে ইসলামী

২৭। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

২৮। দ্রষ্টব্যঃ ৪৫নং, *ঢাকা ল' রিপোর্ট*, হাইকোর্ট বিভাগ, পৃ. ৪৩৩

২৯। *মেনিফেস্টো*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ.২৮- ২৯

৩০। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, *জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ২০০১, পৃ. ২৩০

৩১। *ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার*, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, ৪ মে, ২০০৮

৩২। *নীতিমালা*, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, অক্টোবর, ১৯৯৭, পৃ. ১৯

৩৩। *সেমিনার স্মারক গ্রন্থ* (২০০৭), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫-১৬

৩৪। বিস্তারিত দেখুন, Richard Holloway, *Supporting Citizens Initiatives,* Dhaka, UPL, 1998, P. 20

৩৫। *সাক্ষাৎকার*, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

৩৬। ড. মাহফুজ পারভেজ, "বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা", *সেমিনার স্মারক গ্রন্থ (২০০৭)*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃ. ২৪-২৫

৩৭। উদ্ধৃত, ডঃ মাহফুজ পারভেজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

৩৮। আল হাদীস, *আবু দাউদ শরীফ*

৩৯। মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, "ক্ষুদ্র ঋণঃ দারিদ্র্য দূরীকরণ বনাম সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়করণ", *সেমিনার স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, ২০০৬, পৃ. ১৪২

৪০। অধ্যাপক গোলাম আযম, *ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই*, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৮ পৃ. ৭

৪১। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, ৫ম খন্ড, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ২২০

৪২। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯

৪৩। অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস*, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ৪৫-৪৬

৪৪। অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস*, পৃ. ৩৪

৪৫। বিস্তারিত, *পূর্বোক্ত*

৪৬। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৯

৪৭। Michael Parentti, *Inventing Reality the Politics of Mass Media*, St Martin Press, New York, 1986, P. 213-226.

৪৮। আহমদ আবদুল কাদের, তথ্য সন্ত্রাস: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ জুন, ২০০৪

৪৯। *The Wall Street Journal*, USA, April 2, 2002

৫০। ড: মোহাম্মদ আবদুর রব, *বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তথ্য আগ্রাসনঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, ঢাকা, ২০০৩ পৃ. ১৮৭-১৮৮

৫১। Sadek khan, BD Can't Slacken Alert in Diplomatic and Security Fronts, *Holiday*, December 13, 2002

৫২। হিন্দুস্থান টাইমসের রিপোর্ট, *মানবজমিন*, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪

৫৩। ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯

৫৪। উদ্ধৃত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানু-মার্চ, ২০০৬, পৃ. ১৪৯

৫৫। গবেষক কর্তৃক পরিচালিত *জরিপের* ফলাফল

৫৬। ব্রাক এ পর্যন্ত ৬৪ জেলার ৪৮০টি থানার ৬৮,৪০৮টি গ্রাম এবং ৪৩৭৮টি বস্তির ১০ কোটি মানুষদের ঋণ দিয়েছে ১৩,৩২১ কোটি টাকা। ব্রাকের রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম বিস্তৃত ৬৮,৪০৮টি গ্রামে। নন ফর্মাল স্কুল ৩৪ হাজারের মত । এ সব স্কুলে ১১লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭০ শতাংশ ছাত্রী । গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতার বেশীর ভাগ হচ্ছে মহিলা, সূত্রঃ সেমিনার স্মারকগ্রন্থ, (২০০৩-২০০৫), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৬, পৃ- ১২৬, ১২৮

৫৭। মুফতি ফজলুল হক আমিনীর ভাষন, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩০ জুলাই, ২০০৩

৫৮। মাওলানা আরিফ বিল্লাহ (সংকলিত), *তাবলীগ বয়ান (২য় খন্ড)*, ঢাকা কাশেমিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৯, পৃ,৯৯

৫৯। মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, *তাবলীগ জামায়াত*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৬, পৃ. ৫১-৫৪

৬০। ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *তাবলীগী ছয় নম্বর*, দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার এন্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ.৯

৬১। মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

৬২। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬-১২২

৬৩। ড. হাসান মোহাম্মদ, *তাবলীগ আন্দোলন, তাবলীগ জামায়াত*, কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০০, পৃ. ১১

৬৪। *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৯২

৬৫। সৈয়দ মো: মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল-মাদানী (সম্পা), *আলোর বাতিঘর পীর সাহেব চরমোনাই* (রহ), ২০০৭, পৃ. ২৫

৬৬। *সাক্ষাৎকার*, অধ্যাপক আহমদ আবুল কাদের, মহাসচিব, খেলাফত মজলিস

৬৭। বক্তব্য, মতিউর রহমান নিজামী, *অষ্টম কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন-২০০৬ (পুস্তিকা)*, পৃ. ৭

৬৮। Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath, UPL 1988, P.31*, এবং ভাষণ, মতিউর রহমান নিজামী, *অষ্টম রুকন সম্মেলন*, ২০০৬

৬৯। *সাক্ষাৎকার*, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, মহাসচিব, খেলাফত মজলিস

৭০। ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)*, পৃ. ৯১

৭১। খেলাফত মজলিসের মহাসচিব অধ্যাপক আবদুল কাদের কর্তৃক *সরবরাহকৃত তালিকা* হতে প্রাপ্ত তথ্য

৭২। *কেন্দ্রীয় অফিস*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এবং ড: তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

৭৩। জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কার্যলয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে *সারণিকৃত*

৭৪। সাক্ষাৎকার, কেন্দ্রীয় সভাপতি, ছাত্রমোর্চা, উদ্ধৃতঃ *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ১ জুন, ২০০৫ পৃ.১৩-১৪

৭৫। *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ১জুন, ২০০৫, পৃ. ১৫-১৬

৭৬। *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৭

৭৭। বিস্তারিত, সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ১ জুন, ২০০৫, পৃ. ১৮

৭৮। Mahfuz Safique, *Political Islam in Bangladesh: The Serpent Green Rises.* http://mahfuz. wordpress. com

৭৯। বিস্তারিত, *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ১ জুন, ২০০৫. পৃ. ১৯-২০

৮০। বিস্তারিত, *সংবিধান ও কর্মপদ্ধতি*, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

৮১। *সংবিধান*, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

৮২। *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২রা জানু, ১৯৮১

৮৩। ইউ. এ. বি. রাজিয়া আক্তার বানু, বাংলাদেশে জামায়াত-ই-ইসলামী আন্দোলনঃ বর্তমান ও ভবিষ্যত, বইঃ গোলাম হোসেন, *বাংলাদেশঃ সরকারও রাজনীতি*, একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯২, পৃ. ১২৪

৮৪। অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, পঞ্চশ খন্ড, কামিয়ার প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ১৯৭

৮৫। মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, (সম্পা), *একাত্তরের ঘাতক জামায়াতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান*, ১৯৮৯, পৃ.১৫৮-৫৯

৮৬। *Students' Views*, Bangladesh Islamic Chhatra Shibir, April, 1993, P. 18

৮৭। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

৮৮। *ছাত্র সংবাদ*, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯, পৃ. ১২

৮৯। *দৈনিক সংবাদ*, ২৬ জুলাই, ২০০৭

৯০। *নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট* এবং জামায়াতে ইসলামীর *কেন্দ্রীয় কার্যালয়* থেকে প্রাপ্ত তথ্যে

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

অষ্টম শতাব্দী থেকে ইসলামের বাণী বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রচার শুরু হয়। কালক্রমে ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ'শ (১২০৪-১৭৫৭) বছর মুসলিম শাসনের পর ইংরেজরা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। মুসলমান নেতৃত্বের একটি অংশের স্বার্থপরতা এবং হটকারী আচরণের কারণে মুসলিম জনগণ ইংরেজ খ্রিস্টান শাসকদের অধীন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা বিপর্যয়কর অবস্থার সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে কিছু মুসলিম সংস্কারক এবং শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় মুসলমানরা রাজনৈতিক এবং আদর্শিকভাবে সচেতন হতে শুরু করে। এই আত্মসচেতনতা মুসলমানদেরকে সংগ্রামী করে তোলে। ইংরেজ বিরোধী বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গের পর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হিন্দু এবং মুসলিম দু'টি জাতি আলাদাভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করে। পরবর্তীতে এ দু'টো প্রধান জাতির রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এর দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সমঝোতার প্রেক্ষাপটে বৃটিশ ভারতের রাজনীতি এগিয়ে চলে। রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থা বিবেচনা করে বাধ্য হয়ে বৃটিশ সরকার ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ করে এবং একই সময়ে দু'টি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মূলত: মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে শাসকশ্রেণী জনসমর্থন হারায়। জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়। শুরু হয় প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ সামরিক শাসন। রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটাতে শুরু হয় জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয় অবিভক্ত পাকিস্তানের একমাত্র সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে জেনারেল ইয়াহিয়া এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর ষড়যন্ত্র ও হঠকারিতা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ধাবিত করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা রাখে।

স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্য ইসলামী দলগুলোর সকল প্রকার রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালের

১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা লাভের পর বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি আবার শুরু হয়। ২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট এবং আসন লাভ করে। পরবর্তীতে নব্বই এর দশকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী দলগুলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের সাথে জামায়তে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামী দল মহাসমাবেশ, বিক্ষোভ, হরতাল, অবরোধ এর মাধ্যমে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের সকল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হয়ে তৎকালীন সেনা প্রধান লে:জে: হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করেন। সেই সময়কার সরকারি দলের নেতৃত্বের সংকট এবং মন্ত্রীদের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ফলে জেনারেল এরশাদ শাসন ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং দু'বছরের মধ্যে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে তিনি শাসনকার্য চালাতে শুরু করেন। এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল গণতান্ত্রিক রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সামরিক সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সামরিক সরকারের পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চালায়। ছাত্রদের প্রতি এরশাদ সরকারের কঠোর মনোভাব এবং নিপীড়ন রাজনৈতিক দলগুলোকে ভাবিয়ে তোলে। মূলত: ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রমেই এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ১৫ দল ও ৭ দল সামরিক আইন প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুণ:প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে বাধা নিষেধ প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রধান দুই জোটের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রথম থেকেই যুগপৎ আন্দোলনে শরিক ছিল।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জামায়াত ১৯৭৯ সালের মে মাসে আবার স্বনামে বাংলাদেশে এর রাজনৈতিক কার্যক্রম আরম্ভ করে। জামায়াত নীতিগতভাবে সামরিক শাসন বিরোধী। জনগণের সক্রিয় সমর্থনের মাধ্যমে জামায়াত ইসলামকে বিজয়ী করতে চায়। সামরিক শাসন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিনষ্ট করে। দেশকে কল্যাণকর রাষ্ট্রে পত্তিরুত করতে জামায়াত জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি মনে করে।

তাই জামায়াত আদর্শগত এবং কৌশলগত কারণে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৩ সালের প্রথমার্ধে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সাংবিধানিক বিতর্ক শুরু হয়। ১৫ দলীয় জোট এবং এর প্রধান শরিক আওয়ামী লীগ ৪র্থ সংশোধনী পূর্ববর্তী '৭২-এর সংবিধান পুণঃপ্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তিতে নির্বাচন দাবি করে। কোন কোন দল ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান বহালের দাবি জানায়। এ সময় শাসনতন্ত্র সংশোধন করে জাতীয় সংসদ ও শাসন ব্যবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের দাবি ওঠে। শাসনতান্ত্রিক সে বিতর্কে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জামায়াত সংবিধান সংশোধনের যে কোন প্রচেষ্টাকে জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিরোধী বলে মন্তব্য করে সামরিক সরকারকে এ ধরনের সুযোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য সকল দলের প্রতি আহ্বান জানায়। শাসনতান্ত্রিক সে বিতর্ক বাদ দিয়ে মূলতবী সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে সামরিক আইনের ভিতরেই জামায়াত সারাদেশে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র বিলি করে। জামায়াতের সে প্রচারপত্র এবং বক্তব্য দেশের সচেতন মহলের নিকট প্রশংসিত হয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক বিতর্কটি একটি বড় ইস্যু ছিল। অবশেষে সকল দল এ ইস্যুটি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার কারণে সামরিক সরকার সংবিধান সংশোধনের সুযোগ পায়নি।

ক্ষমতা গ্রহণের পর এরশাদ প্রথমেই স্থানীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করেন। জামায়াত অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় সরকারের এ প্রক্রিয়াকে বেসামরিকীকরণ এবং গণতন্ত্রের নামে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নীলনকশা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে দেশ ও জাতির স্বার্থে সামরিক শাসন দ্রুত প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের মার্চের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি জানায়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে সফরকালীন সময়ে '৮৪র মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কিত এরশাদের ঘোষণায় জামায়াত তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একে গণতন্ত্র বিরোধী কৌশল হিসেবে উল্লেখ করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করার জন্য সকল দলের প্রতি জামায়াত বিশেষ অনুরোধ জানায়।

এরশাদ সরকারের সামরিক শাসনামলে প্রথম প্রকাশ্য রাজনীতির শুরুতে জামায়াতে ইসলামী ঢাকায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জনসভায় "কেয়ার-টেকার সরকার" গঠন করে এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ ধরনের সরকার গঠনের প্রস্তাব এটাই প্রথম। জামায়াতের সে দাবির প্রতি আন্দোলনরত বিরোধী জোট ও দলসমূহের সমর্থন প্রথমদিকে পাওয়া যায়নি। ১৫ ও ৭ দলীয় জোট কয়েক মাস পর এ দাবি সরকারের নিকট উত্থাপন করে।

১৯৮৪ এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এরশাদ সরকারের সাথে বিরোধী জোট ও দলের রাজনৈতিক সংলাপে জামায়াত "কেয়ারটেকার" সরকারের দাবি উত্থাপন করে। জামায়াত ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটকে আহ্বান জানিয়েছিল ঐক্যবদ্ধভাবে সংলাপে

অংশগ্রহণের জন্য। কিন্তু ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াত পৃথকভাবে সংলাপে অংশগ্রহণ করে। সংলাপে জোট ও দলগুলোর কোন একক দাবিও ছিলনা। সংলাপে সফলতার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও অভিন্ন দাবি পেশ করার জন্য দু'জোটের প্রতি জামায়াত আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু দু'জোটের পক্ষ থেকে "কেয়ার-টেকার" বা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন দাবি উত্থাপিত হয়নি। এরশাদ সরকারের সাথে বিরোধী জোট ও দলের রাজনৈতিক সংলাপ সফল হয়নি। দলগুলো তাদের দাবির ব্যাপারে অভিন্ন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াত যদি একসাথে সংলাপে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারতো এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঐক্যবদ্ধ দাবি জানাতে পারতো, তাহলে '৮৪ সালের সংলাপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো না।

আন্দোলনের অংশ হিসেবে জামায়াত ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়। জামায়াতের ১০ জন সদস্য জাতীয় সংসদে এরশাদ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকান্ডের গঠনমূলক বিরোধিতার পাশাপাশি জামায়াত সংসদের বাহিরে রাজপথের আন্দোলনও অব্যাহত রাখে। ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠলে বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ থেকে বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। পদত্যাগের প্রশ্নে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেও জামায়াত দলীয় ১০জন সদস্য ৩রা ডিসেম্বর '৮৭ তৃতীয় জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে রাজপথের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে কোন দলের সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করার ঘটনা বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম । নব্বইয়ের এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে কার্ফ্যুর মধ্যেও জামায়াত সক্রিয়ভাবে গায়েবানা জানাজা ও মিছিলের অংশগ্রহণ করে। এরশাদের পতনের পর "কেয়ার-টেকার" সরকার প্রধানের নাম মনোনয়নের ব্যাপারে প্রধান দু'জোটের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও জামায়াত এর পূর্ব ঘোষণায় অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে "কেয়ার-টেকার" সরকার গঠনের দাবিতে অবিচল ছিল। দীর্ঘ মিটিং এবং আলাপ আলোচনার পর অবশেষে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে "কেয়ারটেকার" সরকার প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

জামায়াত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শরিক ছিল। জামায়াতের কোন পর্যায়ের নেতা আন্দোলনে বিরত থেকে বা সরে পড়ে সরকারি দলে যোগদান করে স্বার্থ-সিদ্ধি করার চিন্তা করেন নি। বরং আন্দোলনের স্বার্থে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে জামায়াত নেতৃবৃন্দ বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নির্যাতন, কারাবরণ, সন্ত্রাস, হত্যা কিছুই জামায়াতকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে পারেনি।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের দৃঢ়তা, সততা এবং সক্রিয় ভূমিকার কারণে জামায়াত বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এরশাদ সরকারের পতনের পর অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের ১৮টি আসন লাভের ফলে দেশে বিদেশে জামায়াতের পরিচিতি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। উক্ত নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে তৃতীয় অবস্থান লাভ করায় জামায়াতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে জামায়াত রাজনৈতিক মহলে অনেকটা মিত্রশূন্য ছিল। কিন্তু এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার কারণে জামায়াত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের অনেক নিকটে আসার সুযোগ পায়। এতে জামায়াতের প্রতি বিরোধী নেতা-কর্মীদের নেতিবাচক মনোভাব শিথিল হয়। সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের কারণে জামায়াতের গণভিত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচির আধিক্যের কারণে জামায়াতের আদর্শিক এবং সাংগঠনিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটে। রাজনৈকিতভাবে জামায়াত যতটুকু এগিয়ে গিয়েছিল, অভ্যন্তরীণভাবে ততটুকু শক্তি অর্জন করতে পারেনি।

এরশাদের পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিবেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় সরকার গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। সরকার গঠনের অচলাবস্থা নিরসনে জামায়াতে ইসলামী এগিয়ে আসে। বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থনদান করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ৫ম সংসদ নির্বাচনই ছিল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথম সুষ্ঠু নির্বাচন। তাই জামায়াত পরবর্তী নির্বাচনগুলোও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের নিমিত্তে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংযোজনের দাবি উত্থাপন করে এবং ৫ম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে এ সংক্রান্ত একটি বিল পেশ করে। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল বিএনপি এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি এবং সংসদে বিলটি উত্থাপনের সুযোগও দেয়নি। বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সুবিধাভোগী হয়েও এর বিরোধিতা শুরু করে। এক পর্যায়ে তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে সরকারিদলের ভোট কারচুপি ও অনিয়ম সংঘটিত হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। জামায়াত, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির যুগপৎ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে সংসদ থেকে বিরোধীদলের সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। বিরোধীদল বিহীন প্রায় এক বছর সংসদ চলার পর আন্দোলনের মুখে সরকার ৫ম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা করে। কিন্তু বিরোধীদলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থার দাবি না মানায় ৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে সকল দল এক যোগে বয়কট করে। বর্জন

ও প্রতিরোধ কর্মসূচির মধ্যে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বিএনপি একতরফা নির্বাচন করে। নির্বাচন পরবর্তী সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন, ধর্মঘট, অবরোধের ফলে সংসদের এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশন ডেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংক্রান্ত ১৩তম সংশোধনী পাস করে বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐক্যমত্যের সরকার গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, জননিরাপত্তা আইন বাতিলসহ অন্যান্য ইস্যুতে প্রধান চার বিরোধীদলের ঐকবদ্ধ আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। হরতাল, মহাসমাবেশ, রোড মার্চ, লং মার্চ, গণবিক্ষোভ, ঘেরাও কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তারা ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতিতে প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলন একটি নব অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রায় পুরো জীবন রাজনীতির ব্যাপারে নীরব থাকার পর বৃদ্ধ বয়সে তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণ ছিল যথেষ্ট আলোচিত বিষয়। মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) রাজনীতিতে যোগদানের পূর্বে বাংলাদেশে আলেম সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। হাফেজ্জী হুজুর এর "তওবার রাজনীতি" উলামা-মাশায়েখদের উক্ত অংশের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়। ইসলামে রাজনীতি নেই বা ইসলাম রাজনীতি থেকে মুক্ত এ ধরনের কোন মন্তব্য এখন বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় কোন আলেমের মুখে শোনা যায় না। কর্মকৌশল বা পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও বাংলাদেশের আলেম সমাজ এখন একমত যে, সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী রাজনীতির বিকল্প নেই। রাজনীতিতে পদার্পণের পূর্বে হাফেজ্জী হুজুর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এরশাদকে চিঠির মারফত দেশের আর্থ সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। দল গঠনের পূর্বে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং ভোটপ্রাপ্তির দিক থেকে ৩য় স্থান অর্জন তাঁর গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সামরিক শাসন অবসান ও এরশাদের অবৈধ সরকারের উচ্ছেদের লক্ষ্যে আন্দোলনকে সংগটিত করার জন্য খেলাফত আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক দলের জাতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানসহ সভা, সমাবেশ, মিছিলের আয়োজন করে। এরশাদের উপজেলা নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের বিরুদ্ধে খেলাফত আন্দোলন

রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন এবং তা বর্জন করে। হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে ১১ দলীয় সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জাতীয় সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে সামরিক শাসন অবসানের জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়। ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ সকল সংসদ নির্বাচনে খেলাফত আন্দোলন অংশগ্রহণ করে। হাফেজ্জী হুজুরের রাজনীতিতে পদার্পণ এবং দলগঠন খুব আলোচিত হলেও তাঁর স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস এবং কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ির কারণে খেলাফত আন্দোলন আশানুরূপ অবদান রাখতে সমর্থ হয়নি। দলে একাধিক ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে দলের প্রতি সাধারণ জনগণের আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকে। খেলাফত আন্দোলন দলগত অবস্থান তেমন ভাল না হলেও এ দলের প্রাক্তন নেতাদের মাধ্যমে গঠিত ৪/৫টি দল ইসলামী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির অন্যতম শক্তি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (ই শা আ) শুরুতে একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হলেও সময়ের ব্যবধানে তা একটি একক দলে পরিণত হয়। শুরুতে শাসনতন্ত্র আন্দোলন ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। কিন্তু নেতৃবৃন্দের অনৈক্যের কারণে শাসনতন্ত্র আন্দোলন এর ঘোষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। চরমোনাইর পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম (রহঃ) ই শা আ এর মুখপাত্র এবং পরবর্তীতে আমীর হিসেবে সংগঠনটিকে এগিয়ে নেন। একক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এরশাদের পতনের পর ইসলামী দলগুলোর বৃহত্তর জোট "ইসলামী ঐক্যজোটে" শরিক হয় ই শা আ। অধিকাংশ জেলায় বা উপজেলায় ই শা আ এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। শেখ হাসিনার (১৯৯৬-২০০১) সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিরোধীদলের যুগপৎ ও ঐকবদ্ধ আন্দোলনের প্রশ্নে ই শা আ ইসলামী ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে আসে। ই শা আ দলগতভাবে পানিচুক্তি, ভারতকে ট্রানজিট প্রদান, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি এবং শিখা চিরন্তনসহ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ঈমান আকিদা বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করে। জনসভা, বিক্ষোভ মিছিল, গণঅবস্থান, মানববন্ধন কর্মসূচির মাধ্যমে ই শা আ ভূমিকা পালন করে।

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও ই শা আ যথাসাধ্য ভূমিকা রাখে। বেগম খালেদা জিয়ার আমলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সময় কয়েকটি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলের সমন্বয়ে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ই শা আ এর আমীর মাওলানা ফজলুল করিম সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। নির্দলীয় সরকার গঠন করে নির্বাচনের দাবিতে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ই শা আ জোটগতভাবে এবং এককভাবে সকল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের একটি অংশ যুব শিবিরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস গঠন করে। মজলিসের প্রতিষ্ঠার পর দলটি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তি পালন উপলক্ষে শিখা চিরন্তন স্থাপনের প্রতিবাদে এবং কিছু এনজিওর ইসলাম বিরোধী তৎপরতা ও নাস্তিক মুরতাদের বিচারের জন্য খেলাফত মজলিস ব্যাপক কর্মসূচি পালন করে। নাস্তিক মুরতাদদের বিচারের দাবিতে ৩০ জুন '৯৪ দেশব্যাপী পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, ভাস্কর্য নির্মাণের নামে পৌত্তলিকতা সংস্কৃতির প্রসারের প্রতিবাদ ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে ভারত অভিমূখে ঐতিহাসিক লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। লংমার্চ কর্মসূচিতে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষে এবং ৫জনের নিহত হওয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। ইসলামী শিক্ষা বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে খেলাফত মজলিস সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। খেলাফত মজলিস ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে ৫ম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে একটি আসন লাভ করে। প্রায় সকল সংসদ নির্বাচনে মজলিস জোটবদ্ধভাবে অংশ নেয়।

এরশাদের পতনের পর ৫ম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী ব্যতীত অপরাপর সক্রিয় ইসলামী দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করে ইসলামী ঐক্যজোট। ৫ম থেকে সকল সংসদ নির্বাচনে "ইসলামী ঐক্যজোট" অংশগ্রহণ করে। বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) এবং আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সময় ইসলামী ঐক্যজোট গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। খালেদা জিয়ার শাসনকালে সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ইসলামী ঐক্যজোট বিরাট ভূমিকা রাখে। ইসলামী ঐক্যজোট তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর রূপরেখা সম্বলিত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির নিকট উত্থাপন করে। বিতর্কিত নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ফাঁসি দাবি, এনজিওদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতা বন্ধ, ব্লাস্ফীমী আইন প্রণয়নসহ অন্যান্য দাবিতে ইসলামী ঐক্যজোটভুক্ত দলসমূহ এবং অন্যান্য দলের আহ্বানে ৩০ জুন '৯৪ সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। মহানবী (সা:) ও পবিত্র কুরআনের অবমাননার প্রতিবাদে এবং নাস্তিক মুরতাদদের শাস্তির দাবিতে ইসলামী ঐক্যজোটের আহ্বানে ১৫ জুলাই '৯৭ দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। শেখ হাসিনা সরকারের সময় ইসলামী ঐক্যজোট পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির প্রতিবাদে লংমার্চ কর্মসূচী পালন করে। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত এবং উলেমা-মাশায়েখদের হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে ইসলামী ঐক্যজোটের উদ্যোগে ঢাকায় মহাসমাবেশ (মার্চ, ১৯৯৯) অনুষ্ঠিত হয়। মহাসমাবেশে হরতাল, রোড মার্চ, লং মার্চ, গণমিছিল, গণঅবস্থান, দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামী ঐক্যজোট শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে চারদলীয় জোটের শরিক হিসেবে যুগপৎ ও ঐকবদ্ধ আন্দোলনে ভূমিকা পালন করে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান শুরু হয়। ধীরে ধীরে জঙ্গিরা সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করে। বর্তমান শতকের শুরু থেকে জঙ্গিবাদ রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। বোমা হামলা এবং আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠী প্রধানত জেএমবি এবং হরকাতুল জেহাদ সারাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। তাদের এ সকল সন্ত্রাসী তৎপরতাকে ইসলামী দলগুলো ইসলাম, জনগণ এবং দেশবিরোধী কর্মকান্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জাতীয় পর্যায়ে সমাবেশ করে ইসলামী দলগুলো বোমাবাজ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। মূলধারার কোন ইসলামী সংগঠন এ জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলেনি। বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় কোন আলেম ধর্মীয় জঙ্গিবাদের অপতৎপরতাকে সমর্থন দেননি। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে জঙ্গিদের নৃশংস, অমানবিক ও দেশদ্রোহী কর্মকান্ডের নিন্দা প্রকাশ এবং জঙ্গি দমনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। ইসলামী সংগঠনসমূহ, উলামা-মাশায়েখ ও জনগণের সচেতনতার ফলে এবং সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে জঙ্গি তৎপরতা একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভব না হলেও তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারেনি। বাংলাদেশের জনগণের জঙ্গি বিরোধী চেতনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক দলগুলো যদি জঙ্গি নির্মূলে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে পারে, তাহলে ধর্মীয় বা সেকিউল্যার কোন জঙ্গিবাদ বাংলাদেশের জন্য বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারবেনা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ণে ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা রয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ব্যাপারে ইসলামী দলসমূহ ভূমিকা রেখে আসছে। তাছাড়া সংগঠনভুক্ত কর্মী-সমর্থকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য প্রায় সকল ইসলামী দলের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংস্কার এবং দুস্থ জনগণের সেবার লক্ষ্যে ইসলামী দলসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গণশিক্ষা কার্যক্রম, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, ক্লাব, সমিতি স্থাপন ও পরিচালনা এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ সংশোধন ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দলগুলো। দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে সহযোগিতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় জনগণের পাশে দাড়ানোর মাধ্যমে আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবা চালিয়ে যাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যাকাত, বাধ্যতামূলক সাদকাহ ও ঐচ্ছিক দান, মীরাসী আইনের কঠোর প্রয়োগ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি, করযে হাসানা, সুদবিহীন সরকারি ঋণ, আত্মীয় স্বজনদের হক আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলাম জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করে।

আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে ইসলামী দলের নেতা-কর্মীদের আরো কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সামজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মানুষের আরো কাছাকাছি পৌছার পরিকল্পনা নিতে হবে ইসলামী দলগুলোকে। সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাকারবারী ইত্যাদি ইস্যুতে ইসলামী দলগুলোর বক্তব্যকে আরো সুস্পষ্ট ও জোরালোভাবে জনগণের নিকট পৌছাতে হবে। এ সকল ইস্যুতে জনগণকে সংগঠিত করে একটি শোষণমুক্ত ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী দলগুলোর আরো কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

রাজনীতিতে সক্রিয় ইসলামী দলগুলোর সাংগঠনিক অবস্থা মোটামুটি ভাল হলেও ওগুলোর গণভিত্তি তত মজবুত নয়। বাংলাদেশের ৮৫% জনগণ ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী বলে দাবি করা হয়। কিন্তু ইসলামী দলগুলোর প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন পরিলক্ষিত হয়নি। দলগুলোর প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন না থাকার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়ঃ

ক. জনগণের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাব

খ. জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, নারী স্বাধীনতা, ফতোয়াসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামকে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শক্তির প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা

গ. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মানুষের মন মগজকে সেকিউল্যার করে তৈরী করে। ধীরে ধীরে ইসলামী চিন্তা- চেতনা ও সংস্কৃতি থেকে মানুষ সরে আসে

ঘ. উলামা শ্রেণী (ধর্মীয় নেতৃত্ব) ইসলামের যথার্থ উপস্থাপনা করতে সফল হননি

ঙ. ইসলামী দলগুলোর নেতৃত্বকে সুকৌশলে পরস্পর বিরোধী করে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে

চ. সর্বোপরি ইসলামী দলসমূহের অনৈক্য ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি

বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলো অন্যতম মূখ্য রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। স্বাধীনভাবে কোন আন্দোলন সৃষ্টি এবং সফলতায় পৌছানো দলগুলোর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক এবং জনগণের আদর্শিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে ইসলামী শক্তির পক্ষে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ইসলামী দলগুলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

১. ব্যাপক গণভিত্তি অর্জনের জন্য আর্থ-সামাজিক ইস্যুতে আরো প্রায়োগিক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

২. বুদ্ধিভিত্তিক এবং সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

৩. জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য বাস্তব কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. আদর্শ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রদের পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। লেজুড়বৃত্তি ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে রেখে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া।

৫. নারী সমাজের মর্যাদা ও দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নারীর ক্ষমতায়ণ, নারীর স্বাধীনতা এবং ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে পাশ্চাত্য ও এনজিওগুলোর প্রচারণার বিপরীতে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬. ইসলামী দলগুলোকে চরমপন্থা এবং গোঁড়ামী মনোভাব সব সময় পরিহার করে চলা।

৭. ব্যাপক ঐক্য সৃষ্টির জন্য দলগুলোকে খুঁটিনাটি বিষয়াবলী পরিহার করে ইস্যুভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

৮. মুসলিম ছাড়াও বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ জনগণ উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় রীতিনীতিও অনেকটা আলাদা। নির্বাচনে উপরোক্ত ধর্মীয় ও উপজাতি সম্প্রদায়সমূহ গুরুত্বপূর্ন গোষ্ঠী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ইসলামী দলসমূহকে অমুসলিম এবং উপজাতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ও বাস্তব বক্তব্য প্রদান করতে হবে। তাদেরকে দলসমূহের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করাসহ সমর্থন আদায়ে আরো কৌশলী হতে হবে।

৯. সর্বোপরি স্বাধীনতা যুদ্ধে ইসলামী দলগুলোর ভূমিকা দেশবাসী বিশেষ করে তরুণ সমাজের কাছে সুস্পষ্ট করা। ইসলামী রাজনীতি এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ইস্যুগুলোর রাজনৈতিক সমাধান হওয়া জরুরি।

১৯৭১-২০০০ সময়কালের ইসলামী দলসমূহ এরশাদ বিরোধী আন্দোলন, সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি এবং ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিরোধী কার্যক্রমসহ প্রায় সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে ভূমিকা পালন করে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী দলগুলো নিয়ামক কোন ভূমিকা রাখতে না পারলেও যুগপৎ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে স্বৈরশাসনের বিরোধিতায় ইসলামের শিক্ষাকে সমুজ্জল করেছে। আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর ইতিবাচক ভূমিকা এরশাদ সরকারকে নৈতিকভাবে দুর্বল করেছে। যুগপৎ আন্দোলনকে রাজনৈতিক এবং নৈতিক শক্তি যুগিয়েছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়। বেগম খালেদা জিয়ার আমলে (১৯৯১-১৯৯৬) সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে শরিক ছিল। সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠায় জামায়াতের বলিষ্ঠ ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সময়কালে পানিচুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি, ট্রানজিট, করিডর,

জননিরাপত্তা আইন, মাদ্রাসা শিক্ষাসহ অন্যান্য ইস্যুতে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিরোধিদলের ঐকবদ্ধ আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটসহ অন্যান্য ইসলামীদল স্বত:স্ফূর্ত এবং কার্যকর ভূমিকা রাখে।

ইসলামী দলগুলোর পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এবং অনৈক্যের কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারা কোন স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। ইসলামী দলগুলোর অনৈক্যের পেছনে আদর্শগত বিরোধের চেয়ে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বই বেশি ক্রিয়াশীল। নেতৃত্বের প্রশ্নে দলগুলো আপস করতে পারেনি বলে বৃহত্তর কোন ইসলামী জোট গঠিত হয়নি। ইসলামী দলগুলোর ঐক্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী দলসমূহের ঐক্য রাজনীতিতে যেকোন সময় পরিবর্তন আনতে সক্ষম। জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য ইসলামী দল এবং নেতৃবৃন্দকে আরো বাস্তব ও উপযোগী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর জনসমর্থন এবং সাংগঠনিক শক্তিকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালনকারি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোসহ বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ বিভক্তি এবং অনৈক্যের রাজনীতি পরিহার করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্যিকারের গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতিচর্চা করলে বিপুল সম্ভাবনময় এদেশ সমৃদ্ধির পানে এগিয়ে যাবে।

শব্দকোষ

অর্থডক্স- গোঁড়া, নৈষ্ঠিক
আমীর- সভাপতি, পরিচালক
আমীরে জামায়াত- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর
আদালতে সাহাবা- সাহাবাগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ন
আল জামায়াত- হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামী সংগঠন
আলবদর- বদর আরবী শব্দ। এর অর্থ সাধারণতঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছাত্র-যুবকদের দ্বারা সংগঠিত বিশেষ বাহিনীকে বুঝায়
আমীরুল মোমেনিন- মুসলিম খিলাফতের প্রধান
আসবিয়াত- অন্যায়ভাবে গোত্রপ্রীতি, জাতি প্রীতি
আইয়্যামে জাহিলিয়াত- অন্ধকার যুগ, সাধারণত ইসলাম পূর্বকাল সময়কে বোঝায়
আমর বিল মারুফ- সৎ কাজের আদেশ
আমল- কার্যক্রম, কার্যাবলী
আকীদা- বিশ্বাস, ধর্মমত, মতাদর্শ
আহলে হাদীস- কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসারী (মাযহাব অনুসারী নয়)
ইত্তেহাদ মা'আল ইখতেলাফ- মতানৈক্যসহ ঐক্য
ইত্তিহাদুল উম্মাহ্‌- জাতিকে ঐক্যবদ্ধকরণ
ইকামাতে দ্বীন- দ্বীন প্রতিষ্ঠা
ইসমাতে আম্বিয়া- নবীদের নিষ্পাপ হওয়া সংক্রান্ত
ইনকিলাব- বিপ্লব
ইজমা- সম্মিলিত রায়
ইশতেহার- শাসক, রাজনৈতিকদল প্রভৃতি কর্তৃক উদ্দেশ্য, কর্মসূচি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রকাশ্য লিখিত ঘোষণা
ইনসাফ- ন্যায়বিচার করা, মাঝখানে পৌছা
ইনশাআল্লাহ্‌- আল্লাহ যদি চান
ইভ্যান্‌জেলিক্যাল- যিশুর বাণী বা সুসমাচার সংক্রান্ত
উসওয়াতুল হাসানা- উত্তম আদর্শ
উলেমা- আলিম শব্দের বহুবচন
ওরস- মাঝারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান
কওমী- বেসরকারি সহযোগিতায় পরিচালিত মাদ্রাসা
ক্যাথলিক- পোপ এর নেতৃত্বাধীন চার্চ এর অনুসারী খ্রিস্টান সম্প্রদায়
কমিউনিস্ট- মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী বা এর সমর্থনকারী ব্যক্তি

কাদেরিয়া- হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত তাসাউফ সাধনার পথ বা পদ্ধতি

কারামাত- অলৌকিক শক্তি

কাদিয়ানী- গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারী। তারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শেষ নবী মানেনা। বিশ্বের আলেমগণ সম্মিলিতভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে।

ক্বিতাল- যুদ্ধ

করজে হাসানা- লাভের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে দান

খিলাফত- ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

খোলাফায়ে রাশেদীন- রাসূলের উত্তরাধিকারী সঠিক পথ প্রাপ্ত চার খলিফা (আবুবকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)

খানকাহ্- পীর বা দরবেশদের আস্তানা

খলিফা- প্রতিনিধি

চিশতিয়া- হজরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি (রহঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত তাসাউফ সাধনার পথ

জামায়াত- দল, সংগঠন

জাহান্নাম- দোযখ, পরকালে বিচারের পর অবিশ্বাসীদের শাস্তির স্থান

জিহাদ- ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ধর্মযুদ্ধ

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ- আল্লাহর পথে জিহাদ

জোয়ান- সৈনিক

জলসা- মজলিস

জমিন- পৃথিবী

জাহেলিয়াত- ইসলাম বিবর্জিত রীতিনীতি

তওবা- ফিরে আসা, নিজের ভুল স্বীকার করে সঠিক পথ অবলম্বন

তাফসীর- কুরআনের ব্যাখ্যা

তা'লীম- জ্ঞান প্রদান

তরবিয়ত- প্রশিক্ষণ

তাহারির- গবেষণা, অনুসন্ধান করা

তাযকিয়া- পরিশুদ্ধতা

তানজীম- সংগঠন

তাগুত- ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ

তাবলীগ- প্রচার

তাওহীদ- আল্লাহ্‌র একাত্ববাদ

দ্বীন- ইসলামী জীবনবিধান, আনুগত্য

দারসে কুরআন- কুরআনের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা

দারসে হাদীস- হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা

দোস্ত আহবাব- গুণমুগ্ধ বন্ধু/ভক্ত

নায়েবে আমীর-জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী পরিচালক বা নেতা

নাউজুবিল্লাহ- আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

নাহি আ'নিল মুনকার- অন্যায় কাজের নিষেধ

নাজায়েয- ইসলামী শরিয়তে অনুমোদনহীন কাজ

পীর- ফার্সী শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ। সাধারণতঃ যে সকল শিক্ষকের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাদেরকে বোঝাতে পীর শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

প্রটেস্ট্যান্ট- খ্রিস্টানদের ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সময়ে (১৬ শতক) রোমের গীর্জা সংগঠন থেকে

বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন খ্রিস্টিয় ধর্ম সংগঠন এবং তাদের পরবর্তী প্রশাখা সম্বন্ধীয়; ঐসব সংগঠনের সদস্য

প্রিসিডিয়াম- সভাপতিমন্ডলী

পয়গম্বর- নবী বা রাসূল

পলিটি- রাষ্ট্র, বিধিবদ্ধ সমাজ

ব্ল্যাস্‌ফীম- স্রষ্টা বা ধর্মের মহত্ব বা পবিত্রতা বিষয়ে ঠাট্টা করা ; অশালীন ভাষায় ধর্মকে আক্রমন করা

বিদ'আত- সুন্নাহ্‌র বিপরীত কার্যাবলী

ফাসাদ- বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য

ফিতনা- বিশৃঙ্খলা, বিপদ

ফিকাহ- কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতেহাদের মাধ্যমে মুসলিম পন্ডিতগণের ধর্ম বিষয়ক সিদ্ধান্ত, মুসলিম আইন ব্যবস্থা

ফতোয়া- ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত, মতামত

মারিফাত- আল্লাহকে বিশেষভাবে জানা

মজলিসে শূরা- পরামর্শ পরিষদ

মজলিসে আম্মাহ- সাধারণ পরিষদ

মজলিসে আমেলা- কর্মপরিষদ

মজলিসে উমুমী- সাধারণ পরিষদ

মজলিসে সাদারাত- সভাপতিমন্ডলী

মজলিসে খাস- উপদেষ্টা পরিষদ

মুবাল্লিগ- দ্বীনের প্রচারক

মারুফ- সৎকর্ম

মুনকার- অন্যায় কাজ, গর্হিত বিষয়
মিরাস- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ
মাছয়ালায়ে কাওমিয়াত- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ
মাযহাব- মত, মতবাদ, আদর্শ
মিল্লাত- জাতি
মোশতারাকা মজলিসে আমল- সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ
মুরিদ- অনুসারী, শিষ্য
মুহেব্বীন- ভক্তবৃন্দ
মুত্তাফিক- সমর্থক
যাকাত- বৃদ্ধি, পরিশুদ্ধতা
রেনেসাঁ- নবজাগরণ
রোযা- রমজানের ফার্সী শব্দ, রমজান শব্দটি 'রামাযা' থেকে এসেছে। এর অর্থ দহন বা জ্বলন।
রুকন- সদস্য
রাজাকার- শাব্দিক অর্থ স্বেচ্ছাসেবক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত মিলিশিয়া বাহিনী
লা'নত- আযাব
শরীয়া- মানব জীবনের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান, ইসলাম
শায়খুল হাদীস- হাদীস শাস্ত্রে বিশারদ ব্যক্তি
শহীদ- স্বাক্ষী, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন দানকারী
শূরায়ী নিযাম- পরামর্শ ভিত্তিক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা
শির্‌ক- আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা
সিলমুন- শান্তি
সিরাতুল মুস্তাকিম- সহজ, সরল, হেদায়েতের পথ
সেকিউলার- ধর্মনিরপেক্ষ, ইহজাগতিকতা
সালাত- নামাজ
সাহাবা- রাসূলের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভকারী মুসলমানগণ
হিন্দ্‌- ভারতবর্ষ/বর্তমান ভারত
হাদীস- রাসূল (সা:) এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদন
হজ্জ- জ্বিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখগুলোতে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত থাকাসহ কাবা ঘরের
অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করা

ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা

প্রশ্ন-১ ঃ প্রায় সকল ইসলামী রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল । আপনি বিষয়টিকে কী ভাবে মূল্যায়ন করেন ?

প্রশ্ন-২ ঃ বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব দেখা যাচ্ছে। এর জন্য কোন কোন কারণকে আপনি দায়ী বলে মনে করেন?

প্রশ্ন-৩ ঃ অনেকে জামায়াতের কিছু কিছু আকিদা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আপনার দৃষ্টিতে কোন কোন বিষয়টি শরিয়তী দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ যা জামায়াতের পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

প্রশ্ন-৪ ঃ বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির প্রতিবন্ধকতা কি কি এবং ওগুলো নিরসনে আপনার অভিমত কি?

প্রশ্ন-৫ ঃ ইসলামী দলগুলোর ঐক্য ও সংহতির প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আপনার বা আপনার দলের সহযোগিতা কতটুকু প্রত্যাশা করা যায় ? এ ঐক্যের জন্য কি কি শর্ত থাকা উচিত বলে মনে করেন?

প্রশ্ন-৬ ঃ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার দলের ভূমিকা স্ববিস্তারে উলেখ করুন।

প্রশ্ন-৭ ঃ নির্বাচনে আপনার দলের অংশগ্রহণের ইতিহাস এবং ফলাফল বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন-৮ ঃ সংসদ নির্বাচনে আপনার দল থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নামের তালিকা এবং সংসদে তাদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম উল্লেখ করুন।

প্রশ্ন-৯ ঃ আপনার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন।

প্রশ্ন-১০ঃ বাংলাদেশের কয়টি জেলা, উপজেলা সদরে আপনার দলের অফিস রয়েছে। কয়টি জেলায় এবং উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ/আংশিক কমিটি রয়েছে?

প্রশ্ন-১১ঃ ইসলামী আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ আপনারা কিভাবে নিশ্চিত করেছেন?

প্রশ্ন-১২ঃ জাতীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বা সাধারণ নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা কতটুকু জরুরি। এ ক্ষেত্রে আপনার দলের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

প্রশ্ন-১৩ঃ বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ভবিষ্যৎ কতটুকু?

পরিশিষ্ট-২

তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে মতামত জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা

[অনুগ্রহপূর্বক সংশিষ্ট স্থানে টিক (√) দিন । পেশা ....]

১। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলোর প্রভাব- মোটামুটি ☐ কার্যকর ☐ প্রভাব নেই ☐।

২। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ইসলামী দলগুলোর নেতিবাচক ভূমিকা বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি জন্য প্রতিবন্ধক- হ্যাঁ ☐ না ☐।

৩। জাতীয় নির্বাচনে ইসলামী দলের প্রার্থী নির্বাচিত না হওয়ার জন্য দায়ী কে-- দুর্বলপ্রার্থী ☐ সংগঠন ☐ উভয়ই ☐

৪। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের অধিকাংশ ভোটার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দেবে... হ্যাঁ ☐ না ☐ উত্তরদানে বিরত ☐।

৫। ইসলামী দলগুলোর ঐক্য না হওয়ার জন্য দায়ী... আদর্শ ☐ কর্মসূচি ☐ ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ☐

৬। জনগণ সচরাচর কোন ধরনের নেতৃত্ব পছন্দ করে... ধর্মীয় শিক্ষিত ☐ ইংরেজী শিক্ষিত ☐ উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত ☐

৭। মন্ত্রণালয়গুলো পরিচালনায় জামায়াত মন্ত্রীগণ কি দক্ষতা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন... হ্যাঁ ☐ না ☐ উভরদানে বিরত ☐

৮। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের জন্য অনেকে ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নের কথা বলেন, আপনি কি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন... হ্যাঁ ☐ না ☐

৯। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন বর্তমান ইসলামী দলগুলো দ্বারা কি সম্ভব? হ্যাঁ ☐ না ☐

১০। সামাজিক কর্মকান্ডে ইসলামী দলের নেতা- কর্মীদের অংশগ্রহণ... মোটামুটি ☐ সন্তোষজনক ☐ প্রত্যাশিত মানের নয় ☐

১১। ইসলামী দলগুলোর ঐকবদ্ধ কর্মসূচি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হ্যাঁ ☐ না ☐

১২। বাংলাদেশের মুলধারার ইসলামী দলগুলো তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিবাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত নয়, আপনি কি মনে করেন... সম্পৃক্ত ☐ সম্পৃক্ত নয় ☐

১৩। ইসলামী দলগুলোর কর্মসূচি ও নেতৃত্বের গুণগত পরিবর্তন দরকার... হ্যাঁ ☐ না ☐

পরিশিষ্ট-৩

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদের লিখিত সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন-১ ঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াত মাত্র ৮-৯% ভোট পেয়েছিল। আওয়ামী লীগ ৯০% শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিল। নির্বাচনে গণরায়ের একটি পরিসংখ্যান পাওয়ার পরও জামায়াত স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল কেন?

উত্তর ঃ ১৯৭০ এর নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামী দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে তখন আওয়ামী লীগও বলেছে, আমরাও বলেছি। অধ্যাপক গোলাম আজমের লেখা ''পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি কোন পথে'' তার প্রমাণ। আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়া খানের LFO এর নিয়ম মেনেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরেই নির্বাচন করে জিতেছে, তা বাদ দিয়ে দেশ আলাদা করার ম্যান্ডেট তারা পায়নি। তাই জামায়াত স্বাধীনতার বিরোধিতা করার প্রশ্নই ওঠেনা। পরবর্তীতে দেশ যখন স্বাধীন হলো, জামায়াত সে স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে তার ভূমিকা পালন করেছে। জামায়াত স্বাধীনতার পক্ষে ছিল, এখনো আছে, ভারতের গোলামীর বিরুদ্ধে ছিল; এখনো আগ্রাসী, সম্প্রসারণবাদী শক্তির বিরোধিতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন-২ ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বদর বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? এ কার্যক্রমে আপনার সংশিষ্টতা কোন পর্যায়ে ছিল?

উত্তর ঃ বদর বাহিনী তৎকালীন সরকারই করেছে শুনেছি, আমার কোন সংশিষ্টতার প্রশ্নই ওঠেনা, আমি এর কোন তৎপরতার বিষয় জানিও না।

প্রশ্ন-৩ ঃ রাজাকার বাহিনীর গঠন এবং অত্যাচার নির্যাতনের ব্যাপারে জামায়াতের ভূমিকা ও দৃষ্টিভংগী কি ছিল।

উত্তর ঃ পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আনসার বাহিনীকে এ নামে পুনর্গঠিত করেছিলো তৎকালীন পাকিস্তান সরকার, তাই জামায়াতের ভূমিকার প্রশ্ন ওঠেনা। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে, খোলা মাইকিং করে এ বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের লোকই ছিল তখন বেশী, কারণ তারা ৮০-৯০% ভাগ ভোট পেয়েছিলো। এটা চাকরী ছিল, মাসিক ৯০ টাকা বেতন ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রাজাকার বাহিনীর জেল, জরিমানা, শাস্তি হয়েছে। তাতে জামায়াতে ইসলামীর কোন লোক অভিযুক্তও হয়নি, শাস্তিও পায়নি।

প্রশ্ন-৪ ঃ বলা হয়ে থাকে জনসমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে জামায়াত ব্যর্থ এ ব্যাপারে আপনার মত কি।

উত্তর ঃ জনসমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে জামায়াত ব্যর্থ তো হয়নি, বরঞ্চ প্রতিনিয়ত অগ্রসরমান। আদর্শিক আন্দোলন ধীর গতিতে অগ্রসর হয়। ১৯৭০ সালের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে প্রায় ১০ লাখ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলে উন্নীত হয়। অপর দিকে ৯১ সালের

নির্বাচনে জামায়াত প্রায় অর্ধ কোটি ভোট পেয়েছে। ব্যাপক অপপ্রচার ও নীতিহীনতার এ সয়লাবে জনগণের মনে জামায়াত সম্পর্কে আগ্রহ, সম্মানবোধ বেড়েছে এটাই মনে হয়।

প্রশ্ন-৫ ঃ জামায়াতকে গণসংগঠনে পরিণত করার জন্য কি কি কর্মসূচি নেয়া দরকার বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ জামায়াত প্রতি বছরই এ সংগঠনকে গণসংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা করছে। ব্যাপক দাওয়াতী কাজ, প্রতিবছর দাওয়াতী পক্ষ পালন, কুরআনে পাকের তাফসীর ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা, সংগঠন মজবুত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজ চলছে। এখন জরুরি অবস্থার কারণে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নেই। তবুও দ্বীনী মাহফিল, তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছে। এবারের সিডরে জামায়াতের ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতাও আল্লাহর মেহেরবানীতে জনমতে প্রভাব পড়েছে।

প্রশ্ন-৬ ঃ আপনার দৃষ্টিতে ২০০১ সালে জামায়াতের সরকারে অংশগ্রহনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক গুলো কি কি।

উত্তর ঃ জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সর্বসম্মত ফায়সালার ভিত্তিতে, দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের পরামর্শে জামায়াত সরকারে অংশগ্রহণ করেছে। জামায়াতের অভিজ্ঞতা বেড়েছে, জামায়াত নেতৃবৃন্দের সততা, যোগ্যতার বাস্তব প্রমাণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ওপরে, প্রশাসনের সর্বস্তরে বিরাট প্রভাব পড়েছে। ১/১১-এর পরে এটা আরো বেশি জাতির নজরে পড়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনে আমরা কেন গোলাম, যারা প্রশ্ন করেছে তারাই আমাদের ভূমিকায় (কিছু ক্রটি বিচ্যুতিসহ) অবশ্যই আশান্বিত হয়েছে, এ দলই পারবে জাতিকে কিছু দিতে। আমাদের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়েই মিথ্যে মামলা দিচ্ছে, ৩৬ বছরের পুরনো ইস্যুকে আনার চেষ্টা করছে, তাও আবার নিজেরা নয়, অনির্বাচিত সরকারের কাঁধে পা রেখে পার পাড়তে চাচ্ছে। সচেতন লোকদের জন্য এটাই যথেষ্ট,"বুঝহ সুজন"। কোন জায়গায় ময়লা ছাফ করতে হলে নিজ গায়ে কিছু ছিটে ফোটা ময়লা পড়বেই, সেটা উপেক্ষা করেই সাহসিকতার সাথে এ জাতিকে কল্যাণের দিকে নিতে হবে।

প্রশ্ন-৭ ঃ বলা হয়ে থাকে জামায়াত ধীরে ধীরে এর আদর্শ থেকে দূরে চলে আসছে- এব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি।

উত্তর ঃ ধীরে ধীরে আদর্শ থেকে দূরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। আমরা যে আদর্শের কথা বলছি, তাইতো নিজেরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। কোন কোন লোকের আবেগ বেশি সচেতনতা কম। কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি (উচ্চ শিক্ষিত) আমাকে বলল, দীর্ঘদিন আপনাদের লোকের সাথে চললাম, কোন আকর্ষণ বোধ হচ্ছেনা, অথচ একটা দলের (সংগঠনের নাম নাই বললাম) কথা বললে সেখানে গেলাম, প্রাণের আকর্ষণ পেলাম। জামা কাপড়, চেহারা সুরত প্রাণ জুড়ায়। ইসলামের একেবারে হারাম ''সুদী'' লেনদেন, সে সুদের সাথে (ব্যাংক চাকুরী) ঐ ব্যক্তি জড়িত এটাও ঠিক। আমি বললাম এ বিষয় জানার পর আপনি বলুন বাইরের ডিজাইনের গুরুত্ব কি থাকে? আদালতে আখেরাতে এ "সুরত" দিয়ে পার পাওয়া যাবে?

পরিশিষ্ট-৪

গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ (পি আর ও) সংশোধন অধ্যাদেশ ২০০৮-এর অধীন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনকৃত রাজনৈতিক দলের তালিকা:

১। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

৩। জাতীয় পার্টি

৪। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

৫। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

৬। বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি

৭। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এল ডি পি)

৮। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বি জে পি)

৯। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

১০। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

১১। ইসলামী ঐক্যজোট

১২। বিকল্প ধারা বাংলাদেশ

১৩। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল

১৪। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ

১৫। গণফোরাম

১৬। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জে এস ডি)

১৭। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

১৮। জাকের পার্টি

১৯। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

২০। জাতীয় পার্টি (জে পি)

২১। বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন

২২। গণতন্ত্রী পার্টি

২৩। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ

২৪। খেলাফত মজলিস

২৫। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

২৬। বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট

২৭। বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি

২৮। ন্যাশনাল পিপলস পার্টি

২৯। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল

৩০। ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ

৩১। গণফ্রন্ট

৩২। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

৩৩। ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন

৩৪। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি

৩৫। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)

৩৬। বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

৩৭। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট

৩৮। বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এল.এম)

৩৯। ফ্রিডম পার্টি

উলেখ্য, প্রথম পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ৩৯টি দলের মধ্যে ইসলামিক দল ১২টি।

পরিশিষ্ট-৫

বাংলাদেশের প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের তালিকাঃ

১। ইসলামী ঐক্যজোট

২। ইসলামী ডেমোক্র্যাটিক লীগ

৩। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

৪। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (বর্তমান বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন)

৫। ইসলামী ন্যাশনালিষ্ট পার্টি

৬। ইসলামী গণতন্ত্রী পার্টি

৭। ইসলামী কৃষক পার্টি

৮। ইসলামী গণআন্দোলন

৯। খেলাফত মজলীস

১০। খেলাফত আন্দালন

১১। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

১২। জাতীয় খেলাফত পার্টি

১৩। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

১৪। জাতীয় উলেমা দল

১৫। জেহাদ পার্টি

১৬। নেজামে ইসলাম পাটি

১৭। বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি

১৮। বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ

১৯। বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট

২০। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

২১। বাংলাদেশ জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম

২২। বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন

পরিশিষ্ট-৬

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর অবস্থান

১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯

নং	দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ এবং ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ	২৬৬	১৯,৪১,৩৯৪	১০.০৭%	২০
২	নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি	২	১,৫৭৫	০.০১%	-

৩য় জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ৭ মে, ১৯৮৬

নং	দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১০৩	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫%	৪
২	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৭৬	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১%	১০
৩	ইসলামী যুক্তফ্রন্ট	২৫	৫০,৫০৯	০.৯৮%	-
৪	বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন	৭	২২,৯০১	০.০৮%	-
৫	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩৯	১,২৩,৩০৬	০.৪৩%	-
৬	জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম	১	৫,৬৭৬	.০২%	-
৭	জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি	১	৫,৫৭২	.০২%	-
৮	ইয়ং মুসলিম সোসাইটি	১	১৪১	.০০০৫%	-
৯	বাংলাদেশ ইসলামী রাজনীতি পার্টি	১	১১০	.০০০৪%	-

৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ৩ মার্চ, ১৯৮৮

নং	দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১৩	১,০৫,৯১০	০.৪১%	-

এ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলসমূহ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। জামায়াতসহ প্রধান ইসলামী দলগুলোও নির্বাচন বর্জন করে।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

নং	দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	৪১,৩৬,৬৬১	১২.১৩%	১৮
২	জাকের পার্টি	২৫১	৪,১৭,৭৩৭	১.২২%	-

নং	দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
৩	ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	২,৬৯,৪৩৪	০.৭৯%	১
৪	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩	৯৩,০৪৯	০.২৭%	-
৫	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েনুদ্দীন)	৬	৬৬,৫৭৫	০.২০%	-
৬	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	৩২,৬৯৩	০.১০%	-
৭	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	২৪,৩১০	০.০৭%	-
৮	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলামী ফ্রন্ট	৩	১৫,০৭৩	০.০৪%	-
৯	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৬	১১,০৭৩	০.০৩%	-
১০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৮	২,৭৫৭	০.০১%	-
১১	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশ	২	১,০৩৯	০.০০৩%	-
১২	মুসলিম পিপলস্ পার্টি	১	৫১৫	০.০০২%	-
১৩	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	১	২৪১	০.০০১%	-
১৪	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	৩	২১৪	০.০০১%	-
১৫	বাংলাদেশ ইসলামী বিপবী পরিষদ	১	২০২	০.০০১%	-
১৬	বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিকান পার্টি	১	১৩৮	০.০০০৪%	-

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬

বিএনপি ব্যতীত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ইসলামী দলসমূহও নির্বাচন বর্জন করে।

৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১২ জুন, ১৯৯৬

নং	দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩০০	৩৬,৫৩,০১৩	৮.৬১%	৩
২	ইসলামী ঐক্যজোট	১৬৬	৪,৬১,০০৩	১.০৯%	১
৩	জাকের পার্টি	২৪১	১,৬৭,৫৯৭	.৩৯৫১%	-
৪	জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৮	৪৫,৫৮৫	.১০৭৫%	-
৫	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২৩	২৩,৬৯৬	০.০৫৫৯%	-
৬	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৬	১৮,৩৯৭	০.০৪৩৪%	-
৭	ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন	২০	১১,১৫৯	০.০২৬৩%	-
৮	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (জমির)	২১	৪,৫৮০	.১০৮%	-
৯	ইসলামী আল জিহাদ দল	১	২৮৮	.০০৭%	-
১০	ইসলামিক দল বাংলাদেশ (সাইফুর)	১	২২১	.০০০৫%	-
১১	বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি	১	১৩২	.০০০৩%	-
১২	বাংলাদেশ তানজিমুল মুসলিমিন	১	৮১	.০০০২%	-
১৩	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	২৯	.০০০১%	-

সূত্র : নির্বাচন কমিশন এবং মাহমুদ শফিক, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, বইপত্র, ২০০২, পৃ. ১৬৫-১৭৫।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ১ অক্টোবর, ২০০১

নং	দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোট	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩১	২৩,৮৫,৯০৭	৪.২৯%	১৭
২	ইসলামী ঐক্যজোট	৭	৩,৭৫,৯৮০	০.৬৮%	২
৩	জাতীয় পার্টি (এ) ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট)	২৮১	৪০,৩৭,৯৯২	৭.২৬	১৪ *
৪	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৩০	৯৫৩৪ **	-	-

** ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের প্রাপ্ত ১৪ টি আসনই জাতীয় পার্টির।*

*** ১৬ টি আসনের প্রাপ্ত ভোট।*

পরিশিষ্ট - ৭

বিভিন্ন নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী আসনসংখ্যা

সংসদ	দলের নাম	আসন সংখ্যা
দ্বিতীয়	মুসলিম + আইডিএল	২২
তৃতীয়	জামায়াতে ইসলামী	১৫
”	খেলাফত আন্দোলন	০২
”	ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন	০১
চতুর্থ	বর্জন	-
পঞ্চম	জামায়াতে ইসলামী	২৯
”	খেলাফত আন্দোলন	০১
”	ইসলামী ঐক্যজোট	০১
ষষ্ঠ	বয়কট	-
সপ্তম	জামায়াতে ইসলামী	১২
”	ইসলামী ঐক্যজোট	০১
অষ্টম	জামায়াতে ইসলামী	১৭
”	ইসলামী ঐক্যজোট	০১

পরিশিষ্ট-৮

ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে জামায়াতের প্রাধান্য বিস্তারকারী জেলাসমূহ

১৯৮৬ : রাজশাহী বিভাগ : পঞ্চগড়, দিনাজপুর-১, দিনাজপুর-৩, নীলফামারী, রংপুর, রাজশাহী জেলা, পাবনা, খুলনা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, সাতক্ষীরা।

ঢাকা বিভাগ : শেরপুর।

সিলেট বিভাগ : সিলেট (৫ ও ৬), মৌলভীবাজার (১)।

চট্টগ্রাম বিভাগ : কুমিলা-১০, লক্ষীপুর-৩, রাঙ্গামাটি।

১৯৯১ : রাজশাহী বিভাগ : পঞ্চগড়-২, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট-১, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

খুলনা বিভাগ : মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, নড়াইল, বাগেরহাট, খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা।

বরিশাল বিভাগ : নেই।

ঢাকা বিভাগ : জামালপুর (১ ও ২), শেরপুর-১, ময়মনসিংহ (৬ ও ৭), নেত্রকোনা-৩, কিশোরগঞ্জ-২, গাজীপুর -৩, রাজবাড়ী।

চট্টগ্রাম বিভাগ : কুমিলা (৪,৫,১০,১১ ও ১২), চাঁদপুর -৩, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, কক্সবাজার।

সিলেট বিভাগ : সিলেট-১।

১৯৯৬ : রাজশাহী বিভাগ : দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, রগুড়া, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

খুলনা বিভাগ : মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, নড়াইল, বাগেরহাট, খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা।

ঢাকা বিভাগ : শেরপুর-১, ময়মনসিংহ-৬।

চট্টগ্রাম বিভাগ : কুমিলা-১২, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম (১৪ ও ১৫), কক্সবাজার।

[সূত্র : বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১, এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩]

পরিশিষ্ট-৯

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ও সদস্যের (রুকন) দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

কর্মীর কার্যাবলী:

১. নিয়মিত বৈঠকে যোগদান করা;

২. এয়ানত দেওয়া;

৩. ব্যাক্তিগত রিপোর্ট রাখা ও বৈঠকে পেশ করা;

৪. দাওয়াতী কাজ করা।

সদস্যের (রুকন) দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১ দ্বীন সম্পর্কে অন্তত: এতটুকু জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে যাহাতে তিনি ইসলাম ও জাহিলিয়াত (ইসলামের বিপরীত মতবাদ ও চিন্তাধারা) এর পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন এবং আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়তের সীমা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইবেন।

২ নিজের আক্বিদা- বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজ-কর্মকে কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক গড়িয়া লইবেন। নিজ জীবনের উদ্দেশ্য, মূল্যমান, পছন্দ অপছন্দ এবং আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করিয়া এই সবকিছুকে আলাহর সন্তোষের অনুকূলে আনয়ন করিবেন। আর স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মপূজা পরিহার করিয়া নিজেকে সম্পূর্নরুপে আলাহর বিধানের একান্ত অনুসারী ও অধীন বানাইয়া লইবেন।

৩ আলাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাতের বিপরীত সকল প্রকার জাহিলী নিয়ম-প্রথা ও রসম-রেওয়াজ হইতে নিজেকে সম্পূর্ন মুক্ত ও পবিত্র করিবেন এবং ভিতর ও বাহিরকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে প্রচেষ্টা চালাইবেন।

৪ আত্মম্ভরিতা ও পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে যে সব হিংসা-বিদ্বেষ, ঝোঁক-প্রবনতা, ঝগড়া-ঝাটি ও বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং দ্বীন ইসলামে যেসব বিষয়ে কোনই গুরুত্ব নাই তাহা নিজের অন্তর ও জীবনকে পবিত্র রাখিবেন।

৫ ফাসিক ও খোদাবিমুখ লোকদের সহিত দ্বীনের প্রয়োজন ব্যতীত সকল বন্ধুত্ব-ভালবাসা পরিহার করিয়া চলিবেন এবং নেক লোকদের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।

৬ নিজের সকল কাজ-কর্ম আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্য, সততা ও ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করিবেন।

৭ নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক এলাকার লোকদের মধ্যে দ্বীনি ভাবধারা প্রচার ও প্রসার এবং দ্বীনের সাক্ষ্য দানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

৮ আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং জীবন ধারণের প্রকৃত প্রয়োজন ব্যতীত এই উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে না এমন সকল তৎপরতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন।

পরিশিষ্ট-১০

খেলাফত আন্দোলনের কর্মীগণের নিম্ন লিখিত কর্মসূচী নিয়মিত পালন করার বিধান রয়েছেঃ

দৈনিক:

১ ক. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায় করা এবং তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলা।
খ. ফরজ নামাযের পর অন্তত দশ মিনিট অজিফা, তেলাওয়াত ও দূরূদ শরীফ পড়া।

২. ক. নিয়মিত ব্যায়াম করা
খ. রিযিককে হালালের জন্যে যত্নবান থাকা।

৩. নিয়মিত আন্দোলনের বই কিতাব ও পত্র পত্রিকা পড়া।

৪. প্রত্যহ কাউকে কোন কিছু দান করা কিংবা কারো কোনো উপকার করা ।

৫. পাড়াপড়শী ও আন্দোলনী ভাইদের যথাসম্ভব খোঁজ খবর নেয়া।

৬. রাতে পরিবারবর্গের কাজের হিসেব নেয়া ও নিদ্রার প্রাক্কালে মোহাসাবায়ে নফস (আত্ম পর্যালোচনা) করা।

৭. দৈনিক অন্তত একজনকে খেলাফতের দাওয়াত দেয়া।

সাপ্তাহিক:

১. সাপ্তাহিক বৈঠকে হাজির হওয়া এবং বৈঠকে সপ্তাহের সাংগঠনিক কাজের রিপোর্ট প্রদান করা।

২. প্রতি শুক্রবার জুমআ'র নামাজের প্রাক্কালে ইকামাতে দ্বীন সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত ওয়াজের ব্যবস্থা করা।

৩. অন্তত একজনকে খেলাফত আন্দোলনে শরীক করা ।

৪. আন্দোলন সম্পর্কিত অন্তত একখানা বই পড়ে শেষ করা।

মাসিক:

১. মাসে অন্তত একদিন কোন এক বুযুর্গ আলেমের সান্নিধ্যে থাকা।

২. অন্তত একবার কর্মী ট্রেনিং ও রাত জাগরণে যোগদান করা।

৩. মাসিক রিপোর্ট জিম্মাদারের কাছে প্রদান করা।

বার্ষিক:

১. ঈদ উপলক্ষে পাড়া পড়শী ও গরীব দু:খীদের খোজ খবর নেয়া এবং যাকাত, ফিতরা ও কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে বায়তুল মালের মাধ্যমে গরীব-দু:খীদের ভেতর বিতরণ করা।

২. যার ওপর হজ্ব ফরজ হয়েছে, তার হজ্বব্রত পালন করা এবং যাদের যাকাত ফিতরা ওয়াজিব হয়েছে, তাদের যথাযথভাবে যাকাত ফিতরা আদায় করা।

৩. উর্ধ্বতন সংগঠনের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট ও চাঁদা প্রেরণ করা।

পরিশিষ্ট -১১

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এর কর্মী/ মুবাল্লিগদের দৈনন্দিন কর্মসূচি

১। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায় ও তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

২। ফজর ও মাগরিব নামাযের পর অন্তত কিছু সময় জিকির, অযীফা, তেলাওয়াতে কোরআনসহ নফল ইবাদতের চেষ্টা করা।

৩। নিয়মিত কোরআন-হাদীস, মাছয়ালা-মাছায়েল, আল্লাহর অলীদের কিতাব, আন্দোলনের বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করা।

৪। সাধ্য মোতাবেক চলতে-ফিরতে, ওঠতে-বসতে সর্বদা জিকরুল্লাহ ও দরুদ শরীফ জারি রাখা।

৫। দৈনিক সাধ্যানুযায়ী আন্দোলনের দাওয়াত দেয়া।

৬। দ্বীন কায়েমের নিয়তে প্রতিদিন দু'রাকাত নামাজ (সালাতুল হাজত) আদায় করা।

৭। আলাহর পথে কম করে হলেও নিয়মিত দান করা ও জান মালের কোরবানীর জন্য আলাহর দরবারে তাওফিক কামনা করা।

৮। প্রতিদিনের পারস্পরিক লেনদেন পরিষ্কার রাখা এবং আচার-আচরণ সুন্দর হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা।

৯। প্রত্যহ কারো কোন উপকার করা।

১০। হালাল রুজি উপার্জন করা ও হারাম থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

১১। অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায়ের চেষ্টা করা।

১২। রাতে ঘুমানোর পূর্বে সমস্ত দিনের কাজ কর্মের এহতেছার (আত্ম সমালোচনা) করে ভুল-ত্রুটির জন্য আলাহর দরবারে এস্তেগফার ও ভাল কাজের জন্য শুকরিয়া আদায় করা।

১৩। ঘুমানোর সময় অজু রেখে সুরায়ে ফাতেহা ও সুরায়ে এখলাসসহ দোয়া দরুদ পড়ার অভ্যাস করা।

পরিশিষ্ট-১২

এরশাদের সামরিক শাসনামলে সংবিধান সংশোধনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে জামায়াতের বক্তব্য সম্বলিত লীফলেট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সামরিক সরকার ও রাজনৈতিক সংলাপ

সামরিক সরকার দেশের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাচ্ছে। এ উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের বিবেচনার জন্য কিছু কথা পেশ করা কর্তব্য মনে করছে।

এক বছর আগে বর্তমান সামরিক সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দুর্নীতি দমন ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ঘোষণা করেই এ সরকার ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু সরকারি দায়িত্ব এমনই ব্যাপক তৎপরতা দাবি করে যে, স্বাভাবিকভাবেই কর্মের পরিধি বেড়ে যায়। ফলে জাতীয় আদর্শ, শিক্ষানীতি, পলিটিক্যাল সিস্টেম, সরকার গঠন পদ্ধতি, জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বের ধরন, ভূমি অবস্থা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়।

সামরিক শাসন নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজন পূরণের জন্যেই আসে। তাই তাড়াতাড়ি গণতান্ত্রিক সরকার বহাল করা সম্ভব হলে মৌলিক বিষয়ের মীমাংসার ভার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া সহজ হয়। সামরিক সরকার সে সব বিষয়ের মীমাংসা করার চেষ্টা করলে ভয়ানক জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ, রাজনৈতিক ময়দানে সে বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক মতভেদ থাকার ফলে সামরিক সরকারের পক্ষে কোন একটা বিশেষ মত সমর্থন করা সম্ভব হয় না।

সশস্ত্র বাহিনী ও জাতীয় ঐক্য

সশস্ত্র বাহিনীই জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। সামরিক সরকার সশস্ত্র বাহিনী দ্বারাই পরিচালিত বলে এ সরকারকে রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে বাঁচিয়ে রাখা জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি। রাজনৈতিক ময়দানে সংগত কারণেই বিভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন ও সংগঠন গড়ে ওঠে। জনগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতের সমর্থক দেখা যায়। সশস্ত্র বাহিনীকে এ জাতীয় রাজনৈতিক মত-পার্থক্য ও বিভেদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে।

সম্প্রতি এ বিষয়ে জাতি এক তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষিত শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে সরকার ও কতক ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একটা দু:খজনক বিতর্ক চালু হয়ে গেল। ১৪ জানুয়ারী এক ওলামা সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে জেনারেল এরশাদ একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই তাঁর মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি সরকারি কোন ঘোষণা করেন নি। কিন্তু তিনি সরকার প্রধান হওয়ায় তার ব্যক্তিগত মতকে ১৫টি রাজনৈতিক দল গুরুত্ব না দিয়ে পারেনি। ফলে ১৫ দলীয় রাজনৈতিক ঐক্য ও তাদের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের সাথে সরকারের এক দু:খজনক সংঘর্ষে পরিবেশ খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। অবশ্য পরে সরকারের সদিচ্ছার ফলে পরিবেশ ক্রমেই উন্নতির দিকে গেছে।

এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সামরিক সরকার ও জনগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে, রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িত না হওয়াই সামরিক সরকারের মর্যাদার জন্য জরুরি। সামরিক সরকার যদি বিতর্কিত বিষয়ে কোন মতের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে চায়, তাহলে সামরিক সরকার স্বয়ং বিতর্কিত হয়ে পড়বে। তাই সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসার দায়িত্ব জনগণের হাতে তুলে দেয়াই নিরাপদ।

নির্বাচনই একমাত্র পথ

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তার মীমাংসা জনগণের দ্বারাই ময়দানেই হওয়া সম্ভব। এর জন্য জাতীয় সংসদের নির্বাচনই একমাত্র পথ। বর্তমান সরকার দেশের শাসনতন্ত্রকে বাতিল না করে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। এখন মূলতবি শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

শাসনতন্ত্রে হাত দিতে গেলে এমন জটিলতার সৃষ্টি হবে যে, শেষ পর্যন্ত দেশ কোন সংকটে পতিত হয় তা বলা যায় না। কারণ, শাসনতন্ত্র এমন এক পবিত্র দলিল যার ওপর জনগণের আস্থা না থাকলে দেশে কোনক্রমেই স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। যে শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত, সে শাসনতন্ত্রই স্বাভাবিকভাবে জনগণের আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হয়। জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া শাসনতন্ত্র কখনো সে মর্যাদা পায় না। দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই রচিত। এ পর্যন্ত যে কয়েকবার এটাকে সংশোধন করা হয়েছে তার কোনটাই আন্‌কনস্টিটিউশন্যাল (শাসনতন্ত্র বহির্ভূত) পদ্ধতিতে করা হয় নি। এসব সংশোধনীর পক্ষে ও বিপক্ষে যত মতই থাকুক, এসব সংশোধনী আইনসম্মত বলে স্বীকার করতে সবাই বাধ্য। কারণ, এসব সংশোধনী হয় জাতীয় সংসদে-গৃহীত হয়েছে আর না হয় গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। তাই বর্তমান শাসনতন্ত্রে যে কোন রকম সংশোধনী আনতে হলে জাতীয় সংসদের প্রয়োজন। যারা শাসনতন্ত্রে সংশোধনী আনতে চান, তাদের জন্য একমাত্র সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমই হলো জাতীয় সংসদ। সংলাপের মাধ্যমে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মতের বিভিন্নতা ব্যাপক। কেউ চান সংশোধন পূর্বকালীন শাসনতন্ত্র। কেউ চান ৪র্থ সংশোধনীর পূর্বের শাসনতন্ত্র। কেউ চান ৫ম সংশোধনীর পরবর্তী, আর কেউ ৬ষ্ঠ সংশোধনীসহ চান। এর মীমাংসা কে করবে এবং কীভাবে হবে?

আগামী শীতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সরকার যদি আগামী শীত মওসুমেই জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য সময় ঘোষণা করে তা হলে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ নির্বাচনমুখী হয়ে পড়বে। নির্বাচনের গুরুত্ব সরকার অনুভব করছে বলেই এ সম্পর্কে একটা সময় ঘোষণা করেছে। সে অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন এখন থেকে আরও দু'বছর পর অনুষ্ঠিত হবার কথা। দেশ, জাতি ও সশস্ত্র বাহিনীর স্বার্থে নির্বাচন এতটা বিলম্বিত হওয়া উচিত নয় বলে আমরা মনে করি।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারলে সামরিক সরকার সকল রাজনৈতিক দল ও জনগণের পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আপন মর্যাদায় বহাল থাকবে।

ইতোমধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে ময়দানে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার সবই নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সিদ্ধান্ত দেবে। এর কোন বিকল্প পথ নেই। রাজনৈতিক

দলের সংখ্যা কমাবার উদ্দেশ্যও নির্বাচনের মাধ্যমেই সফল হতে পারে। এরও কোন বিকল্প উপায় নেই। নিয়মিত নির্বাচন হতে থাকলে দলের সংখ্যা অবশ্যই কমতে থাকবে। নির্বাচনের অভাবেই এ দেশে দলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গণতান্ত্রিক বিশ্বের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলে।

রাজনৈতিক সংলাপের দ্বারা কোন মৌলিক বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা হতে পারে না। বরং তার দ্বারা রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হবারই অশংকা। বিভিন্ন দল প্রত্যেক বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলে সরকার কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ? তাই সংলাপের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে জাতিকে মীমাংসায় পৌছাবার সুযোগ দেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করি।

ফারাক্কা সমস্যা ও নির্বাচন

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক কায়েম করার পথে বেশ কয়েকটি বিষয়ে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে আছে। বিশেষ করে ফারাক্কা সমস্যার সমাধানের জন্য গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খালের প্রস্তাব বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। এ জাতীয় ইস্যুতে সরকারের পেছনে গোটা জাতির সমর্থন প্রয়োজন এবং ব্যাপক গণ-সমর্থন যোগাড় করা নির্বাচিত সরকারের পক্ষে সহজ। সশস্ত্র বাহিনী হলো দেশের সর্বশেষ সম্বল। কূটনৈতিক দরকষাকষির দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনীর হাতে থাকলে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থন পুষ্ট হয়ে জনগণের পক্ষ থেকে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে, তা সামরিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এ কারণেও নির্বাচন তরান্বিত হওয়া প্রয়োজন। এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক যে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ ইসলামকে বিতর্কের বিষয় পরিণত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী জীবনবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হোক, আর বিদেশী আদর্শের অনুসারী হওয়ার দরুনই হোক, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের একটি ক্ষুদ্র সক্রিয় অংশের ঈমান আকিদা দেশের শতকরা ৮৫ জন নাগরিকের অনুরুপ নয়। তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও তারা সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কর্ম তৎপর। রাজনৈতিক অঙ্গণে তারা বহুদলে বিভক্ত হলেও কুরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে তারা ঐকবদ্ধ।

তাই বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শের বিষয়টাকে রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে মীমাংসা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এর মীমাংসা গণতান্ত্রিক পথেই হবে। বিভিন্ন অজুহাতে জনগণের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র করা না হলে নির্বাচনে স্বাভাবিক পথে জনগণই এ বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

রাজনৈতিক সংলাপের আলোচ্য বিষয়

বর্তমান রাজনৈতিক সংলাপের দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামরিক সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে বিষয়টি হলো "রাজনৈতিক আচরণ বিধি"। রাজনৈতিক ময়দানে সুস্থ গণতান্ত্রিক আচরণ বিধিবদ্ধ করার কাজটি এ সংলাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হলে দেশের বিরাট কল্যাণ হতে পারে। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত আচরণ বিধি সরকারের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

এ বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে একটিমাত্র বিষয় মনে হলেও এর ব্যাপকতা এত বিরাট যে, সংলাপের মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পৌছাতে যথেষ্ট সময় লেগে যেতে পারে। বর্তমান সরকার অরাজনৈতিক হওয়ার কারণে এ কাজটি নিরপেক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে বলে

আমাদের আশা। এ কাজটি এত গুরুত্ববহ যে, এর সুফল দেশকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে দ্রুত এগিয়ে নিতে পারে।

সর্বশেষ আমরা দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত আবেগ নিয়ে আবেদন জানাচ্ছি যে, সবাই আল্লাহ পাকের নিকট কাতরভাবে দোয়া করুন যাতে সামরিক সরকার এ বছরের মধ্যেই গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে সন্ত্রাস ও সংকটের হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

প্রকাশকাল: ১৩ই জমাদিউসসানী ১৪০৩ হিজরী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, ২৬ শে মার্চ ১৯৮৩ ইং, ১১ই চৈত্র, ১৩৮৯ বাংলা, বড় মগবাজার, ঢাকা-১৭

পরিশিষ্ট-১৩

Private Members' Bill on NCG Submitted by Jamaat-I-Islami Bangladesh (JIB), 1991

To be Introduced in Parliament

A Bill

Further to amend Article 123 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh

WHEREAS it is expedient further to amend article 123 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh for the purpose herein after appearing:

It is hereby enacted as follows:-

1. **Short title and commencement**:

   i. This Act may be called the Constitution (Amendment) Act, 1992.

   ii. It shal come into force at once.

2. **Amendment of Article 123 of the Constitution**: In the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, after article 123 (4), the following subarticles shall be added:-

   Notwithstanding anything contained in the provisions in this Constitution, on the day of the declaration of the general election of the members of Parliament by the Election Commission under article 123(3)(a) and (b) of this Constitution, the Prime Minister and other ministers in a body shall resign from their offices by placing their resignation letters in the hands of the President.

   After the resignation of the Prime Minister and other ministers from their offices under article 123(5) of this Constitution, the President may with his pleasure appoint a Council of Advisers. This Council of Advisers will act as interim Cabinet.

Provided that the memebers of the Council of Advisers shall not have affiliation with any political party; nor they will be allowed to seek election for the members of Parliament.

Provided also that as soon the President is pleased to appoint the Prime Minister as per article 56(2) of this Constitution, the Council of Advisers so formed be declared abolished.

Statement of Reasons and Objectives:

In view of holding free, fair and impartial election Jamaat-e-Islami Bangladesh, on the 20th day of November, 1983, put forth the demand of a Caretaker Government and presented its formula as well. The demand of Caretaker Government turned into people's demand and as a result the Government of Ershad was compelled to

resign and Caretaker Government was formed. The election of the Parliament held on the 27th February 1991 under the Caretaker Government was free, fair and impartial. In order to institutionalise democracy and to hold free, fair and impartial election in future, it is felt that the national election be held under Caretaker Government. For this reason the amendment of the Constitution has been sought.

Matiur Rahaman Nizami
Leader o the Parliamentary Party
Jamaat-i-Islami Bangladesh
Member of Parliament- 68
Pabna- 1

(Source: Nizam Ahmed, Non- Party Caretaker Governent in Bangladesh-Experience and Prospect, UPL,2004, PP, 154-55)

পরিশিষ্ট-১৪

Outline of NCG Proposed by BAI JP and JIB, June 1994

The Outline proposed that on the dissolution of Parliament by the President: The Prime Minister shall resign.

To run the government during the interim period until the election of Parliament and the formation of a new government, the President shall appoint, in consultation with the opposition, an acceptable person as the Prime Minister who, during that period, will administer the country as the Chief Executive under Article 55 of the Constitution.

The Prime Minister of the interim government and his ministers shall not be candidates in the ensuing election, nor can they be members of any political party.

1. The main responsibility of the interim government shall be to ensure a free, fair and neutral election and to carry on the day-to-day affairs of the state and matters of national emergency.
2. The interim government shall stand dissolved as soon as the new Prime Minister is administered the oath of office under Article 56 of the Constitution.

The Outline further proposed that in order to ensure a free and fair election:

1. The Election Commission was to be reconstituted and re-established in such a manner that it could function as a fully independent body.
2. A self-contained code o conduct for the election was to be framed and its implementation ensured.
3. In order to implement the above two proposals, laws were to be enacted, if necessary.

(Source: Nizam Ahmed, Non- Party Caretaker Goverment in Bangladesh-Experience and Prospect, UPL,2004, P, 161)

পরিশিষ্ট-১৫

জামায়াতে ইসলামীর ১৭ দফা দাবি

প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

পবিত্র কুরআন মজীদ, রসূল (সঃ)-এর জীবন এবং খুলাফেয়ে রাশদীনের আদর্শ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম কতিপয় অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয় বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যখন কোন ইসলামী মাহফিলে বক্তব্য রাখেন তখন ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবেই উল্লেখ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত নেই। ফলে ক্ষমতার রদবদল সত্ত্বেও সত্যিকার অর্থে কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

অন্যদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, নারী নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ যাবতীয় অব্যবস্থা এবং আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের চাপে আমাদের জাতিসত্তা ও স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন। এসব থেকে মুক্তি পেয়ে যদি আমরা একটি জনকল্যাণমূলক উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই তাহলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৭ দফা দাবি প্রণয়ন করেছে, আপনাদের খেদমতে তা পেশ করা হলোঃ

১। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে।

২। বাংলাদেশের সংবিধানে আলাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি সন্নিবেশিত থাকতে হবে।

৩। কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস ঘোষণা করতে হবে।

৪। কাদিয়ানীরা যেহেতু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী মানে না, সেহেতু তাদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার হেফাযতের লক্ষ্যে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ইসলামী চেতনা ও জেহাদী জয্‌বা সৃষ্টি করতে হবে।

৬। ক. বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গাসহ সকল আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে। ফারাক্কা বাঁধ চালু করার পর থেকে এ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা আদায়ের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে ক্ষতি পূরণের মামলা দায়ের করতে হবে।

খ. ভারতে ট্রানজিটের নামে করিডর এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য সার্ককে অকার্যকর করে তথাকথিত উন্নয়ন চতুর্ভূজ বা অন্য নামে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করা চলবে না।

৭। ভারতের মদদপুষ্ট তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী কোন চুক্তি করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোন অবস্থাতেই সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা চলবে না।

৮। সরকারের মূল দায়িত্ব হবেঃ সূরা আল-হজ্জ এর ৪১ নং আয়াত অনুযায়ীঃ

ক. নামায কায়েমের মাধ্যমে জনগণের চরিত্র গঠন,

খ. যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দু:স্থ ও অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান,

গ. সৎ কাজ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা,

ঘ. অসৎ কাজ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ,

ঙ. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভাত-কাপড়-বাসস্থান-শিক্ষা ও চিকিৎসা তথা মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণ,

চ. সকল নাগরিকের জান-মাল-ইজ্জত আব্রু তথা মানবাধিকারের হেফাযত, আইনের শাসন কায়েম, সন্ত্রাস নির্মূলকরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ।

ছ. অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কালাকানুন বাতিলকরণ।

৯। কুরআন-সুন্নাহ্ মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করে তাদের মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে হবে। যৌতুক প্রথাসহ যাবতীয় নারী নির্যাতন কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।

১০। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও উপজাতীয় সকল ধর্মের লোক যাতে স্বীয় ধর্মীয় মতামত ও রীতিনীতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১১। নীতি নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে সুপারিশ করেছে তা দেশের সংবিধান বিরোধী বলে বর্জন করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ গঠন ও জাতীয় উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে মহিলাদের যথাযথ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

১২। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে প্রকৃত অর্থে ওটাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করতে হবে।

১৩। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেঃ

ক. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে হবে।

খ. দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে প্রটেকশন দান এবং যথাযথ বিকাশের সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ. জনগণের শতকরা আশি জনই কৃষক। তারাই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া দেশের সমৃদ্ধি অসম্ভব। কৃষি উৎপাদন লাভজনক করার উদ্দেশ্যে কৃষকদের সুদবিহীন ঋণদান এবং কৃষি সামগ্রী, সার, বীজ ও কীটনাশক সংগ্রহে ভর্তূকী প্রদান করতে হবে।

ঘ. কর্মক্ষম সকল জনশক্তিকে জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখার জন্য যোগ্য হবার সুযোগ দিয়ে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগ করে সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

চ. সকল ধরনের পেশাকে সম্মানজনক গণ্য করতে হবে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যভিচার উচ্ছেদসহ সকল প্রকার শোষণ এবং যাবতীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

১৫। একশ্রেণীর এনজিওর জাতীয় স্বার্থ, নৈতিক ও সামজিক মূল্যবোধ বিরোধী কার্যকলাপ, সুদী ঋণের মাধ্যমে শোষণ ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

১৬। জাতীয় প্রচার মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনকে শিক্ষা বিস্তার এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে টিভি রেডিওতে চরিত্র বিধবংসী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা এবং অপসংস্কৃতির প্রচার বন্ধ করতে হবে।

১৭। যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, মঙ্গল-প্রদীপ প্রজ্জলনসহ সকল প্রকার বিজাতীয় অপসংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

আসুন আমরা দলমত নির্বিশেষে দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৭ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলি। আলাহ্ পাক আমাদের সবাইকে এ মহান আন্দোলনে শরিক হবার তাওফীক দান করুন।আমীন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।

পরিশিষ্ট-১৬

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণাপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

'নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম'

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

এ অধমের আহ্বানে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত মুশতারাকা মজলিসে আমল বা কম্বাইন্ড অ্যাকশন কমিটি বা সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত আজকের এ সাংবাদিক সম্মেলনে আপনারা সমবেত হওয়ায় আমি আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং আপনাদের জানাচ্ছি মোবারকবাদ। দেশ ও জাতির এমন এক চরম ক্রান্তিলগ্নে কোন ঈমানদার দেশপ্রেমিক ব্যক্তি নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই নিছক দ্বীন ও মিল্লাতের হেফাজতের তাগিদে আমরা সম্মিলিতভাবে আপনাদের মাধ্যমে গোটা জাতির বিবেকের কাছে এক বিশেষ আবেদন জানাতে হাযির হয়েছি।

আপনারা জানেন, এই উপমহাদেশে প্রায় হাজার বছর শাসন চালানোর পর মুসলমানরা দু'শ বছর বৃটিশ গোলামীর মর্মান্তিক অভিশাপের শিকার হয়। এ অভিশাপের আঘাতে সচকিত মুসলমানরা গোলামীর শুরু থেকেই খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শে শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ আজাদী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত সে আজাদীর জেহাদে টিপু সুলতান, সৈয়দ আহমদ শহীদ ও হাজী নেছার আলী ওরফে তিতুমীরসহ তাদের উত্তরসূরী হাজার হাজার আলেম ও লাখ লাখ অনুসারী শাহাদাত বশুরু করেন। সে সংগ্রামের শেষভাগে এসে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদল হাসান, মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী এর নেতৃত্বে পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ বিতাড়নের অভিযান চলে। এ অভিযানের ধারা বেয়েই পরবর্তীকালে ওলামায়ে কেরাম, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশপ্রেমিক জনতার অশেষ ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে বৃটিশ বিতাড়ন পর্ব সমাপ্ত হয়।

প্রসঙ্গত উলেখ্য, বৃটিশ বিতাড়ন পর্বের শেষ পর্যায়ে হাকীকুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ:) 'মুক্ত ভারতে' ইসলাম কায়েমের জন্যে উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করেন। যদিও তিনি তাঁর জীবনে উক্ত স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেন নি। তথাপি তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরী মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর নেতৃত্বে ইসলামী হুকুমতের ওয়াদায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র ভূমি পাকিস্তান অর্জিত হয়। অত:পর পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী করাচীতে সর্বদলীয় ওলামা কর্তৃক ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণীত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন চক্রান্তে জেঁকে বসা সামরিক শাসনের অভিশাপ, শাসনতন্ত্রের পর শাসনতন্ত্র রচনা ও বাতিলের মাধ্যমে শোষণ ও বৈষম্যের ন্যাক্কারজনক অভিযান চলল। তার পরিণতিতে সৃষ্ট এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল।

বলাবাহুল্য ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ওয়াদা রক্ষায় পাকিস্তানী শাসকদের ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা জনিত জুলুম ও বৈষম্যের জন্যই অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রনায়করাও যখন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও গনতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করলেন, জাতির হতাশা তখন চরমে পৌছল। আর তারই পরিণতিতে প্রেসিডেন্টের পর প্রেসিডেন্ট, নেতার পর নেতা ও সেনানায়কের পর সেনানায়ক হত্যার নির্মম কর্মকান্ড শুরু হয়ে গেল। অপরদিকে আসমানী গজবের আনাগোনা যথারীতি চালু হয়ে গেল। ইসলামী হুকুমতের অনুপস্থিতির অভিশাপে একদিকে যেমন মদ, জুয়া, ঘুষ, ভেজাল, কালোবাজারী, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, খুন, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি, ব্যভিচার, মুদ্রাস্ফীতি, দূর্মূল্য, ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে দেশ বিপর্যস্ত হল। অপরদিকে তেমনি সাইক্লোন, প্লাবন, টর্ণেডো, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মন্বন্তর সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে চলল। মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দিল সামরিক আর বেসামরিকের ক্ষমতার হাত বদলের দুর্ভাগ্যজনক লীলা-খেলা। এ খেলা দেশ ও জাতিকে ভয়াবহ এক গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে রসাতলে নেবার আশু আশংকাকে তীব্রতর করে তুলল।

আমাদের আর্ন্তজাতির অবস্থা আরও সকরুণ। সীমান্ত প্রহরীদের উপর ভারতীয় প্রহরীদের হামলা এবং বাংলাদেশের সমুদ্র ও আকাশসীমা লংঘন যেন ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফারাক্কা, তালপট্রি, আঙরপোতা ও দহগ্রাম সমস্যা এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ও পর্যবেক্ষন টাওয়ার নির্মানসহ অনেক সমস্যাই প্রতিবেশী ভারতের সাথে সিদ্ধান্তহীনভাবে ঝুলে রয়েছে। এ ছাড়া রুশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদী চক্রের আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বেড়াজালে জড়িয়ে যে কোন মুহূর্তে আমাদের স্বাধীনতা নস্যাত হবার আশংকা রয়েছে। এ ব্যাপারেও অতীত সরকারগুলোর মত বর্তমান সামরিক সরকারও মেরুদন্ডহীনতার পরিচয় দিচেছ। একটি স্বাধীন জাতির বৈদেশিক নীতির অনুসরণের প্রশ্নে যে ধরণের ঈমানী শক্তি ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তা বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পরন্ত তাদের অনুসৃত নীতি চরম পদলেহী, অবমাননাকর ও ভারসাম্যহীন। মুসলিম জাহানের ঐক্যের বাস্তবানুগ ভিত্তি ও বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের সঠিক পদ্ধতি বর্তমান সরকারের চিন্তাভাবনার নাগালের বাইরে অবস্থিত।

মূলত: রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে অতীতের সরকারগুলোর মত বর্তমান সরকারও অদক্ষতা, নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষেত্রবিশেষে সীমাহীন উদাসীনতা প্রদর্শন করায় জাতীয় জীবনের ভিত ধ্বসে পড়েছে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য অর্জিত হওয়া তো দূরের কথা আজ সমাজের প্রতিটি শ্রমিক এবং পেশাজীবি মানুষ বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত এবং বাঁচার সংগ্রামে দিক দিশাহীন। স্বাধীনতার তের বছর পরেও মানুষ আজ মৌলিক অধিকার বঞ্চিত, ভাত কাপড়ের সমস্যাটি আরও জটিলতর রুপ ধারণ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে একদলীয় ও বহুদলীয়, প্রেসিডেন্সিয়াল ও পার্লামেন্টারী, সামরিক ও বেসামরিক ইত্যাকার পদ্ধতির পালানুক্রমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রয়োগ চলছে বিভিন্ন দলের দফাওয়ারী দাবী দাওয়ার বিচিত্র 'নোছখার'। কিন্তু কোন পথেই জনগণের সমস্যার সমাধান হয়নি, আসে নি তাদের মুক্তি। দেশ ও জাতির মুক্তি তাহলে কোন পথে...

বস্তুত: মুক্তির অবধারিত পথ কেবল একটিই এবং তাহচ্ছে আলাহ ও রসূল (সা:)-এর নির্দেশিত বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠন এবং তৌহিদী জনতার ঈমানের সাথে তার সার্বক্ষণিক ও সঠিক অনুশীলন। সকল মানুষ আল্লাহ্ তা'য়ালার দাস

আর মানুষ মানুষের ভাই। তাই মানুষ মানুষের প্রভু হবে না, মানুষের মাঝে থাকবে না কোন ভেদাভেদ, থাকবে না শ্রেণী, জাতি ও গোত্রীয় বৈষম্য। আমাদের জীবনে আজ প্রয়োজন সেই নিখুঁত ইসলাম, যে ইসলাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, গোঁড়ামী এবং কুসংস্কার হতে মুক্ত। যে ইসলাম বৈষম্যের সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে মানব গোষ্ঠীর জন্যে একটি ভারসাম্য ও সুষমাপূর্ণ সুখী সমাজ গড়তে চায়। সে সমাজে থাকবে না অর্থনীতির ভেদবৈষম্য। বরং সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের অধিকার হবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে মানুষ মুক্তি পাবে সামন্তবাদী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সবরকম স্বৈরশক্তির নিপীড়ন থেকে।

দুর্ভাগ্যবশত: আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাদের কারোই আলাহর দ্বীন ও শরীয়তের ইলম ছিল না। ছিল না ইসলাম কায়েমের কোনরুপ সদিচ্ছা। ফলে এদেশের শতকরা নব্বই জন ইসলামের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও আজও এ মাটিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুপস্থিত। এদেশে ইসলাম যতটুকু এবং যেভাবে রয়েছে, তা রয়েছে কেবল অসংখ্য আলেম ওলামা ও পীর মুরশিদের ঐকান্তিক প্রয়াস ও ত্যাগ তিতীক্ষার কারণে। তবে অতীতেও যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কিছু নামধারী পীর আলেমের মাধ্যমে ইসলামের অপব্যবহার হয়ে এসেছে, এখনও তেমনি যে হচেছ না তা নয়। ইসলামের অপব্যবহার করেছে পুঁজিবাদীরা, সাম্রাজ্যবাদীরা, এমনকি সামরিক শাসকরাও। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে এ মাটিতে আজ পর্যন্ত ইসলামের লালন ও বিকাশ সাধন হয় নি এবং হয় নি বলেই দেশ ও জাতি আজ দিশেহারা, বিপর্যস্ত, এমনকি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন লা'নতে লাঞ্ছিত।

মানবতাবোধহীন সহানুভূতিহীন প্রত্যেক মানুষ আজ চরম সংকটে নিপতিত, বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন। সামাজিক জীবনে ভাইয়ে ভাইয়ে কোন্দল, জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক দলসমূহের হানাহানি এবং সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা সংরক্ষণ ও ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতা উদ্ধারের দ্বন্দ্ব দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা ও ভোগান্তি বাড়িয়েই চলছে। যুগ যুগের বঞ্চিত জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট আদর্শভিত্তিক একটি কর্মসূচি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল-পূর্ণর্দখল কিংবা সংরক্ষণের প্রয়াসে যত উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করা হোক না, অপপ্রয়াস ব্যতীত কিছু হবে না। তবে আজন্ম মুক্তিপিপাসু বাংলার মানুষের মুক্তির নেশা আজ দুর্নিবার। তাই সবরকম স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন আন্দোলনে ও জিহাদ চালিয়ে তারা আজ তাদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্যে খেলাফত কায়েমের মাধ্যমে শোষণ ও জুলুম থেকে চায় চিরমুক্তি। জাহেলী শাসন- শোষণে সৃষ্ট সমস্যা ও তার পরিণতিতে আসমানী গজবরুপে আগত বিপর্যয় বাংলাদেশের মানুষের ভোগান্তিকে আজ শেষ পর্যায়ে পৌছিয়াছে।

এমনি এক দুর্যোগময় মুহূর্তে দ্বীন ও মিল্লাতের হেফাজতের তাগাদায় আমি তওবার ডাক দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ময়দানে অবতীর্ন হয়েছিলাম। অত:পর নির্দলীয় হিসাবে দলমত নির্বিশেষে গোটা জাতিকে খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালাম। জাতীয় নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক ডেকে ইসলামী হুকুমতের তিন দফা কর্মসূচি পেশ করলাম। সামরিক সরকার প্রধানের কাছে খোলা চিঠি দিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানালাম। নির্ধারিত সময়ে তিনি আমার আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় জেহাদের তৃতীয় ধাপ ঘোষণা করলাম। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বান জানালাম খেলাফত প্রতিষ্ঠার এ জিহাদে শরীক হওয়ার জন্যে। আলহামদুলিলাহ্ আমার এ আহ্বানের ফলশ্রুতি আজ আপনারা সব ক্ষেত্রে কম বেশী প্রত্যক্ষ করছেন। কিন্তু সামরিক সরকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তার স্বৈরাচারী তান্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্ট যে, বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের মাধ্যমে সংকট উত্তরণ সুকঠিন। তাই আজ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ অধমের নেতৃত্বে দশটি দ্বীনি, রাজনৈতিক ও যুব সংগঠনের সমন্বয়ে ইসলামী হুকুমতের তিন দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মোশতারাকা মজলিসে আমল বা সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে। আমাদের এ ঐক্য কর্মসূচির ঐক্য, আন্দোলনের ঐক্য, জেহাদী ঐক্য, আমরা আশা করছি অচিরেই আরও অনেক সংগঠন এ পরিষদে যোগ দেবে।

বর্তমানে পরিষদভুক্ত সংগঠনেগুলোর নামঃ

১. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
২. জাতীয় মুক্তি আন্দোলন
৩. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
৪. জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম
৫. খেলাফতে রব্বানী পার্টি
৬. ইসলামী যুব শিবির
৭. ইসলামী যুব আন্দোলন
৮. খাদেমুল ইসলাম জামায়াত
৯. মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুয়াত
১০. মজলিসে দাওয়াতুল হক

উলেখিত সংগঠনগুলোর উলেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ যথা মাওলানা আব্দুর রহীম, মেজর এম.এ. জলীল, মাওলানা আশরাফ আলী, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীন, ব্যরিষ্টার কোরবান আলী, (অবঃ) ক্যাপ্টেন সুলতান উদ্দীন, মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা আযীযুলাহ, মাওলানা হোসাইন আহমদ, মাওলানা হামীদ উলাহ্, অধ্যাপক আখতার ফারুক, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা জাফরুলাহ খান, মাওলানা আবদুল জব্বার, মাওলানা আব্দুল হাই, আহমদ আবদুল কাদের, হাফেজ হেমায়েত উদ্দীন প্রমুখ এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আপনাদের প্রাসংগিক প্রশ্নের উত্তর সংশিষ্ট নেতার কাছ থেকে পাবেন।

এ পরিষদের চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আলাহ্ ও রসূলের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এবং আশু লক্ষ্য হচ্ছেঃ

১. অনতিবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবিদের সমন্বয়ে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন।

২. বাংলাদেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ' ঘোষণা করা।

৩. হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে খসড়া ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে শাসনতন্ত্রের উপর জনমত গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

অবশেষে আমি সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে বাংলাদেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির এই দুর্যোগময় মুহূর্তে ওলামা মাশায়েখ, আইনজীবি, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মসীজীবী, অসিজীবী, লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক, ছাত্রসহ, সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে

ঐক্যবদ্ধভাবে বর্তমান অবৈধ ও অনৈসলামিক শাসন উৎখাত করার জেহাদে অংশ গ্রহনের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর। তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করে কোটি কোটি ভুখা- নাংগা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান এবং মানবিক ও আধ্যাতিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনের জন্যে দেশ ও জাতিকে আজ আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-এর নির্দেশিত পথেই এগিয়ে যেতে হবে। এর বিকল্প কোন পথ নেই।

আসুন! আমরা সকল প্রকার খোদায়ী লা'নত এবং মানবীয় জিল্লতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে খেলাফতে রাশেদার আদর্শে দৃঢ় ঈমানের সাথে এগিয়ে চলি। আমাদের এ জেহাদে বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী দল বা শ্রেনীর বিরুদ্ধে নয়। এ জেহাদে দ্বীন ও মিল্লাতের হেফাজতের জেহাদ, এ জেহাদ দেশের স্বাধীনতা ও, মর্যাদার জেহাদ। পরম করুনাময় আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের সকল শক্তির উৎস। আল্লাহর পথে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

নাছরুম মিনাল্লহি ওয়া ফাতহুন কারীব।

আহ্‌কার

মুহাম্মাদুল্লাহ্ (হাফেজ্জী হুজুর)
আমীর, মোশতারাকা মজলিসে আমল
(সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ)

(সূত্রঃ হাফেজ্জী হুজুর রহ. স্মারকগ্রন্থ, ২০০৫, পৃ. ৯৬৪-৬৮)

পরিশিষ্ট-১৭

বৃটিশ-ভারত কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত মাওলানা মওদূদীর তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব

প্রথম প্রস্তাব: দুই বা তার অধিক জাতির দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সঠিক ও সুবিচারপূর্ন পদ্ধতি নিম্নরুপ:

এক ঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের (International Federation) মূলনীতির ভিত্তিতে। অন্য কথায় এটা একটি মাত্র কোন জাতির রাষ্ট্র হবেনা। বরঞ্চ চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের একটা রাষ্ট্র (A state of Federated Nations)।

দুইঃ এ ফেডারেশনের শরিক প্রত্যেক জাতি সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের (Cultural Autonomy) অধিকারী হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি তার জীবনের বিশেষ পরিমন্ডলে অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার সংশোধনের জন্যে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

তিনঃ সকলের জন্য সমান এমন আঞ্চলিক বিষয়সমূহের জন্য যে কর্মপদ্ধতি তৈরী করা হবে তা হবে সমঅংশীদারিত্বের (Equal Partnership) ভিত্তিতে।

সংস্কৃতিক স্বায়ত্বশাসনের মূলনীতি হবে নিন্মরূপ

১। যে সব জাতি নিয়ে ফেডারেল রাষ্ট্র হবে তার প্রত্যেকটি সার্বভৌম (Sovereign) হবে, অর্থাৎ সে তার কাজের পরিসীমার মধ্যে আপন এখতিয়ার খাটাতে পারবে।

২। শিক্ষা, ধর্মীয় বিষয়দি (যথা- মসজিদ, উপসনালয়, ধর্মীয় নির্দেশনাবলী আপন জাতির লোকের উপর কার্যকর করা এবং নির্দেশ লংঘন করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা) বিশেষ সাংস্কৃতিক, সামাজিক বিষয়াদি (যথা- বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার) এবং জাতীয় সামাজিক ব্যবস্থা, (National Social System) প্রত্যেক জাতির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকবে এবং কেন্দ্রের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।

৩। এসব উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জাতির পৃথক পৃথক জেলা ও প্রদেশ ভিত্তিক কাউন্সিল থাকবে। এ সবের উপর থাকবে একটি সুপ্রীম কাউন্সিল। উপরোক্ত বিষয়গুলি এসব কাউন্সিলে পেশ করা হবে এবং এসব স্থান থেকেই সে সবের জন্য আইন বিধি অনুমোদন করা হবে। এসব আইনের মর্যাদা দেশীয় আইন থেকে কম মর্যাদাশীল হবে না। এসব কার্যকর করার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো (Executive structure) থাকবে এবং জাতীয় কাউন্সিলের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আইন শৃংখলা ব্যয়ভার বহনের জন্যে কর আরোপ করার ও তা আদায় করার পূর্ণ এখতিয়ার এ জাতীয় ব্যবস্থায় থাকবে। দেশের রাজস্ব তহবিল থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রত্যেক জাতির জন্য বরাদ্ধ করা হবে। যেমন ফেডারেল রাষ্ট্র সমূহ এবং ফেডারেল কেন্দ্রের মধ্যে অর্থ বন্টন হয়ে থাকে।

৪। চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের (Federated Nations) মধ্যে অথবা ফেডারেশনের কোন অংশ ও কেন্দ্রের মধ্যে কোন আইন সম্পর্কিত বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা ফেডারেল কোর্ট (Federal Court) করবে।

৫। নিজেদের বিশেষ আইন অনুযায়ী বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রত্যেক জাতির স্থায়ী বিচার ব্যবস্থা থাকবে। আর দেশের কোর্টগুলোর তার পরিপূর্ণ বিচারের এখতিয়ার থাকবে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্ন আসে। এ সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্যরূপে 'সমঅংশীদারিত্বের' নীতির ভিত্তিতে হবে কারন এ হচ্ছে সর্বভৌম জাতিসমূহের ফেডারেশন। কোন একটি জাতির একক শাসন ব্যবস্থা নয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

যদি আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের এ কাঠামা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে দ্বিতীয় এ হতে পারে যে, বিভিন্ন জাতির জন্য পৃথক পৃথক ভূমিখন্ডের সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে, যেখানে তারা তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বসাতে পারে। অধিবাসী বিনিময়ের জন্যে পঁচিশ বছর অথবা কমবেশী দশ বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অধিক পরিমাণ অভ্যন্তরীন স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে হবে। ফেডারেল কেন্দ্রের অধিকার কম করা হবে। এ অবস্থায় আমরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে মিলে একটা ফেডারেল রাষ্ট্র বসাতে শুধু রাজীই হবে না, বরঞ্চ একে প্রাধান্য দেব।

তৃতীয় প্রস্তাব

এ প্রস্তাবও যদি গৃহীত না হয় তাহলে সর্বশেষ দাবী আমাদের এই হবে যে, আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রগুলো পৃথক পৃথকভাবে গঠন করা হোক। তাদের একটা পৃথক ফেডারেশন হবে। এমনি হিন্দু রাষ্ট্রগুলোরও একটা পৃথক ফেডারেশন হবে। তারপর এ দুই অথবা ততোধিক ফেডারেশন রাষ্ট্র গুলোর মধ্যে এক ধরনের কনফেডারেশন (Confederation) হতে পারে, যেখানে বিশেষ বিশেষ খাতে যেমন প্রতিরক্ষা, পরিবহন ও বাণিজ্যিক সম্পর্কিত বিষয়ে নিদিষ্ট শর্তে সহযোগিতা হতে পারে।

(সূত্রঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, আব্বাস আলী খান প্রকাশনা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ- ১৯৯৬ পৃ. ৬৭, ৬৮)

পরিশিষ্ট -১৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে

- পৃথক পার্বত্য মন্ত্রণালয় হবে। মন্ত্রী হবেন উপজাতি।
- তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরীষদ গঠিত হবে।
- আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের চেয়াম্যান হবেন উপজাতি।
- সকল ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে উপজাতিদের, বাকী এক তৃতীয়াংশ থাকবে অ-উপজাতীয়দের
- আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী হবেন উপজাতি।
- পার্বত্য ভূমি বন্দোবস্ত, ক্রয় বিক্রয় ও ইজারা দিতে পরিষদের অনুমোদন লাগবে।
- পরিষদের সম্মতি ছাড়া কোন জমি সরকার অধিগ্রহণ কিংবা হস্তান্তর করতে পারবেনা।
- সকল সরকারি, আধাসরকারি, পরিষদ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদের এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয়রা অগ্রাধিকার পাবে।
- সেনা- বিডিআর ও আনসারদের সকল আস্তানা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে।
- আত্মসমর্পণের পর প্রত্যেক শান্তিবাহিনী সদস্যকে ৫০ হাজার টাকা করে দেয়া হবে।
- ভূমিহীন এবং ২ একর পর্যন্ত ভূমির মালিকদের আরো ২ একর করে জমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে। অউপজাতীয়দের দেয়া বিভিন্ন প্রকারের ভূমি যথাযথভাবে ব্যবহার না হয়ে থাকলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।
- তিন পার্বত্য জেলার আইন শৃংখলা, প্রশাসন, উন্নয়ন সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করবে আঞ্চলিক পরিষদ।
- ভূমিকর, টোল নির্ধারণ ও আদায়ের এখতেয়ার পরিষদের কাছে থাকবে।
- খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কাশণের মাধ্যমে প্রাপ্ত রয়্যালটি পাবে আঞ্চলিক পরিষদ।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহবায়ক জনাব আবুল হাসনাত আবদুলাহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জণসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

(সূত্রঃ ইনকিলাব, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

পরিশিষ্ট-১৯

চার দলের শীর্ষ নেতাদের যৌথ ঘোষণা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমরা বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক দল প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর গোলাম আযম ও ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান আজিজুল হক আমাদের নিজ নিজ দল, জোট ও সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং আর্থ সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে দেশবাসীর পক্ষে ঘোষণা দিচ্ছি যে, একের পর এক জনস্বার্থ বিরোধী, রাষ্ট্রঘাতী, সংবিধান বিরোধী, জনগণের ধর্ম বিশ্বাস বিরোধী, স্বৈরাচারী ও অমানবিক কর্মকান্ড এবং সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত ক্ষমতাসীন সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সকল বৈধতা হারিয়েছে

আমরা সম্মিলিতভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি, যেহেতু আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা –সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখন্ডতা বিপন্ন এবং

যেহেতু এই সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির সুষ্ঠু ও অবাধ পরিবেশ ধ্বংস করে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দলীয় অস্ত্রবাজির এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সকল নাগরিকের জীবন, সম্পদ এবং নারীর সম্ভ্রম বিপন্ন করেছে এবং

যেহেতু সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন এবং

যেহেতু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার, ভয়-ভীতি ও নির্যাতনের মাধ্যমে একদলীয় ফ্যাসিবাদী কায়দায় রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সরকার রাজপথ দখলের নামে সরাসরি সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছে, সমগ্র জাতিকে সরকারের মদদপুষ্ট দলীয় লোকদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি করেছে এবং এই সরকারের অত্যাচার-অনাচার, জেল, জুলুম, নির্যাতন, হয়রানি ও মিথ্যা মামলার কারণে মানবাধিকার লংঘন চরম পর্যায়ে পৌছেঁছে এবং হাজার হাজার বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের কারাবন্দী করা হয়েছে এবং তিনশোরও বেশী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং

যেহেতু শুধু নিরস্ত্র মিছিলের উপরেই নয়, সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উপরও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে সরকার গণতান্ত্রিক নীতিবোধের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে, এমনকি সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যার অপচেষ্টা করতেও সরকার দ্বিধা করেনি,

এবং যেহেতু এ সরকার তাদের একান্ত বশংবদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পবিত্রতা সম্পূর্ণভাবে কলূষিত করেছে, এ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনসহ কোন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, ক্ষমতাসীন দল জনগণের ভোটাধিকার ছিনতাই করে নির্বাচনকে কী নিদারুণ প্রহসনে পরিণত করতে পারে লক্ষীপুর, মিরেরসরাই, পাবনা, ফরিদপুর এবং টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচন তার সর্বশেষ জঘন্য উদাহরণ। বিরোধী দলসমূহের

৪ দফা দাবী উপেক্ষা করে একদলীয় একতরফা ভোটবিহীন পৌরসভা নির্বাচন করে জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান হীনতম দলীয়করণের শিকারে পরিণত করেছে; এবং যেহেতু জাতীয় সংসদকে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে এবং আইনের শাসনকে আজ দলীয় শাসনে পরিণত করা হয়েছে এবং

যেহেতু একটি বিশেষ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি অনুসরণের কারণে আজ আমাদের নিজস্ব জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার দরুন অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং সরকারের আত্মঘাতী নীতির কারণে দেশে জাতীয় এবং বিদেশী নতুন পুঁজি বিনিয়োগ স্থবির হয়ে গেছে এবং যেহেতু ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং

যেহেতু সরকারের প্রভু-তোষণ নীতির ফলে বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের চোরাবাজারে পরিণত হওয়ায় দেশের অধিকাংশ শিল্পখাত একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে আর বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছে এবং

যেহেতু সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে এবং বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং

যেহেতু একদিকে সার, বিদ্যুৎ ও কীটনাশক ঔষুধসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত না করার ফলে কৃষক সমাজ এবং কৃষি খাত আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং গ্রামের মানুষ অপুষ্টি, অভাব ও আয়ের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে এবং যেহেতু আজ তিন কোটি কর্মক্ষম বেকার যুবকের জন্য সরকার কর্মসংস্থানের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং

যেহেতু শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার নানা অপচেষ্টায় সরকারের যোগসাজশ সুস্পষ্ট, এবং মজুরী কমিশনের সুপারিশ প্রণয়ন ও শ্রমিকদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের কোনই উদ্যোগ নেই এবং

যেহেতু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাদের প্রতিনিধিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাকরীচ্যুৎ ও জেলে পুরে সরকার তাদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করছে, এবং তিন বছর ধরে পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কর্মচারীদের সাথে শঠতা করছে এবং

যেহেতু ক্ষমতায় এসেই এ সরকার শেয়ার মার্কেটে ফটকাবাজারীর সুযোগ ও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ক্ষমতাসীনদের দেশীয় দোসর ও বিদেশী মহাজনরা সাধারণ মধ্যবিত্ত হাজার হাজার পরিবারের আজীবনের সঞ্চয় লুণ্ঠন করে নিয়েছে। পুঁজি বাজারের সংকটে শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে এবং

যেহেতু এই সরকার রাষ্ট্রঘাতী লক্ষ্যে আমাদের জাতিগঠনমূলক সকল প্রতিষ্ঠান যথা বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, শিল্প ও বাণিজ্যিক কাঠামোসমূহকে একে একে পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং

যেহেতু সরকার উচ্চ আদালতকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। বিচারকদের জবাবদিহিতার ভূয়া প্রশ্ন তুলে বিচারকগণকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও মর্যাদাহীন করতে চাইছে এবং

যেহেতু সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে সরকার সংবাদপত্রের জবাবদিহিতার ধুয়া তুলে পর্দার অন্তরালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা করছে। সমালোচনাকারী সাংবাদিকদের বেছে বেছে জীবননাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে এবং যেসব সংবাদপত্র সরকারের দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশ করছে ও সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরছে, তাদের বিজ্ঞাপনের প্রাপ্য কোটা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং

যেহেতু জাতীয় রেডিও এবং টেলিভিশনকে সরকার দলীয় প্রচার, বিরোধীদলের চরিত্র হনন ও নির্লজ্জ মিথ্যাচারে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে এবং

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সরকার সংবিধান লংঘন করে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ও নতুন অশান্তির বীজ বপন করেছে এবং দেশের এক দশমাংশ ভূখন্ড রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করার ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছে এবং

যেহেতু তথাকথিত পানি চুক্তিতে গঙ্গার পানির হিস্যার গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তার কোন বিধান এবং চুক্তি ভঙ্গের বিষয়ে কোন সালিশের ব্যবস্থা না রেখে সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং

যেহেতু দলীয়করণ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ও পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অসহায় মানুষকে জিম্মি এবং ছাত্রীদের সম্ভ্রমহানির হীন ক্ষেত্রে পণ্ডিরুত করা হয়েছে এবং

যেহেতু সরকার ইসলামী মূল্যবোধ এবং সকল ধর্ম বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও আলেম সমাজের ওপর ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এবং

যেহেতু সরকারের মন্ত্রী, এমপি, উপদেষ্টা, দলীয় মদদপুষ্ট দালাল এবং অসৎ ব্যক্তিদের সীমাহীন দুর্নীতি ও অস্ত্রধারীদের চাঁদাবাজি দেশের আর্থ সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন ও দুঃসহ করে তুলেছে এবং যেহেতু ট্রান্সশিপমেন্টের নামে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতকে করিডর দেয়ার উদ্যোগ নিয়ে সরকার জাতীয় স্বার্থ ও অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং

যেহেতু সরকার আমাদের সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের আক্রমণ, বিডিআর সদস্য ও নাগরিকদের হত্যা, জমি এবং সম্পদ দখলের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে;

সেহেতু আজ সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, কৃষিজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আলেম-উলামা, ডাক্তার, আইনজীবী, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, মহিলা, সংস্কৃতিসেবী ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর জনসাধারণের একটি মাত্র দাবি। আর তা হলো, বর্তমান সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে সাংবিধানিক নিয়ম মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতি, আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রক্ষার এটাই আজ একমাত্র শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথ।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নূন্যতম পর্যায়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রেখে ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে আমাদের

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শামিল হতে হবে। তাই আমাদের চার দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই যে, যথাসত্বর ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে একটি দেশপ্রেমিক ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শক্তিশালী সরকার গঠন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা।

এই ভবিষ্যত সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার" – সাংবিধানের এই মূলনীতি সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন; কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন; প্রশাসনিক শৃংখলার পুনরুদ্ধার; সর্বস্তরে মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি; অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ দমন ও সকল নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধান; আইনের শাসন পুনরুদ্ধার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা, বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল, শিক্ষার মান ও পরিবেশ পুনরুদ্ধার; সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা; রেডিও টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান; দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ; সর্বক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মান ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা; মানবসম্পদ উন্নয়ন; সংবিধান, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলোর বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা; কৃষক শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন; বিপুল বেকার যুব সমাজের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখে সকল জনগণের সঞ্চয় ও জীবন মানের সুরক্ষা; নারী সমাজের অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এবং শিশুদের সুন্দরতম জীবন বিকাশের সুযোগ নিশ্চিতকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও বহুমুখী শক্তি সঞ্চয়; প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুনিয়ন্ত্রণ; সংবিধানের মূলনীতি পরিপন্থী সকল আইন সংশোধন; সর্বসম্প্রদায়ের নাগরিকের জন্য আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধান; এবং জাতীয় স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

আমাদের সমগ্র জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। আমাদের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের জয় হবেই, ইনশাআল্লাহ। সরকারের মনে রাখা উচিত, জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলনের মধ্যে দিয়েই সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হতে পারে। সংঘাতের পথ বিপর্যয়ই ডেকে আনে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান এক দফার আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। চক্রান্ত যত কুটিলই হোক, নির্যাতন যত বর্বরই হোক, জনজোয়ার কখনও স্তব্ধ হয় না।

আমরা দেশের সকল জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রকামী, ইসলামী দল, গ্রুপ, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র, সকল পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী সংগঠন ও ব্যক্তিকে চলমান গণআন্দোলনে শামিল হবার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আমাদের আন্দোলনের বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা দেশ জুড়ে সকল মহল্লায়, গ্রামে, শহরে ও বন্দরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহবান জানাচ্ছি।

বেগম খালেদা জিয়া	**হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ**	**গোলাম আযম**	**আজিজুল হক**
চেয়ারপার্সন	চেয়ারম্যান	আমীর	চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	ইসলামী ঐক্যজোট

পরিশিষ্ট- ২০

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের উদ্দেশ্যে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আহবান

বোমাবাজরা দেশ, গণতন্ত্র ও ইসলামের দুশমন এদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করুণ।

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুলাহ্‌।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, সাম্প্রতিককালে ইসলামের নামধারী কয়েকটি ভুইফোড় সংগঠন বোমাবাজি, মানুষ হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে দেশে অরাজকতা ও আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়া'তুল মুজাহিদীন (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ, জাগ্রত মুসলিম জনতা এসব সন্ত্রসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত বলে গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়। এছাড়া তারা নিজেরাও প্রচারপত্র বিলি করে ঘটনার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করছে। এরা ১৭ আগস্ট একযোগে সারাদেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ৩ অক্টোবর চাঁদপুর, লক্ষীপুর ও চট্টগ্রামে এবং ১৯ অক্টোবর সিলেটে আদালতের বিচারককে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালায়। ১৪ নভেম্বর তারা ঝালকাঠিতে বোমা মেরে ২ জন বিচারককে নির্মমভাবে হত্যা করে। সর্বশেষ ২৯ নভেম্বর গাজীপুর ও চট্টগ্রামের আদালত প্রাঙ্গণে এবং পুনরায় ১ ডিসেম্বর গাজীপুর জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত ৪ জন আইনজীবীসহ ১১জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়।

জেএমবির প্রচারপত্রে দাবি করা হয়েছে তারা আল্লাহর আইন ও ইসলামী শাসন কায়েম করতে চায়। আর এ উদ্দেশ্যেই তারা নাকি বোমাবাজি ও বিচারকদের খুন করছে। যারা ইসলামের নামে বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও মানুষ খুন করে তারা আলাহর আইন কায়েমের জন্য নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধে জঘণ্য ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এ কাজ করছে। বোমাবাজরা ইসলাম বিরোধী শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, আত্মঘাতি বোমাবাজি ও অন্যায়ভাবে মানুষ খুন সম্পূর্ণ হারাম। ইসলাম এসেছে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। ইসলামে জঙ্গিবাদ বলে কোন কিছু নেই। পবিত্র কুরআনে আলাহ্‌ পাক বলেছেন, "তোমরা সমাজে বিশৃংখলা (ফাসাদ) সৃষ্টি করো না... বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের আলাহ্‌ পছন্দ করেন না" (সুরা বাকারাহ-১১, মায়েদা-৬৪)। অন্যত্র আলাহ্‌ তায়ালা বলেছেন, ''যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করলো... সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো" (সূরা মায়েদা-৩২)।

ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাস করে না। আলাহর নবী (স.) শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে জনগণের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে পরিবর্তন এনে তাদের ইসলামের পক্ষে এনেছিলেন। ইসলামের এটাই সঠিক পদ্ধতি। এটাই নবী করীম (স.) এর সুন্নাত। এ সুন্নাত পরিত্যাগ করে যারা আলাহর আইন কায়েমের নামে বোমাবাজি ও সন্ত্রাস করে মানুষ খুন করছে, বিচারক হত্যা করছে তারা যে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এতে কোন সন্দেহ নেই। এরা শুধু ইসলামেরই দুশমন নয়, বাংলাদেশেরও দুশমন। বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এরা নষ্ট করতে চায়।

বর্তমান জোট সরকার ইসলামের নামধারী এসকল সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও তাদের মূলোৎপাটনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐকবদ্ধভাবে এ পরিস্থিতি মোকাবেলার আহবান জানিয়েছেন। এজন্য জনসাধারণকে সচেতন করা একান্তই জরুরি। এ ব্যাপারে আমি শুধু আপনার দায়িত্বটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মসজিদের একজন সম্মানিত ইমাম হিসেবে সন্ত্রাসীদের মুখোশ উম্মোচন করে আপনি যদি মুসলীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তাহলে ধর্মপ্রাণ মানুষ আরো সচেতন হবে বলে আমি আশা করি। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে আপনারা যারা জাতির মহান খেদমত করছেন, তাদের উদ্দেশ্যেও বলতে চাই, আপনারাও আপনাদের শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্রদের বোমাবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

বাংলাদেশ শান্তি ও সম্প্রীতির দেশ। কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এদেশের মানুষ কখনোই বরদাশত করেনি। তাই আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে দেশ, গণতন্ত্র ও ইসলামের দুশমন, অশান্তি সৃষ্টিকারী বোমাবাজদের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

আল্লাহ হাফেজ।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
আমীর
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।
(তারিখ: ৩-১২-২০০৫)

পরিশিষ্ট- ২১

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তৎকালীন দলীয় আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম নিম্মোক্ত কারণসমূহ উলেখ করেনঃ

প্রথমতঃ আদর্শগত কারণেই জামায়াতের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ধারক ও বাহকদের সহযোগী হওয়া সম্ভব ছিলনা। যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে সচেতনভাবে বিশ্বাস করে, তারা এ দুটো মতবাদকে তাদের ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনে করতে বাধ্য। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস দলের আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। জামায়াতে ইসলামী তখন থেকেই এ মতবাদের অসারতা বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে। আর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই হলো ধর্মহীনতা।

দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের অতীত আচরণ থেকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকে এ দেশের এবং মুসলিম জনগণের বন্ধু মনে করা ও কঠিন ছিল। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সংগত কারণেই তাদের যে আধিপত্য সৃষ্টি হবে এর পরিণাম মঙ্গলজনক হতে পারে না বলেই জামায়াতের প্রবল আশংকা ছিল।

তৃতীয়তঃ জামায়াত এ কথা বিশ্বাস করত যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশী হওয়ার কারণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে গোটা পাকিস্তানে এ অঞ্চলের প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে। তাই জনগণের হাতে ক্ষমতা বহাল করার আন্দোলনের মাধ্যমেই জামায়াত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিল।

চতুর্থতঃ জামায়াত বিশ্বাস করত যে, প্রতিবেশী সম্প্রসারণবাদী দেশটির বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচতে হলে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রভূক্ত থাকাই সুবিধাজনক। আলাদা হয়ে গেলে ভারত সরকারের আধিপত্য রোধ করা পূর্বাঞ্চলের একার পক্ষে বেশী কঠিন হবে। মুসলিম বিশ্ব থেকে ভৌগলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং ভারত দ্বারা পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় এ অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জামায়াতের নিকট উদ্বেগের বিষয় ছিল।

পঞ্চমতঃ পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পলিসির কারণে এ অঞ্চলে স্থানীয় পূঁজির বিকাশ আশানুরুপ হতে পারেনি। এ অবস্থায় এ দেশটি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খপ্পরে পড়লে আমরা অধিকতর শোষন ও বঞ্চনার শিকার পশুিরুত হবো বলে জামায়াত আশংকা পোষণ করতো।

জামায়াত একথা মনে করতো যে, ভারতের সাথে সমমর্যাদার লেনদেন সম্ভব হবেনা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব জিনিস এখানে আমদানী করা হতো, আলাদা হবার পর সে সব ভারত থেকে নিতে হবে। কিন্তু এর বদলে ভারত আমাদের জিনিস সমপরিমান নিতে পারবেনা। কারণ রফতানীর ক্ষেত্রে ভারত আমাদের প্রতিযোগী দেশ হওয়ায় আমরা যা রফতানী করতে পারি, তা ভারতের প্রয়োজন নেই। ফলে আমরা অসম বাণিজ্যের সমস্যায় পড়বো এবং এদেশ কার্যত ভারতের বাজারে পরিণত হবে।

ষষ্ঠতঃ জামায়াত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ঠ সমস্যা এবং সকল বৈষম্যের অবসান করতে চেয়েছিল। জামায়াতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌র আইন সৎলোকের শাসন কায়েম হলে বে-ইসলামী, যুলুম ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং অসহায় বঞ্চিত মানুষের সত্যিকার মুক্তি আসবে। এসব কারণে জামায়াতে ইসলামী তখনো আলাদা হবার পক্ষে ছিলনা।

(সূত্রঃ গোলাম আযম, পলাশী থেকে বাংলাদেশ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃঃ-৪০-৪২)

পরিশিষ্ট- ২২

সাক্ষাৎপ্রদানকারী ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের তালিকা

নাম দায়িত্ব/দলের নাম সাক্ষাৎকারের তারিখ

১. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

২. মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ আশরাফ, আমীর, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ১১ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

৩. মাওলানা ফজলুল হক আমিনী, চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্য জোট, ১৬ মার্চ,২০০৮

৪. মাওলানা মোঃ রেজাউল করিম, আমীর, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ৫ মার্চ, ২০০৮

৫. মাওলানা মোঃ মুহিউদ্দীন খান, নির্বাহী সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, ৬ মার্চ,২০০৮

৬. জনাব মকবুল আহমাদ, নায়েবে আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

৭. জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মহাসচিব, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৭ মার্চ, ২০০৮

৮. মাওলানা জাফরুলাহ খান, মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

৯. অধ্যাপক আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ৫ মার্চ, ২০০৮

১০. মাওলানা রাফি উদ্দিন আহমেদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য, জামায়াতে ইসলামী, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

১১. মুহাম্মদ তাসনীম আলম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, জামায়াতে ইসলামী, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

১২. মাওলানা হামীদুলাহ, কেন্দ্রীয় নেতা, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

১৩. মাওলানা আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় নেতা, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৬ মার্চ, ২০০৮

১৪. অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, কেন্দ্রীয় নেতা, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৬ মার্চ, ২০০৮

১৫. মাওলানা ওয়াসেল, প্রেস সেক্রেট্যারী, ইসলামী ঐক্য জোট, ১৬ মার্চ,২০০৮

গ্রন্থপঞ্জী

ক. দলীয় প্রকাশনা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

অষ্টম কেন্দ্রীয় রুকন (সদস্য) সম্মেলন, ২০০৬, আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ ও সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্য, ঢাকা, জুলাই, ২০০৬।

গঠনতন্ত্র, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী, প্রচার বিভাগ, জা ই বা, ১৯৮৪।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা, ঢাকা, জা ই বা, ১৯৯১।

জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ও পরিচিতি, ঢাকা, জা ই বা, ২০০৬।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সদস্য সম্মেলন প্রস্তাব, ঢাকা, জা ই বা, ১৯৮৩।

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ১৯৯৮।

জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উদ্দেশে মাওলানা নিজামীর আহ্বান সম্বলিত প্রচারপত্র, ডিসেম্বর ২০০৫।

পরিচিতি : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা, মার্চ. ২০০৬।

পল্টনের ঐতিহাসিক মহাসমাবেশে আমীর জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ, ঢাকা (২৮ ডিসেম্বর, ২০০৫), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জানুয়ারী, ২০০৬।

মেনিফেস্টো, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৬।

মিডিয়ার মুখোমুখি, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৮।

বুলেটিন, (ইংরেজি), প্রচার বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

সংগঠন পদ্ধতি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯২।

সামরিক সরকার ও রাজনৈতিক সংলাপ, জামায়াত কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্র, ১৯৮৩।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

আমীরে শরিয়তের সমাপনী ভাষণ, জাতীয় সম্মেলন, ১৯৮৩।

গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, কেন্দ্রীয় দফতর, লালবাগ, ঢাকা।

জাতির ক্রান্তিলগ্নে রাজনীতিতে পদার্পণ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দেশবাসীর কাছে হাফেজ্জী হুজুরের ভাষণ।

সত্যের কষ্ঠিপাথরে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

নীতিমালা, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, নভেম্বর, ২০০৫।

পরিচিতি, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, কেন্দ্রীয় দফতর ২/২-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১০০০।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, নভেম্বর, ১৯৯৭।

জাতীয় সম্মেলন '৯৯ স্মারক, ঢাকা, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, অক্টোবর, ১৯৯৯।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪৪/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১০০০।

ইসলামী ঐক্যজোট

নীতিমালা, ইসলামী ঐক্যজোট, ডিসেম্বর, ১৯৯৯০।

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন কী চায়, কেন চায়, কীভাবে চায়, প্রকাশনায়ঃ ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, ডিসেম্বর ২০০৩।

স্মারক, মহাসম্মেলন, ২০০৩, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, পরিচিতি, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৮৫/১- পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০।

ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ

গঠনতন্ত্র, ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ

মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহর (হাফেজ্জী হুজুর) পক্ষে প্রচারিত সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের লীফলেট, ১৯৮৫।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির

কর্মপদ্ধতি।

ছাত্র সংবাদ।

রক্তাক্ত জনপদ।

সংবিধান।

Students Views.

খ. সরকারি প্রকাশনা

Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission Report ; Jatïiæa Sangsad Election, 1986, 1991, 1996, 2001

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৮৬।

সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।

গ. সংবাদপত্র

দৈনিক আমার দেশ

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক খবর

দৈনিক দেশ

দৈনিক নয়াদিগন্ত

দৈনিক পাকিস্তান

দৈনিক প্রথম আলো

দৈনিক যুগান্তর

দৈনিক বাংলার বাণী

দৈনিক সমকাল

দৈনিক সংগ্রাম

দৈনিক সংবাদ

The Bangladesh Observer

The Dawn (Pakistan)

The Hindustan Times (India)

The Independent (Bangladesh)

The Morning News (Pakistan)

The Statesman (India)

ঘ. সাময়িকী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

মাসিক পৃথিবী

শিক্ষক সমিতি পত্রিকা (চ.বি.)

সমাজ নিরীক্ষণ

সাপ্তাহিক পূর্ণিমা

সাপ্তাহিক বিচিত্রা

সাপ্তাহিক রোববার

Asian Survey
Asian Journal of Political Science
Bangladesh Political Studies
Far Eastern Economic Review
The Chittagong University Journal of Social Sciences
The Dhaka Courier
The Wall Street Journal, U.S.A.

ঙ. প্রবন্ধ

ইসলাম মুহাম্মদ নুরুল, "ক্ষুদ্রঋণঃ দারিদ্র দূরীকরণ বনাম সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়ককরণ" সেমিনার স্মারকগ্রন্থ, ২০০৬, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

চৌধুরী, মতিউর রহমান, "শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন" সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ঢাকা, ১লা জানুয়ারি, ১৯৯০।

পাটওয়ারী, মোঃ এনায়েত উল্যা, জঙ্গি তৎপরতা ও বাংলাদেশের রাজনীতির সাম্প্রতিক ধারা, শিক্ষক সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা, ২০০৬।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ জার্ণাল, চতুর্বিংশ ভলিউম, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৬।

পারভেজ ড. মাহফুজ, "বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা" সেমিনার গ্রন্থ, (২০০৭) বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বানু, ইউ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার, বাংলাদেশে জামায়াত-ই-ইসলামী আন্দোলন : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

রশিদ, মোহাম্মদ আবদুর, "ধর্ম ও রাজনীতি : পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ" সমাজ নিরীক্ষণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮২।

শাকিল, এম জহিরুল হক, "বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি", তারেক শামসুর রহমান (সম্পা:) বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, শোভা প্রকাশন, ২০০৯।

হোসাইন, মো: মামুন, "মিডিয়া আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও মুসলমান", ছাত্র সংবাদ, জুলাই, ২০০৭।

Ahmed, Emajuddin, "Current Trends of Islam in Bangladesh" in Society and Politics in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1989.

Alwani, Al, "Missing Dimension in Contemporary Islamic Movement" The American Journal of Islamic Social Science, 12.2, Summer, 1995.

Binder, Leonard, "Crisis of Political Development" In L. Binder (et.al) Crisis and Sequences in Political Development, New Jersey, Princeton University Press, 1971.

Chowdhury, Munir Ahmed, "Induction of State Religion in the Constitution of Bangladesh" in Bangladesh Political Studies, Vol-IX-XIII, 1986-89.

Coleman, James S. "The Political System of the Developing Areas" in G.A. Almond and J.S. Coleman (eds), The Politics of Developing Areas, New Jersey, Princeton University Press, 1971

Fukuyama, Francis, The Primacy of Culture, Journal of Democracy, 6:1 (December) 1994.

Hakim, Muhammed. A. "The Use of Islam as a Political Legitimization Tool: The Bangladesh Experience", 1972-1990" Asian Journal of Political Science, Vol. 6, No-2 1998.

Hasmi, Tajul Islam, "Islam in Bangladesh Politics" in Hussain Mutalib and Tajul Islam Hasmi, Muslim and the Modern State: Case Studies of Muslims in Thirteen Countries, St. Martins Press , New York, 1994.

Huntington, Samuel P. "Will More Countries Become Democratic" Political Science Quaterly, 99:2 (Summer, 1984)

Kabir, Bhuian Md. Monoar, " Islamic Politics in Bangladesh: Internal External Contexts" in Mahfuzul H. Chowdhury, (ed.) Thirty Years of Bangladesh Politics, UPL, 2007.

Kabir, Bhuian Md Monoar, "Resurgence of Religion Political Forces in Bangladesh Polity: A Study of Jammat-i- Islam" in Verinder Grover (eds.) Encyclopaedia of SAARC NATIONS, Deep & Deep Publication, New Delhi, 1997.

Khan, Sadek, BD Can't Slacken Alert in Diplomatic and Security Fronts, Holiday, December 13, 2002.

Lambton, A K S, "Islamic Political Thoughts" in Joseph Shachat and C.E. Bosworth (eds), The Legacy of Islam, Oxford University Press, 1979.

Lapalambara, J. and Myron Weiner, "The Origin and Development of Polical Parties in Their (eds) Political Parties and Political Development, New Jersey, Princeton University, 1967.

Pye, Lucian W. "Political Culture and Political Development" in Lucian W. Pye and Sidney Verba (eds), Political Culture and Political Development NewJersey, PrincetonUniversity Press,1965.

Weber, Max, "Politics as a Vocation" excerpted in A. Pizzorzo (ed), Political Sociology, Penguin Book Ltd. England, 1971.

Weiner, Myron, "The Politics of South Asia" in G. A. Almond and Coleman (eds) The Politics of Developing Areas, New Jersey, Princeton University Press, 1971.

চ. পুস্তক-পুস্তিকা

আউয়াল, মাওলানা আবদুল, *জামাতের আসল চেহারা*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়াহ, *তাবলীগ জামায়াত*, অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ২০০৬।

আফানাসিয়েভ, এ.জি. মার্কসীয় দর্শনঃ সরল রূপরেখা

আবদুল্লাহ, *চরমোনাই পীরের গোপন রহস্য*, আবদুল্লাহ প্রকাশনী, বরগুনা, ২০০৬।

আযম, অধ্যাপক গোলাম, *আমার দেশ বাংলাদেশ*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

_____ *ইসলামী ঐক্য মঞ্চ চাই*, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ১৯৯৮।

_____ *জীবনে যা দেখলাম*, (৩য়খন্ড), কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪।

_____ *জীবনে যা দেখলাম*, (৫ম খন্ড), কামিয়াব প্রকাশনা।

_____ *জীবনে যা দেখলাম*, (৬ষ্ঠ খন্ড), কামিয়াব প্রকাশন।

_____ *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা*, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫।

_____ *জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ১৯৮৭।

_____ *বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস*, কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৬।

_____ *বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ১৯৯২।

_____ *বাংলাদেশের রাজনীতি*, আল আযামী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৩।

আরিফ, রইসউদ্দিন, *উপমহাদেশে ধর্ম রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৯।

আরেফিন, এ.এস.এম.সামছুল, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ইউপিএল, ১৯৯৫।

আলম, অধ্যাপক মোঃ তাসনীম, *ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ২০০৬।

আলম, মাহবুবুল, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৮২।

আসাদ, আবুল, একশ' বছরের রাজনীতি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪।

কালো পঁচিশের আগে ও পরে, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯০।

আহমদ, কামরুদ্দিন, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯২।

আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৯।

ইয়াহ্হিয়া, আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ, *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, কওমি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০।

ইসলাম, মেজর (অব:) রফিকুল, স্বাধীনতার ২২ বছর, কাকালি প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন, সাম্প্রদায়িকতা, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্র ধর্ম*, কলকাতা, ১৯৮৯।

বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪।

করিম, ড. আবদুল, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

_____ *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯।

কামারুজ্জামান, মোহাম্মদ, *অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগ্রামী জীবন*, ১৯৮৯।

_____ *বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ১৯৯৩।

কবির, শাহরিয়ার, *গণআন্দোলনের পটভূমি*, দিব্য প্রকাশনী, ১৯৯৩।

খাঁ, মোহাম্মদ আকরাম, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।*

খান, আব্বাস আলী, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ১৯৯৮।

_____ *জামায়াতে ইসলামী ইতিহাস (১ম খন্ড)*, প্রকাশনা বিভাগ, ২রা জানুয়ারী ১৯৯৬।

_____ *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২।

জলিল, মেজর এম. এ., *জলিলের রচনাবলী*, মেজর জলিল পরিষদ, ১৯৯৭।

নিজামী, মতিউর রহমান, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ২০০৪।

_____ *জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ১৯৯৮।

তালিব, আবদুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪।

তালুকদার, আবদুল ওয়াহেদ, *৭০ তেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, পান্ডুলিপি, ঢাকা, ১৯৯৬।

পাটওয়ারী, মো: এনায়েত উল্যা, *স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা*, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২।

ফারুক, অধ্যাপক আখতার, *মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজ্জী হুজুর*, হিজবুল্লাহ প্রকাশনী, ১৯৮৩।

_____ *বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন*, কেন্দ্রীয় দফতর কর্তৃক প্রকাশিত।

_____ *বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন কী ও কেন*, আল আশরাফ প্রকাশনী, ১৯৮৫।

বিল্লাহ, মাওলানা আরিফ, *তাবলীগ বয়ান (২য় খন্ড)*, ঢাকা, কাশেমিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৯।

ভূঁইয়া, এম. এ. ওয়াদুদ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, রয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৯। মওদূদী,

মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আলা, *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি*, প্রকাশনা বিভাগ, জাইবা, ২০০৪।

_____ *ইসলামী ও জাতীয়তাবাদ*, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০।

_____ ইসলামী সাংস্কৃতির মর্মকথা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯

_____ *উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান* (১মখন্ড) আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৮।

_____ *জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর*, প্রকাশনা বিভাগ, জাইবা, ১৯৯২।

মজিদী, নুর হোসেন, *ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব*, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭।

_____ *মাওলানা আবদুর রহীম (রাঃ) : একটি বিপ্লবী জীবন*, সাথী প্রকাশনী, ২০০৩।

মাদানী, সৈয়দ মোঃ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল, *আলোর বাতিঘর পীর সাহেব চরমোনাই (রহঃ)*, ২০০৭।

মিয়া, ছিদ্দিকুর রহমান, *তাবলীগী ছয় নম্বর*, দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার এন্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৪।

মোহাইমেন, এম.এ. *ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর*, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৪।

মোহাম্মদ, হাসান, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, একাডেমিক পাবলিশার্স ঢাকা, ১৯৯৩।

_____ *তাবলীগ আন্দোলন, তাবলীগ জামায়াত*, কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০০।

_____ *বাংলার সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন*, রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৪।

_____ *বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার আলোকে করিডোর ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট*, ইউনিভার্সিটি পাবলিশার্স, ২০০০।

রব, ড. মোহাম্মদ আবদুর, *বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তথ্য আগ্রাসনঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*।

রহমান, অধ্যাপক মুজিবুর, *কারাগার থেকে আদালতে অধ্যাপক গোলাম আযম*, আল ইসলাহ প্রকাশনী, ১৯৯২।

_____ জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী, আল ইসলাহ প্রকাশনী, ১৯৮৯।

_____ *জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস*, প্রকাশনা বিভাগ, জা ই বা, ২০০১।

রহমান, ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজের ভূমিকাও প্রভাব, (১৯৭২-২০০৯)*,একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৭।

রহমান, তারেক শামসুর, *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক*, শোভা প্রকাশন, ২০০৯।

রহমান, হাফেজ মুহাম্মদ হাবিবুর, *ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, কী চায়, কেন চায়, কীভাবে চায়*, ঐক্য আন্দোলন প্রকাশনী, ২০০৩।

_____ *মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রাঃ)*, মাওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৭।

রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, খন্ড-২*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫।

রাজ্জাক, মাওলানা আবদুর, *আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) জীবনী*, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

রায়, মানবেন্দ্র নাথ, *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান*, শতদল প্রকাশনী, ঢাকা।

রায়না, অশোকা, *ইনসাইড 'র' দি হিস্ট্রি অভ ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস*, ঢাকা মিথারা প্রকাশনী, ১৯৯৩

রিয়াজ, আলী, *শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসংগ*, ঢাকা আনন্দধারা, ১৯৮২।

রেজা, শাহ্ আহমদ ও আবদুর রহীম আজাদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি: প্রকৃতি ও প্রবনতা, ২২ দফা থেকে ৫ দফা*, সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭।

রহিম, এম. এ. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, আহমদ পাবিলিসিং হাউস, ১৯৯৪।

শওকত, মোহাম্মদ নুর হোসাইন, *আই ডি এল একটি বিপ্লবী চেতনা*, ঢাকা, দীয়া প্রকাশনী, ১৯৮০।

শফিক মাহমুদ, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়*, বইপত্র, ২০০২।

হাননান, ড. মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২।

_____ *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

হালদার, গোপাল, *বাঙালী সাংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫।

হাসান, মঈদুল, *মূলধারা '৭১*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৬।

হোসেন, আবু মো: দেলোয়ার, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, প্রেরণা প্রকাশনী, ১৯৯৩।

হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ১৯৯৬।

হোসেন, গোলাম, *বাংলাদেশ: সরকার ও রাজনীতি*, একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯২।

Abootalebi, Ali Reza, Islam and Democracy : State Society Relations in Developing Countries, 1980-1994, NewYork, Gastand Publishers Inc. 2000.

Ahmed Emajuddin, Society and Politics in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1989.

Ahmed, Moudud, Bangledesh : Constitutional Quest for Autonomy, UPL, 1991.

Ahmed, Rafiuddin: The Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Identity, Oxford University Press (Delhi), 1988.

Ahmed Salahuddin, Bangladesh Past and Present, APH Publishers Corporation, New Delhi, 2004.

Ali, Dr A.K.M. Ayub (et al), Islam in Bangladesh Through the Ages, Islamic Foundation Bangladesh, July 1995.

Arnold, T.W. The Preaching of Islam : A History of the Propagation of theMuslim Faith, Lahore.

Asad, Muhammad, The Principles of State and Government in Islam, California, 1961.

Azam, Golam, A Guide to Islamic Movement, Azami Publishers, Dhaka, 1968.

Banu, U.A.B. Razia Akter, Islam in Bangladesh, E.J.Brill, Leiden, NewYork, Koln, 1992.

Binder, Leonard, Religion and Politics in Pakistan, University of California Press, 1963.

Chowdhury, G.W. Islam and the Contemporary World, Academic Publishers, Dhaka, 1991.

Chowdhury, K.C. Role of Religion in Indian Politics, Sundeep Prokashani, Delhi, 1978.

Chowdhury, Mahfuzul H. Thirty Years of Bangladesh Politics, UPL, 2002.

Duverger, Murice, Political Parties : Their Organisation and Activities in the Modern State, London, Methuen and Co. Limited, 1967.

Esposito, John L. Islam and Politics, Syracuse University Press, NewYork.

Gibb, H.A.R Mohammedanism. The New American Library, NewYork, 1955.

Hakim, Muhammed A. The Shahabuddin Intrregnum, University Press Ltd, Dhaka, 1993.

Hand, Robert E. The World Living Religion, NewYork, 1959

Haynes, Jeff, Religion in Third World Politics, Open University Press, Buckingham, 1993.

Hitti, Philip K. Islam and the West, Van Nostrand Company Inc. Princeton, 1962.

Hollway, Richard, Supporting Citizens Initiatives, Dhaka, UPL, 1998.

Huda A.K.M. Shamsul, The Constitution of Bangladesh, Vol.2, Signet Press Limited, 1997.

Islam, Dr. Nazrul, Islam, 9/11 and Global Terrorism, A Study of Perception and Solution Viva Books Private Limited, New Delhi, 2005.

Jahan, Raunaq, Bangladesh Politics : Problems and Issues, University Press Limited, Dhaka, 1980.

Kabir, Bhuian Md Monoar, Politics and Development of the Jamaat-e-Islami Bangladesh, AH Development Publishers House, Dhaka. 2006.

Khan, Dr. Moin-Ud-din-Ahmed, History of the Faraidi Movement, Islamic Foundation Bangladesh, 1984.

Khan, Shamsul Islam, S. Aminul Islam and Imdadul Haque, Political Culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1996.

Laski, H.J. Parliamentary Government in England, Allen & Unnarid Limited, London, 1963.

Laswell, Harold, The Political Writings of Harold Lesswell, The Free Press, Illinois, 1951

MacIver, R.M. The Web of Government, Collier-Macmillan Limited London, 1965.

Mawdudi, Syed Abul Ala, Islamic Law and its introduction in Pakistan, Lahore Islamic Publication Limited, 1983.

Mawdudi, Kilafat wa Mulakiat, Lahore, Idarah Tarjuman al Quran, 1975.

Maniruzzaman, Talukder, The Bangladesh Revolution and its Aftermath, UPL, 1988.

Montagomery, John D. and William J. Siffin, eds. Approaches to Development : Politics Administration and Changes Administration and Changes. Megraw Hill Book Company, NewYork, 1966.

Moten, Abdul Rashid, Political Science: An Islamic Perspective, Macmillan Press Limited, London, 1996.

Organski, A.F.K. The Stages of Political Development, NewYork, 1965.

Parentti, Michael, Inventing Reality the Politics of Mass Media, St. Martin Press, New York, 1986.

Qureshi, I.H. Pakistan First Constitutional Assembly Debates, vol. 5, No 5.

Qureshi, Istiaq Hossain, Ulema in Politics, Renaissance Publishing House, Delhi, 1985.

Rahman, Mohammad Fazlur. The Quranic Foundation and the Structure of Muslim Society, Vol. 2, Karachi, 1977.

Rodee, Carlton Clymer, Introduction to Political Science, Mcgraw Hill Book Company, NewYork, 1976.

Weihrich, Heinz, Harold Koontz, Management, Global Perspective, Mcgrow-Hill International Editions, 1994.

Weiner, Myron, Party Building in a New Nation : The Indian National Congress, Chicago, 1967.

ছ. ধর্মগ্রন্থ

আল কুরআন

হাদীসগ্রন্থ, আবু দাউদ শরীফ

জ. এনসাইক্লোপেডিয়া

International Encyclopaedia of Britannica, Vol. 12, Macmillan, NewYork, 1986.

ঞ. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

রহমান, মোহাম্মদ সাঈদুর, মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ:) : তাঁর রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার, পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

হক, এ.কে.এম. এমদাদুল হক, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ১৯৯১-২০০২: রাজনৈতিক দলসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, এম. ফিল থীসিস, ২০০৩, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

Ahmad, Aftabuddin, The Mujib Regime in Bangladesh: Its Problem and Performances, Ph.D. Dissertation, University of London, 1983.

Chowdhury, Rafiqul Islam, Recruitment of Political Elite and Political Development in India and Nigeria, Ph.D. Dissertation, Oregon, University of Oregon, 1964.

Siddiqui, Mustafizur Rahman, Movement for Democratization in Bangladesh During the Ershad and Khaleda Government, Ph.D. Dissertation, 2002, University of Chittagong.

বাংলাদেশে
ইসলামী রাজনীতির
তিন দশক
(১৯৭১-২০০০)

ISBN: 978-984-90583-0-4